চাক্‌মা জাতি

(জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত)

সতীশ চন্দ্র ঘোষ

সম্পাদক

রঞ্জিত সেন

অরুণা প্রকাশন

২, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯

চাক্‌মা জাতি

(জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত)

সতীশ চন্দ্র ঘোষ

CHAKMA JATI

(Jatiya Chitra O Itibritta)

Satish Chandra Ghosh

প্রথম সংস্করণ

জুলাই ২০০০

প্রকাশক

শ্যামল ভট্টাচার্য্য

অরুণা প্রকাশন

২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

লেজার কম্পোজ ও মুদ্রণ

অরুণা প্রিন্টার্স

২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশকের কথা

অনেক গ্রন্থের মাঝে আমরা কদাচিৎ দু'একটি বই হাতে পাই। এমন বই যাদের বিষয়বস্তু যেমন অনন্য তেমনি তাদের ভাষা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমানকালে ঐতিহ্যকে ফেলে দেওয়ার একটা সর্বনাশা প্রবণতা প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আমরা জানি না বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মানুষ তার ধ্রুপদী ভাবনা-চিন্তাকে কতখানি ও কিভাবে বর্জন করতে চায়। আধুনিক বিশ্ব যে সমাজ উপহার দিতে চায় তা এতই সবিময় যে সেখানে দু'বার ভাবার অবকাশ বিরল। কিন্তু আমাদের প্রাচীন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা, ঋষিরা তো আমাদের ভাবতেই শিখিয়েছিলেন। সেই ভাবনা হবে শতধা, বহুমুখী ও সদা সঞ্চরণমান। আজ আমাদের ভাবনা ভাবছেন গুটি কয় মানুষ, যাঁরা বাণিজ্যিক জগতকে আলো দেখাতে ব্যস্ত, মানুষের মননকে সেভাবে নয়। সুদূর কোন্ এক অঞ্চলের কোন্ এক সংস্কৃতিতে লালিত কোন্ এক ব্যক্তির হাতে আছে এমন যাদুকাঠি যার দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন ভাষা তথা সংস্কৃতির আবহাওয়াতে মানুষ জাত প্রভাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ নিজে বুঝতে এবং ভাবতে ভুলে যাচ্ছে।

আমরা সেই দুরবস্থা হতে একটু রেহাই পেতে চাই। কিন্তু চাই বললেই তো পাওয়া যাবে না চাইবার শক্তিও জানা চাই এবং যেটা চাই সেটা কেমন সেটাও জানা চাই এতসব চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা খুঁজে চলেছি এমন সব বই যেগুলির আবেদন চিরন্তন, যেগুলি জানিয়েছে আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকে যাঁরা বহন করেছিলেন বাংলার সেই বহুকথিত নবজাগরণের আলোকবর্তিতা। ইদানীং পৃথিবী ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকায় আমাদের সেই মনন যেন হারিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য সব ক্ষুদ্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হয়ে। আমরা ক্ষুদ্রকেই বৃহৎ আকার দিতে চাই এবং সেজন্য বেছে নিতে চাই এমন কিছু বই যারা সর্বদাই বৃহৎ।

পাঠক এই বৃহৎ-কে অনুভব করলেই বুঝব ক্ষুদ্রের বৃহৎ প্রচেষ্টা মহৎ।

‘চাকমা জাতি (জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত)’ একটি অনবদ্য গ্রন্থ। বহু গবেষণা, দীর্ঘ পরিশ্রম, গভীর মনোযোগ এবং অদম্য উৎসাহ না থাকলে এমন গ্রন্থ লেখা যায় না। বইটি বাংলার ১৩১৬, ইংরাজি ১৯০৯ সালে মুদ্রিত হয়। লেখক তাঁর ‘নিবেদনম্’-এ জানিয়েছেন যে এই বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করতে তাঁর চার বছর লেগেছিল আর কিছু সময় লেগেছিল লিখতে। যদি ধরে নিই যে তাঁর মোট সময় লেগেছিল প্রায় পাঁচবছর তবে বেশ স্পষ্ট করেই বলা যেতে পারে যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময়কালের আগে-পরেই এ গ্রন্থের তথ্য সঙ্কলনের কাজ শুরু হয়েছিল। এই বইয়ের উদ্দেশ্য শুধু ইতিহাস রচনা নয়, লেখকের কথায় একটি ‘অজ্ঞাত জনমণ্ডলীকে দশের সমক্ষে আনিয়া পরিচিত’ করা। এ এক মহৎ উদ্দেশ্য—একটা Mission। এটি প্রাণিত চৈতন্যের মানবপ্রীতির প্রকাশ, ইতিহাসে যার নজির বড় একটা পাওয়া যায় না। লেখক সতীশচন্দ্র ঘোষ চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলেন। শিক্ষকতায় বছর আষ্টেক কাটতে না কাটতেই তিনি ভালোবেসে ফেললেন সেই পার্বত্য প্রদেশ আর সেখানে বসবাসকারী পাহাড়ি মানুষগুলোকে। অর্থ ও ক্ষমতাশূন্য ব্যক্তির পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বড় কষ্টকর — এ কথা অকপটে স্বীকার করেছেন লেখক। কিন্তু সমস্ত কষ্টকে স্বীকার করলেও অসুবিধার নিরসন হয় না। যে মানুষদের নিয়ে তিনি লিখবেন তারাও সভ্যতার প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠী নয় — তারা অনগ্রসর, সঙ্কুচিত, আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক মানুষ; শিক্ষিত মানুষের সামনে তারা মুখই খুলতে চায় না। সভ্যতাদর্পী মানুষদের তারা ভয় করে। তাদের অনীহা, তাদের জড়তা কাটিয়ে তাদের কাছ থেকে তথ্য আহরণ করা সহজ নয়। লেখক এমনই একটি কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। সে কাজে তিনি সার্থকও হয়েছিলেন যথেষ্ট—রচনা করেছেন একটি অনবদ্য বই, একটি ‘জাতীয় ইতিবৃত্তের সংবাদ’। লেখকের ভাষায় তিনি যা করেছেন তা হল ‘অপূর্ব রহস্য সমাচ্ছন্ন বক্ষ্যমান পার্বত্যজাতির এক অস্পষ্ট ছায়া চিত্রণ’। কৃতী মানুষের এমন নম্রতা, সম্ভ্রমশীল, বিনীত পাণ্ডিত্যের এমন আনত ভঙ্গিমা কি সচরাচর দেখা যায়? বর্তমান গ্রন্থটি একবারে বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। এর বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ভারতী, প্রবাসী, সাহিত্য, কল্পতরু, বৌদ্ধবন্ধু, পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রবন্ধাকারে, মাসে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধগুলিকে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল তার অনেকখানিই সুহৃদবর্গের কাছ থেকে এসেছিল, বিশেষ করে চাকমার রাজা ভুবনমোহন রায় বাহাদুর-এর কাছ থেকেও এসেছিল আর্থিক অনুদান। অর্থাৎ লেখকের কাজ এতটাই অভিনব, এতটাই মহৎ এবং আশ্বাস-উদ্দীপক যে তাঁর পারিপার্শ্বের মানুষজন তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নের নৈরাশ্যকাতর পরিবেশকে কাটাতে সাহায্য করেছিলেন। এমন বিদ্যোৎসাহিতা এখন আর দেখা যায় না। যখন এ গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল তখন লেখকের সামনে বড় কোনো মডেল ছিল

না। Hunter, Risley, Marshman প্রভৃতি পথিকৃৎ গবেষকদের উপর তিনি নির্ভর করেছেন, ভরসা করেছেন Census Report-এর উপর। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, ক্যালকাটা রিভিউ ইত্যাদি পত্রপত্রিকা থেকে তিনি তথ্য আহরণ করেছেন। ঠিক একই ভাবে ব্যবহার করেছেন 'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস। অসংখ্য উপাদানের মধ্যে এতো কয়েকটি মাত্র। বইয়ের পাদটীকা পড়লে বোঝা যায় লেখকের পাণ্ডিত্য কী গভীর! শব্দের ব্যুৎপত্তি, তার প্রয়োগ, তার অর্থ—এ নিয়ে যেমন আলোচনা আছে সেই রকম আলোচনা আছে ইতিহাস, ভূগোল,সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি নানাবিষয় নিয়ে। একটি জাতির পুরাতত্ত্ব লিখতে গিয়ে তিনি প্রতিবেশী নানা জাতির কথা আলোচনা করেছেন। বিষয়ের এমন বিস্ময়কর ব্যাপ্তি ইতিপূর্বে আর কোনো পার্বত্য জাতির ইতিহাসে দেখা যায়নি। এমন সমুদ্র-প্রমাণ গবেষণার উপর কোনো টীকা বা ভাষ্য লেখা যায় না। গ্রন্থটি নিজেই নিজেতে সম্পূর্ণ। তাই এ গ্রন্থকে বুঝবার জন্য চাকমাজাতি সম্বন্ধে কিছু আধুনিক পাঠ নীচে প্রদত্ত হল। পাঠকদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে চাকমারা অত্যন্ত নিপীড়িত জাতি। আধুনিক রাজনীতি ও রাষ্ট্র বিবর্তনের অভিঘাতে তারা জর্জরিত। এ পুস্তক যখন লেখা হয়েছিল তখন দেশ ভাগ হয়নি, ফলে চাকমাদের ভাগ্যও ততটা বিড়ম্বিত হয়নি। আজ দেশভাগের ফলে তারা উৎখাত জাতি — ছড়িয়ে আছে নানা স্থানে — বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে, ভারতবর্ষের ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচলে। তারা হারিয়েছে তাদের বাসভূমি। অসংখ্য মানুষ আছে ত্রাণ শিবিরে। তাদের মধ্যে উত্থান হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে অথচ তাদের ভাগ্য বিপর্যয় কাটেনি—বহুস্থানে তারা উদ্বাস্তু, শরণার্থী — refugee। যাঁরা পৃথিবীর ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে ভাবেন এ বই তাদের ব্যথিত চৈতন্যে প্রলেপ দেবে এই ভেবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যারা ছিন্নমূল, বাস্তুচ্যুত তাদেরও এক দিন আমাদের মতোই বসতি ছিল। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্যবোধ থেকে এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ, চাকমাদের সম্বন্ধে নতুন লেখার অবতারণা। চাকমারা এমন একটি মানব গোষ্ঠী যারা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত, যারা এশিয়ার মানব বৈচিত্রের এক অসাধারণ উপাদান। আব্দুস সাত্তার লিখিত *In the Sylvan Shadows* গ্রন্থটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চলের এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতি ও মানবসম্পদের ধারণা পাবেন। এর সঙ্গে অবশ্যপঠিতব্য গ্রন্থ হল হান্টারের *Statistical Accounts of Bengal*-এর চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চল সংক্রান্ত খণ্ডটি। এই সব গ্রন্থের মধ্যে অনেক তথ্য থাকলেও এঁরা কেউই বর্তমান লেখককে ছাপিয়ে যেতে পারেননি। বাংলার উপজাতীয় মানবসম্পদকে জানার জন্য পাঁচটি প্রকৃষ্ট গ্রন্থরাজি হল—

১. William Wilson Hunter : *Statistical Accounts of Bengal*, 20 vols. [এ ক্ষেত্রে পঠিতব্য Vol. 6]

২. L.S.S. O 'Malley : *Bengal District Gazetteers.*

৩. Edward Twite Dalton : *Descriptive Ethnology of Bengal*

৪. Herbert Hope Risley : *The Tribes and Castes of Bengal.*

৫. R.H. Sneyd Hutchinson : *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers,Chittagong Hill Tracts.*

এই সমস্ত গ্রন্থগুলি লিখিত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমে। তখন ভারতবর্ষের জনজাতিকে নতুন করে জানার ও বোঝার চেষ্টা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শুরু হয়েছিল। ভারতীয় মানবশক্তির অভ্যন্তরকে জানার এই পরিবেশেই বর্তমান গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে। এর বিশেষত্ব হল যে এর মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বকে সামনে রেখে এক সার্বিক পুরাতত্ত্বের ইতিবৃত্ত রচনার প্রয়াস হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৩ পৃষ্ঠার ১ নং পাদটীকায় বুদ্ধদেব ও বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তা Iconography-র বিষয়। আবার ১৯ নং পৃষ্ঠার ২নং পাদটীকায় এবং ২১পৃষ্ঠার সমস্ত পাদটীকায় যা আলোচিত হয়েছে তা সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তাকে পুরাতত্ত্বের আলোচনায় ব্যবহার করা হয়েছে। এই রকম একাধিক শৃঙ্খলাকে জড়িয়ে আলোচনা রয়েছে সমস্ত বইতে। বই-এ ব্যবহৃত পাদটীকার ব্যাপকতা, তার ভার ও গাম্ভীর্য প্রমাণ করে যে লেখক সত্যানুসন্ধানী। তথ্যের ভেতর দিয়ে তিনি সত্যকে খোঁজেন। এটি প্রকৃত ঐতিহাসিকদের ধর্ম। এই অর্থে এই বই একটি প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থ। যেখানে ঐতিহাসিক বিতর্ক রয়েছে সেখানে তিনি সমানভাবে তথ্যসংগ্রহে আগ্রহী—যেমন ২৫ পৃষ্ঠার ৩ নং পাদটীকায়। চট্টগ্রাম কেন ইসলামাবাদ হল তার অতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে এই টীকায়। অনুরূপভাবে ২৯ নং পৃষ্ঠার ১নং পাদটীকায় এবং ৯৪ পৃষ্ঠার ১ নং পাদটীকায় পাঠক পাবেন কর্নফুলী নদীর উপর ছোট একটি ভৌগোলিক আলোচনা। এই রকমভাবে সমস্ত বইজুড়ে ছোট ছোট জ্ঞানের জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে। পাঠকদের জন্য সংগোপনে সঞ্চয় করা হয়েছে অপার্থিব বিস্ময় ও অনাস্বাদিত পুলকের ভাণ্ডার। এমন সার্থক লেখা সহজে মেলে না। এই বইয়ের উপর নতুন কোনো সংযোজন করা সম্ভব নয় কারণ চাকমাজাতির পুরাতত্ত্ব নিয়ে নতুন কোনো তথ্যের উৎখনন ঘটেনি। আধুনিক কালের সমস্ত লেখাই চাকমাদের রাষ্ট্র বিপ্লবজনিত ভাগ্য বিপর্যয় নিয়ে গবেষণা। নীচে আমরা কিছু আলোচনা সন্নিবেশিত করলাম যা পাঠ করলে পাঠকের পক্ষে বর্তমান পুস্তকের দুর্গম অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। বলা যেতে পারে যে নীচে যা দেওয়া হল তা সমস্ত বইয়ের প্রারম্ভিক কথা। মনে রাখতে হবে যে চাকমা জাতি প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত—চাকমা, টংচঙ্গ্যা ও দৈংনাক। আমাদের নীচের আলোচনায় যখনই চাকমাজাতির উল্লেখ হয়েছে তখন সামগ্রিকভাবে তার উল্লেখ হয়েছে, বিশ্লেষিত অর্থে নয়। বর্তমান গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠা অনন্তর এর আলোচনা আছে। চাকমাদের মধ্যে অভ্যন্তর বিভাজন অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না। তবে তাদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠী ছিল এবং তাদের বর্ণনা বর্তমান গ্রন্থের ৪৪-৪৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। এই

বইয়ের আরও দু-একটি বিশেষ দিক আছে। এর মধ্যে কুকিদের সম্বন্ধে নানা তথ্য আছে এবং আছে চাকমা জাতির স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ক আলোচনা (পৃপৃ. ১৩৯-৪১)। এ আলোচনাগুলি বড়ই দুর্লভ। এগুলি জ্ঞান জগতের হীরামাণিক্য। পাঠক-পাঠিকা এর কিঞ্চিৎ লাভ করলেই নিজেদের ধন্য মনে করবেন। এই পুস্তকের পুর্নমুদ্রণের জন্য আমরা অরুণা প্রকাশনের কর্ণধার শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অরুণা ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা এই গ্রন্থ এবং অনুরূপ আরও অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য পুরাতন বই পুর্নমুদ্রণ করে বাঙালি বিদ্যোৎসাহিতার যে পরিচয় দিয়েছেন তার দ্বারা বাংলার মুদ্রণ জগতে তাঁদের স্থান অক্ষয় হয়ে রইল। পরিশেষে আমরা ধন্যবাদ জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি তাদের। তারা এই বৃহৎ সংগ্রহশালার দ্বার পাঠকদের কাছে অর্গলমুক্ত না করলে এ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হত না। এতবড় গ্রন্থ পাঠ করার জন্য প্রস্তুতি দরকার। নীচে আমরা তাই পুস্তকের পূর্বকথা লিপিবদ্ধ করলাম।

*** *** ***

পুস্তকের পূর্বকথা

চাকমাজাতি একটি পার্বত্যজাতি। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বাস। ইতিহাসে তারা চাংমাজাতি রূপেও পরিচিত। ইংরাজি ভাষায় তাদের নাম দুভাবে লিখিত হয়—Chakma এবং Changma। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেও তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত রয়েছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলেই তাদের মূল বসতি। সেখানে তারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে প্রধান প্রাচীন জনগোষ্ঠী (ethnic group)। সেই অঞ্চলের সমস্ত উপজাতীয় (tribal) জনগণের তারা পঞ্চাশ শতাংশ। টংচঙ্গা (Tangchangya) বলে যে উপজাতির কথা আমরা শুনতে পাই তারা চাকমাজাতিরই একটি অংশ। এই দুই জাতির মানুষের ভাষা এক, তাদের সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান এক। এমনকি তাদের ধর্মও এক, সে ধর্ম হল থেরবাদ (Theravada) বৌদ্ধধর্ম।

সংস্কৃতে থোবাদকে বলে স্থবিরবাদ — যা প্রাচীন তার জ্ঞান, যাঁরা প্রাচীন তাঁদের উপদেশ ('The Teaching of the Elders' or 'the Ancient Teaching')। এটি হল বৌদ্ধ ধর্মের সবচেয়ে প্রাচীনতম দর্শন। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ভারতবর্ষে। এটি বৌদ্ধধর্মের রক্ষণশীল ভাগ। শ্রীলঙ্কার ৭০ শতাংশ মানুষ এই ধর্ম মেনে চলে। এছাড়া কম্বোডিয়া, লাওস, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড এবং চিন, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের কোনো কোনো স্থানে এই ধর্ম প্রচলিত আছে। চাকমারা এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত মানুষ।

জনগোষ্ঠী হিসাবে (ethnically) চাকমারা হল তিব্বতী-বর্মী (Tibeto-Burman) মানুষ। সেই অর্থে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সমস্ত পার্বত্য জনগোষ্ঠী—যাদের আমরা

উত্তর-পূর্ব ভারতে দেখতে পাই — তাদের সকলের সঙ্গে এদের প্রাচীন স্থানিক বন্ধন রয়েছে। তাদের সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকদের মত এই রকম ঃ "Ethnically, the Chakmas are Tibeto-Burman,and are thus closely related to tribes in the foothils of the Himalaya. Their ancestors came from the Magadhan Kingdom (Now Bihar, India) to settle in Arakan and most of them later moved to Bangladesh, settling in the Cox's Bazar District, the Korpos Mohol [Karpas Mahal] area and areas of the present Mizoram" (en. wikipedia. org/wiki/Chakma_people) এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে চাকমারা মূলত ভারতবর্ষের মানুষ। কয়েকশ বছর আগে তারা জীবিকার সন্ধানে পূর্ব দিকে যাত্রা করে এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্র সন্নিকটে পার্বত্য সমতলে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। সেখানে তারা এতই প্রাধান্য বিস্তার করে যে সমস্ত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উপর তারা নিজেদের আধিপত্য ও প্রাধান্য কায়েম করতে সক্ষম হয়। তারাই হয়ে ওঠে চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চলের শাসক গোষ্ঠী। পরবর্তীকালে তাদের প্রাধান্য কমে যায় এবং তাদের শাসক রাজা দেবাশীষ রায় একজন প্রতীক শাসকের (sybolic rules) রূপ নিয়ে অবস্থান করতে থাকেন।

চাকমাদের উদ্ভব সম্পর্কে আরও অন্য মত আছে। (পরিশিষ্ট-১ দেখুন)

চাকমাদের জানতে হলে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলকে জানা দরকার। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত। এর অবস্থান ২১° ২৫' ও ২৩° ৪৫' উত্তর অক্ষরেখা এবং ৯১° ৫৪' ও ৯২° ৫০' পূর্বদ্রাঘিমা রেখার মধ্যে। বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, খাগরাছড়ি, বান্দরবন প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত হয়েছিল। এর উত্তরে ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরা, দক্ষিণে ব্রহ্মদেশের আরাকান পার্বত্যমালা, পূর্বে মিজোরামের লুসাই ও ব্রহ্মদেশের আরাকান পার্বত্যমালা ও পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা। ১৯৪৭ সালে এই অঞ্চলের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৯৭.৫ শতাংশ। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগন্য। সেখানকার ভূমিজ মানুষরা হল চাকমা, মর্ম (Marmas), মরুং (Marungs), খুমি (Khumis), চক (Chaks), ত্রিপুর, তেনচুংগ্যা (Tenchungyas) বা টংচঙ্গা, পাংখো (Pankhos),ম্রু (Mrus) বা মুরু, বম (Bawms) খ্যাংগ, (Khyangs)। এছাড়া এখানে আছে গুর্খা, অসম, সাঁওতাল ইত্যাদিরা। এদের মধ্যে চাকমা, মুরুং, চক, মর্ম, খুমি ইত্যাদিরা হল বৌদ্ধ। ত্রিপুররা হল হিন্দু। লুসাই, বম, পাংখো ও খ্যাংগরা হল খ্রিস্টান। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ে অমুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৯৭.৫ শতাংশ। বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল ৮৫ শতাংশ, হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ১০ শতাংশ, আদিম ধর্মাবলম্বী (Animists) ছিল ৩ শতাংশ ও মুসলমানরা ছিল ১.৫ শতাংশ। এখানকার সমস্ত মানুষই উপজাতীয়। এরা প্রথাগত ভাবে ঝুম চাষ করত। ১৯৯১ সালের জণগণনায় দেখা গেছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা হল ৯, ৭৪,৪৪৭। এর মধ্যে

৫০,১, ১১৪ জন মানুষই হচ্ছে উপজাতীয়। (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ঝুম পদ্ধতিতে চাষ করত বলে তাদের বলা হয় ঝুমিয়া বা জুমিয়া [উচ্চারণের দোষে 'ঝ' আপভ্রংশ হয়ে 'জ' হয়েছে।]

এতরকম মানুষদের নিয়ে যে জনসমাজ তার ভেতর ঐক্য কতটুকু ছিল? মনে রাখতে হবে যে চট্টগ্রাম পার্বত্য সমাজে প্রধান জনগোষ্ঠী বলতে ছিল দশটি—চাকমা, মর্ম, ত্রিপুর, চক, মুরুং, খুমি, লুসাই, খ্যাংগ, বম ও পাংখো। এদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বিকচকুমার চৌধুরী লিখেছেন : "Though these people possess diverse national identity, they have cultural, religious and ethnic affinity among themselves quite different from the Bengali-Muslims, the ruling and dominant class in Bangladesh. The indigenious people of the CHT [Chittagong Hill Tracts] have been living side by side for centuries together without any racial conflict. The CHT is basically, the land of ten national minorities." [Bikach Kumar Chowdhury : *Genesis of Chakma Movement* (1772-1989) : Historic Background, Tripura Darpan Prakashani, Agartala 1991, pp. 2-3]

আসলে উপজাতীয় মানুষেরা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়, আপন কাজে নিমগ্ন সহাবস্থানে বিশ্বাসী মানুষ। ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই সারা ভারতবর্ষের উপজাতীয় মণ্ডলে যা ঘটেছে এখানেও তাই হয়েছে—অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাইরের থেকে, তাদের উৎখাত করার বা তাদের অবস্থানকে নাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বাইরে থেকে। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা। এদের সম্মিলিত শক্তি কম নয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল চাকমারা। আরাকানরা তাদের বলত সক্ বা সাক (Saks) বা থেক (Theks), স্থানীয় ভাষায় ছেক। ১৫৪৬ সালে আরাকান রাজ মেং বেং-এর (Meng Beng), সঙ্গে বর্মীদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের সময় সাক রাজা আরাকানদের আক্রমণ করে কক্স বাজারের অন্তর্গত রামু (Ramu) অঞ্চলটি দখল করে নেন।

ইউরোপীয়রা যখন ভারতবর্ষে এল তখনও চাকমারা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি। সপ্তদশ শতকের শুরুতে পর্তুগীজরা তাদের চাকোমা (Chakomas) বলে উল্লেখ করেছে। এই সময় ডিয়েগো ডি অ্যাস্টর (Diego de Astor) নামে একজন পর্তুগীজ বাংলার একটি মানচিত্র আঁকেন। সেই মানচিত্রের পর্তুগীজ নাম ছিল 'ডেস্‌ক্রিপকাও ডো রেইনো ডি বেঙ্গলা' (*Descripcao do Reino de Bengalla*)। ১৬১৫ সালে জোয়া ডি ব্যারোস (Joa de Barros) নামে একজন ভদ্রলোক একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম কোয়ার্টা ডিকাডা ডা এশিয়া (Quarta decada da asia যার অর্থ Fourth deade of Asia বা এশিয়ার চার দশক)। এই বইতে সেই মানচিত্র সযত্নে মুদ্রিত হয়েছিল। এই মানচিত্রে চাকমাদের 'চকোমা' (Chakomas) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চাকোমাস (Chakomas)বলে একটি স্থানের

উল্লেখ আছে এই মানচিত্রে। গবেষকরা বলেছেন যে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে চাকোমাস অঞ্চলটি অবস্থিত ছিল। এইটিই ছিল চাকমাদের প্রাচীন অবস্থান। পরে এই অঞ্চলটি আরাকান রাজ দখল করে নেন। ১৫৯৩ থেকে ১৬১২ সালের মধ্যে আরাকান রাজা মেং রাজগ্রি সেলিম শাহ (Meng Rajagri Salim Shah) এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। ১৬০৭ সালে এক পর্তুগীজ বণিককে লিখিত এক পত্রে তিনি নিজেকে আরাকান, চাকমা ও বাংলার সর্বপ্রধান এবং সর্বোচ্চ রাজা বলে উল্লেখ করেছেন।

[এই নিয়ে পঠিতব্য গ্রন্থ Sir Arthur P. Phayre, Chief Commissioners of Burma, *History of Burma*, p. 79 এবং উল্লেখ্য http:\\ catalogo.bnportugal.pt.ipac.sp? session]

আরাকানদের দ্বারা পরাজিত হয়ে চাকমারা তাদের প্রসারিত অবস্থান থেকে হটে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বলতে যে অঞ্চলকে আমরা এখন বুঝি তারই মধ্যে স্থান সংকীর্ণ গণ্ডিতে অবস্থান করতে থাকে। সেখানে আলেকইয়াংদং (Alekyangdon) নামক স্থানে তাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। গবেষকরা বলেন যে বর্তমানে আলিকাদাম (Alikadam) নামে যে স্থানের কথা আমরা জানতে পারি সেটিই ছিল প্রাচীন আলেকইয়াংদং। সেখান থেকে—কিছুকাল পরে আরেকটু স্থিতিশীল হলে —তারা উত্তর দিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যেতে শুরু করে এবং বর্তমানে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া (Rangunia), রৌজান (Rauzan), ফটিকচারি নামক উপজেলাগুলি ঘিরে একটি বড় এলাকায় তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। এইভাবে তাদের বসতিভিত্তিক স্থিতিশীলতা গড়ে ওঠে।

[চাকমা জাতির ইতিহাস নিয়ে পঠিতব্য গ্রন্থ হল সৌগত চাকমা লিখিত **পার্বত্য চট্টগ্রমের উপজাতি ও সংস্কৃতি**]

১৯৬৬ সালে বাংলার মোগল সুবেদার শায়েস্তা খান আরাকানদের পরাজিত করেন এবং চট্টগ্রাম দখল করে নিয়ে তার নতুন নামকরণ করেন ইসলামাবাদ। কিন্তু তিনি চাকমাদের উপর আক্রমণ চালাননি। ফলে মোগল বিজয়ের প্রাথমিক পর্বে চাকমাদের সঙ্গে মোগলদের সম্পর্ক খারাপ হয়নি। এর একটি কারণ বোধহয় এই যে মোগলরা চট্টগ্রামের সমতল স্থানে নিজেদের শাসন কায়েম করেছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে তাদের সাম্রাজ্যের থাবা বাড়ায়নি। কিন্তু সাম্রাজ্য প্রসারশীল হলে পরিস্থিতি সহজ থাকে না। অচিরেই মোগলদের সঙ্গে চাকমাদের গোলযোগ উপস্থিত হয়। চাকমারা চট্টগ্রামের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মোগলদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তারা চাকমাদের কাছ থেকে কর দাবি করতে লাগল। এইভাবে স্থিতিশীল চাকমাদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিল।

মোগল-চাকমা সম্পর্কের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হল ১৭১৩ সালে। তারপর থেকে বিবদমান দুই তরফের মধ্যে আর কোনো বড়মাপের বিশৃঙ্খলা হয়নি। মোগলরা কখনোই প্রত্যন্তের মানুষদের উপর জবরদস্ত শাসন চাপিয়ে দিতে চাননি। আনুগত্যের শিথিল কাঠামোর মধ্যে থেকে প্রত্যন্তের মানুষ কর দিলেই তারা খুশি থাকতেন। ফলে চাকমাদের উপর তারা দমন-পীড়নমূলক আধিপত্যকে চাপাতে চাননি। মোগলরা চাকমা রাজ শুকদেবকে পুরস্কৃত করেছিলেন। তাঁদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে শুকদেব একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজধানীর নাম হয় 'শুকবিলাস'। এখনও এই রাজার রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ এখানে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে শুকবিলাস থেকে রাজানগর নামক স্থানে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

চাকমা জাতির মধ্যে বিপর্যয় নেমে এল ইংরাজ ঔপনিবেশিক শাসনকালে। ১৭৬০ সালে মীর কাশিম বাংলার নবাবীপদ পাওয়ার লোভে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই তিনটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল ইংরাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সমর্পন করেন। এই তিনটি ছিল তখন বাংলাদেশের উদ্‌বৃত্ত জেলা। ১৭৬১ সালের ৫ই জানুয়ারি কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে হ্যারি ভেরেল্‌স্ট (Harry Verlest) চট্টগ্রাম জেলার দায়িত্ব নেন। তখন এই জেলার দায়িত্বে ছিলেন মহম্মদ রেজা খাঁ। রেজা খাঁ কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেই হ্যারি ভেরেল্‌স্ট চাকমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। চাকমা রাজা ছিলেন তখন শের দৌলত খাঁ। তিনি মোগলদের কর দিতেন, বিনিময়ে ছিলেন সমস্ত অভ্যন্তরীন ব্যাপারে স্বাধীন। তিনি কোম্পানীর আধিপত্যমূলক কর্তৃত্ব মানতে রাজি ছিলেন না। কোম্পানীর শাসনকর্তারা এই সময়ে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেছিলেন। সেটিও চাকমারা স্বীকার করে নেয়নি। এগুলি সব ছিল যুদ্ধের পরিস্থিতিকে উস্কে দেওয়ার মতো ঘটনা। কোম্পানীর সঙ্গে চাকমাদের যুদ্ধ শুরু হল অচিরেই। যুদ্ধ চলেছিল ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত। ১৭৭০, ১৭৮০, ১৭৮২ ও ১৭৮৫ সালে কোম্পানী চার বার চাকমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল। ১৭৮৫ সালে ইংরেজরা বুঝতে পারল যে চাকমাদের সম্পূর্ণ দমন করা যাবে না। তাই কোম্পানী চাকমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করল। তখন চাকমা রাজা ছিলেন শের দৌলত খানের পুত্র রাজা জান বক্স খান (Jan Box Khan)। চাকমারাও বুঝতে পারছিল যে বেশী দিন ইংরেজদের প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। ১৭৮৭ সালে চাকমা রাজা কোম্পানীর সার্বভৌমত্ব মেনে নিলেন। প্রতিবছর ৫০০ মন তুলা তিনি কোম্পানীকে দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কলকাতায় এই দুই সার্বভৌম ও অধীনস্থ শক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস ও চাকমা রাজার মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তার শর্ত ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী জান বক্স খানকে চাকমা জাতির রাজা বলে স্বীকার করে নিল।

২. চাকমা রাজা স্বীকার করে নিলেন যে তাঁর রাজ্যে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাঁর।

৩. কোম্পানী স্বীকার করে নিল যে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে উপজাতীয় মানুষদের স্বশাসন (Autonomy) বজায় রাখা এবং সেখানে সমতলের মানুষদের অনুপ্রবেশ বন্ধ রাখা।

৪. জান বক্স খান চুক্তির দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন যে তাঁর অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা তিনি বজায় রাখবেন।

৫. এই শর্তও কবুল করা হল যে চাকমাদের ভূখণ্ডে ইংরেজ সৈন্য থাকবে। তাদের উদ্দেশ্য হবে চাকমাদের ভীতি প্রদর্শন করা নয়, বরং অন্যান্য দুর্ধর্ষ উপজাতির আক্রমণ থেকে চাকমাদের রক্ষা করা।

১৮২৯ সালে তৎকালীন চট্টগ্রামের ব্রিটিশ কমিশনার মেনে নিয়েছিলেন—অর্থাৎ পুরাতন চুক্তি-শর্তগুলিকে নতুন করে কবুল করেছিলেন এই ভাষায়—

"The hill tribes were not British subjects but merely tributaries & we recognized no right on our part to interfere with their internal arrangements. The near neigbourhood of a powerful & stable government naturally brought the Chief by degree under control & every living chief paid to the Chittagong collector a certain tribute or yearly gifts. These sums were at first fluctuating in amount but gradually were brought to specific & fixed limit, eventully taking the shape not as tribute but as revenue to the state."

উপরে উল্লিখিত কমিশনার হ্যালহেডের ঘোষণা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে উপজাতিরা (tribes) কেউ ব্রিটিশ প্রজা নয়। অতএব উপজাতিদের অভ্যন্তরীণ জীবন যাপনে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার ব্রিটিশ সরকারের নেই। এর সঙ্গে অবশ্য এও ঘোষণা করা হল যে পরিপার্শ্বের এক শক্তিশালী সুস্থিত সরকার প্রতিবেশীরূপে বহাল থাকায় চাকমা প্রধান (Chief) ধীরে ধীরে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে এসেছেন এবং অন্যান্য উপজাতির প্রত্যেক প্রধানই চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়কারী (Collector) এর কাছে নির্দিষ্ট কর বা বাৎসরিক উপহার প্রদান করেছেন। এই করই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে প্রদেয় রাজস্বে পরিণত হয়েছিল। এই ঘোষণার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল অন্য একটি ঘোষণা— ব্রিটিশ প্রাধান্যের (British Supremacy) একটি ধারণা। এই ধারণা থেকেই পরবর্তী কালে ব্রিটিশ সর্বোত্তমতার ধারণা (Concept of the British Paramountcy) জন্মলাভ করেছিল।

[পঠিতব্য গ্রন্থ Dr. Suniti Bhusan Kanungo, (Professor of History, University of Chittagong), *Chakma Resistance to British Domination*

1772-1798; S.P. Talukdar, *The Chakmas : Life and Struggle*, এবং Government of Bengladesh, *The District Gazetteer of Chittagong Hill Tracts*]

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের অপসারণ ও দেশভাগের পর থেকে চাকমারা মূলত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলেই বাস করত। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে এইটিই ছিল তাদের বাসভূমি। কিন্তু ধীরে ধীরে বাঙালি জাতির মানুষ (Ethnic Bengalis) চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রবেশ করতে থাকলে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে গোলযোগ শুরু হয়। চাকমারা বিদ্রোহ করে। পরপর যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে তারাই চাকমা উত্থানকে নির্মমভাবে দমন করেছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে চাকমারা মিজোরামে বসবাস করে : চাকমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আত্মপরিচয়ের (Identity) একমাত্র সংগঠন হল Chakma Autonomous District Council. ভারতবর্ষের এই প্রতিষ্ঠানটি মিজোরামে বসবাসকারী চাকমাদের মাত্র ৩৫ শতাংশকে নিজের নিয়েন্ত্রণে রাখতে পেরেছে।

চাকমারা যে ভাষা বলে তা হল তিব্বতী-বর্মী পরিবারের (Tibeto-Burman family) ভাষা। চাকমাদের একটি অংশ চট্টগ্রামের নিজস্ব চাটগাঁইয়া ভাষা বলে। এই ভাষাটি হল প্রাচ্য ভারতীয়আর্য্য ভাষা (Eastern Indo-Aryan Language) যা বাংলা ভাষার খুব সমীপবর্তী ভাষা। বর্তমানে চাকমারা যে ভাষা বলে তা হল চাংমা ভাজ (Changma Vaj) বা চাংমা কোদা (Changma Kodha)। এটি হল প্রাচ্য ভারতীয়-আর্য্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ-পূর্বীয় বাংলা ভাষার শাখা (South eastern Bengali branch of Eastern Indo-Aryan Language)। চাংমা ভাজ এর বর্ণমালা যে হরফে লেখা হয় তাকে বলে ওঝোপাত (Ojhopath)। চাকমারা সাধারণত যে লিপি ব্যবহার করে তা হল খমের (Khmer) লিপি। এই লিপি এক সময়ে কাম্বোডিয়া, লাওস, শ্যাম ও দক্ষিণ ব্রহ্মে ব্যবহৃত হত। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে চাকমাদের ভাষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "Though the Chakmas are of Mangoloid group, this language is of the Indo-Aryan group. It is a corrupt form of Bengali written in a corrupt form of Burmese alphabet. This has given rise to severel theories regarding the origin of the Chakma people. (http :// priyo.com/life/2009/01/16/10098.html)

পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে যে সব জনগোষ্ঠী আছে তাদের কোনো লিখিত ইতিহাস নেই (documented history)। ফলে তারা তাদের মৌখিক ঐতিহ্যের (oral tradition) উপর নির্ভর করে তাদের পরিচয়, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি চিহ্নিত করে এবং তাদের উৎস খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। নৃতত্ত্বগত ভাবে চাকমারা মঙ্গোলয়েড (Mongoloid) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভাষা ইন্দো-আর্য্য পরিবারের (Indo-Aryan group) শাখা।

চাকমারা নিজেদের উদ্ভব সম্বন্ধে একটি বিশ্বাস পোষণ করে। তা এইরকম। কোনো একটি পার্বত্য অঞ্চল থেকে তাদের উদ্ভব। সেই পার্বত্য অঞ্চলে ছিল একটি রাজ্য। তার নাম 'কলপনগর' (Kalapnagar)। কলপনগর (কল্পনগর ?) ছিল হিমালয়ের কোলঘেঁষা একটি রাজ্য। অনেকে মনে করেন যে কলপনগর নেপালের কাছাকাছি কোনো রাজ্য। চাকমারা নিজেরা নেপালের কথা ভাবে না। ঐতিহাসিকরাই এই যোগসূত্র রচনা করার চেষ্টা করেন। চাকমাদের চিন্তাধারায় আরাকান, খুব বেশি হলে ব্রহ্মদেশ হল তাদের আদিভূমি। শিক্ষিত চাকমারা অবশ্য অনুমান করে যে নেপালের শাক্যবংশ থেকে তাদের উদ্ভব। শাক্যদের অবস্থান ছিল নেপালের দক্ষিণ দিকে, বর্তমান বিহার-সংলগ্ন অঞ্চল। এরই ভিত্তিতে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন বর্তমান বিহার থেকে চাকমাদের উদ্ভব। অভিরাজা নামে এক শাক্যরাজা ৯২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কপিলাবস্তু থেকে উত্তর আরাকানে এসে ধান-নগ্য-ওয়া-তি (Dha-ngya-wa-ti) বা ধাননাগবতী বা ধান্যবতী নামক স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। এই অঞ্চলটি হয় সেই রাজ্যের রাজধানী। এই রাজবংশের নাম হয় সাংগসসারথ (Sangasasaratha)। বর্মী রাজবংশের ইতিহাসেও এ কথা লেখা আছে যে শাক্যবংশের রাজারা উত্তর ভারত থেকে এসে ব্রহ্মদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা শাসন করেছিল। তাদের শাসনকাল শুরু হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের জন্মের আগে। বুদ্ধের তিরোধানের পরেও তারাই উত্তর ব্রহ্মদেশ শাসন করেছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের অনুমান যে একসময়ে অভিরাজা বা তাঁর বংশধরদের রাজত্বকাল শেষ হয়ে এসেছিল। উত্তর ব্রহ্মে তাঁদের প্রাধান্য বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁরা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিশে যায়। যাদের সঙ্গে তারা মিশে গিয়েছিল তারা হল আরাকানের মানুষ। আরাকানেই ছিল তাঁদের প্রকৃত বসতি। এক সময় আরাকানে তাঁদের স্থিতি কোনো কারণে বিঘ্নিত হতে থাকে। ১০৫২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের থেকে বা তার কোনো কাছাকাছি সময় থেকে তারা আরাকান ছেড়ে চট্টগ্রামে আসতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চলেই তারা তাদের পাকাপাকি বসতি গড়ে তোলে।

চাকমারা বিশ্বাস করে যে তাদের স্থিতিশীল জীবনের প্রথম প্রাচীন বসতি ছিল চম্পকনগর বা চম্পানগর বলে কোনো স্থানে। তাদের আদিকালের শাসকরা, শাক্যরাজারা, চম্পকনগর থেকেই শাসন করত। শাক্যরা ছিল ক্ষত্রিয় বংশ। এক শাক্যরাজার দুই পুত্র ছিল— বিজয়গিরি ও উদয়গিরি। অগ্রজ বিজয়গিরি একবার রাজ্যজয়ে যাত্রা করলেন। চম্পকনগর ছেড়ে তনি দক্ষিণদিকে যাত্রা করেন এবং দিগ্বিবিজয়ে যাত্রা করে তিনি ত্রিপুর, আরাকান ও কুকিরাজ্য দখল করেন। তিনি যখন চম্পকনগরে ফিরছিলেন তখন খবর পেলেন যে তাঁর পিতা প্রয়াত হয়েছেন এবং তাঁর অনুজ উদয়গিরি সিংহাসন দখল করে নিয়েছেন। উদয়গিরি নাকি তাঁর অগ্রজকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতও হচ্ছিলেন। এ খবর শুনে বিজয়গিরি আর দেশে ফিরলেন না। তাঁর জয় করা রাজ্যেই তিনি নতুন রাজত্ব শুরু করলেন। তিনি ও তাঁর অনুচরেরা স্থানীয় কন্যাদের বিবাহ করলেন। বিজয়গিরি রাজাকে সংহত করার জন্যে আরাকান রাজের সঙ্গে সন্ধি করলেন

এবং নাফ (Naaf) নদীর ধারে তার রাজধানী স্থাপন করে নতুন বসতি বিস্তার করলেন। কিন্তু সেখানেও বিজয়গিরির চাকমা প্রজাবর্গ চাকমাদের স্থায়ী অধিষ্ঠান হল না। কিছুকাল পরে তারা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে চলে এলেন এবং মাতামুহুরি ও কর্ণফুলী নদীর তীরে তাদের বসতি স্থাপিত হল। চাকমাদের সমস্ত ইতিহাস খুঁজেও আজ পর্যন্ত চম্পকনগরের প্রকৃত অবস্থান নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়নি। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন [যেমন হাচিনসন ও দেওয়ান মনে করেন] যে চম্পক নগর ছিল বিহারে। ক্যাপ্টেন লুইস মনে করেন যে তা ছিল মালক্কায়। এর থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে চাকমারা একটি মালয় উপজাতি। ঐতিহাসিক তালুকদার মনে করেন যে চম্পকনগর আসলে বর্হিভারতের একটি স্থান। তার অবস্থান ছিল বর্তমান থাইল্যান্ডের (Thailand) চিয়াংমাই (Chiangmai) এবং লম্পং (Lampang) শহরের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে সেটি ছিল ত্রিপুরায়। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে চম্পকনগরের যেকোনো অবস্থানই বাংলাদেশের বাইরে কল্পনা করা হয়েছে। সে অর্থে চাকমারা বাংলাদেশে বহিরাগত মানুষ — 'migrated people in Bangladesh'। ঐতিহাসিক তালুকদার [তাঁর গ্রন্থ : S.P. Talukdar, *Chakmas An Embattled Tribe*] বলেছেন যে কপিলাবস্তুর শাক্য এবং ব্রহ্মদেশের থেক (Thek) উপজাতির মানুষদের সংমিশ্রণে চাকমারা উদ্ভূত হয়েছেন। তাই যদি হয় তবে বিহারের সঙ্গে চাকমাদের যোগ থাকা অসম্ভব নয়। বিহারের সঙ্গে যোগ থাকলে চাকমারা ক্ষত্রিয় রূপে প্রতিপন্ন হয়। হাচিনসন এই মতটিকে মানতে রাজি হননি। তিনি লিখেছেন —

"The connection of the Chakma race with Kshatriya from Champaknagar, the capital of Anga in Bhagalpur, is a myth, and the origin must be traced to unions between the soldiers of Nawab Shaista Khan, the Governor of Bengal, under the Emperor Aurangzeb about 1670, and Arakanese immigrants, and subsequently with the hill women. Buddhism appears to have always been their religion, and there are no traces of Muhammadanism in spite of the fact that all their Chief have Muhammadan names." চাকমারা তাদের মুসলমান উত্তরাধিকারকে মানতে রাজি নয়। এমনকি ইসমলাম ধর্মের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল এ কথাও তারা অস্বীকার করে। মুসলমান শাসকদের চাপ এড়াবার জন্য তাদের রাজারা মুসলমান উপাধি নিয়েছিলেন এমন ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল। চাকমা রাজা ভুবনমোহন রায় [তিনি ১৯৩৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন] বিশ্বাস করতেন যে চাকমারা শাক্যজাতির অংশবিশেষ এবং তারা সকলে ভগবান বুদ্ধের বংশধর। তাঁর ধারণা অনুযায়ী চাকমারা ক্ষত্রিয় জাতির শাখা এবং প্রাচীন কালে তারা ব্রাহ্মণদের মতো উপবীত ধারণ করত। এই বক্তব্য সত্য হলে চাকমারা বর্ণহিন্দুদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে।

[পঠিতব্য : রাজা ভুবনমোহন রায়, চাকমা রাজবংশের ইতিহাস, ১৯১৯। চাকমা রাজবংশের ইতিহাস নিয়ে তিনি 'গৈরিক' নামক বাংলা পত্রিকায় (নবম খণ্ড, ১০ সংখ্যা ও অষ্টম খণ্ড ৯ সংখ্যা) প্রবন্ধও লিখেছেন। এই পত্রিকাটি শ্রীঅরুণ রায়ের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত হত।]

চাকমাদের সুস্থিত জীবনের বিপর্যয় শুরু হয় ইংরাজ আমলে। পূর্ববাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশের) পার্বত্যাঞ্চলে ইংরাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পূর্বে এই সমস্ত পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। মাঝে মাঝে মোগলদের আক্রমণ ঘটত ঠিকই কিন্তু তা তাদের প্রথাগত জীবনকে ভেঙে দিতে বা বদলে দিতে পারেনি। তাদেরই অন্তর্ভুক্ত চাকমারা তাই দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের মতো করে বেঁচেছে। সনাতন এই পার্বত্য জাতিগুলি সম্বন্ধে একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন : "Disturbed occasionally by the forays of Mughal adventures, they carried on an insular existence, much like the Japanese in the Tokugawa times, though without the latter's known disapproval of the alien. Rich in fauna and flora, it was also known as 'kapasmahal,' an area which produced high quality kapas (cotton) used in the manufacture of the legendary muslin of Dhaka."

[Saradendu Mukherjee, *Subjects, Citizens and Refugees : Tragedy in the Chittagong Hill Tracts(1947-198)*, Indian Centre for the Study of Forced Migration, New Delhi, 2000, p.13]

মনে রাখতে হবে যে সমস্ত পার্বত্য জাতিগুলিই আমাদের কাছে উপজাতি (Tribe) রূপে চিহ্নিত। চাকমারা নিজেদের উপজাতি বলে গণ্য করে না। নিজেদের তারা জনগণ — 'people'— বলে দাবি করে। তারা বলে যে তারা একটি সমাজ। তাদের লেখার হরফ রয়েছে ('a written script'), একটি সুসংগঠিত ধর্ম আছে, আর তার সাথে আছে নিশ্চিত জীবিকা ('a defined way of livelihood'), জন্ম-মৃত্যু ঘিরে সামাজিক ভাবে পালনীয় বিধি এবং আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সবই তাদের আছে। সবচেয়ে বড় কথা এসবের সঙ্গে আছে একটি সাধারণ সংস্কৃতি এবং জনগোষ্ঠীগত সুসামঞ্জস্য ('ethnic homogeneity')। তাহলে তাদের অবস্থানকে একটি সুশীল সমাজের (civil society) অবস্থান বলে ধরবে না কেন? এইটিই তাদের প্রশ্ন।

[পঠিতব্য — *The Chakma Voice*, Vol.1, No. 1 (Bizu edn, April, Calcutta, 1995); R.H. Sneyd Hutchinson : *Eastern Bengal and Assam District Gazetteer, Chittagong Hill Tracts*, Pioneer Press, Allahabad,

1909 এবং Verelst to Vansittasrt, 16 January, 1761, "A General Report on the Newly Acquired District of Chittagong," File No. A 22/432, December 1760-December 1780, Chittagong Bangladesh National Archives, Dhaka]

ইংরাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে কোম্পানীর তরফে ফ্রান্সিস বুকানন নামে এক পদস্থ অফিসারকে চট্টগ্রামের অবস্থা সরেজমিনে পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে পার্বত্যাঞ্চলে কৃষিকাজ, বিশেষ করে মশলার চাষ এবং স্থানটির প্রসার ও তার প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে। তিনি লিখেছিলেন যে পার্বত্যাঞ্চলের মানুষদের অবস্থা চট্টগ্রামের কৃষকদের থেকে অনেক বেশি উন্নত ও সচ্ছল। তারা বাঙালিদের কাছে চাল, তুলা, আদা, ইত্যাদি বিক্রয় করে এবং বাঙালিদের কাছ্ থেকে গ্রহণ করে মাছ, লোহা এবং লোহার জিনিসপত্র। তাদের গবাদি পশু নেই, তার বদলে আছে ছাগল, ভেড়া, শূকর, এবং পোল্ট্রি-পোষিত (Paultry-fed birds) পাখি। পাহাড়ের মানুষ একেবারে ধনমানহীন দরিদ্র ('destitute of riches')নয়। তাদের বাড়িঘরের একটা শ্রী রয়েছে। অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে একটি সভ্যতার চিহ্ন রয়েছে।

[পাঠতব্য — Francis Buchanon, " Journey Through Chittagong and Tipperah", 1798 (Handwritten Manuscript)- Add. Ms. 19286. এটি পাওয়া যাবে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডনে]

ইংরাজ দলিলে এই সব মানুষেরা ঝুম, ঝুমা, জুমা, জুমিয়া, পাহাড়ি ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়। তাদের সবচেয়ে প্রচিলত নাম হল 'জুমিয়া'। এরা ঝুম (Jhum) প্রথায় চাষ করত। তার থেকেই এই নাম। এই অঞ্চলের প্রথম জেলা গেজেটিয়ার দেখিয়েছে যে এখানে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মোট ৮৩০০০ বৌদ্ধ মানুষ বসবাস করত। যা সচরাচর করা হয় না তাই করা হয়েছিল জনৈক পুলিশ কর্তাব্যক্তিকে R.H. Sneyd Hutchinsonকে এই গেজেটিয়ার লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি পার্বত্যাঞ্চলের মানুষদের অনেক অবস্থানকেই বুঝতে পারেননি। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লিখলেন যে এখানে খ্রীষ্টধর্ম ক্রমপ্রসারশীল—অতএব এখানে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের যথেষ্ট অবকাশ আছে—"Christianity is gradually making headway and there is an excellent field for missionary effort."

[R.H. Sneyd Hutchinson, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteer : Chittagong Hill Tracts*, Pioneer Press, Allahabad, 1909]

হাচিনসনের ধারণা ছিল ভুল। যাকে তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের শান্তিপ্রিয় ক্ষেত্র ভেবেছিলেন সেখানে ইসলামের সেনারা প্রবেশ করতে লাগল এবং কিছুকালের মধ্যে তা হয়ে উঠল উত্তেজনার রঙ্গভূমি। শরদিন্দু মুখার্জী লিখলেন যে — "He (Hutchinson) was to prove totally wrong because, far from turning into an 'excellent field' for the missionaries, it became the happy hunting ground for the soldiers of Islam." (প্রগুক্ত পৃ. ১৫) । এতদিন ধরে প্রাকৃতিক পরিবেশে যে পার্বত্য জনগণ প্রকৃত অর্থেই শান্তিতে বাস করত তারা, শাসকের নিপীড়নে, বহিরাগতদের অত্যাচারে এবং সভ্যতাদর্পী মানুষদের আস্ফালনে জর্জরিত হয়ে উঠল। ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনে তারা নিঃস্ব হল। এই রকম পরিস্থিতিতে তারা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে লাগল। ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল তাদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতি'। এই সমিতি গঠন করেছিলেন কামিনী মোহন দেওয়ান। এর সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "This was the first political association of this area" [প্রাগুক্ত পৃ. ১৫]

[পঠিতব্য কামিনী মোহন দেওয়ান, **পার্বত্য চট্টলার এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী**, রাঙ্গামাটি, ১৯৭০]

সাম্প্রতিক কালে চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলের চাকমাদের নিয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এই সমীক্ষার রিপোর্টে চাকমাদের অনগ্রসরতাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই রিপোর্টের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল।

Chakma is the name of the largest tribe found in the hilly area known as the Chittagong Hill Tracts (CHT). The CHT comprising Rangamati, Khagrachari and Bandarban hill dsitrict of the South-eastern part of Bangladesh, [IS] the ancestral homeland of the Jumma indigenous peoples. The indigenous people of those mountain areas have been managing the resources with their traditional knowledge and customs. The traditional economy of them is called as subsistence economy which is completely need oriented, which means that production aims and therefore the overall level of production are geared to fulfilling the totallity of individual and communal needs.

অর্থনীতিতে দুটি জিনিষ আছে—প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা—need and want সভ্যতার অনগ্রসরতার পর্যায়ে মানুষ প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিক (need-based) জীবনযাপন করত। সভ্যতা যখন প্রগতিশীল হয় তখন মানুষের জীবন চাহিদা-নির্ভর হয়ে পড়ে। আমাদের উপরে উদ্ধৃত সমীক্ষা-রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে এখনও চাকমাদের অধিকাংশ মানুষই প্রয়োজনীয়তা-নির্ভর জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। তাদের অর্থনীতি এখনও traditional economy, subsistence economy ইত্যাদি প্রাচীন অনুন্নত অর্থনীতির মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে তাদের নিয়ে নানা আইন রচিত হয়েছে কিন্তু তাদের বৃহৎ মঙ্গল তার দ্বারা সূচিত হয়নি। সমীক্ষা রিপোর্টে এই ভাবনাই নিবদ্ধ রয়েছে।

Like other indigenous territories in the world, various policies and programs have been implemented from the time of the first colonial power, the British to the present national administration in CHT. Sometimes the policies and programs contributed towards political and economic chaos in the region frequently stained by bloodshed. Because many of these programs were the consistent disregard for the indigenous people and their value systems and traditional knowledge ... The denial of the land rights of the indigenous people to exist as a separate and distinct people with their own tradition, culture and practices is seriously undermining [being undermined] in the CHT. Also the communication system of rural CHT is very difficult. Maximum of the Chakmas are residing is this rural area [and] out of ten different ethnic tribal groups and [are] leading strange life style.

চাকমারা সমস্ত অর্থেই এখনও গ্রামীণ। তাদের জন্য উপর থেকে চাপানো সমস্ত আইনই তাদের প্রতিষ্ঠিত জীবনপদ্ধতির উপর আঘাত হেনেছে, ঘটিয়েছে রক্তপাত। তাদের নিজেদের জমির উপরের অধিকার হরণ করা হয়েছে, তাদের স্বতন্ত্র থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের প্রচলিত প্রথা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা হয়েছে। তাদের সার্বিক ধ্বংস সাধন—genocide ছিল সকলের উদ্দেশ্য। এই পরিস্থিতি তারা কাটিয়ে উঠেছে। ২০০টি চাকমা পরিবারকে সমীক্ষা করে তাদের উন্নয়নের বড় কোন চিত্র পাওয়া যায়নি। দেখা গিয়েছে ২০০টি পরিবারের ৭৭ শতাংশ গৃহের পরিবার প্রধান বনিয়াদি পর্যয়ের শিক্ষা (primary level education) সমাপ্ত করেছে। অবশ্য বাংলাদেশে সার্বিকভাবে গৃহের পরিবার প্রধানদের শিক্ষার যে হার তার থেকে এটি বেশি। তাদের পরিবারের আয়তন এখন ৫.৪ যা বাংলাদেশের

জাতীয় পর্যায়ের পরিবারের আয়তনের সঙ্গে সমান। চাকমাদের মধ্যে এখন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার চাহিদা দেখা দিয়েছে। তাই, এমনকি গ্রাম পর্যায়েও চাকমারা কৃষিকাজ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করছে। সমস্ত গ্রামীণ চাকমাদের মধ্যে ৩৩.০৫ শতাংশ মানুষ জীবিকার্জন করে, অর্থাৎ এখনও ৬৬.৯৫ শতাংশ মানুষ নির্ভরশীলতায় (dependency) রয়েছে। গ্রামীণ চাকমাদের মাথাপিছু আয় ৭০৯ বাংলাদেশী টাকা যা জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু আয়ের থেকে ২.৭৫ শতাংশ কম। সমীক্ষা নেওয়া চাকমা গ্রামে দেখা গেছে গড়ে বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব ৭২৯.১৫ মিটার। চাকমা জনগণের ৫০ শতাংশ তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্যে ব্যয় করে ৫০০ থেকে ২০০০ বাংলাদেশী টাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে ৪৮ শতাংশ পরিবারের মধ্যে অন্তত একজন বনিয়াদি শিক্ষার বাইরে — 'dropped out of primary education. I' এই শিক্ষা—ছুট হওয়ার কারণ আর্থিক দীনতা, গৃহ থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব নয়।

(উপরে উল্লিখিত সমীক্ষার উপসংহারের অংশ থেকে গৃহীত হয়েছে এই তথ্য।)

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই চাকমাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ হয়। কোনো কোনো মহলে এ রকম বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে চাকমাদের সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৬ সালে নয়, ১৯১৭ বা ১৯২০ সালে। যাই হোক এটি প্রকৃত রাজনীতির আদি পর্বের ঘটনা। এই ঘটনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "This was the begining of proto-politics in the hill tracts, much in the fashion of similar developments which took place in the coastal presidency towns in India in the early nineteenth century." [শরদিন্দু মুখার্জীর প্রাগুক্ত বই, পৃ. ১৫]। চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার এক সময়ে এই অঞ্চলের প্রশাসনের ব্যাপারে কিছু স্বাধীনতা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তখন পার্বত্য মানুষগুলি সম্মিলিত ভাবে তার প্রতিরোধ করে। এই উত্তেজনাকে পার্বত্যাঞ্চলের প্রথম উত্থান-ব্যঞ্জক প্রবণতার প্রকাশ বলে ধরে নেওয়া হয়। এর গুরুত্বকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : "paving the way of arousing political settlement in the CHT in subsequent years and decades."

[S. Uttaram, " A Genesis of the Movement for self-determination of the Jumma People of CHT and its future : In memory of 10 November, 1983 (CHT Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti, 1985) pp. 34-36 cited in P.K. Debbarma and S.J. George (eds.) *The Chakma Refugees in Tripura*, South Asian Publishers, New Delhi, 1993]

চাকমাদের জীবনে প্রকৃত বিপর্যয় নেমে এল ১৯৪৬-৪৭ সালে। স্বাধীনতার সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ সমস্ত স্থিতিশীল মানুষের অস্তিত্ব টলিয়ে দিল। চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চলের জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ ছিল বৌদ্ধ। অতএব আইনত তাদের কোনো মুসলিম রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা নয়। তার আসা উচিত ছিল ভারতবর্ষে। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাদের চট্টগ্রামের উপর নজর ছিল। এই অঞ্চল পাকিস্তানে যাবে, এই আশঙ্কায় এখানকার মানুষ বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেন। প্যাটেলও সমস্যাটি বুঝে ছিলেন। চট্টগ্রামের কোনো অঞ্চল পাকিস্তানের অধীনে থাকা প্যাটেল বলতেন অবাস্তব। পাকিস্তান সংযুক্তির প্রস্তাবকে তিনি এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন— the "proposition was so monstrous that if it should hapen, they would be justified in resisting to the utmost of their power and count on our maximum support in such resistance."

প্যাটেলের মত সমর্থন করেছেন প্রায় সকলে—লর্ড মাউন্টব্যাটেন থেকে নেহেরু পর্যন্ত সকলে। নেহেরু মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন যে ধর্ম ও সংস্কৃতি এই দুই দিকের বিচারে চট্টগ্রাম পাবত্যাঞ্চল ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। যদি চট্টগ্রাম পাকিস্তানে যায় তবে কংগ্রেসের ভেতর থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে— "there would be serious reaction among Congress leaders at this." কথাও হয়েছিল যে চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চল ভারতবর্ষকে দান করা হবে। এর পরিবর্তে পাকিস্তানকে অন্য কোন অঞ্চল দান করা হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের নেতারা জোর দিয়ে কোনো কথা বলেননি। স্বাধীনতার আগমন, ক্ষমতা প্রাপ্তি, ব্রিটিশ শাসনের অপসারণ—এই সব নিয়ে ভারতীয় নেতারা মত্ত ছিলেন। এদিকে পাকিস্তানের পক্ষে মুসলমান নেতারা বলতে লাগলেন যে চট্টগ্রাম জেলা ও কর্ণফুলী নদীই হচ্ছে পূর্বপাকিস্তানের অর্থ ভাণ্ডার। কর্ণফুলির তীরে জলবিদ্যুৎ-এর কারখানা গড়া হবে। চট্টগ্রামের বন্দরের বাণিজ্য পূর্ববাংলাকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করবে—এই সব যুক্তি দেখিয়ে চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করা হল। 'contiguity clause'-এর ভিত্তিতে পাকিস্তানের পক্ষে মতদান করা হল। ভারতীয় নেতারা নির্বাক হয়ে রইলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হল। এই সময় থেকে এই অঞ্চলের মানুষদের সর্বনাশ সূচিত হল।

[পঠিতব্য — Nicholas Mansergh : *The Transfer of Power 1942-47, Vol-XII, 8 July-25 August 1947*, Her Majestry's Stationery Office, London, 1981 পৃপৃ. ৬৭৪, ৬৯১, ৭৩২, ৭৩৭]

চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চলের পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অযৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলির একটি। এই নিয়ে ঐতিহাসিকের মন্তব্য এই রকম —

Hence the acquiescence by the Indian leaders to the impulsive decision to hand over the CHT to East Pakistan defying the well known principles of co-existence of communities and nationhood came as a bolt from the blue to all. This almost sealed the fate of the CHT. No wonder the British abdicated their responsibilities thereafter." (শরদিন্দু মুখার্জীর পূর্বোক্ত বই, পৃ.১৬)

"Thus much against their own desire and fearful of the consequences, the people of the CHT found themselves 'thrown to the wolves' much the same way as Khan Abdul Gaffar Khan was to say about the NWFP [North Western Frontier Province] being handed over to West Pakistan. It was a clossal defeat of the Congress leadership and reveals much about their numerous unexplained and queer decisions, all of which went against the interests of the Hindus, Buddhist and Sikhs and also perhaps of the Indian State.

চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চল পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তির বিরুদ্ধে কিছু দেশপ্রেমী চাকমা নেতা বিদ্রোহ করেছিলেন। সে বিদ্রোহ সফল হয়নি। চাকমা তথা সমস্ত পার্বত্য উপজাতিগুলি তাদের বিড়ম্বিত ভাগ্য নিয়ে সেদিন থেকেই এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা শুরু করল।

পরিশিষ্ট-১

চাকমাদের উদ্ভবের বিষয়ে অন্য মতও জানা দরকার। কর্নেল ফের (Col. Phayre) বলেছেন যে চাকমারা আদিতে ছিল ব্রহ্মদেশে বসবাসকারী মানুষ। অনুরূপ মত প্রকাশ পেয়েছে ব্রহ্মদেশ ও আরাকানের কিছু প্রাচীন ইতিহাসে যেমন চুইজাং খ্যা থাং (Chuijang Khya Thang) এবং দেংগাওয়াদি আরেদফাগ-এ। ত্রিপুরার রাজ ইতিহাস রাজমালাতেও ধরনের কথাই বলা আছে। [পঠিতব্য গ্রন্থ Colonel Phayre : *The History of Burma*]। স্যার হার্বার্ট রিসলে (Sir Herbert Risley) মনে করেন যে চাকমারা হল আরাকানের সাক (Tsak) বা সেক (Tseak) উপজাতি (tribe) থেকে উদ্ভূত। চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে এদেরই 'ছেক' বলা হয়। ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লেউইন (Captain T. H. Lewin) এই মতেরই সমর্থক। তিনি লিখলেন — "The name Chakma is given to this tribe in general by the inhabitants of the Chittagong District and the largest and dominant section of the tribe recognises this as its rightful appellation. It is also sometimes spelt Tsakma or Tsak, or as it is called in Burmese, Thek."

[পঠিতব্য : T.H. Lewin : *The Hill Tracts of Chittagong and the Dewellers Therein* এবং Col. Phayre, *Journal of Asiatic Society of Bengal*, No. 145, 1844, pp. 201-202]

চাকমারা যে আরাকান থেকে উদ্ভূত এমন মত পোষণ করেছেন আর. এইচ. স্নেড হাচিনসন (R. H. Sneyd Hutchinson)। তিনি লিখেছেন: "The Chakmas are undoubtedly of Arakanese origin. They immigrated into the Chittagong District where they intermarried largely with the Bengalees, whose language they speak. The Chakma is of medium stature and thick-set build, with fair complexion and a cheerful, honest-looking face. Physically he is a finer specimen of manhood than the Magh."

[পঠিতব্য : R.H. Sneyd Hutchinson, *Eastern Bengal and Assam District Gazetters, (Chittagong Hill Tracts)*, p. 21]

চাকমাদের উদ্ভব নিয়ে আব্দুস সাত্তার লিখেছেন :

"The Chakmas and the other tribes in old days were undoubtedly inhabitants of Arakan and its Hill Tracts, for we find mention of them among the earliest of the records of our dealings with the Raja of Arakan. A letter received on June 24, 1787 from the Raja of Arakan to the Chief of Chittagong demands, among other things, fugitive repatriation of some fugitive Chakmas who have fled from the Burmese territory and taken asylum in the hilly recesses of Chittagong."

"At present Rangamati contains a thick concentration of the Chakma populations, although fag-ends of their settlement are traceable elsewhere too."

[Abdus Sattar : *In the Sylvam Shadows*, Dacca, 1971, p. 272]

মনে রাখতে হবে যে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী কোনো উপজাতিই সেখানকার অঞ্চল থেকে উদ্ভূত মানুষ (Autochthones) নয়। তাদের কোনো লিখিত ইতিহাসও (documented history) নেই। ফলে তাদের উদ্ভবের ইতিহাস নানা প্রক্রিয়াব মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হয়। তাদের শারীরিক গঠন, পোষাক, খাদ্য, ভাষা, সামাজিক প্রথা, ধর্ম বিশ্বাস — এ সবকিছুকে ব্যাখ্যা করে তবেই তাদের আদি অবস্থান ও উদ্ভবকে বোঝা যায়। ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদরা চাকমা জাতির উদ্ভব আলোচনা করতে গিয়ে সাক (Tsak) বা সেক (Tsek) শব্দ

দুটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক সময়ে সাক বা সেকরা রাউমতি বা রামায়তি (Ramayati) নামক স্থানে প্রাধান্য বিস্তার করে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। রাময়তি ছিল তৎকালীন আরাকান রাজ্যের রাজধানী কিংবা প্রধান শহর। ৩৬৫ মাঘিসালে (maghisal) অর্থাৎ ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাদের সাহায্য নিয়েই বর্মীরাজা নিয়া সিং নিয়া থেইন (Nya Tsing Nya Thain) তাঁর সিংহাসন পনুরুদ্ধার করেন। কর্নেল ফের বলেছেন যে এক সময়ে পশ্চিম থেকে বেশ কিছু বণিক এসে এদের দেশে বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপন করে। আস্তে আস্তে এই স্থান ও তার চারপাশের অঞ্চলে তারা তাদের পাকাপাকি বসতি স্থাপন করে। এইভাবে পার্বত্যাঞ্চলের মানুষদের নিজস্ব স্থানগুলি বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারা সাক বা সেক উপাধি গ্রহণ করে। বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ এন. এলিয়াস (N. Elias) তাঁর *History of the Shans of Burma* গ্রন্থে বলেছেন যে এই বিদেশী বণিকরা ছিল তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আরব দেশ থেকে আগত মুসলমানরা যারা শেখ (Shaikh or Sheikh) এই উপাধি নিয়েই এসেছিল। শেখ থেকেই সেক বা সাক শব্দটির উদ্ভব। এই সাকরা এখনও ব্রহ্মদেশের সাগর-উপকূল অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের ধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে চাকমাদের ধর্মের মিল না থাকলেও চেহারা, মুখাবয়ব ও শরীরের গঠন থেকে নৃতত্ত্ববিদরা চাকমাদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

সাক ও চাকমাদের সম্বন্ধে মগদের (পাঠান্তরে মঘ) একটি ধারণা আছে। ধারণাটি হল এই যে তারা হচ্ছে মোগল। এক সময়ে মোগলদের সঙ্গে আরাকানদের এক বড় মাপের লড়াই হয়েছিল। এই লড়াইতে মোগলরা পরাজিত হয়। তখন অসংখ্য মোগলদের যুদ্ধবন্দীরূপে আটক করা হয়। আরাকান রাজ তাদের আরাকান কন্যাদের বিবাহ করে আরাকান রাজ্যে বসবাস করতে বাধ্য করেন। তাদের সন্তানসন্ততিরা সাক জাতির আদি মানুষ। তাদের থেকেই চাকমাদের উদ্ভব। এই মত কোনো কোনো প্রতীচ্য ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন। টি. এইচ লিউইন (T. H. Lewin) সরাসরি এই মতকে সমর্থন করেন। তিনি বলেছেন যে চাকমারা একসময়ে মুসলমান ছিল। তাদের ধর্ম কালের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। সতীশচন্দ্র ঘোষ নিজেই বলেছেন যে মোগল সৈন্য বাহিনী ও মগরমণীর মিলনে চাকমাদের উৎপত্তি হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমারা মোগলদের কর দান করত। তাদের মধ্যে অনেকেই মোগলদের ধর্ম, তাদের নাম, উপাধি ও খেতাব ব্যবহার করতে শুরু করেন। কিছুদিন পরেই তারা আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তারা শান্তি লাভ করে। মোগল উপাধি গ্রহণ করার পরিণতিতে চাকমা প্রধানরা 'খান' নামে পরিচিত হন, যেমন জামাল বা জামুল খান, শেরমস্ত খান, শের দৌলত খান, জান বক্স খান, জব্বর খান, তব্বর খান, ধরম বক্স খান ইত্যাদি। তাঁদের পত্নীরা 'বিবি' বলে চিহ্নিত হতেন। এখনও চাকমারা অভিবাদন অর্থে 'সালাম' শব্দটি ব্যবহার করেন, বিস্ময়সূচক, খেদসূচক ইত্যাদি অর্থে খোদা-র নাম উচ্চারণ করে থাকেন।

[দ্রষ্টব্য J.P. Mills : *Notes on a Tour in the Chittagong Hill Tracts in 1926, Census of India*, 1931.]

এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে চাকমারা বিশ্বাস করে না যে তাদের পূর্বপুরুষেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারা বলে যে অতি প্রাচীন কালে জনৈক চাকমা রাজা এক নবাবজাদীকে বিবাহ করেছিলেন। সেই রমণীর সূত্র ধরে কিছু কথা, শব্দ, আচার-বিচার ইসলামী ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক আব্দুস সাত্তার অবশ্য বলেছেন যে চাকমাদের মধ্যে ইসলামিক রীতি-নীতি একবারে বদ্ধমূল হয়েছিল।

পরিশিষ্ট - ২

চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চল সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা এই রকম :

"The district of Chittagong Hill Tracts is, other things apart, a cradle of human evolution. In the grooves of its forests and lonely recesses of hills abound diverse wild tribes, crude, primitive and aboriginal.

The general features of the district are 'tangled mass of hills, ravines and cliffs covered with dense trees, bushes and creeper jungles. The interval between the smaller hill ranges are filled up with a mass of jungle, low hills, small water courses, and swamps of all sizes and descriptions, and so erratic in this configuration as to render any uniform description impossible...."

[Abdus Sattar, *In the Sylvan Shadows*, p. 193]

চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চল আগে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই জেলার পার্বত্য উপজাতির মানুষেরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি দাবি করলে চট্টগ্রাম জেলা থেকে তার পাহাড়ি অঞ্চল প্রশাসনিকভাবে স্বতন্ত্র করে ভিন্ন একটি পাহাড়ি জেলা তৈরি করা হয়। ১৮৬০ সালের ১ আগষ্ট থেকে এই স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চলকে একটি জেলায় পরিণত করে তার নাম দেওয়া হয় Chittagong Hill Tracts. Bengal Government Act III, 1860 অনুসারে এই প্রশাসনিক বিভাজন তৈরি করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এই ভাবে একটি স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হলে তার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একজন পদস্থ কর্মচারী বা অফিসার নিয়োগ করা হয়। তাঁর প্রশাসনিক পদবী বা designation হল Superintendent of Hill Tribes [লক্ষণীয় Hill Tracts নয়, Hill Tribes]। এই কর্মচারীর প্রধান কাজ হল সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্রিটিশ শাসনের শান্তিকে অক্ষুন্ন রাখা। W.W. Hunter বলেছেন : "The primary object of the appointment of a Hill Superintendent was the supervision of the independent tribes and the protection of the dependent tribes within

his jurisdiction." এই কর্মচারীকে তখন জেলা শাসকের কোনো মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাঁর ছিল একজন Officer-in-Charge-এর পদমর্যাদা। ১৮৬৭ সালে এই মর্যাদার বদল ঘটল। Superintendent of the Hill Tribes থেকে তিনি হলেন Deputy Commissioner of the Hill Tracts। এতদিন তার ক্ষমতা ছিল শুধু পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এখন সমস্ত জেলার রাজস্ব ও বিচার বিভাগটিকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখা হল। তাঁর উর্ধ্বতন হলেন Commissioner of the Division। তাঁর সিদ্ধান্তের উপর আবেদন করতে হলে কমিশনারের দপ্তরে করতে হত।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গ সরকার (Bengal Government) এই জেলাকে তিনটি সার্কেলে (Circles) বিভক্ত করল। ১৮৮২ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই বিভাজন চালু হল। এই সার্কেলগুলি হল — চাকমা সার্কেল, বোমোং সার্কেল এবং মোং সার্কেল (Bomong and Mong Circle —কেউ কেউ বোমোঙ্গ ও মোঙ্গ লিখে থাকেন)। এই সার্কেলগুলিকে আলাদা আলাদা করে একজন রাজা বা প্রধানের অধীনে রাখা হল। চাকমা সার্কেলের আয়তন হল ২৪২১ বর্গমাইল। তার প্রধানের শাসনকেন্দ্র হল রাঙ্গামাটি বা রাঙামাটি। বোমোং সার্কেলের আয়তন হল ২০৬৪ বর্গমাইল। তার শাসনকেন্দ্র হল বান্দরন। মোং সার্কেলের শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল রামগর নামক স্থানে।

[দ্রষ্টব্য— Bengal Government Act III of 1860 এবং W.W. Hunter : *A Statistical Account of Bengal, Vol VI (Account of Chittagong Hill Tracts)*]

সূচিপত্র



নিবেদনম্

বাল্যকাল হইতে পুণ্যবতী জননীর শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া কালিন্দী রানীর অলৌকিক চরিত্রকথা শুনিতে শুনিতে কতদিন যে অশ্রুবারিতে তাঁহার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না, সেই সঙ্গে সঙ্গে তদীয় বিস্তৃত জীবনী জানিবার এক আগ্রহ-বীজ এই মরুহৃদয়ে উপ্ত হয়। তাহার পর সংসারের কত ঘাতপ্রতিঘাত এ জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কে তাহার অবধি করে? অবশেষে যখন অবস্থার অন্য এক আবর্তনে এই রাঙামাটি গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী স্কুলে সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসি, তখন পুনরায় সেই বাল্য-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠে। আমার এই চাকুরী ভাল কি মন্দের নিমিত্ত হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে ইহা নিশ্চিত যে — এখানে না আসিলে উক্ত আশাবীজ অঙ্কুরিত না হইতেই দারুণ দারিদ্র্যদহনে বিনষ্ট হইয়া যাইত।

আজ আমার এই কার্যের অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল। প্রায় প্রথম বৎসরেক স্থানীয় ভাব গতিকের সহিত পরিচিত হইতেই কাটিয়া যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য একরূপ স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। অনন্তর এই পার্বত্যপ্রদেশের ইতিহাস সঙ্কলনেও প্ররোচনা জন্মে। কিন্তু যখন শুনিতে পাইলাম যে, স্থানীয় প্রধান শাসনকর্তামহোদয় স্বয়ংই একার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আমি তদনুরূপ সঙ্কলনে বিরত হইয়া দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ইতিবৃত্তের সহিত মহীয়সী মহিষী কালিন্দী রানী এবং তদীয় রাজবংশের তথা সমগ্র চাক্‌মাসমাজের বিস্তারিত বিবরণীপূর্ণ বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নে তৎপর হই। কিন্তু হায়, অর্থ কি ক্ষমতাশূন্য ব্যক্তির পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইতে যাওয়া কি বিষম বিড়ম্বনা, তাহা যদি কেহ কখনও আমার ন্যায় অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, তবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ দুরারোহ শৈলশৃঙ্গ, দুর্গম পার্বত্য পথ দুর্জ্ঞেয় পাহাড়ী-রহস্য — অন্য পরে কা কথা — পার্শ্ববর্তী দেশবাসী আমার পক্ষেও বহু অন্তরায় ঘটাইতেছিল! তথাপি বলিতে কি, কর্মক্লান্ত জীবনের প্রাণপণ শ্রম, কষ্টোদ্বৃত্ত অর্থ ইত্যাদি দরিদ্রসম্বল যাহা কিছু অকাতরে প্রদান করিয়াও, অনেক স্থলে হতাশ হইতে হইয়াছে। আমি যে অজ্ঞাত জনমণ্ডলীকে দশের সমক্ষে আনিয়া পরিচিত করিতে এত যত্নশীল, তাহারা কিন্তু তাহাতে কেমন এক ভীতিপূর্ণ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, তদ্দ্বারা বড়ই বেগ পাইয়াছি। এমনকি তাহাদের অভাব অভিযোগের সংবাদ লইতে গিয়াও আমায় বহু বাধা পাইতে হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ অনির্বচনীয় কষ্টে প্রায় চারি বৎসর কালের অক্লান্ত চেষ্টায় উপাদান সংগৃহীত হইলেও, অতি শঙ্কিতভাবে সঙ্কলনকার্যে প্রবেশ করিয়াছি। কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে এই উদ্যম সম্ভবতঃ অভিনব, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ কোন একখানি জাতীয় ইতিবৃত্তের সংবাদ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। প্রবন্ধ বা পুস্তিকাকারে কোন কোন জাতীয় কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, তৎসমুদয়ের ধারাবাহিক কোন শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিরাট একটি

জাতি-পরিচয়ের তুলনায় তথাকথিত বিবরণী অতীব সামান্য। এই গ্রন্থও তৎপক্ষে যথেষ্ট নহে, তবে তদুপযোগী করিতে লেখক যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন — ইহাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা! এবং গত এই কয় বৎসরের দুঃসহ শ্রমসাধনার ফলে—সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের হৃদয়পটে অপূর্ব রহস্য সমাচ্ছন্ন বক্ষ্যমাণ পার্বত্যজাতির এক অস্পষ্ট ছায়া চিত্রণে সমর্থ হইলেও তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন।

প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কতিপয় বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ভারতী, প্রবাসী, সাহিত্য, কল্পতরু, বৌদ্ধবন্ধু, পরিষৎপত্রিকা প্রভৃতি বিবিধ মাসিক পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য যেন ভ্রমপ্রমাদ বিশোধিত হইয়া যায়। পরন্তু তাহার অনুকূল সমালোচনা এবং সম্পাদক ও পাঠকবর্গের আকুল আগ্রহই অনন্তর পুস্তকাকারে মুদ্রণে অধিকতর সাহসী করিয়াছে। এপক্ষে সর্বোপরি চাক্‌মাজাতির মুকুটমণি শ্রীশ্রীযুক্ত রাজা ভুবনমোহন রায় বাহাদুরের নাম সর্ব্বাগ্রে স্বর্ণাক্ষরে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তদীয় সাহায্যফল রহিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপিখানিও তিনি বহু কষ্ট স্বীকারে দেখিয়া দিয়াছেন এবং মদীয় উৎসর্গ গ্রহণের উত্তরে যে মন্তব্যলিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে আমায় স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতাবলে আশাতীত প্রশংসিত করা হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কনব্যয়েও তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, ইত্যাদি বহুকারণে কেবল গ্রন্থখানি তাঁহায় উৎসর্গ করিয়াই আমি কৃতজ্ঞতামুক্ত নহি, তাঁহার এই অপার স্নেহোপকারের কথা চিরকাল গৌরবের সহিত স্মরণ করিব। মুদ্রাঙ্কনব্যয়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান, শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ান এবং আরও কতিপয় মহোদয়ের প্রদত্ত সাহায্য বহুপরিমাণে উপকার করিয়াছে।

আমার সাহিত্যজীবনেব পরমবন্ধু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদয়ের স্নেহানুকম্পা ইহজীবনে পরিশোধিত হইবার নহে। বলিতে কি তদীয় সনির্বন্ধ উত্তেজনাতেই এই অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যসেবা স্ববৃত্তিপীড়িত জীবনের বিরল অবসরেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থখানি প্রণয়নেও তিনি বহু নৈরাশ্য-কাতরতায় আশ্বাসোদ্দীপনা প্রদান করিয়াছেন এবং বিশেষ শ্রম স্বীকারে পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া দিয়াছেন। সংগ্রহকার্যে পরমস্নেহভাজন শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার আমার প্রধান সহায়। আমি তাহা হইতে অকুণ্ঠিতচিত্তে সাহায্য লাভ করিয়াছি তদ্ভিন্ন চাক্‌মাসমাজের উপরোক্ত নেতৃত্রয় এবং বর্তমানে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের পদে উন্নীত প্রিয় সুহৃদ্‌ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দেওয়ান, বাবু মধুচন্দ্র দেওয়ান প্রভৃতি অনেকেরই সমীপে আমি তজ্জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বাম্মিজ্‌ভাষায় অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সহযোগী শিক্ষক শ্রীযুক্ত মঙ্‌ আংজাই মহোদয় হইতে যে সাহায্য পাইয়াছি, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ব্যতিরেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমার অপর উপায় নাই। কুমার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বায এবং মিশনারী ডাক্তার জি.ও টেইলার আমার ফটোগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়া বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আমি স্থানীয় প্রধান

মিশনারী রেভঃ জি. হিউজ, "বাল্মীকিরজয়ের" ইংরাজী অনুবাদক শ্রীযুক্ত রজনী রঞ্জন সেন বি.এল. প্রভৃতি আরও অনেকের আনুকূল্য লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিসের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও সহযোগী শিক্ষক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য বি.এ. মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁহাদের সমীপে আমি বিশেষ ঋণী।

অনন্তর লিখিতেও প্রাণ অবশ হইয়া পড়ে, গ্রন্থ প্রণয়নের এই কয় বৎসরে মদীয় বক্ষে কয়টী সুতীক্ষ্ণ শেলাঘাত পড়িয়াছে, প্রতি চোটেই যেন পঞ্জরাবলী দীর্ণজীর্ণ হইয়া গিয়াছে! প্রথমতঃ ৬ই পৌষ, ১৩১৩ সালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিসের নাজির প্রিয় সুহৃদ যতীন্দ্রমোহন দাস মহোদয় অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি আমায় অকাতরভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পরন্তু ইহার জন্য এত ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বদিনও খবর লইয়াছিলেন। সেই বৎসরেই দ্বিতীয় শেলাঘাত আশৈশব বন্ধু জমিদারকুমার দীনেশচন্দ্র নন্দীকে হারাইয়া! ২৬শে চৈত্র (মঙ্গলবার) আমার এই দুর্বিপাকের দিন। একই পরাণে হাসিয়া খেলিয়া — একই বৃক্ষের শাখাত্রয়ের ন্যায় সে, আমি ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন শিশুকাল হইতে একত্রে বর্দ্ধিত হইতেছিলাম। অহো, দুরন্ত কৃতান্তের নির্ম্মম পদাঘাতে ফুলফলে বিভূষিত না হইতেই তাহার একটি ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অসময়ে ছিন্নশাখ বৃক্ষের মত অবশিষ্ট দুইজনের হৃদয়ও চুরমার হইয়া গেছে!! তৃতীয় আঘাতে কেবল আমি নহি সমগ্র বঙ্গভূমি তথা আসমুদ্র-হিমাচল ব্যথিত। বিগত ১০ই মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের পূর্ণশশী মহাকবি শ্রীমন্নবীনচন্দ্র সেন মহোদয় মহাকালের আবর্তনে চিরদিনের নিমিত্ত অস্তমিত! হায়, এই পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রিত হওয়ার পর তদীয় পুণ্যময় নামের সহিত আর "শ্রী" যোগ করিতে পারি নাই। অনন্তর মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়া আসার পর. গত ৭ই আষাঢ় অত্রত্য ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর গগনচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় অকস্মাৎ আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, তাঁহার নিকট হইতেও আমি এই পুস্তকের জন্য বহু সাহায্য লাভ করিয়াছি। আজ ইহারা জীবিত থাকিলে কত যে আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের পরম আদরের এই গ্রন্থ গ্রহণ করিতেন, মুদ্রাঙ্কন সমাপ্ত করিয়া তাহা যতই প্রাণে জাগিতেছে, অশ্রুগতি আর সংবরণ করিতে পারিতেছি না! এই সঙ্গে অব্যবহিত পূর্ববর্তী শিশুপুত্র ও স্নেহময়ী খুড়ীঠাকুরানীর দুরপনেয় শোকস্মৃতি আর অধিক লেখা অসাধ্য করিয়া তুলিল !!

মদীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতি এখনও শেষ হয় নাই। বরং যাঁহাদিগের অনুকম্পায় এই সামান্য গ্রন্থের গৌবব বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের উল্লেখই বহিয়া গিয়াছে। এ নিমিত্ত অগাধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুব সি আই. ই. মহোদয়ের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখ কর্তব্য ছিল। তৎকৃত ভূমিকায় এক পক্ষে যেমন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব অতি সহজভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, পক্ষান্তরে তাহাতে তিনি ভারতেতিবৃত্তের প্রকৃতি ও পবিচয়

আলোচনায় স্বকীয় গভীর গবেষণাফল প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা দেশের ইতিহাসচর্চায় এক নূতন উচ্ছ্বাস ছুটিবে আশা করা যায়। অনন্তর স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর. এইচ. স্নেইড্ হাচিন্সনের নাম বলা প্রয়োজন। অপরাপর সাহায্য ব্যতীত তাঁহার অনুকম্পায় এই পুস্তকের পক্ষে যে একটি গুরুতর ভ্রম সংশোধন করিতে পারিয়াছি ততোধিক সন্তোষের বিষয় আর নাই। আমি পূর্বে সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে এই জিলা ও তদধীন সার্কেলাদির পরিমাণ ফল গ্রহণ করিয়াছিলাম, বহিতেও তদনুসারে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উক্ত মহোদয়ের গভীর অনুসন্ধান ফলে যে বিশুদ্ধ ক্ষেত্রফল স্থির হইয়াছে, শুদ্ধিপত্র ও মানচিত্রে তদনুসারেই সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। তদ্ব্যতীত বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের অনুগ্রহে অত্রত্য শাসন-বিধানানুবাদ প্রকাশের অনুমোদন এবং শাসনকর্তাদিগের তালিকাদি প্রাপ্ত হওয়াতেও গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইহাকে তাঁহাদের গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া যথার্থই গৌরবান্বিত করিয়াছেন। "পরিষৎ" স্বীয় ব্যয়ে উৎকীর্ণ কয়টী ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়াও অশেষ উপকার করিয়াছেন, ইত্যাদির নিমিত্ত ইহাদের সকলেরই সমীপে গ্রন্থকার অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

সর্বোপরি ধন্যবাদ পরম মঙ্গলময় বিধাতার। একমাত্র তাঁহারই করুণাবলে, বিশেষতঃ মুদ্রাযন্ত্রের লৌহকবল হইতে প্রায় দেড় বৎসর পরেও গ্রন্থখানি উদ্ধার করিতে পারিয়াছি। পাঠকবর্গ দেখিতে পাইতেছেন, আমার ভাগ্যফলে ইহা পাঁচখানি প্রেস ঘুরিয়া, তবে বাহির হইল। প্রথমে প্রিয় দক্ষিণাবাবুর কমলা প্রেসে সাতমাস পর্যন্ত ঘুরিয়া মুক্তি পাই; দ্বিতীয় প্রেসেও প্রায় ছয় মাস যাবৎ ঘুরিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু এই ফাইন আর্ট প্রেস হইতে যে গর্হিত ব্যবহার পাইয়াছি, তাহা বলিতে ঘৃণা হয়। জানি না, তাঁহারা মফস্বলবাসী দরিদ্র স্কুল মাষ্টার পাইয়া এরূপ করিলেন, অথবা গ্রাহকমাত্রেরই সহিত এরূপ ব্যবহার! তৃতীয় শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রেসে নিয়মিতরূপেই কাজ পাইতেছিলাম, কিন্তু অনন্তর তিনিও বা কেন আমায় পরিত্যাগ কবিলেন. বুঝিলাম না। অবশেষে মেট্‌কাফ্ প্রেসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনরূপে রক্ষা লাভ করিলাম। তজ্জন্য ইহাদের নিকট আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞ, পরন্তু মুদ্রাযন্ত্রের এইরূপ গণ্ডগোলে যে শুদ্ধিপত্র ব্যবস্থা আমি ঘৃণার সহিত দেখিতাম, তাহা এই গ্রন্থললাটেই মুদ্রিত করিতে হইল। আশা করি. তজ্জন্য পাঠকবর্গ এই গ্রহবিড়ম্বিত লেখককে ক্ষমা করিবেন। ইতি।

গ্রন্থকারস্য

১লা আগষ্ট, ১৯০৯

রাঙামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম

ভূমিকা

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে জগতের আদর্শ তাহা কেবল গিরি, নদী, নির্ঝর বা শীতোষ্ণ ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদনিচয় লইয়া নহে, সর্বধর্মের একত্র সমন্বয়, সর্বোপরি মানসিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ হইতে আদিম মানবীয় সরলতা ও প্রকৃতি-নির্ভরতা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার যুগপৎ সংসর্গে এস্থান স্মরণাতীত কাল হইতে সমগ্র ভূমণ্ডলে রমণীয় ও লোভনীয় হইয়া আছে। প্রাচীন জ্ঞানোজ্জ্বল হোমহবির্গন্ধ- পূত দিব্য যুগ হইতে আড়ম্বরদীপ্ত বাষ্প-ধূমাচ্ছন্ন বর্তমান কালে অবতরণ করিলে — অপর সহস্র পরিবর্তনের সংঘর্ষণেও ভারতের সেই "বসুধৈবকুটুম্বকম্" নীতি জীবন্ত রহিয়াছে দেখিয়া প্রাণ শান্ত হয়। দেশের সহিত দেশের — সমাজের সহিত সমাজের — প্রাণের সহিত প্রাণের পরিচয় ঘটাইতে পারে বলিয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, নতুবা আপনা আপনি হাসিয়া-খেলিয়া-খাইয়া-শুইয়া পশু -পক্ষী জীবনও চলিয়া যায় না কি? রেল জাহাজের বিস্তারে যাতায়াতের ক্লেশ লাঘব হইতে পারে, মনের তাহাতে কি আসে যায়? তাহার অনাবিল film-এ বিভিন্ন প্রাণের প্রীতিময় চিত্রপুঞ্জ যত অধিক প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, হৃদয়ভার ততই লঘুতর হইয়া যায়। তখন তুমি আর কেবল তোমার নহ, বিশ্ব তোমার বাড়িঘর—বিশ্ববাসী তোমার ভাই-ভগিনী; দেখিবে, তোমার সুখেদুঃখে—উত্থানপতনে নিখিল বিশ্ব বিচলিত হইয়া উঠিতেছে!

ভারতের বেদ, পুরাণ, সংহিতা, উপনিষদ ইহাই আমাদিগকে দিন দিন শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি হইতেও আমরা অতীত সমাজের সেই অস্পষ্ট আভাস প্রাপ্ত হইতেছি। যদিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের "কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণী" ভিন্ন ভারতের অপর কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ অধুনা বর্তমান নহে। কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা নিশ্চিত বলা যায় না যে, জগতের নশ্বরত্বজ্ঞানে ভারতে ইতিহাস-লিখনপ্রথা তৎপূর্বে প্রচলিত ছিল না। পরন্তু উপর্যুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে কুমারিকা হইতে সুদূর তিব্বত ভূমি পর্যন্ত এবং আরব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত—বিশাল ভূভাগের জলে স্থলে সর্বত্রই ভারতেতিবৃত্তের জরাজীর্ণ পৃষ্ঠাসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। পাঠক্রমের অজ্ঞতা হেতুই আমাদের অতীত কাহিনী ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন বোধ হয়। বস্তুতঃ এই সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অধ্যয়ন করিবার সুযোগ বা অবসর পাঠকের নাই, পক্ষান্তরে তাদৃশ বিশৃঙ্খল পৃষ্ঠাসমূহ হইতে পাঠোদ্ধার করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। বহু দিন হয়, প্রাচ্য পণ্ডিত কর্ণেল টড্ মহোদয় 'রাজস্থানে'র ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে এক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, অন্ততঃ সেই পথ ধরিয়া হইলে, ভারতের সকল স্থানের পুরাবৃত্ত ভাগ সংগৃহীত হইলে, দেশের এক মহৎ অভাব ঘুচিত।

বর্তমান গ্রন্থকার অধিকতর কঠোর অবস্থানিচয় হইতে এই জাতি বিশেষের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে অপর এক অভিনব আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতের অভ্যুদয় সম্পন্ন অপরাপর জাতির তুলনায় এই নগণ্য প্রান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মাজাতি সামান্য বিবেচিত হইলেও, ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, সভ্যতা-অসভ্যতা এবং উন্নতি-অনুন্নতির অভ্যন্তর

প্রদেশে বহিরাবরণ ও বাহুল্য পরিহার করিয়া সকল জাতির সকল শ্রেণীর প্রাণের গতি একই ভাবে চলিয়াছে এবং যে প্রবৃত্তি লইয়া জীব মানব শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে তাহাও সমস্ত human feelings and passions — সুখ-দুঃখ-হিংসা-দ্বেষ-অনুরাগ-বিরাগ পূর্ব্ববৎ স্থির রহিয়াছে। ত্রিসহস্র বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী Papyrous পত্রের উপর হস্তলিখিত যে এক পুরাতন গল্প মিশর দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এই উক্তির সত্যতা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়। তাহা উপলব্ধ হইলে আর্য্য অনার্য্য সভ্য অসভ্য প্রাচ্য প্রতীচ্যের কোন বিভাগই থাকে না — সকলকেই নিজের অংশ মাত্র বলিয়া জ্ঞান হয়। সকলের অন্তর্গতি একই দিকে প্রধাবিত, এবং সকলকেই বিশ্ব বিধাতার সমদৃষ্টির সমক্ষে একই প্রাণে অনুপ্রাণিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা মুখে 'ভাই ভাই - ঠাঁই ঠাঁই, ভেদ নাই - ভেদ নাই ইত্যাকার যাহা বলি না কেন, সেই এক প্রাণ ভ্রাতৃত্ববোধ আমাদের অতি অল্পই আছে। যাহাদিগকে কখনও দু'চক্ষে দেখি নাই, এমনকি যাহারা সাদা কি কালো তাহাও জানি না তাহাদিগের নিমিত্ত প্রাণের কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মিবার সম্ভাবনাও তো দেখিতেছি না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর সহৃদয় তাঁহারা (Hunter, Risley) বা স্থানীয় ইংরাজ শাসনকর্তাদিগের গ্রন্থ হইতে সেই অজ্ঞাত ভাইভগিনীদের সংবাদ লইয়া থাকেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, কোন ভিন্ন জাতীয় চরিত্রের সহিত পরিচিত হইতে পার্শ্ববর্তী জাতিরও বহুকাল কাটিয়া যায়. তাদৃশ স্থলে বিদেশীয় লেখকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-কুলশীল জাতি বিশেষতঃ জটিল পার্বত্য রহস্য সম্বন্ধে সামান্য কয় বৎসরের অভিজ্ঞতায় কত আর আশা করা যাইতে পারে। তবে তাঁহারা যে স্বাভাবিকী অনুসন্ধিৎসাগুণে দেশের এই অনাদৃত জাতি সম্বন্ধে এত শ্রম স্বীকার করিতেছেন. তাহাতেই অগণ্য ধন্যবাদ, তাঁহাদের হইতে দেশের প্রতি আমাদের বহু কর্তব্য শিক্ষা করিবার আছে।

এক্ষণে দেখিব আমাদের বর্তমান গ্রন্থকার ইহাতে কিরূপ কৃতকার্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পার্বত্য জাতি সম্বন্ধে সাধারণত লোকেব নানারূপ ভ্রান্ত মত ও বিশ্বাস শুনা যায়। অভ্যন্তরীণ অবস্থানাভিজ্ঞতাই ইহার এক মাত্র কারণ — এই গ্রন্থালোচিত যাবতীয় বিষয়ের সার সংগ্রহ করিয়া দিয়া পুস্তকের রসভঙ্গ করিতে না চাহিলেও, পাঠকবর্গকে একটা স্থূল পরিচয় দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই পক্ষে আমাদের আশা আছে, তাঁহারা সূচীপত্রখানি দেখিলেই তৃপ্তিলাভ করিবেন। একটা জাতি সম্পর্কে ভাষায় যতটা পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, তিনি তাহা আশাতীতরূপে চিত্রিত করিযাছেন এবং বিষয়গুলি এমনি সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, মূল গ্রন্থখানিকে সহজেই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, প্রথম খণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত --- ইহাই ইতিবৃত্ত ভাগ। এই অংশে গ্রন্থকারের গভীব তত্ত্বানুসন্ধান এবং আরাকান, ব্রহ্ম, তিব্বত, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের ঐতিহাসিক সাহিত্যের বহুল সমালোচনের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই উপলক্ষে কেবল চাক্‌মাজাতির নহে, অধিকন্তু পূর্বোক্ত প্রদেশাদিবও অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তদীয় আলোচনা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে চলিয়াছে দেখিয়া আশা করা যায়. ইহা রাজা-প্রজা, স্বজাতি-বিজাতি সকলের তুল্যরূপ প্রীতি আকর্ষণ করিবে। দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত সামাজিক ভাগ এবং তৃতীয়

খণ্ডে মূল গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ তাহা সভ্যতা ভাগ। অর্থাৎ কোন অপরিচিত জাতির সংবাদ যেরূপে লওয়া স্বাভাবিক, গ্রন্থকার যেন তেমন কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠককে সম্মুখে রাখিয়া, যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় যথাক্রমে বিন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই শেষ দুই খণ্ডে লেখকের ভূয়োদর্শন ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ততোধিক বর্ণনা শক্তি অধিকতররূপে পরিস্ফুট। জানিলেও জানাইবার, দেখিলেও দেখাইবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই থাকে। আমি পুনরায় বলি, সেই শক্তি বর্তমান গ্রন্থকারের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে এবং তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন উপলক্ষে কিরূপ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ও গ্রন্থটীকে পূর্ণতা প্রদান করিতে কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থের অল্পমাত্র স্থূল পাঠ করিলেই সহজেই উপলব্ধি হয়। আরও আশ্বাসের কথা, গ্রন্থখানি চাক্‌মাজাতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইলেও, ইহাতে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বও স্থূলরূপে আলোচিত হইয়াছে।

চাক্‌মাদিগের সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম, ইহারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী নহে। বহুকাল ধরিয়া ইহাবা স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছে এবং এক সময়ে পার্বত্য সমস্ত প্রদেশের শৈলশিখরে প্রকৃতির সরল শিশুর ন্যায় স্বেচ্ছাভিলাষে বিচরণ করিতেছিল। লেখক তিব্বতীয় ও দার্জিলিংবাসী লিম্বুদিগের কেবল বাংলা-আখ্যায় ইহাদের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন কিন্তু আচারব্যবহার প্রভৃতি আরও বহু প্রকারে উভয় সমাজে সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। তিব্বতের মহাযান ধর্মই যে চাক্‌মাদিগের আদি ধর্ম ইহাদিগের আধুনিক জীবনেও তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অতঃপর লেখকের বঙ্গীয় প্রাচীন বর্ণমালার সহিত ব্রহ্ম ও চাক্‌মাবর্ণের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া দেশের সমক্ষে এক অপূর্ব তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন, ইহাতে তিনি আশ্চর্য গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, এইরূপ ঐতিহাসিক ও অভ্যন্তরীণ যাবতীয় তত্ত্বগর্ভ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ কোন গ্রন্থ এযাবৎ কোন জাতি সম্বন্ধে প্রণীত হয় নাই, বিশেষতঃ বাঙ্গলায় ইহাই সর্বপ্রথম Antiquatic গ্রন্থ। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস সাহিত্য ও সমাজে এই গ্রন্থ সকলেরই সাদর সম্বর্দ্ধনা লাভ করিবে।

অধিক আর কি লিখিব, গ্রন্থকার বয়সে নবীন হইলেও প্রবীণাধিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি "Indian Research Society"র জনৈক বিশিষ্ট সভ্য। আশা করি তাঁহা দ্বারা দেশের আরও বহু পুরাতত্ত্ব দেশের সমক্ষে উদ্ধার লাভ করিবে এবং তিনি জাতীয় ইতিহাসের যে সঙ্কেত প্রদান করিলেন, তাহাতে প্রত্যেক দেশহিতৈষী অন্ততঃ স্বজাতির ইতিহাস সঙ্কলনে ব্রতী হইবেন। তরুণ লেখককে বৃদ্ধের এই সস্নেহাশীর্বাদ---সুখস্বাস্থ্যের সহিত চিরায়ু লাভ করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করুন।

ইতি

শ্রী শরচ্চন্দ্র দাস

লাসাভিলা
দার্জিলিং

চাক্‌মা জাতি
প্রথম পরিচ্ছেদ
(১) জাতীয় পরিচয় এবং (২) প্রাচীন কাহিনী

সভ্যতা

বর্তমান সভ্যতার নৈকষ্য-পরীক্ষায় পার্বতীয় জাতিসমূহের মধ্যে চাক্‌মাদিগের একতম শ্রেষ্ঠ আসন স্বীকার করা যাইতে পারে। বিদ্যা-বুদ্ধি-শিল্প-সাহিত্যে ইহাদিগের শক্তি সভ্য জাতিরই প্রায় সমকক্ষ, এবং উন্নতিও সন্তোষজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি মিঃ হজসন (Mr. Hodgson) প্রমুখ কোন কোন বিদেশীয় ঐতিহাসিক কেবল অনুমানবলে ইহাদিগকে আদিম অসভ্য—বর্বর (Aboriginal) শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন,(১) এ কেমন অবিচার? ভারতের যাবতীয় পুরাবৃত্ত কাহিনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন, উপর্যুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রাচীন নিদর্শনাবলীও বিলুপ্তপ্রায়। তাই বলিয়া উপযুক্ত প্রমাণ-পরীক্ষা ব্যতিরেকে কেবলই অনুমানে ঘুরিলে, ঐতিহাসিকের দায়িত্ব চুকিবে কেন? সত্য বটে, প্রমাণের উচ্ছৃঙ্খল-আবর্তে পড়িয়া অনেক সময়ে যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয়। তখন সেই মীমাংসা পাঠককেও বুঝিতে দেওয়া উচিত। নতুবা অভিজ্ঞতার উচ্চ-আসনে দাঁড়াইয়া ভ্রূকুটি সঞ্চালনে স্পষ্ট-নিঃসন্দিগ্ধভাবে বক্তৃতা করিয়া গেলে, নিরীহ পাঠককে প্রতারণা করা হয় মাত্র। তাঁহারা যে তিমিরে-সে তিমিরেই পড়িয়া রহেন! বর্তমান পুস্তকেও যে সে দোষ ঘটিবে না, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে যথাসাধ্য সাবধান রহিলাম—এই পর্যন্ত! তা'ছাড়া প্রবোধের কথা এই যে, এই পুস্তক প্রণয়নে দুর্লভ তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে কঠোর যত্নস্বীকারের ক্রুটী হয় নাই। উপস্থিত চাক্‌মাজাতির উৎপত্তি, স্থিতি বা পরিব্যাপ্তিমূলক এ যাবৎ যে সমুদয় বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দারা ইহারা যে অনার্য নহে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন করা যায়। সে সমুদায় বাদ বিচার যথাক্রমে আলোচিত হইতেছে।



(১) Vide :-

(i) Bengal Asiatic Society's Journal No. 1, 1853

(ii) The Calcutta Review, October, 1869

(iii) Cencus Report, 1901

ইহাদিগের মুখমণ্ডল গোলাকার;নাসিকা নত ও চিপিট, গণ্ডদেশের অস্থি উন্নত, বক্ষঃ প্রশস্ত, বাহুযুগল মাংসল, জঙ্ঘাদেশ অতিশয় স্থূল ও সুদৃঢ় (বোধ হয় পর্বতারোহণ ও অবরোহণই ইহার প্রধানতম কারণ হইবে) সর্বোপরি অক্ষিগোলকের কপিলাভাস এবং বক্রদৃষ্টি ইত্যাদি লইয়া শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় বটে, কিন্তু সুগঠিত নহে ! শারীরিক উপাদানগুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। বর্ণ গৌর সত্য কিন্তু লাবণ্যবর্জিত। অপরতঃ কেশভূষণেও ইহারা নিতান্ত অসৌভাগ্য। পুরুষেরা বিরলগুম্ফ — শ্মশ্রুহীন (২) বলিলেও চলে। রমণীসমাজেও আগুল্‌ফবিলম্বিত কেশদাম স্বপ্নের অগোচর। এককথায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মঙ্গোলিয়ান সংজ্ঞার সহিত অক্ষরে অক্ষরে ইহাদিগের সাদৃশ্য রহিয়াছে। "বঙ্গীয় জাতি ও বংশ" (Tribes and Castes of Bengal) নামক পুস্তকে স্যার রিজ্‌লী মহোদয় নানা প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন যে * এতাদৃশ শারীরিক গঠন এবং বর্ণগত সৌসাদৃশ্যে ইহাদিগকে মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তৎ-সমর্থনার্থে তিনি ইহাদের শতকরা ৮৪.৫ জনের মঙ্গোলীয় চেহারা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্যও দিয়াছেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিত (Herr Verchow) হার ভার্‌চো মহোদয় বলেন, এই পরিমাপ কোনও জাতিরই আকৃতিগত তুলনার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

শারীরিক গঠন

*Page 168

পরন্তু আমরা মানবজাতির ককেশিয়ান, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি ভিত্তিহীন বিভাগগুলির উপর আস্থা স্থাপন করিতে সম্মত নহি। জলবায়ু এবং মানসিক বৃত্তি ও ব্যবসায়াদিভেদে জীবের নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাহা দেখিয়া শুনিয়াও বিভিন্ন প্রদেশবাসী-বিভিন্নবৃত্তিক মানবগণের বর্ণ ও আকারগত বিভিন্নতায়, বিভিন্ন বংশভুক্ত নির্দেশ করা কদাপি সঙ্গত বোধ হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী হনু, নাসিকা ও করোটির গঠন এবং সংস্থান বৈষম্য দেখিয়া যে চীন ও মঘ (কিরাত) দিগকে মঙ্গোলীয় স্থির করিয়াছেন, মনু সংহিতা প্রভৃতি বহু প্রামাণ্য গ্রন্থে তাহাদিগকে ভূতপূর্ব ভারতবাসী বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়াই জানিতে পারা যায়।(৩) সুতরাং চাক্‌মাগণ মঙ্গোলীয় কি না এবংবিধ প্রশ্নের মীমাংসা আমরা আদৌ প্রয়োজনীয় মনে করি না।

চাক্‌মাদিগের জাতীয় ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমত দেখাইতে হইবে, তাহাদের আদিম বসতিস্থান কোথায়, এবং কিরূপেই বা তাহারা বর্তমান অধ্যুষিত স্থানসমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর এফ্. মূলার (F. Muller) ব্রহ্মদেশ, আরাকান ও পার্বত্য চট্টগ্রামনিবাসী জাতিমাত্রকেই "লোহিতিক"(৪) বংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন+। অর্থাৎ ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসী প্রায় সমুদায় জাতির মুলশাখা লোহিত্য—নামান্তরে ব্রহ্মপুত্র (যোরকিও সাংপো) নদের তীরভূমি হইতে

+Allgemeine Ethnographic, P. 405

---

(২) যে দু'এক গাছি উঠে, অনেকে তাহাও চিমটার সাহায্যে উৎপাটিত করিয়া ফেলে।
(৩) "সাহিত্য সংহিতার" ১৩১২ সালের 'আষাঢ়' সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত মন্তব্য বাহির হইয়াছে।
(৪) Lohitic – from Lohita, 'red' a name of the Brahmaputra believed by lassen to have reference to east and the rising sun (Ind. Alt. I 667, note)

আগত। অপরাপর নরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে "তিব্বতীব্রহ্মা" নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই 'লোহিতিক' বা 'তিব্বতীব্রহ্মা' সংজ্ঞার সহিত বক্ষ্যমাণ চাক্‌মাজাতির সম্বন্ধনির্ণয় করিবার পূর্বে, "পার্বত্যচট্টগ্রাম এবং তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ (The Hill Tracts of Chittagong and the Dewellers therein) প্রণেতা—এই পার্বত্য-চট্টগ্রামেরই ভূতপূর্ব ডিপুটি কমিশনার কাপ্তেন টমাস্ হাবার্ট লুইন (Captain Thomas Herbert Lewin) কৃত শ্রেণীবিভাগের আলোচনা সমীচীন মনে করি। তিনি এই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিবর্গকে ব্রহ্মদেশীয় নামানুকরণে "খ্যয়ংথা" এবং 'টংথা" শ্রেণীদ্বয়ে বিভাজিত করিয়াছেন *। শব্দ দুইটি ব্রহ্মভাষাজ, 'খ্যয়ং অর্থ নদী, 'টং' অর্থ পর্ব্বত, আর 'থা' বা 'ছা' শব্দের অর্থ সন্তান। অতএব যাহারা নদীকূলে বাস করে, তাহাদিগকে "খ্যয়ংথা" অর্থাৎ "নদীর সন্তান" এবং পর্বত শৃঙ্গবাসিগণকে 'টংথা" অর্থাৎ "পাহাড়ের সন্তান' বলা যায়[৫]। এই সংজ্ঞামতে চাক্‌মাগণকে তিনি "খ্যয়ংথা" শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত [৬] করিয়া গিয়াছেন। +গ্রূণওয়েডেল সাহেব (Herr A. Grunwedel) বলেন, ইহা কেবল বাহ্যভাবে নহে, কার্যতও এই প্রথা তাহারা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া থাকে। কিন্তু (Herr Verchow) ভারচো সাহেবের মতে এই সকল বিভাগ তাহাদের (বর্তমান) নদীকূলে আবাস ও পার্বত্য বাসস্থান অনুযায়ী হইয়াছে, এতদ্দ্বারা আদিম বসতি বা কোন বিশেষ বিধি কিছুতেই অনুমান করা যায় না। আমরাও এই শেষোক্ত মত সমর্থন করি।

মূল নির্দেশ

*Page-28

শারীরিক গঠনাদি দেখিয়া আবার কেহ কেহ সন্দেহ করেন, ইহারা আরাকান হইতে উৎপন্ন,[৭] বাঙ্গালীদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থনকল্পে ইহাও বলিতে চাহেন যে, চাক্‌মাগণ সম্প্রতিমাত্র আরাকানী ভাষা ছাড়িয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে। তাহা হইলে এখনও আমরা চাক্‌মা ভাষায় প্রচুর মঘীশব্দ পাইতাম, কিন্তু ইহা একপ্রকার নাই বলিলেও হয়। পক্ষান্তরে রিজ্‌লী মহোদয় বলেন * "এতৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণও অতিশয় দুর্বল। কেননা, আমরা যতদূর জানি, অল্পকাল মাত্র হইল আরাকানে লোকবসতি আরম্ভ হইয়াছে।" তবে কিনা ইহারা যে এক সময়ে আরাকানে বসবাস করিতেছিল, তাহাতে কোন ভুল নাই। তথা হইতে অনুকৃত বর্ণাবলী এযাবৎ ব্যবহৃত হইতেছে।

সিদ্ধান্ত বিশেষ

*Tribes and castes of Bengal, p. 168

(৫) রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস লেখক বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ "খ্যয়ংথা" গণকে মঘবংশজ এবং 'টংথা' দিগকে কিরাতবংশজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শেষে আবার তিনি কাপ্তেন লুইনের মতে মত দিয়া বলিয়াছেন "খ্যয়ংথা" বংশের একটী শাখা চাক্‌মা নামে পরিচিত (৩৩৩ পৃষ্ঠা), তবে কি তিনি চাক্‌মাগণকে মঘবংশজ বলিতে চাহেন? অন্যত আমরা মঘ এবং কিরাতদিগকে অভিন্নজাতি বলিয়াই জানি।

(৬) কাপ্তেন লুইনের এই মন্তব্য হইতে "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত"কার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাসগুপ্ত "ইয়ংথা" অর্থাৎ 'খ্যয়ংথা' শব্দের এক ব্যাপক অর্থ নির্দেশ করিযা চাক্‌মাজাতিকে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে "টংথা" মিশ্র ও সঙ্কর জাতি।

(৭) পরন্তু তারকবাবুও (কোন্ অনুমানবলে জানি না) লিখিয়াছেন, "ইয়ংথা (অর্থাৎ চাক্‌মাগণ) আরাকান্ বংশসম্ভূত।" চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা ৫।

ইহাদিগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতিমূলক এরূপ নানাবিধ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। মঘেরা বলে, ইহারা মোগল বংশধর। কোন সময়ে চট্টগ্রামের (মুসলমান) উজীর কতগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরাকানরাজ-বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক বিশুদ্ধাচারী "ফুঙ্গীর"[৮] কুটীর-পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তখন ফুঙ্গী উজীরকে তদীয় আশ্রমে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কথা রহিল, অতি সত্বরেই ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাতে উজীরও সম্মত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পাকের বিলম্ব দেখিয়া তিনি জনৈক সৈনিককে তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। সে আসিয়া কুটীরে প্রবেশ করতঃ দেখিল, ফুঙ্গী একটি পাত্রে চাউল ও মাংস দিয়া উনানের উপর স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু উনানে কাষ্ঠ দেওয়া হয় নাই। তৎপরিবর্তে ফুঙ্গী পাত্রনিম্নে পদদ্বয় রাখিয়াছেন, — অঙ্গুলীসমূহ হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছে। সে এই অলৌকিক দৃশ্যে অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রভুকে আসিয়া সমুদয় বিবৃত করিল। ইহাতে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, 'তাদৃশ প্রক্রিয়ায় কখনও অন্ন পরিপক্ক হইতে পারে না।' অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে পুনর্যাত্রার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। এদিকে সেই বিশুদ্ধচেতা ফুঙ্গী অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাহারা চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি অতিশয় মর্মাহত হইয়া সসৈন্যে উজীরকে অভিশপ্ত করিলেন। তাঁহাদের প্রতি এক যাদুময় তেজঃ প্রেরিত হইল। তাহারই ফলে আরাকানরাজের সৈন্যসম্মুখে উপনীত হইলে তাঁহাদের চিত্তবল বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেল, — অনায়াসেই পরাজিত এবং বিপক্ষের হস্তে বন্দীভূত হইলেন। আরাকানেশ্বর এই মোগলগণকে স্থানীয় অধিবাসীদের হইতে পত্নী গ্রহণের অনুমতি দিয়া স্বীয় রাজ্যে দাসস্বরূপে স্থাপন করিলেন। ইহারাই ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান চাক্‌মাজাতিতে পরিণত হইয়াছে।

জনশ্রুতি

মুসলমানী শব্দের প্রাধান্য

এই জনশ্রুতির পরিপোষকতায় কাপ্তেন লুইন দেখাইয়াছেন যে, ১৭১৫ হইতে ১৮৩০ খৃঃ-অব্দ পর্যন্ত জামুল খাঁ, সেরমুস্ত খাঁ, সেরদৌলত খাঁ, জানবক্স খাঁ, জব্বর খাঁ, টব্বর খাঁ, ধরমবক্স খাঁ প্রভৃতি চাক্‌মাভূপতি বর্গ "খাঁ" উপাধি[৯] পরিগ্রহ করিতেন। তদানুষঙ্গিক ইহাও উল্লিখিত হইতে পারে যে, এই সময়ে তাঁহাদের কুলবধূগণেরও "বিবি" খেতাব প্রচলিত ছিল। এখনও অশিক্ষিত সাধারণে "সালাম" শব্দে অভিবাদন করে এবং আশ্চর্য বা খেদসূচক আবেগে "খোদা"র নাম স্মরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও কেবল এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়া কখনই ইহাদিগকে মোগল-প্রসূত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ চট্টগ্রামে মোগলাধিকার স্থায়ীরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল, আড়াইশত বৎসরেরও কম; ইহার দেড়শত

(৮) ফুঙ্গী বৌদ্ধ যাজক বা মঠাধ্যক্ষ।

(৯) এই "খাঁ" উপাধি সম্বন্ধে আবার কেহ কেহ বলেন, চাক্‌মাদিগের জনৈক রাজা চট্টগ্রামের কোন মুসলমান উজীর পরিবার হইতে বিবাহ করায় এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা পুরুষপরম্পরাগত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতেও আমাদের সন্দেহ বিস্তর।

বৎসর পূর্ব হইতে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। পূর্বোক্ত প্রবাদ সত্য হইলে চাক্‌মাজাতির উৎপত্তিকাল তিন শত বৎসরের অধিক হইতে পারে না, সুতরাং ইহা একেবারে অসম্ভব। বোধ হয়, চট্টগ্রামে মুসলমান-প্রাবল্য-সময়ে এই করদরাজন্যবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার "খাঁ" "বিবি" প্রভৃতি সম্মানাস্পদ খেতাব গ্রহণ করিয়াছেন।[১০] এমনকি ইঁহাদের জড় কামানও কালু খাঁ, ফতে খাঁ—প্রভৃতি গৌরববাচক 'খাঁ' আখ্যা[১১] লাভ করিয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত দু-একটী মুসলমানী সংস্কার এবং 'আদব-কায়দা'ও প্রবেশলাভ করিয়াছে, ইহা অবশ্য মানিয়া লওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশীয়েরা ইহাদিগকে "ছাক্'বা 'ছেক্' নামে নির্দেশ করেন। কুকিরাও[১২] ডাকে "টুইছেক্"। তাহাদের ভাষায় "টুই" শব্দের অর্থ "জল", সুতরাং তাহাদিগের মতেও ইহারা জলতীরবাসী জাতি। সম্ভবতঃ চাক্‌মাগণকে কর্ণফুলী ও তাহার করদ চেঙ্গী, শুভলং, কাচালং প্রভৃতি তীরে বসবাস করিতে দেখিয়াই কুক্‌িগণ টুইছেক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন[১৩] বলা বাহুল্য এই আখ্যাও কাপ্তেন লুইনেরই মতানুবর্তিত, কর্ণেল[১৪] ফেইরি (Colonel Phayre) আরাকানের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন, * "রাজা-ওং" অর্থাৎ আরাকানের রাজমালাতে পাওয়া যায়, রারানথির (বর্তমান বারাণসী) রাজপুত্র যুবরাজ কৌমিসিং পিতা কর্তৃক ব্রহ্ম, শান (বর্তমান শ্যাম) এবং মালয়জাতি অধ্যুষিত দেশসমূহের

চাক্‌মা নমের বুৎপত্তি

*Bengal A.S. Journal – No 145 of 1844

(১০) পরন্তু এই সকল উপাধি হয়ত কেহ কেহ মুসলমান সম্রাট হইতেও পাইয়া থাকিবেন। কেননা দেখা যায়, হুসেনশাহ্ স্বীয় মন্ত্রী গোপীনাথ বসুকে "পুরন্দর খাঁ" এবং সভাসদ পণ্ডিত মালাধর বসুকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, - "সেকালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল, "পুরন্দর খাঁ" "গুণরাজ খাঁ" এই সব রাজদত্ত খেতাব।" — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য়) ১৪৯ পৃঃ। যাহা হউক এগুলি আধুনিক বর্ণপুচ্ছাপেক্ষা যেন অধিকতর মূল্যবান মনে হয়।

(১১) পাতিয়ালা রাজ্যেও এরূপ 'খাঁ' উপাধিধারী একটী কামানের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার নাম কুড়ি খাঁ। ১৮৪৫ ৪৬ অব্দের যুদ্ধে ইংরেজ হস্তে পতিত হয়।

(১২) কুকি আখ্যাটী পূর্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালীদের দ্বারা তাহাদিগের "কু কু - কু - কি কি কি" শব্দ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকিবে। কেননা তাহাদিগকে কোন বিষয় বা স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণতঃ উত্তর দেয়, 'কু - কু - ক' অর্থাৎ সে কি বা সেখানে কি কি - কি - কি এখানে কি বা এখানে এই! পরন্তু বিগত সেন্সাস্ রিপোর্টেও লিখিত হইয়াছে, The word Kuki is really a genenc term used by the people of the plain to denote the hillmen, other than Tiperahs and Chakmas' (Report on the Census of Bengal, p. 420).
কাছাড়বাসিগণ ইহাদিগকে "লুছাই" নামে অভিহিত করিত। কাপ্তেন লুইন এই শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন - 'লু' অর্থ মস্তক, এবং 'ছাই' ক্রিয়ার অর্থ কাটা অর্থাৎ যাহারা মাথা কাটে। যাহা হউক গভর্ণমেণ্ট তাহা হইতেই "লুসাই" (Lushai) বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

(১৩) পক্ষান্তরে কুকিগণ পর্বতশীর্ষে বাস করে বলিযাই ইহাদের প্রতি ঈদৃশী অভিধা প্রদান করিয়া থাকিবে।

(১৪) ইনি পরে "Sir Arthur" উপাধি পাইয়াছিলেন। History of Burma নামে ইহার একখানি পুস্তকও আছে।

উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হইলে, তিনি বর্তমান ছান্দোয়া নগরের নিকটবর্তী আরাকানের প্রাচীন রাজধানী রামায়তী নগরে আসিয়াছিলেন। এখানে তিনি পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে নানা জাতীয় লোক আনয়ন করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা সর্বাদৌ উপজীবিকা প্রার্থনা করে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের নাম রাখিলেন — "ছেক"।(১৫) ইহারাই ক্রমে রাজকীয় ইতিবৃত্তে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ৩৫৬ মঘাব্দে (৯৯৪-৯৫ খৃঃ-অব্দ) রাজা ন্যা-সিং-ন্যা-তৈন্য এই ছেক বা ছাক্‌দিগেরই সহায়তায় সিংহাসন লাভ করেন। ইহার তিনশত বৎসর পরে রাজা মেংদি, শ্যাম এবং ছাক্‌দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি আরাকানের প্রান্তসীমায় ছাক্‌সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদিগের আচার, ব্যবহার চাক্‌মাদিগের সহিত নানাস্থলে বিভিন্ন হইলেও, মূলতঃ সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। এই 'ছাক্' নামটি যেন 'চাক্‌মা' নামেরই রূপান্তর মাত্র। সার রিজলিও "ছাক্—ছাক্‌মা"—"চাক্‌মা" রূপে মূল নির্দেশ করিয়াছেন। কাপ্তেন লুইন বলেন,+ "চাক্‌মা নামটি চট্টগ্রামের অধিবাসীগণের দ্বারা প্রদত্ত"। কিন্তু চট্টগ্রামের জনসাধারণ অদ্যাপি "চাক্‌মা" ও "জুমিয়া"(১৬) আখ্যার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারে নাই। মঘ, ত্রিপুরা প্রভৃতিকে বাদ রাখিয়া প্রধানতঃ চাক্‌মাগণকেই অধিকাংশ চট্টগ্রামবাসী "জুম্মোয়া" (জুমিয়া) নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এমনকি কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনও "জুমিয়াজীবন" লিখিতে গিয়া এই ভ্রমে পতিত্ হইয়াছেন। তৎকৃত অবকাশরঞ্জিনীতে (১৭২ পৃষ্ঠা, হিতবাদী সংস্করণ) 'জুমিয়া' শব্দের টীকা দেখিলেই ইহা সহজে উপলব্ধ হয়। অপর "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত"—লেখক তারকবাবুর ভ্রম আরও স্পষ্টতর। তিনি লিখিয়াছেন "(ইয়ংথাগণ) জাতিতে জুমিয়া, ইহারা অনেকাংশে সুসভ্য, ধর্মে বৌদ্ধ। চাক্‌মারানী কালিন্দী এই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন (৫ পৃষ্ঠা)"। ফলতঃ জুমোপজীবী পার্বত্য জাতিমাত্রকেই যে "জুমিয়া" বলা হয়, তাঁহারা সেই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ না করিয়া কেবল চাক্‌মাজাতি বিশেষকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং লুইন মহোদয়ের অনুমানের সার্থকতা কোথায়? পক্ষান্তরে ইহারা নিজে বলিয়া থাকে, তাহাদিগের আদিম বসতিস্থান 'চৈম্পানগো' বা চম্পকনগর হইতে 'চাকমা' নামের উৎপত্তি। রাজ্যবিস্তার মানসে রাজপুত্র এদিকে আসিয়াছিলেন, আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই, উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রহিয়া গিয়াছেন। এযাবৎ যত সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, সমুদয়ই তাহাদের এই উক্তির অনুকূলে। আমরা ক্রমে ক্রমে সে-সকল উপস্থিত করিতেছি। ব্রহ্মদেশে অধিবাসকালে তদ্দেশীয়েরা ইহাদিগকে (দীর্ঘ উচ্চারণে) "ছাক্‌মা", সংক্ষেপত —"ছাক্" নামে অভিহিত করিয়া থাকিবে। আর কর্ণেল ফেইরি-বর্ণিত যুবরাজ কৌমিসিংহের প্রতিপত্তি বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়াই সন্দেহ জন্মে।

+The H.T. of Ctg. and the dwellers therein, p.62

---

(১৫) আরন্তু আরাকানে এই একই বর্ণবিন্যাসে 'ছেক' এবং 'ছাক্' উচ্চারণগত বৈষম্য রহিয়াছে। অনেকেই 'ছাক্' উচ্চারণের পক্ষপাতী।

(১৬) জুমিয়া — যাহারা "জুম" করে। "জুম" কৃষিরই প্রক্রিয়াবিশেষমাত্র। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে ইহার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

২

এক্ষণে এই চম্পকনগর যে কোথায় অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করাই বিষম সমস্যা। কেহ কেহ ইহাকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মগধ অর্থাৎ বর্তমান বেহার রাজ্যে নির্দেশ করিয়া থাকেন।(১৭) সেখানে ইহাদিগের পূর্বপুরুষ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এই পার্বত্যপ্রদেশ অধিকার করিয়া এখানে বসবাস এবং স্থানীয় অধিবাসী মঘদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধ চালাইতে থাকেন। কিন্তু আমরা এই ভিত্তিহীন অনুমানের উপর আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি। কোথায় ভাগলপুর, আর কোথায় বা পার্বত্য চট্টগ্রাম — শত শত মাইল ব্যবধান। প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের বক্ষের উপর দিয়া সম্পূর্ণ অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিল, অথচ ইতিহাসের সুস্পষ্ট আলোকে ছায়ামাত্র পড়িল না, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? তদ্ভিন্ন এই দ্বাদশ শতাব্দীতেও যে তাহারা আরাকানে বিচরণ করিতেছিল, তত্রত্য ইতিবৃত্তে ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অপর একদলের মতে এই চম্পকনগর মালক্কার নিকটবর্তী, সুতরাং চাক্‌মাগণ মালয়বংশজ * কিন্তু কল্পনাব্যতীত তাহাদের অপর কোনও প্রমাণ নাই, অতএব ইহাও ন্যায়তঃ গ্রহণ করিতে পারি না। পরিশেষে চাক্‌মা সম্প্রদায়ের সযত্নরক্ষিত আখ্যায়িকাবিশেষের উল্লেখ দেখাইয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতেছি।

চম্পক নগর

* The H.T of Ctg. and the dwellers therein, p.62

ইহারা উৎসব-আমোদ কথকদিগের প্রমুখাৎ " ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যান" এবং "চাটিগাঁ[১৮] ছাড়া" নামক পূর্বপুরুষের প্রাচীন কাহিনী অতিশয় আগ্রহ এবং ভক্তিভরে শ্রবণ করিয়া থাকে। এই দুইটিতে আখ্যায়িকার গন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা হইতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিতে পারা যায়। এই গ্রন্থের শেষভাগে কাহিনী দ্বয়ের মূল সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, বর্তমান প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে এস্থলে সংক্ষেপে মাত্র তাহাদের সারভাগ উল্লিখিত হইল। "ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যানে" আছে, কোন সময়ে "চম্পকনগরে উদয়গিরি নামে জনৈক রাজা ছিলেন।" পুনরায় সেই প্রশ্ন! পরন্তু ইহাতে উপাখ্যানকার চম্পকনগরীর অবস্থান নির্ণয়ের পথ কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। যতদূর দেখা যায়, ইহা ত্রিপুরাদেশেরই অন্তর্গত।(১৯) কেননা, উপাখ্যানপাঠে জানা

উপাখ্যান

(১৭) তাঁহাদের মতে চম্পকনগর সম্ভবতঃ চীনদেশীয় পর্যটক ফা-হিয়ান্ বর্ণিত চম্পারাজ্য। তিনি ৪২৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। বর্ণনায় আছে, বর্তমান ভাগলপুরের অনতিদূরে অবস্থিত কম্পাপুরী বা কর্ণপুরের রাজধানী চম্পারাজ্য।

(See also Bishop Biganelit's Life of Gautama, P. 430. 2nd Edition)

(১৮) প্রাচীন চাটিগাঁ হইতে বর্তমান চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

(১৯) সাহিত্যবিদ্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এ এই চম্পক নগরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলে সেইখানেই চাঁদসদাগরের আবাসভূমি ছিল। তাহাদের কল্পনায় লখীন্দরের লৌহবাসর ভিত্তিও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। সে যাহা হউক্ তৎসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। (১৭৪ পৃষ্ঠা ২য় সংস্করণ)

যায়, 'রাজা উদয়গিরির দুই পুত্র, বিজয়গিরি ও সমরগিরি [২০] দক্ষিণে মঘাধীশ্বরের রাজ্য বিস্তারে বাধা দিবার নিমিত্ত যুবরাজ বিজয়গিরি সেনাপতি রাধামোহন-সমভিব্যাহারে তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন। কিন্তু রাধামোহন প্রিয়তমা পত্নী ধনপতির সনির্বন্ধ অনুরোধে যুদ্ধযাত্রার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরাপাড়ায় জয়নারায়ণ রোয়াঝার সন্নিধানে প্রতিদিন অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছিলেন। চম্পকনগর অপর কোন দেশে হইলে পার্শ্বগ্রামে ত্রিপুরাপাড়া থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ এই বর্ণনায় জলপথে চট্টগ্রাম আসিতে মেঘনা-দরিয়ার [২১] উল্লেখ আছে।

চম্পকনগরের অবস্থান নির্দেশ

তদ্দ্বারাও চম্পকনগরকে ত্রিপুরার অন্ততঃ সমীপস্থ বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া, চাক্‌মাদিগের জাতীয় কাহিনীর আরও দুইটী কারণে আমরা এই চম্পকনগরকে ত্রিপুরার অন্তর্গত মনে করিতে পারি। ইহাদের গানে আছে —

"ডোমে বাজায় ঢোলদগর
ফিরিয়াইয়ম্‌ [২২] নূরনগর।"

ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ "নূরনগর" পরগণার কথা সম্ভবতঃ সকলেই অবগত আছেন। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের মধ্যে ত্রিপুরার গোমতী নদীর উৎপত্তি বিবরণটীও রূপকথাচ্ছলে সবিশেষ প্রসিদ্ধ. ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে তাহা আমূল প্রদত্ত হইল। ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত ইহাদিগের কোনকালে সম্বন্ধ না থাকিলে, সমাজের সহিত জড়িত হইয়া এ সকল কাহিনী থাকা কি সম্ভব হইতে পারে? এই সঙ্গে আরও বলা যায়, চাক্‌মা-রমণীগণ ত্রিপুরা মহিলাদের অনুকরণেই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। ইত্যাদি কারণে আমাদের উপযুক্ত বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদক উইলসন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, এই ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও আরাকান প্রদেশ লইয়া পুরাকালে সুহ্মদেশ গঠিত হইয়াছিল। [২৩] সুতরাং ত্রিপুরার চম্পকনগরবাসী চাক্‌মাগণের দৃষ্টি চট্টগাম ও আরাকানের উপর সহজেই আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। এক্ষণে আমরা মূলার (Mr. Muller)

২০) কেহ কেহ এই বিজয়গিরি ও সমরগিরিকে ত্রিপুরাধিপতি দেবমাণিক্যের পুত্র বিজয়মাণিক্য ও অমরমাণিক্যের সহিত অভিন্ন কল্পনা করেন। কিন্তু নামগত এই সামান্য সাদৃশ্য ভিন্ন ইহাদের জীবনীতে কোন মিল পাওয়া যায় না।

(২১) 'দরিয়া' মুসলমানী শব্দ, অর্থ সমুদ্র। উপাখ্যানকার মেঘনার মহান পরিসর দেখিয়া সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

(২২) ফিরিয়া যাইব অর্থাৎ প্রত্যাবৃত্ত হইব।

(২৩) ইহা অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। মহাকবি কালিদাস "রঘুবংশ মহাকাব্যে" সুহ্মদেশকে পূর্বসাগরের উপকূলে 'তালিবনপূর্ণ শ্যামায়মান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়প্রবৃত্ত সম্রাট রঘু -

"পৌর স্ত্যানেবমাক্রামন্‌ তাংস্তান্‌ জনপদান্‌ জয়ী।
(সুহ্মদেশং) প্রাবা তালীবন শ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ।।"
৩৪, ৪র্থ সর্গ।

সাহেবের সেই ব্রহ্মপুত্রনদে আগত লোহিতিক [২৪] জাতির সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধও স্বীকার করিতে পারি। এই মতে ত্রিপুরায় তাহাদের প্রাচীন উপনিবেশ-স্থাপনও অযৌক্তিক নহে। বিশেষতঃ শ্রীহট্টের দক্ষিণপ্রান্তে এক চাক্‌মাসম্প্রদায় অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আপনাদিগকে "উত্তরের চাক্‌মা" এবং বক্ষ্যমান জাতিকে "দক্ষিণের চাক্‌মা" বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রীহট্টের চাক্‌মাগণকেও ইহাদের শাখাবিশেষ স্বীকার করা যায়। এবং মূল চাক্‌মাজাতিকেও নরজাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের সংজ্ঞায় "তিবতীব্রহ্মা" বংশসম্ভূত বলা যাইতে পারে। এক্ষণে ইহাদের বিস্তৃত পর্যালোচনা করা যাক।

উক্ত উপাখ্যান "চাঁটিগাঁ-ছাড়া" অর্থাৎ 'চট্টল বর্জ্জন' কাহিনীর অবতরণিকা মাত্র, শেষোক্ত আখ্যায়িকায় তাহারা কিরূপে চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণী আছে। দুঃখের বিষয় এই ঘোরতর যুদ্ধরাশিপরিপূর্ণ বিচিত্র আখ্যানভাগে সময় নির্দ্দেশক কোনও সুবিধা নাই। কেবল এই মাত্র বলিতে পারা যায়, তখনও চট্টগ্রামের মঘরাজার প্রভুত্ব প্রসারিত হয় নাই। ইহা অনুমান—চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর কথা হইবে। পক্ষান্তরে এই "চাটিগাঁ-ছাড়া"র চম্পকনগরও চট্টগ্রাম হইতে অত্যধিক দূরবর্তী নহে। সুতরাং এতদ্দ্বারাও ত্রিপুরা দেশেই চম্পক নগরের অবস্থান বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

আখ্যায়িকা

"চাটিগাঁ-ছাড়া"য় আছেঃ-

বিজয়গিরির অভিযান

যে সময়ে যুবরাজ যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এদিকে মঘরাজ অমঙ্গলাশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। জ্যোতির্বেত্তার নিকট জানিতে পারিলেন, উত্তরে শত্রু জন্মিয়াছে। কিন্তু গুপ্তচর পাঠাইয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। এদিকে বিজয়গিরি (অপর প্রতিনিধি অভাবে) সেনাপতি রাধামোহনকেই লইয়া অভিযান করেন। কালাবাঘা প্রদেশে [২৫] তদীয় শিবির সংস্থাপিত হইল। মঘদেশ জয়ের নিমিত্ত বিপুল সৈন্যসহকারে রাধামোহনই প্রেরিত হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা সমুদ্রও পাইয়াছিলেন। এইরূপে সসৈন্যে তিনি কৈংগাং-তীরে [২৬] আসিয়া মঘরাজ-সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। মঘরাজা সন্ধি চাহিলেন না। অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত ও বশীকৃত হন।

'মঘদেশ-জয়ের পর রাধামোহন খ্যয়ংদেশ [২৭] বিজয়ের নিমিত্ত ছুটিলেন। সেখানে

(২৪) 'রাজমালা' লেখক আবার এই লোহিতিক সম্প্রদায়কে হিমালয়, পূর্বপ্রান্ত, এবং মধ্যীভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে গারো, ত্রিপুরা, কাছারী ও মণিপুরী প্রভৃতি পূর্বপ্রান্ত শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং এই চাক্‌মাগণও "পূর্বপ্রান্ত লোহিতিক" শ্রেণীভুক্ত হইবে।

(২৫) বর্ণনা পাঠে মনে হয়, কালাবাঘা প্রদেশ চম্পকনগর ও চট্টগ্রামের মধ্যভাগে, শেষোক্ত প্রদেশেরই অনতিদূরে অবস্থিত।

(২৬) কেবল চাক্‌মারা কেন, সমস্ত পূর্ববঙ্গেই "গাং" শব্দে নদীকে বুঝায়। শব্দটী বোধ হয় "গঙ্গা" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২৭) খ্যয়ং জাতির আবাসস্থান। অদ্যাপি আরাকানে এই জাতি বিরল নহে। ইহাদের রমণীগণ পরমাসুন্দরী,

"জালি পাগর্জ্যা"[২৮] নামক স্থানে গিয়া সকলে বিশ্রাম লাভ করিল। ক্রমে খ্যয়ংদেশও বিজিত হইল। অতঃপর রাধামোহনের রাজ্যজয়-লিপ্সা এতই বাড়িয়া যায় যে, অচিরে তিনি প্রবলপরাক্রান্ত অক্সাদেশ (ব্রহ্ম) জয়ের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। কিন্তু এখানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধে সেনাপতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। শেষে দৈববলে অনাময় হইয়া পুনরায় দ্বিগুণিত তেজে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, অক্সাদেশও অধিকৃত হইল। তদনন্তর প্রত্যাবর্তন-পথে অনায়াসেই কাঞ্চনপুর[২৯] হস্তগত করিলেন। তখন আবার পূর্বদিকে কুকিরাজ্য জয় করিবার ইচ্ছা হইল। রাধামোহনের আগমন সংবাদে কুকিরাজ প্রস্তরনির্মিত দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ক্রমাগত পঞ্চদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধের পর কুকিরাজ পরাভূত হইলেন।

রাধামোহনের ব্রহ্মজয়

'দিগ্বিজয়ব্যাপার শেষ করিয়া সেনাপতি রাধামোহন যুবরাজ-সমীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কালাবাঘাপ্রদেশ হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলে মঘরাজা 'পুনরায় চাক্‌মারাজ আসিতেছেন' শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাপ্লারেইকুলে রাধামোহনের সহিত বিজয়গিরির সাক্ষাৎ হয়। তখন সেনাপতি স্বদেশ-গমনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। যুবরাজ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার প্রার্থনা অনুমোদন করেন। প্রায় বার বৎসরের (?) পর রাধামোহন স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

প্রত্যাবর্তন

বিজয়গিরির দিগ্বিজয় যাত্রার পর বৃদ্ধ রাজার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। সিংহাসন শূন্য থাকিলে পাছে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সমরগিরি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাধামোহনের প্রত্যাবর্তন সংবাদ পাইয়া সমরগিরি তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। রাধামোহন বিজয়গিরির উপদেশানুসারে বলিলেন যে, 'তিনি নিশ্চয়ই আগামী অগ্রহায়ণ মাসে প্রত্যাবর্তন করিবেন।' তদনন্তর সমরগিরি রাধামোহনের প্রমুখাৎ বিজিত রাজ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ করিলেন।

সমরগিরি হইতে সাক্ষাৎ

'এদিকে বিজয়গিরি নবরাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা বিধান করিয়া সেই অগ্রহায়ণ মাসেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যখন কালাবাঘা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, অনেকদিন হইল বৃদ্ধ পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন

কিন্তু সমস্ত বদনমণ্ডলে 'উল্‌কি' চিহ্নিত করিয়া অপূর্ব সুষমা ঢাকিয়া রাখে। কথিত আছে, পুরাকালে অত্যাচারী মঘরাজার কুদৃষ্টি হইতে অবলাগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই ঈদৃশী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ক্রমে সেই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে।

(২৮) জালি পাগর্জ্যা বৃক্ষবিশেষ। এই জাতীয় অত্রত্য হান্যারচর বাজারের নিকটেও আছে। সম্ভবতঃ এই গাছ অধিক ছিল বলিয়াই তদনুসারে স্থানের নাম হইয়াছে। কথিত আছে, খ্যয়ং জাতিরা উক্ত বৃক্ষের উপরই বসবাস করিত। বৃক্ষের প্রসার দেখিলে ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

(২৯) ইহা সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী বর্তমান কাঞ্চননগর হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, এক সময়ে আরাকান হইতে জনৈক মঘাধিপতি হৃতরাজ্য হইয়া কতিপয় প্রজার সহিত এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

সমরগিরিরই হস্তগত হইয়াছে, তখন তিনি কিরূপে গিয়া কনিষ্ঠ সহোদরকে অভিবাদন করিবেন — এই লজ্জা এবং মনঃক্ষোভে অধীর হইয়া আর অগ্রসর হইলেন না। তখন বড়ই মর্মপীড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন — 'যে দেশে এহেন অবিচার, (জ্যেষ্ঠ বর্তমানে কনিষ্ঠ রাজ্য পায়), সেখানে আর যাইব না। অতএব সৈন্যগণ, চল পুনরায় ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যাই।' এইরূপ বহু আক্ষেপ করিয়া বিজয়গিরি ব্রহ্মদেশে সসৈন্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণকে তত্রত্য অধিবাসীদের হইতে পত্নীগ্রহণের অনুমতি দিয়া নিজে রূপে-গুণে বরণীয়া "আরি" (পরী) জাতীয়া এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন। ক্রমে বিজিত রাজ্যের ধর্ম এবং আচার-পদ্ধতিগুলিও তথাকথিত চাক্মাসমাজে পরিগৃহীত হইয়া গেল। এইরূপে চট্টগ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ায় কবি আখ্যায়িকার নাম "চাটিগাঁ-ছাড়া" রাখিয়াছেন। কিন্তু চাক্মা জাতির প্রধান মূল চম্পকনগরেই পড়িয়া রহিল। শ্রীহট্ট নিবাসী বর্তমান চাক্মাগণ এই বংশসম্ভূত হইবে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এই পুস্তকে তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। ইহাতে কেবল বিজয়গিরির অনুসৃত চাক্মাদিগের বিবরণই লিপিবদ্ধ হইবে।

বিজয়গিরির আক্ষেপ

"চাটিগাঁ-ছাড়া" উপাখ্যানবিশেষ বটে, কিন্তু ইহাতে কল্পনার অব্যাহত-প্রভাবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানি আমি, ঐতিহাসিকের আসরে উপাখ্যানের আদর নাই, ছন্দঃ এবং পদমিলনের জন্য হইলেও কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারও কৈফিয়ৎ আছে। "চাটিগাঁ-ছাড়া" যেই ছন্দে বিরচিত, তাহার পদমিলনের নিমিত্ত কবিকে বড় একটা ভাবিতে হয় নাই, অথচ মিত্রাক্ষর। শেষ পঙ্‌ক্তিতে যাহা বর্ণনা করিতে হইবে, তাহারই অন্ত্যবর্ণবিশিষ্ট যে কোন একটি অর্থশূন্য বাক্য পূর্বে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সে যাহা হইক, এই সুদীর্ঘ বৎসরাবলীর পরেও "চাটিগাঁ-ছাড়ার" প্রমাণমূলক সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। চট্টগ্রামের কমিশনের অফিসে ব্রহ্মসম্রাট তরবুমার ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আছে। ইহা চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্তার নিকট উভয় রাজ্যের মধ্যে অবাধ-বাণিজ্য চালাইবার প্রার্থনায় লিখিত হইয়াছিল। পত্রখানি সুদীর্ঘ, বাহুল্যভয়ে এস্থলে মাত্র প্রয়োজনীয় অংশের মর্মানুবাদ তুলিয়া দিলাম। —

ব্রহ্মসম্রাটের পত্র

* * * *

"চট্টগ্রাম মোগলরাজ এবং অমরপুর-রাজ আম্বাং দামা[৩০] কর্তৃক আবাদিত ও অধ্যুষিত হয়। এখানে তাঁহারা চতুঃশতাধিক দুইসহস্র সাধাবণ উপাসনামন্দির ও চতুর্বিংশতি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আম্বাং দামার সিংহাসনাধিরোহণের পূর্বে এই দেশ "ছত্রধারী" উপাধি-

(৩০) কাপ্তেন লুইনের মতে, অমরপুর - ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের নামান্তর এবং যুবরাজ অর্থাৎ "দারূন" উপাধি হইতে "দামা" হইয়া থাকিবে। কিন্তু "রাজমালায়" দেখিতে পাই "অমরপুর অমরমাণিক্যের রাজধানী নিবিড় অরণ্যমধ্যে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। ত্রিপুরার অন্যান্য রাজধানী অপেক্ষা অমরপুর ব্রহ্মার নিকটবর্তী।" (৫ পৃষ্ঠা)

বিশিষ্ট নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তাঁহারা অনেক উপাসনামন্দির প্রস্তুত এবং প্রত্যেক জাতীয় লোকদিগকে ধর্মশিক্ষা দিতে যাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যুত ইহাদিগের সময়ে রতনপুর, দুর্গাদি, আরাকান, দুর্গাপতি, রামপতি, চৈদক, মাহদীনি, মানাং প্রভৃতি দেশের অধিপতি রাজা ছিরীতমাছাকের অধিকারের পূর্বে এদেশের শাসনব্যবস্থা নিকৃষ্ট ছিল। তাঁহার ন্যায়পরায়নতা ও কার্যদক্ষতার সহিত শাসনকার্য নির্বাহিত হইত; তাঁহার শাসনে প্রজাবর্গ সুখী ছিল। তদানীন্তন সাধুগণের বন্ধুত্ব-দ্বারাও তিনি অনুগৃহীত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে বুদ্ধনামা একজন তাঁহার আবাসাভিমুখে গেলে, রাজা তৎসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যেন একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দেন। এই প্রার্থনামতে খোয়ামাচ্চি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বর্গ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য প্রস্তরাদি বর্ষিত হইয়াছিল। এ সমুদয় প্রাগুক্ত ধর্মযাজকের রক্ষণাবেক্ষণে ভূমধ্যে প্রোথিত ছিল। লোকে এইখানেই দেবতাগণকে পূজা করিতে আসিত। পর্যটক ও যাত্রীদিগের সেবার নিমিত্ত রাজা ঐ মন্দিরে ভৃত্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন। রাজা নিজে পাঁচখানি গ্রন্থপাঠেই সময় কাটাইতেন। ধর্মশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ অসৎ আচার ও কার্য হইতে তিনি সতত বিরত ছিলেন এবং তদীয় ধর্মযাজকগণ হংস, পারাবত, ছাগল, শূকর, মোরগ প্রভৃতি জীবের মাংস খাইতেন না। দুস্কর্ম, চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যা ও পানদোষ এ সময়ে একরূপ অজ্ঞাতই ছিল।

* * * *

"দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত প্রজাশাসনকরতঃ আমি — ছিরীতমাছাকের আইন ও রীতি-নীতি যথার্থই প্রতিপালন করিয়াছি।"

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মদেশীয়েরা চাক্‌মাগণকে ছাক্ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই ছিরীতমাছাক্ রাজা বিজয়গিরির অনতিপরবর্তী উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভবনা। ব্রহ্মদেশের আবহাওয়ায় এত পরিবর্তন ঘটিতেছিল যে নামটী পর্যন্ত রক্ষা পায় নাই। কোথায় উদয়গিরি বিজয়গিরি প্রভৃতি আর কোথায় তাঁহাদিগেরই বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিরীতমা! অতঃপর আমরা এইরূপ ইয়াংজ, চোত্রু, চোতু প্রভৃতি বংশধরদিগের কথা উল্লেখ করিব। এস্থলে প্রাচীন নরপতিগণের শাসনবিধির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা কেবল অর্থ ও রক্তপিপাসু ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রজারচরিত্র শোধন ও ধর্মসাধনের পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। বিশেষতঃ চাক্‌মাধীশ্বর ছিরীতমার শাসনপ্রণালী এত উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া শত্রুরাজগণও তাহা আদর্শরূপে মানিয়া চলিয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মরাজ্যের চাক্‌মা অধিপতিবর্গের শাসনবিবরণী বর্ণিত হইতেছে।

ব্রহ্মদেশের পুরাবৃত্ত "চুইজং-ক্য-থাং"- এর মধ্যে দেখিতে পাই, বিরাট ব্রহ্মসাম্রাজ্য তিন প্রধানভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগের অধিপতি ব্রহ্মরাজ স্বয়ং, অপর দুই অংশ চাক্‌মা ও মঘরাজার শাসনাধীনে ছিল বলিয়া কীর্তিত। এতদ্ভিন্ন ইহাতে চাক্‌মাগণসংক্রান্ত বিশেষ কোন

ঘটনার উল্লেখ নাই। অন্যতঃ "দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং" অর্থাৎ "আরাকান কাহিনী" আমাদিগের প্রধান প্রামাণ্যগ্রন্থ। আরাকানাধীশ্বরের দিগ্বিজয় বর্ণনায় ইহা নানাদেশের তথ্যে পরিপূর্ণ। আমাদের

ব্রহ্ম ও আরাকানের ইতিহাস

দেশীয় ইতিহাসের সহিত দু'একস্থলে ইহার সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তদীয় সাক্ষ্যে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায় না। এই সভ্যতার প্রদীপ্তালোকেও ঐতিহাসিকের নিকট নিরপেক্ষ বর্ণনা পাইবার আশা বড় অল্প। একই দৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন চস্‌মায় বিভিন্ন বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া লিপিবদ্ধ হয়, আর হতভাগ্য পাঠক দেখিতে দেখিতে ভ্রান্ত, পড়িতে পড়িতে উদ্‌ভ্রান্ত এবং ভাবিতে ভাবিতে প্রভ্রান্ত হইয়া মজিয়া রহে! 'অন্ধের হস্তীদর্শন' কাহিনী বোধ করি অনেকেই অবগত আছেন। সুতরাং স্বরূপতত্ত্ব পাইতে হইলে, আমাদিগকে সমস্তই একীভূত করিয়া একটি

ঐতিহাসিক রহস্য

অভিনব সংগ্রহ গঠন করিতে হইবে। সুখের বিষয় — আজকাল এই শ্রেণীর দুই-চারিখানি পুস্তক বাঙ্গালাতেও দেখা দিতেছে, তাহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

"দেঙ্গ্যাওয়াদি - আরেদফুং" তে ৪৮০ মঘাব্দে, খৃষ্টীয় ১১১৮-১৯ সনে চাক্‌মাদিগের সর্বপ্রথম উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়—"এ সময়ে পেঁগো (আধুনিক পেগু) দেশে আলং-চিছু নামা জনৈক রাজা ছিলেন। পশ্চিমের বাঙ্গালীদিগের সহিত মিলিত হইয়া চাক্‌মাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করে। পেঁগোরাজ স্বীয় প্রধানমন্ত্রী (কোরেঙ্গী)-কে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলে, একটী সারসপক্ষী একখানি মৃত প্রাণীর চর্ম মুখে লইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। তিনি তাহাকে ধরিয়া রাজার শিবিরে

চাক্‌মা ও বাঙ্গালী

লইয়া গেলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, এই সারস—বাঙ্গালী ও চর্মখানি—চাক্‌মা, উভয়ের মিত্রতা ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ এই সারসের ন্যায় বশ্যতা স্বীকার করিবে। রাজা মন্ত্রীর এহেন যুক্তিগর্ভ আশ্বাসবাক্যে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে একটি হস্তী উপহার প্রদান করেন। অনন্তর হঠাৎ চতুর্দিকে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিল, পবিত্র "মহামুনি" মূর্তি[৩১] স্বেদসিক্ত হইলেন, ঘন ঘন অশনি নিপাত — অকালবৃষ্টি — বন্যায় সমস্তাৎ হাহাকার পড়িয়া গেল, রাজা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া এই অমঙ্গল শান্তির নিমিত্ত পুরোহিতকে শতমুদ্রা প্রদান করিলেন। এই

(৩১) বুদ্ধদেব, জন্মস্থান কপিলাবস্তু নগরে "শাক্যমুনি" লঙ্কায় "চন্দ্রমুনি" (চাঁহিদা মুনি) এবং ব্রহ্মদেশে বিশেষতঃ অকিয়াবে "মহামুনি" আখ্যায় অভিহিত ও পূজিত। প্রাগুক্ত মূর্ত্তিদ্বয় যথাসম্ভব স্বাভাবিক অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যেরই মত। কিন্তু মহামুনিকে দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। উচ্চতায় যেন আকাশ ছুঁইয়াছে, পরিধানে কপিলবস্ত্র, ধ্যানস্তিমিত নয়নযুগল, নবধারের বৃত্তি নিরোধ - নিবাত-নিষ্কম্প সাধনাতৎপর সেই বিরাট মূর্ত্তি বিরাট ভাবেরই সূচনা করে। কর্ণেল ফেইরী বলেন (Bengal Asiatic Society's Journal - No 1451, 1844 A.D.) আরাকানরাজা ছান্দা-থু ভিয়া গৌতম (অর্থাৎ চতুর্থ) বুদ্ধের অনুকরণে মহামুনিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ছিলেন।" শাস্ত্রে আছে বুদ্ধ দেবের উচ্চতা পরিমাণ ৮০ হাত। মহামুনি মূর্ত্তিতে শাস্ত্রমত যতদূর সম্ভব রক্ষা পাইয়াছে। চট্টগ্রামেও এতদনুকরণে দুইটী মহামুনিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ঘটনার বহুকাল পরে আনালুম্ম নামক পেগুরাজার শাসন সময়ে পুনরায় বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ মিলিয়া উত্থিত হয়। রাজা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া দাম্মাজিয়াকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। দাম্মাজিয়া যাত্রা করিয়া সম্মুখে দেখিলেন, একটী বক ও একটী কাক ঝগড়া করিতেছে, অবশেষে বক কাকের ডানা ভাঙিয়া দিল। তিনি রাজার নিকট আসিয়া ইহা বিবৃত করিলেন। মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, এই কাক বাঙ্গালী এবং বক আমরা। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ নিশ্চিত। সেনাপতি অমিত-উৎসাহে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। পাঁচদিন অবিরাম যুদ্ধের পর বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ পলায়ন করে"। (১৭-১৯ পৃষ্ঠা)

"অনন্তর কুতুবদিয়ার উত্তরে বাঙ্গালীগণ এবং আরাকানের অন্তর্গত ক্রিন্দেন পাহাড়ের চাক্‌মাগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিল। আরাকান রাজার দুই মন্ত্রী পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে. বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ যাহাতে মিশিতে না পারে — তজ্জন্য আমাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে। বাঙ্গালীদিগকে জয় করিতে পারিলে চাক্‌মাগণকে বশে আনিতে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু বাঙালীরা বেগতিক দেখিলেই পলাইয়া যায় এবং প্রায়শঃই অশান্তি উৎপাদন করে। সুতরাং যেরূপে তাহাদিগের সমূহ বল বিধ্বস্ত হয় সেই কৌশল খেলিতে হইবে। এই নিমিত্ত পঞ্চ সহস্র "বালাম নৌকা" [৩২] প্রস্তরপূর্ণ করিয়া একদা নিশাভাগে বাঙ্গালীদের জাহাজাদি চলিবার পথে ডুবাইয়া রাখা হয়। বর্তমান মাতামুড়ি নদীর মোহনায় চান্দাজা ও মু[illegible]্যংজ নামক সেনাপতি-দ্বয়ের অধীনে দশসহস্র সৈন্য থাকে। অন্যদিকে প্রকাণ্ড বংশভেলায় বারুদ, গোলা এবং বহুসংখ্যক সৈনিক-পুত্তলিকা স্থাপন [৩৩] করিয়া ভাটার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গালীরা মনে করিল, ঐ বুঝি মঘসৈন্য আসিতেছে। তাহারা অনতিবিলম্বে জাহাজে চড়িয়া গোলাবর্ষণতৎপর হইল। ভেলা যতই নিকটতর হইতেছিল, তাহারা আরও অধিকরূপে গোলাক্ষেপণ করিতে লাগিল। পরিশেষে এই গোলার অগ্নিতেই ভেলাস্থিত বারুদ-গোলাদি জ্বলিয়া সসৈন্যে বাঙ্গালীদিগের জাহাজ বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে অতি সহজেই বাঙ্গালী-বিজয় হইয়া যায়। পক্ষান্তরে চাক্‌মারাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া মঘরাজ অধীনতাস্বীকারপূর্বক বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মন্ত্রী মঘরাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, চাক্‌মারাজার সহিত সখ্যস্থাপনে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বাঙ্গালীদিগের কূটবুদ্ধিতেই চাক্‌মারাজ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন।" (২৪-২৫ পৃষ্ঠা)

বাঙ্গালী-বিজয়

"৬৯৫ মঘাব্দে (১৩৩৩-৩৪ খৃঃ অঃ) আরাকানাধিপতি মেঙ্গাদি [৩৪] সমীপে লামুনছুগ্রী নামা জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ দিলেন, উচ্চব্রহ্মের চাক্‌মারাজা নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন।

(৩২) এই নৌকাগুলি আকারে সুবৃহৎ। এক এক নৌকায় ৫/৬ শত মণ বোঝাই ধরে। সমুদ্রপথেই প্রায় যাতায়াত করিয়া থাকে। চট্টগ্রামেও ইহার প্রচলন যথেষ্ট।

(৩৩) শুনা যায় চীন জাপান যুদ্ধে সুচতুর জাপানীগণ এইরূপ কৃত্রিম সৈন্য স্থাপন করিয়া অহিফেন বিভোর চৈনিকগণকে প্রতারিত করিয়াছিলেন।

(৩৪) এই মেঙ্গাদি পরিশেষে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন।

এই সংবাদে তিনি প্রধানমন্ত্রী (কোরেঙ্গী) রাজাঙ্গ্যাছাংগ্রাইর অধীনে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া চাক্‌মারাজার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। পরে "রিজার্ভ" হইতে আরও বিংশসহস্র সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে দিলেন। কিন্তু ছাংগ্রাই আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তংখংজার শাসনকর্তা হ্রিঞ্জচুর অধীনে দশহাজাব এবং তঙ্গুর শাসনকর্তা রেমাচুর সঙ্গে দশহাজার সৈন্য দিয়া মংদ্রুমের পথে, জান্দোয়াজার শাসনকর্তা ছাদোয়াং-এর তত্ত্বাবধানে দশহাজার দিয়া ছাব্রংকামার পথে, দালাকের শাসনকর্তা ক্যচুঙের সহিত দশহাজার সৈন্য দিয়া দালার পথে, রুজাঙ্গুরং নামক শাসনকর্তাকে দশহাজার সৈন্য দিয়া রুচ্চারুইর পথে, মাইয়ং-এর শাসনকর্তা খেচুকে দশহাজার এবং চিথোংজার শাসনকর্তা লাইচুর অধীনে দশহাজার সৈন্য দিয়া ছালোক্যোর জলপথে প্রেরণ করেন। মন্ত্রী নিজে বিশ হাজার 'রিজার্ভ' সৈন্য পঞ্চাশ হাজার অপরাপর সৈনিক এবং ত্রিশ হাজার বাঙ্গালী কুলী সমভিব্যাহারে চানীর পথে যাত্রা করিলেন। এইরূপে প্রত্যেকেই যথাস্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

চাক্‌মারাজার বিরুদ্ধে অভিযান

এতদ্ভিন্ন বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তংখংজাব শাসনকর্তার নিকটেই পেঁগো রাজ্য থাকিবে। পেগুরাজ বাধা দিতে চাহিলে তোমরা বলিবে, "আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই, মঘরাজ মিত্রতা স্থাপনের নিমিত্ত এক পরমা সুন্দরী রমণী উপহাব লইয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" পরে তোমরা স্ত্রীলোকটিকে সুসজ্জিত করাইয়া দেখাইও। দালার পথযাত্রী ক্যচুংকেও এইরূপে শ্যামরাজাকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সঙ্গে এক একটি সুন্দরী বমণীও দিয়াছিলেন। অনন্তর মন্ত্রীপ্রবর ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, তিনি স্বয়ং চাক্‌মারাজার রাজধানী (উচ্চব্রহ্মের) মইচাগিরি আক্রমণ করিবেন, সুতরাং উচ্চ ও নিম্ন ব্রহ্মের সকলে সাবধান থাকিবে। যখন যাহা ঘটে, যেন অবিলম্বে তাঁহার কাছে সংবাদ প্রেরিত হয়।

পাশবিক কৌশল

"মন্ত্রী ছাংগ্রাই তংদাম্রুনগরে উপনীত হইয়া চান্দাই নামা জনৈক শাসনকর্তাকে একখানি পত্রসহ চাক্‌মারাজ-দরবারে দূতরূপে পাঠাইলেন। পত্রে উল্লিখিত হইল, মঘরাজা এক পরমা রূপবতী যুবতীর সহিত তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। চান্দাই নিজমুখেও এতাদৃশ বিবরণী বেশ সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিলেন। চাক্‌মারাজা ইহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া চান্দাইকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন। এবং প্রধানমন্ত্রীর নিমিত্ত একটি হস্তী, একখানি স্বর্ণহার, একখানি সুবর্ণযাঁতি, দুইটি ঘোড়া, সুবর্ণমণ্ডিত রেকাব ও জিন, এবং একটি সোনার "থোক্‌দান"(৩৫) পারিতোষিক লইয়া স্বীয় মন্ত্রী ব্রাচমীকে পাঠাইলেন। ব্রাচমী আসিতেছেন শুনিয়া ছাংগ্রাই সৈন্যবাহিনী পোচন্দাত্তর পাহাড়ে লুকাইয়া

চাক্‌মা-রাজার পুরস্কার

(৩৫) থোক্‌দান থুথু ফেলিবার পাত্র বিশেষ।

রাখিলেন, নিজে মাত্র কয়েকজন লোক লইয়া রহিলেন। ব্রাচ্‌মী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে এক সুন্দরী রমণী প্রদর্শিত হইল। অনন্তর এই যুবতীকে লইয়া যাইতে লোকজন পাঠাইবার নিমিত্ত পত্র দিয়া ব্রাচ্‌মীকে বিদায় করিলেন। ব্রাচ্‌মী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজার কাছে সুন্দরীর অলৌকিক রূপলাবণ্য বর্ণনা এবং ছাংগ্রাই-এর (কূটনীতি-প্রসূত) পরিচয়ানুসারে — যুবতীকে মঘরাজ মেঙ্গদির সহোদরা বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। পরিচয় শুনিয়া চাক্‌মারাজা আরও আহ্লাদিত হন, এবং সবিশেষ আড়ম্বর সহকারে রাজসহোদরাকে আনয়নের জন্য অনেক লোকজন পাঠাইলেন। মন্ত্রী ছাংগ্রাই এই রমণীর সহিত একশত হস্তীও চাক্‌মারাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিতে ঢাকার শাসনকর্তা রেয়ংকে দশ হাজার সৈন্য লইয়া সঙ্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু রেয়ংকে গোপনে বলিয়া দিলেন, চাক্‌মারাজা নৃত্যগীতাদি অতিশয় ভালোবাসেন, মদ্যসেবীর ন্যায় অপবদিকে দৃষ্টি থাকে না, সুতরাং সুযোগ পাইলেই আপন সুবিধা করিয়া লইবে। পরে "কহিচার"[(১)] শাসনকর্তা ওয়ান্টবোর সঙ্গেও দশসহস্র সৈন্য দিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণের নিমিত্ত পাঠাইলেন।

"এদিকে রজনীসমাগমে চাক্‌মারাজ ইয়াংজ অনললুব্ধ পতঙ্গপ্রায় প্রমোদ-নিকেতনে নৃত্যগীতাদিতে প্রমত্ত আছেন, এমন সময়ে, রেয়ং যুবতীকে আনিয়া তদীয়
মোহজাল
করে সমর্পণ করিলেন। রাজা অতিশয় আনন্দের সহিত যুবতীকে পার্শ্ববর্তী আসনে উপবেশন করাইয়া পুনরায় আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন হইলেন। রাত্রি প্রায় বারটার সময় রেয়ং চতুর্দিকে আক্রমণ করেন। ওযান্টবোও পশ্চাদ্ভাগের জঙ্গলপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছাংগ্রাই এইরূপে দলে দলে ক্রমশ অপর সমুদয় সৈন্য পাঠাইয়া পরিশেষে দলবল-সহ স্বয়ং যোগদান করিলেন। এখানে তাঁহাদিগকে কোন যুদ্ধক্লেশ পাইতে হয় নাই। অতিসহজেই চাক্‌মারাজ ইয়াংজ এবং মধ্যমপুত্র চোফ্রু ও কনিষ্ঠপুত্র চৌতুকে বন্দী করিয়া মইচাগিরির পর্বতাকীর্ণ নগরমধ্যবর্তী রাজপ্রাসাদ অবরোধ করেন।
ফাঁদে বন্দি
সেখানেও বিনাক্লেশে যুবরাজ চুজং, রানী তিনজন, দুই রাজকন্যা এবং দাসদাসীগণকে বদ্ধ করিলেন। ততঃপর মন্ত্রিপ্রবর ছাংগ্রাই ৬৯৫ মঘাব্দের (বাঙ্গালা ৭৪০ সাল) ২রা মাঘ চাক্‌মারাজা এবং তদীয় তিন রানী, তিন পুত্র, দুই কন্যা ও দাসদাসীদিগের সহিত রেয়ংকে মঘরাজ মেঙ্গদিসমীপে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে চাক্‌মারাজ্য অতিসহজেই মঘরাজার করতলগত হইল। অবশেষে ১৩ই মাঘ বিজিত রাজ্য হইতে পঞ্চাশটি হস্তী, কুড়িটি গয়াল, অপরিমিত স্বর্ণ-রৌপ্য এবং দশসহস্র চাক্‌মা প্রজা লইয়া প্রধানমন্ত্রী নিজেও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(১) চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর কিয়দংশ কাপ্তা বা কহিচা নামে কথিত। সম্ভবতঃ এস্থলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তাকেই নির্দেশ করা হইয়াছে।

"মন্ত্রিবর রাজাঙ্গ্যা ছাংগ্রাইব কর্মদক্ষতায় অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আরাকানাধিপতি মেঙ্গতি তাঁহাকে "মাহা-উম্বা-ওয়ান্না" অর্থাৎ মহাপ্রাজ্ঞ খেতাব ও একখানি স্বর্ণমণ্ডিত পাল্কী পুরস্কার প্রদান করেন, এবং হস্তীর উপর চড়িয়া যাতায়াতের অনুমোদন করিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার পুত্র আংজাউর সঙ্গে চাক্‌মারাজার কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা চমির্খাকে মেঙ্গাদি নিজেই রাখিয়া দেন। অনন্তর চাক্‌মারাজ ইয়াংজকে আরাকানের অন্তঃপাতী ক্যমুছা নামক স্থানের ক্যফাজাতির আধিপত্য অর্পণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চজুং ও মধ্যমপুত্র চোফ্রুর হস্তে যথাক্রমে কিউদেজা ও মিজ্জা দেশের শাসনকর্তৃত্ব দেওয়া হয়। এবং কনিষ্ঠ পুত্র চৌতুকে কাংজা নামক স্থানের জলকর-তহসীলভার দিয়া নিকটে রাখেন। চাক্‌মা-রাজপুত্র তিনজনই মঘরাজার বিশেষ তত্ত্বাবধানে রহিলেন। অপর দশসহস্র চাক্‌মাপ্রজাকে আবাকানের অন্তর্গত "ত্রংখ্যং" এবং 'ইয়ংখ্যং' নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্বতন উপাধি পরিবর্তিত করিয়া "দৈংনাক" আখ্যা প্রদান করিলেন।

মঘবাজার অনুগ্রহ

দৈংনাক জাতির

"এতাদৃশী অধীনতায় জীবনযাপন রাজপুত্রত্রয়ের ক্রমেই অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। ৭০৫ মঘাব্দে (১৩৪৩/৪৪ খৃঃ-অঃ) মেঙ্গদি লিমব্রু যাত্রা করিলে, তাঁহারা তিন ভ্রাতাই একত্র- যোগে পোচন্দাও পার হইয়া উচ্চব্রহ্মে পলাইয়া গেলেন। মঘরাজা ইহা শুনিয়াও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। অনন্তর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চজুং ভূতপূর্বাবশিষ্ট প্রজাগণকে লইয়া মংজাগ্র নামক স্থানে রাজত্ব আরম্ভ করেন। মধ্যমভ্রাতা চোফ্রু ক্যজম রাজার নিকট হইতে "মংরেনো" খেতাব এবং প্রুমরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। কনিষ্ঠ চৌতু চাখ্যং নামক রাজার অধীনে থাকিয়া ক্রমে ৭২৪ মঘিতে (১৩৬২-৬৩ খৃঃ) "তারদ্যা" উপাধি ও আমাস্রু দেশের শাসনভার লাভ করেন।"

চাক্‌মা-রাজপুত্রের পলায়ন

ইতিহাসই যদি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে যে, উচ্চ ব্রহ্মের মইচাগিরিতে চাক্‌মারাজার প্রাচীন রাজধানী ছিল। তথায় তাঁহার প্রাধান্যেরও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নতুবা তাঁহাকে দমনের নিমিত্ত আরাকানাধিপতির সুচতুর মন্ত্রী রাজাঙ্গ্যা ছাংগ্রাই প্রায দুইলক্ষ সৈন্য লইয়াও তাদৃশ কুরুচিপূর্ণ প্রতারণা খেলিতে গেলেন কেন? আমরা ইতিপূর্বে দেখাইযাছি, কতকগুলি চাক্‌মা বাঙ্গালীদিগের সহিত মিলিত হইয়া মঘরাজার বিরুদ্ধে বারম্বার উপদ্রব করিয়াছিল। ইহাদিগের সহিত শেষোক্ত চাক্‌মারাজার সম্বন্ধ কতদূর ছিল, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে আরাকানের সীমান্ত প্রদেশে বাঙ্গালী বসতির সন্নিধানেই যে কতিপয় চাক্‌মার বাস ছিল — তাহা নিশ্চিত। আর ইহারাই মঘরাজা কর্তৃক পুনঃপুনঃ প্রপীড়িত হইয়া মইচাগিরির অভ্যুদিত বল পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহাও অসম্ভব নহে। "চুঁইজুং-ক্য-থাং" এ ব্রহ্মদেশে চাক্‌মারাজ্যখণ্ডের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার কোন সীমা নির্দেশ নাই। মইচাগিরিই বোধ হয় সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল।

মইচাগিরি বিজয়ের পর আরাকানাধীশ্বর চাক্‌মারাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। অতঃপর তাঁহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়ে। বলিতে কি, আর উঠিতেই পারিলেন না। নানাবিধ চিকিৎসার ফলে রোগের উপদ্রব কমিল বটে, কিন্তু নিরাময় হইল না। সেই দীর্ণ-জীর্ণ জীবনে আর বল ফিরিয়া পাওয়া গেল না — অধিকন্তু দিন দিন শক্তি খর্ব হইতে লাগিল। যাহা হউক, এস্থানে আমাদের আর একটি কথা খুলিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রাগুক্ত বর্ণনায় দেখা গেল, চাক্‌মারাজ ইয়াংজকে অপর এক স্বতন্ত্র জাতিরই আধিপত্য দেওয়া হইয়াছিল এবং রাজপুত্রগণের মধ্যে চোফ্রু এবং চৌতু বিজাতীয় রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। সুতরাং কেবল যুবরাজ চজঙ্গের হস্তেই দলিতাবশেষ চাক্‌মাদিগের আধিপত্য ছিল, অর্থাৎ মংজাম্রু তখন একমাত্র প্রকৃত চাক্‌মারাজ্য। অন্য পক্ষে, এই বিপ্লবে চাক্‌মা জাতি হইতে দশসহস্র লোক দৈংনাক নামে অপর এক শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত নিকটবর্তী জাতিসমূহের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধও চালাইয়া থাকিবে। বর্তমানে আচার-ব্যবহারে চাক্‌মাদিগের সহিত তাহাদের বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটিয়াছে।

মূল চাক্‌মারাজ্য

কিন্তু কালক্রমে চাক্‌মাদিগের এই অবশিষ্ট রাজ্যও রহিল না। কিয়ৎকাল পরে * "আরাকানের প্রধানমন্ত্রী পাঙ্গাঙ্গ্যা রাজাকে জানাইলেন যে 'উচ্চব্রহ্মের চাক্‌মারাজ মংছুই বৌদ্ধ ধর্মের আচার-নীতি রক্ষা করিতে চাহেন না, তিনি তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করেন। সৎলোকের উপদেশমতেও চলেন না, অসৎ লোকের পরামর্শ ধরিয়া কার্য করেন। পাপকার্যের প্রতিই তাঁহার অনুরাগ অধিক। তাঁহার কোনও ধর্মই নাই। অধিকন্তু মঘরাজার উপর এযাবৎ তদীয় পূর্বপুরুষের নির্যাতন-ক্রোধ রহিয়াছে। এই সংবাদে মঘরাজ বিচলিত হইয়া মংজাম্রু হইতেও চাক্‌মারাজাকে তাড়াইলেন। তখন তিনি উপায়ান্তরবিহনে প্রজাবর্গসহ আরাকানেরই অন্তপাতী কলোদাঁই নদীকূলে চাক্যেই-ধাঁও নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন, কিন্তু এখানেও তাঁহারা অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। কিছুকাল যাইতে না যাইতেই মংছুইর পুত্র মরেক্যজের সহিত আরাকান-পতির পুনরায় সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়।"

"দেঙ্যাওয়াদি আরেদফুং" ১২২ পৃষ্ঠা

মংজাম্রু হইতে বিতাড়ন

"এই যুদ্ধে মরেক্যজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এবং তাহাতেই বাধ্য হইয়া তিনি প্রজাবৃন্দসমভিব্যাহারে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হন (৭৮০ মঘাব্দে ১৪১৮-১৯ খৃঃ অঃ)। বাঙ্গালার (চট্টগ্রামের) নবাব তাঁহাদিগকে বারখানি গ্রামে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তথায় বহুদিন ধরিয়া তাঁহারা হীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনন্তর ক্রমে সেখানেও তাঁহাদের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়।" চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী মাতামুড়ি নদীকূলে "অলিকদম" (৩৭) নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, — অদ্যপি তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

'দেঙ্যাওয়াদি আরেদফুং" ৫৪ ৫৫ পৃষ্ঠা

চট্টগ্রামে আশ্রয়

* ১০৫৪৬ / তাং ২৯/৭ / ১৩৬৮

(৩৭) 'অলিকদম' অধুনা পার্বত্য চট্টগ্রামের 'শঙ্খ মাতামুড়ি রিজার্ভ' ভুক্ত হইয়াছে।

এখানে আসিয়া অবধি উক্ত খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আর কোন গোলযোগের নিদর্শন নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া বিভিন্ন শক্তির মধ্যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল (১৫১২ খৃঃ অঃ)। তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও মঘ-জাতিত্রয়ের রুধিরধারায় চট্টগ্রাম রঞ্জিত হয়। ত্রিপুরার মহারাজা ধন্য মাণিক্যের বিশ্বস্ত সমর-নীতিজ্ঞ সেনাপতি মহাবীর রায় চয়চাগ হনুমান মূর্তিশোভিত, বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ সুলতান সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দিন ওয়াদ্দিন আবুল মুজাফর হুসেনসাহের(৩৮) সৈন্যগণ অর্ধচন্দ্র-রঞ্জিত এবং প্রবলপরাক্রান্ত আরাকানাধিপতি মেংরাজার সৈন্য-সমূহ বৃষভ-লাঞ্ছিত পতাকাহস্তে চট্টলের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শেষ ফলে মুসলমান ও মঘদিগের ভুজগর্ব খর্ব করিয়া সেনাপতি চয়চাগ চট্টলবক্ষে বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপন করেন। কিন্তু প্রবল-বিক্রম হুসেনশাহ ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। পুনঃপুনঃ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন।

চট্টগ্রামে-শক্তিত্রয়ের সংঘর্ষণ

পক্ষান্তরে ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরাকানরাজ অতিশয় মর্মাহত হইয়াছিলেন। অনন্তর বৈরনির্যাতন-মানসে তিনি বলসংগ্রহে তৎপর রহিলেন। এ সময়ে 'অলিকদমের' চাক্‌মা-নরপতির উপরও তদীয় দৃষ্টি নিপতিত হইল। অবশেষে ৮৭৯ কি তৎপূর্ব মঘাব্দে (১৫১৬-১৭ খৃঃ অঃ) "মঘরাজার সেনাপতি ছেন্দুইজা চাক্‌মাধীশ্বরকে পরাভূত করেন। তৎকালে চট্টগ্রামশহরে মুরাচিন নামা শাসনকর্তা ছিলেন। আরাকানাধিপতি ছাঙ্গেগ্রী

"দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদফুং"

চাক্‌মা রাজাকে পুনর্জয়

(৩৮) বাঙ্গালার ইতিহাসে হুসেনসাহকে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। আমরা কেবল এখানে তদীয় জীবনীর কয়েকটি বিশেষ কথা "চৈতন্যচরিতামৃত" কাব্যের সংগৃহীত সংবাদ হইতে সংক্ষেপে পাঠকগণকে জানাইতেছি। দেখা যায় ইহা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এবং "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-এও স্বীকৃত হইয়াছে। হুসেনসাহ প্রথমে চাঁদপাড়া অঞ্চলের সুবুদ্ধি রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জমিদারের সামান্য ভৃত্যমাত্র ছিলেন। একদা কর্তব্যকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করায় সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করেন। অনন্তর তিনি চাঁদপাড়ার একজন কাজী-দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন এবং তদবধি শ্বশুড়বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। পরে কাজীর অনুরোধক্রমে রাজসরকারে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমে উজিরীপদে উন্নীত হন। শেষে ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে সম্রাট মুজফরসাহ নিহত হইলে গৌড়ের সম্রাট হইলেন। সিংহাসন অধিকার করিয়া হুসেনসাহ বাল্যপ্রভু সুবুদ্ধি রায়কে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার সম্মান বর্ধিত করিয়া তাঁহাকে চাঁদপাড়া গ্রাম নিষ্করস্বরূপে দিতে চাহেন। তাহাতে সেই নিষ্ঠাবাদী ব্রাহ্মণ অস্বীকৃত হইলে একআনা মাত্র কর ধার্য করিয়া দেন। সম্রাট হুসেন পূর্বে উড়িষ্যার অনেক দেবদেবীর মূর্তি ভগ্ন করেন, কিন্তু তিনি পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার শাসনকাল আকবরের সময়ের ন্যায় আদরণীয়। অন্যতঃ তিনি বঙ্গসাহিত্যেরও উৎসাহবর্ধক ছিলেন। পরাগলী ভারতের ভূমিকায় আছে -

"নৃপতি হুসনসাহ হ'এ মহামতি। পঞ্চম গৌড়েতে যাঁর পরম সুখ্যাতি।
অস্ত্রশস্ত্রে সুপন্ডিত মহিমা অপার। কলিকালে হরি হইব কৃষ্ণ অবতার।।
শ্রীকরনন্দী বিরচিত ভারতে আছে — নসরতসাহ (পুত্রের নাম) তাত অতি মহারাজা।
রাম বৎ নিত্যপালে সব প্রজা।।"

নামক মন্ত্রীর অধীনে চারিহাজার সৈন্য দিয়া স্থলপথে চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ পাইয়াই মুরাচিন নারায়ণগঞ্জে পলাইয়া যান, সুতরাং চট্টগ্রাম অতি সহজেই ছাঙ্গেগ্রীর হস্তগত হয়[৩৯]। তখন মঘরাজা কিছুদিন এই বিজিত রাজ্যে বাস করিলেন। পরে ৮৭৯ মঘির ৫ই পৌষ (খৃঃ অঃ ১৫১৭) জিয়োয়াজা নামধেয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া ঢাকায় গমন করেন। এই সময়ে অন্যদিকে মঘরাজপুত্র ইরেমং সন্দ্বীপ, হাতীয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় সৈন্যসামন্তের সহিত (নোয়াখালির অন্তর্গত) লক্ষ্মীপুরে গিয়া রহিলেন।

মঘরাজাকে উপঢৌকন

"১৫ই মাঘ (১৫১৮ খৃঃ অঃ) চাক্‌মারাজ চনুই বশ্যতাস্বীকারপূর্বক আরাকানরাজ-সমীপে তৎপ্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্তার যোগে দুইটি শ্বেতহস্তী উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। মঘরাজ ঢাকায় থাকিয়া ৮৮০ মঘাব্দের ৬ই জ্যৈষ্ঠ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ধাবংগ্রীর নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রাজা ইহার কিছুপূর্বে ছেন্দুইজাকে ধাবাংগ্রীর কার্যে চট্টগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন। ছেন্দুইজা আসিয়া দেখিলেন যে, ধাবাংগ্রীর পত্র সম্পূর্ণ সত্য নহে — চাক্‌মারাজা যে হস্তিদ্বয় উপহার পাঠাইয়াছেন, সেইগুলি বস্তুতঃ শ্বেতহস্তী নয়, কাল হাতীরই গায়ে চুন মাখাইয়া শুভ্রবর্ণ করা হইয়াছে। তিনি ঈদৃশী প্রতারণায় অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া এতৎ উপহারসহ আগত চাক্‌মারাজার মন্ত্রিচতুষ্টয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পরন্তু ধাবংগ্রী বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহা চাক্‌মারাজার শঠতা নহে, এদেশে শ্বেতহস্তী পাওয়া যায় না—তাই তিনি এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ শ্বেতহস্তী না হইলে আরাকানাধীশ্বরের যথোচিত উপঢৌকন হয় না, ইহা চাক্‌মারাজ অবগত আছেন। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণরূপে মার্জনীয়। তথাপি ছেন্দুইজার ক্রোধের উপশম হইল না, তিনি মন্ত্রিগণকে ছাড়িলেন না। ক্রমে এ সংবাদ মঘরাজার কানে পৌঁছিল। তিনি ছেন্দুইজাকে ধাবাংগ্রীর হস্তে পুনরায় চট্টগ্রামের শাসনভার রাখিয়া চাক্‌মামন্ত্রিগণ ও হস্তী-দুইটিসহ ঢাকায় তৎসমীপে যাইতে আদেশ দিলেন। ছেন্দুইজা ভয়ে তখন মন্ত্রীদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে লইয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা উভয়পক্ষের বিবরণী শুনিয়া ছেন্দুইজাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, — 'তুমি রাজবংশসম্ভূত হইয়াও, পণ্ডিত ধাবাংগ্রী যাহা বলিলেন, মূর্খের মত, জঙ্গলীর মত—অহঙ্কারে হিতাহিত বিচার না করিয়া, তাহা শুন নাই। সুতরাং আরও কিছুকাল জ্ঞানীব্যক্তির সঙ্গে থাকিয়া শিক্ষালাভ করহ।' অতঃপর একটি উদাহরণ দিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রামের মহাপাঙ্গাগ্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এবং চাক্‌মারাজার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "কোংলাপ্রু" (সদাশয়) খেতাব ও মন্ত্রীগণকে

(৩৯) "রাজমালা" গ্রন্থকারও বলেন, "মহারাজা ধন্যমাণিক্য যৎকালে হুসেনসাহের সহিত সমরে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় আরাকানপতি নির্বিবাদে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৪৩৯ শকাব্দে (১৫১৭-১৮ খৃঃ) পর্তুগীজ ভ্রমণকারী জন. ডি. সেলবেরা আরাকানরাজকর্তৃক আহূত হইয়া চট্টগ্রাম পরিদর্শনপূর্বক মঘরাজ্যে গমন করেন। তৎকালে চট্টগ্রাম আরাকানপতির হস্তে ছিল।"

বাঙ্গালীদিগের ব্যবহারানুরূপ বহুমূল্য পোষাকাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ৮৮১ মঘাব্দের ১৩ই মাঘ (১৫২০ খৃঃ অঃ) আরাকানপতি ঢাকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে, চাক্‌মারাজ কোংলাপ্রু "ছাজাং-ইয়ু" নাম্নী তদীয় দুহিতাকে উপহার অর্পণ করিলেন।"

১৫২০ খৃঃ অব্দে ধন্যমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া,

নছরতসাহ ১৫২২ খৃষ্টাব্দে মঘরাজ গজাবদিকে পরাজিতকরতঃ চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে হুসেনসাহের উপযুক্ত পুত্র সুলতান নাছিরদ্দিন নছরতসাহ[৪০] স্বর্গগত পিতৃদেবের সন্তোষসাধনের নিমিত্ত সেনাপতি পরাগল খাঁ[৪১] এবং

(৪০) হুসেনসাহের রাজত্বের ন্যায় তদীয় কৃতী সন্তানের শাসনকালও সর্বত্র প্রশংসনীয়। তিনিও বাঙ্গালাভাষার অতিশয় উৎসাহদাতা ছিলেন। পণ্ডিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর তৎকৃত মহাভারতে লিখিয়াছেন,

"শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খাঁন।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান।।"

এই 'ভারত পাঞ্চালী'তেও তিনি সাহিত্য জগতে চিরপরিচিত থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন চট্টগ্রামে তাঁহার প্রভূত যশঃসৌরভ ছিল। এমনকি, হুসেন সাহের পরিচয় দিতে শ্রীকরনন্দী "নসৃরতসাহতাত" লিখিয়াছেন ইহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ আরও বহুকাল ধরিয়া চট্টগ্রামের জনসাধারণ তদীয় স্মৃতি রক্ষা করিবে। বৈষ্ণবপদাবলীতেও তাঁহার কথা আছে—

"সে যে নাসিরা সাহ জানে।
যারে হানিল মদন বাণে।।"

("সাধনা" - শ্রাবণ, ১৩০০)

(৪১) পরাগল খাঁ সুলতান হুসেনসাহেরই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর লিখিয়াছেন,—

"নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান্ হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর।।
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি।।
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিযা।
চাটিগ্রামে চলিলেন হরষিত হৈয়া।।
পুত্র, পৌত্র রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি।।"

ইহা "পরাগলীভারতে"র ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত। পরাগল খাঁ অনুজ্ঞাক্রমে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মহর্ষি জৈমিনির 'ভারত সংহিতা' অবলম্বন করতঃ এই মহাভারত প্রণয়ন করেন। ইহা বঙ্গসাহিত্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সুতরাং পরাগল খাঁর নাম সহজে বিলুপ্ত হইবার নহে। ইহা ছাড়া ফেণী তীরে (চট্টগ্রাম) মিরেশ্বরী থানার অধীন "পরাগলপুরে" "পরাগলের দীঘি" ও পরাগল খাঁর প্রাসাদ ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের অন্তর্গত কদলপুর গ্রামে যে "লস্করের দীঘি" আছে, তাহাও বোধ হয় এই লস্কর পরাগল খাঁর খনিত।

তৎপুত্র ছুটি খাঁর [৪২] বাহুবলে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করিয়া ছিলেন [৪৩]। এসময়ে চাক্‌মারাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী কাহার অঙ্কশায়িনী ছিলেন, ইতিহাস লেখকগণ তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়া না গেলেও, ইহা বোধ হয় অভ্রান্ত যে, চট্টগ্রামের সৌভাগ্যনেমির পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চাক্‌মারাজের অদৃষ্টও পরিবর্তিত হইতেছিল। চট্টগ্রাম অধিকারের পর নছরতসাহ সেনাপতি পরাগল খাঁ-কে তাহার শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র

(৪২) "পরাগলীভারতে"ও আছে—

"তনয় যে ছুটী খান পরম উজ্জ্বল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল।।"

বাস্তবিক ছুটি খাঁ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। অমিত বাহুবলের ন্যায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অসীম অনুরাগ দেখিতে পাই। পিতার অনুকরণে শ্রীকরনন্দী দ্বারা তিনি মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করাইয়া লয়েন। কবিবর শ্রীকরনন্দী প্রভুর গুণ-বর্ণনায় লিখিয়াছেন, —

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটী খান মহাশয়।।
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন।।
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা।।

কবির আত্মকথা —

"অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখন্ডে আদেশিল খান মহাশয়।।
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌঠক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার।।
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া।।"

বর্ণনায় কল্পনার অবাধগতি আছে বটে, কিন্তু ইহা যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বহুমূল্য রত্নবিশেষ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৪৩) নছরতসাহের চট্টগ্রাম - বিজয়কীর্তি অদ্যাপি কেন, আরও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এদেশে জাগ্রত রহিবে। তিনি সর্বপ্রথমে যেস্থানে কটক সংস্থাপন করেন, তাহা (চট্টগ্রাম শহর হইতে ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত — বর্তমান গ্রন্থকারের জন্মভূমি) "ফতে (রা) বাদ" অর্থাৎ বিজয়স্থান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তথায় সুলতান এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় আধ মাইল এবং প্রস্থও দৈর্ঘ্যের তিন চতুর্থাংশ হইবে। পার গুলি প্রায় পাহাড় সমান, মধ্যভাগে শীতকালেও ১২ হাতের অধিক জল থাকে। ইহা (নছরত বাদ্‌সার) "বড় দীঘি" আখ্যায় চট্টগ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতার নিকট পরিচিত। এতদ্ভিন্ন দীঘিরই সন্নিকটে তিনি যে মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা কালের করাল গ্রাসে ভূমিসাৎ হইয়াছিল, কিছুদিন হইল স্থানীয় মুসলমান অধিবাসিবর্গ তাহার জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, সুলতান নছরতসাহ চট্টগ্রাম জয় করিয়া বৃদ্ধা মাতৃসমীপে তাঁহার কোন্ সৎকার্যে অভিলাষ আছে, জানিতে চাহেন। তিনি একটি দীর্ঘিকা খননের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। নছরতসাহ প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি যতদূর পর্যন্ত অশ্রান্তভাবে হাঁটিতে পারিবেন, ততদূর দীর্ঘ দীর্ঘিকা খনিত হইবে। পুত্রের মহৎ সংকল্পে আশাতীত সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধা জননী চলিতে আরম্ভ করেন অনেক দূর গেলে, সুলতানের মন্ত্রীর কৌশলজালে পডিয়া বসিয়া পড়িলেন। ততদূর দীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন ও তৎপার্শ্বে প্রাগুক্ত মসজিদ নির্মাণ করাইয়া নছরতসাহ তদভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক বলিলেন, 'আজ আমি মাতৃঋণ পরিশোধ করিলাম!' ইহা বলিতে না বলিতেই নাকি মস্‌জিদ ভাঙিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পরন্তু নছরতসাহার এই অপমৃত্যু সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীতে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে কিনা অবগত নহি।

বিজয়মাণিক্য রাজা হইয়া চট্টগ্রাম পুনর্বার অধিকার করেন। পরে ইহার আধিপত্য লইয়া ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাধিপতি উদয়মাণিক্যের সহিত মোগলদিগের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুরা সৈন্য এবং মাত্র ৫ হাজার মুসলমান সৈনিক বিনষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম মোগলদিগের অধিকারে যায়। কিন্তু তাঁহারাও অধিক দিন ইহা ভোগ করিতে পারেন নাই, ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরকানাধীশ্বর মেংফালোং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ত্রিপুরা লুণ্ঠন পূর্বক মেঘনাতীরে বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন।

এই যুদ্ধের কিছুকাল পরে (১৫৯৯ খৃঃ অঃ) "তৌঙ (ব্রহ্ম)-রাজ আরাকানেশ্বর (মন্নজাগিরি) সমীপে উপঢৌকন দ্রব্যসহ খ্রিদংজা ও কাহাজা নামক দুই জন দূতকে পত্র লইয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রস্তাব ছিল, যদি মঘরাজ সাহায্যদানে পেগুরাজ্য অধিকার করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় যুবতী কন্যা ও শ্বেতহস্তী উপহার প্রদান করিবেন। আরাকানাধিপতি ইহাতে সম্মত হইলেন এবং চাক্‌মারাজ কোংলাপ্রু, কুকি, ত্রিপুরা, মুরুং, রোয়াজা, খিসা প্রভৃতি সামন্ত নরপতি ও বাঙ্গালার বার দেশের

"দেঙ্যাওয়াদি-আরেদফুং" ১৬০ পৃষ্ঠা

চাক্‌মারাজার অধিনায়কত্ব

শাসনকর্তাকে উপযুক্ত লোকের হস্তে স্ব স্ব কার্যভার রাখিয়া রণসজ্জা-সহকারে তদীয় অনুসরণের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সকলে গিয়া উপস্থিত হইলে চাক্‌মারাজার অধীনে ত্রিশহাজার সৈন্য ও মঘরাজার এক মন্ত্রী থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ৯৬০ মঘিতে (খৃষ্টীয় ১৫৯৮-৯৯ অব্দে) যুদ্ধযাত্রা করিয়া মুগ্ধামা নগরের ঈশানকোণে ছ্যারোয়াব্রাঙা খালের পথে কামল পাহাড়ের উপরে চাক্‌মারাজ কোংলাপ্রুকে পূর্বোক্ত ত্রিশহাজার সৈন্যসহ রাখিলেন। অতঃপর চাক্‌মারাজার খাদ্য ফুরাইয়া যাওয়াতে তিনি নিকটবর্তী (শ্যামের রাজধানী) ব্যাঙ্ককরাজার উপরে আপতিত হয়েন, এবং রাজার কনিষ্ঠা ভ্রাতা বাচাময়কে ধৃত করিয়া আরাকানাধীশ্বরের সম্মুখে আনিয়া দেন [৪৪]।" অতঃপর এদিকে

(৪৪) পক্ষান্তরে আরাকানাধীনশ্বর ও ব্রহ্মরাজের সম্মিলিত শক্তি পেগুরাজকে পরাজিত করে। ব্রহ্মরাজ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আরাকানরাজকে ৩৩০০০ ঘর তাইলং প্রজা এবং বিজিত রাজার পুত্র ও কন্যাকে উপহার প্রদান করেন। আরাকানাধিপতি সেই বন্দিনী যুবতীর পাণিগ্রহণ করতঃ তাহার স্যাংথূঈনাং-এর পরিবর্তে চুমাঙ্গী নাম প্রদান করেন। এই পরিণয় হইতে বন্দিগণও অনুগ্রহ লাভ করিতে থাকে। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে আরাকানাধীশ্বর তদীয় শ্যালককে (পেগুরাজ পুত্রকে) চট্টগ্রামের শাসনভার অর্পণ করেন। তাঁহার তিনপুরুষ পরে (ইতিমধ্যে মুকুটরাজও থাকিবেন) অঙ্গুলার পুত্র হারিও চট্টগ্রামের অধিনায়ক হন। বর্তমান বোমাং-রাজদপ্তরের কতকগুলি প্রাচীন কাগজপত্র হইতে জানা যায়, ১৭১০ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ উজিয়া পশ্চিম প্রদেশীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানোপলক্ষে এখানে আসিলে হারিও তাঁহার সহিত মিলিত হন। ইহাতে উজিয়া হারিওকে বোমাঙ্গী উপাধিতে ভূষিত করেন। পরন্তু বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের ১৮৯৮ ইংরাজীর ৫৪৩ A.D. নম্বর পত্রে দেখা যায়, "the first chief of the Bohmong's family having been a Burmese Boh who fled into the tracts from the king of Ava !" সে যাহা হউক বোমাং হারিওর জীবিতকালে তদীয় পুত্র ছাদাফ্রু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র কোংলাফ্রু হারিওর পরে উত্তরাধিকারিত্বলাভ করেন। অনন্তর ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে বোমাং কোংলাফ্রু মোগলগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া আরাকানরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পরে ১৭৭৪ অব্দে ইংরাজেরা চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি প্রত্যাবর্তন করতঃ চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশবর্তী রামু, বোমু, ইদঘর, ইয়ংছা, মাতামুড়ি, লামা প্রভৃতি স্থানে

ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা অমরমাণিক্য (১৫৯৭ খৃঃ অব্দে) সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া (১৬০৯-১০ খৃঃ অব্দে) পুনরায় আরাকানপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাহাতে মঘরাজ বার বার পরাজিত হইয়া পর্তুগীজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এইবার তাঁহাদের সহায়তায় ত্রিপুরারাজ পরাভূত হয়। অমরমাণিক্য আবার আক্রমণের চেষ্টা করিলে, আরাকানপতি এক বৎসর যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করেন। ত্রিপুরারাজ ইহাতে সম্মত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই শুনিতে পাইলেন, মঘরাজা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন। তখন তিনি স্বীয় তিন পুত্রকে বৃহৎ একদল সৈন্যের সহিত পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে, মঘরাজ ভয়ে গজদন্তবিনির্মিত একটি রাজমুকুট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই মুকুট গ্রহণের নিমিত্ত কুমারগণের মধ্যে মহা বিরোধ উপস্থিত হইল।

অমরমাণিক্য

আরাকানাধীশ্বর সেই সংবাদ শ্রবণে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া, ত্রিপুর বাহিনীকে পরাজিত করতঃ, পর্তুগীজদিগের সাহায্যে উদয়পুর লুণ্ঠন পূর্বক ত্রিপুরাকে সর্বস্বান্ত করিয়া যান (১৬১০-১১ খৃঃ অঃ)। ইহার পর চট্টগ্রাম আর ত্রিপুরার অধীন হয় নাই। অন্যতঃ ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে অমরমাণিক্যের পৌত্র ত্রিপুরাপতি যশোধরমাণিক্য দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের মোগলসৈন্য কর্তৃক পরাভূত হন।

পর্তুগীজবীর্য

বাস করিবার পর অবশেষে ১৮০৪ অব্দে শঙ্খনদীর তীরবর্তী ম্যাচ্ছিং খালে বসতি স্থাপন করেন। ১৮১৩ অব্দের আগষ্ট মাসে খ্যানব্রে নামক আরাকানের জনৈক দস্যু ২০০ উচ্ছৃঙ্খলাচারী লোক লইয়া পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এত উপদ্রব করিতে থাকে যে, তাহাতে তত্রত্য অধিবাসিগণ পলাইয়া যায়। বোমাং কোংলাফ্রুর ছয় পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ ছাথানফ্রু ৪০০ লোক লইয়া তাহাদিগকে এদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তাড়াইয়া দেন। অনন্তর ১৮১৯ অব্দে তিনি বোমাং হইয়া ১৮২২ অব্দে বাসস্থান বর্তমান বান্দরবনে স্থানান্তরিত করেন। ১৮২৩ অব্দে ছাথানফ্রু বনজুগী-সর্দার রেংচুলুমকে জয় করিলেন। একখানি প্রাচীন কাগজে দেখা যায় ১৮২৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এক ভয়ঙ্কর মনুষ্যখাদক ব্যাঘ্রের উপদ্রবে চতুর্দিকে বহুতর ক্ষতি হইয়াছিল। ইহার পদচিহ্নের ব্যাস নাকি প্রায় দেড়হস্ত পরিমিত ছিল। ইহাকে কেহই হত্যা করিতে পারে নাই, পরন্তু আশ্চর্যরূপে অদৃশ্য হইয়াছিল। ১৮৪০ অব্দে ছাথানফ্রুর মৃত্যু হয়। প্রচলিত প্রথা মতে তদীয় শব জ্বালাইবার জন্য আধারে স্থাপিত হইলে হঠাৎ এমন ভয়ানক বৃষ্টি আসে যে, বন্যা আসিয়া সমগ্র বান্দরবনকে ডুবাইয়া দেয়, অধিবাসিগণ তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে উঠিয়া কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিল, কিন্তু শবাধার বন্যায় পূর্ববাসস্থান ম্যাচ্ছিখালের বিধৌত শ্মশানভূমিতে লইয়া আসে। অবশেষে তথায় সেই শব তদীয় পত্নীর শ্মশানপার্শ্বে প্রজ্বলিত হইল। তৎপর অক্টোবর মাসে কৌংলন্যা বোমাং হন। কিন্তু তিনি তৎপরিচালন কার্য বিশৃঙ্খলাপূর্ণ দেখিয়া আপনা হইতেই এই ভার পিতৃব্যপুত্র মংফ্রুর হস্তে পরিত্যাগ করেন। মংফ্রু ১৮৭২ অব্দের লুসাই অভিযানে ইংরাজ গভর্নমেন্টকে বিস্তর সাহায্য করেন। ১৮৭৫ অব্দের নভেম্বর মাসে তদীয় সর্ব কনিষ্ঠ সহোদর ছাইলও বোমাং পদে অভিষিক্ত হন। তিনিও ১৮৮৯ ৯০ অব্দের লুসাই অভিযানে কুলি প্রভৃতি যোগাইয়া ইংরাজ গভর্নমেন্টের সহায়তা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি "ক্যাচারীছং ছুয়েওালুইরা" অর্থাৎ 'মাননীয় সুবর্ণোপবীতধারী রাজা' এই পার্মিজ উপাধি এবং এক সুবর্ণহার গভর্নমেন্ট হইতে প্রাপ্ত হন। ১৯০২ অব্দে ৩রা মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। অনন্তর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত চোলাফ্রু চৌধুরীই বর্তমান বোমাং রাজা।

চট্টগ্রাম মঘরাজার কুক্ষিগত হইল[(৪৫)] বটে কিন্তু কার্যতঃ পর্তুগীজদিগের প্রাধান্য সবিশেষ বর্ধিত হইল। যে সময়ে মঘ ও পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামবাসীদিগকে জ্বালাতন করিতেছিল সেই সময় বাঙ্গালার শাসনকর্তা ইস্‌লাম খাঁ মস্‌হৌদী ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন সঙ্কটে পড়িয়া তত্রত্য মঘ শাসনকর্তা মুকুটরায় ইস্‌লাম খাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মঘরাজ আবার চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। অনন্তর সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার কর্তৃত্ব পাইয়াই মঘদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি পর্তুগীজদিগের প্রাধান্যদর্শনে তাহাদিগকে নানা প্রলোভনে[(৪৬)] বশে আনিয়া ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন।[(৪৭)] এইরূপে আরাকানাধীশ্বরও চিরদিনের নিমিত্ত চট্টগ্রাম হারাইলেন। কিন্তু ক্ষুদ্রতম চাক্‌মারাজ্য ইত্যবসরে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল, মোগল সম্রাটের দৃষ্টি এই পার্বত্যরাজ্যের প্রতি নাও পড়িয়া থাকিবে।

মঘ ও পর্তুগীজ অত্যাচার

বলা বাহুল্য, "দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং"ও অতঃপর চাক্‌মারাজার আর কোন সংবাদ রাখেন নাই। অবশ্য চট্টগ্রামের ইতিহাস তজ্জন্য যাহা কিছু দায়ী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পার্বতীয়গণের প্রতি প্রাচীন ইতিহাসে কোনও সহানুভূতির পরিচয় নাই। ঐতিহাসিকেরা কেন যে ইহাদিগকে তাঁহাদের আলোচনা হইতে বাদ রাখিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ দেখি না। সুতরাং আমরা ঐতিহাসিক অবলম্বন হারাইলাম, কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ আশ্রয়ভ্রষ্ট নহি। ইতিহাস অতীতের প্রায় সীমান্ত প্রদেশে আনিয়া ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কষ্টেসৃষ্টে আর কিয়দ্দুরমাত্র অগ্রসর হইতে পারিলেই আমাদের লক্ষ মন্দিরের শৃঙ্গমণি পরিলক্ষিত হইবে। এই পথটুকু অপরিচিত এবং দুর্গম হইলেও একেবারে অগম্য নহে। বিশেষতঃ সংবাদ পাইয়াছি, আমাদের গন্তব্য পথের স্থানে স্থানে সেই পরিচিত প্রাচীন মন্দিরের ইঁট, স্তম্ভ, বরগা, কড়িকাঠ প্রভৃতি যথেষ্ট রহিয়াছে, গত কয়েক বৎসরের সামান্য অবসরে দুরন্ত কাল তাহা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে পারে নাই।

(৪৫) এই সময় (সম্ভবতঃ ১৬১৪ খৃঃ অব্দ পেগুরাজ-পুত্রের শাসনকাল) হইতে চট্টগ্রামেও 'মঘ' অব্দের প্রচলন আরম্ভ হয়।

(৪৬) পরন্তু মার্শমানের মতে সায়েস্তা খাঁ ধমক দিয়া পর্তুগীজদিগকে বশীভূত করেন (Vide - Marshman's History of Bengal, p. 36)। কিন্তু পর্যটক বার্ণিয়ার স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, সায়েস্তা খাঁ উৎকোচের প্রলোভনে পর্তুগীজদিগকে ভুলাইয়া শেষে কার্যোদ্ধার হইয়া গেলে প্রতিশ্রুতিপালনে কুণ্ঠিত হয়েন। (Bernio's travels in the Mogul Empire, Vol. I, p. 203)।

(৪৭) হান্টার (Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. VI, p. 113)) প্রমুখ অধিকাংশ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মতে নবাব সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া "ইস্‌লামাবাদ" আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু কেহ কেহ আবার ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, ইস্‌লাম খাঁ মস্‌হৌদী চট্টগ্রাম জয় করিয়া স্বীয় গৌরবচিহ্ন স্মরণীয় রাখিতে এই নামকরণ করিয়াছিলেন, (Marshman's History of Bengal)। শেষোক্ত মত গ্রহণ করিতে ঐতিহাসিকদিগের আপত্তি কি, বুঝিলাম না। "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত"কার তারকবাবু দেখিতেছি অপর এক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই লিখিয়াছেন, সায়েস্তা খাঁর প্রিয়পুত্র "উমেদ খাঁর চট্টল বিজয়ে ইস্‌লামের প্রাধান্য স্থাপিত ও তাহা হইতেই এই স্থানের ইস্‌লামাবাদ নাম বিঘোষিত হইল।" (৬৩ পৃষ্ঠা))।

উপরিউক্ত কথাকয়টির বিশদ ব্যাখ্যা স্বরূপে এস্থলে লিখিতে হয়, পূর্বে আমরা "অলিকদমে" চাক্‌মারাজার রাজধানীস্থাপনের উল্লেখমাত্র করিয়া আসিয়াছি। প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ রাজবর্ত্ম, দীর্ঘিকা ইত্যাদি অদ্যাপি তাঁহাদের মহতী কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। পরন্তু এই সমুদয় প্রাচীন ঐশ্বর্য যে অপরের নহে, তাহা পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকভিত্তি ব্যতিরেকে দেশপ্রচলিত জনশ্রুতিও বিশেষরূপে সপ্রমাণ করে। এই সেইদিনও অলিকদমের নিকটবর্তিনী মাতামুড়ি-নদীজলে চাক্‌মাবর্ণাঙ্কিত কয়েকটি বুদ্ধপ্রতিমূর্তি লামা ষ্টেসনের হেডকনষ্টেবল শ্রীযুক্ত নীলকমল বড়ুয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর চট্টগ্রামের মানচিত্রখানি খুলিলে সহজেই চাক্‌মাদিগের গতি ও বিস্তৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিহাস তাহা তুচ্ছ করিতে পারে, কারণ ইহাতে কামান-গোলাদির প্রবল সংঘর্ষণ নাই, অথবা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তারবিহীন টেলিগ্রাফের দ্বারা সংবাদ প্রেরণের সুবিধাও ছিল না। কিন্তু ভূচিত্র তাহা আপনার বক্ষোদেশ হইতে মুছিয়া ফেলিতে সাহস করে নাই। "পৃথিবী সর্বংসহা" তাই বুঝি তচ্চিত্রগুলিও এ সমুদয় কাঁটা-কম্পাসের চিহ্ন যত্নসহকারে জড়াইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। সত্যকথা বলিতে কি, আমাদের দেশের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে আজও অনেক বাকী। জানিবার অনেক কথা ফুটিয়া বিলীন হইয়াছে ও হইতেছে, অথচ সাধারণের গোচরীভূত হইবার উপায় নাই। বর্তমানে সংবাদ ও সাময়িকপত্রের দ্বারা ভেদভাব কথঞ্চিৎ দূর হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাও 'যখন-তখন' মাত্র স্থায়ী নহে। অধুনা বঙ্গের অনেক লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা 'যা-তা' না লিখিয়া এদিকে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে কি বর্তমান, কি ভবিষ্যৎ সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন এবং তাঁহাদের যশোভাতিও অধিকতর উজ্জ্বল হইবে — সন্দেহ নাই।

অলিকদম

কক্সবাজারের দক্ষিণে 'জুমিয়া পাড়া' নামে দুইটি গণ্ডগ্রাম আছে। এই দুই জুমিয়াপাড়ার মধ্যস্থানে 'মঘ-পাড়া' নামক অপর একটি প্রাচীন গ্রাম দেখা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রাম-বাসীদিগের নিকট প্রধানতঃ চাক্‌মারাই 'জুমিয়া' নামে পরিচিত। সুতরাং প্রথমোক্ত গ্রাম দুইটি — চাক্‌মাগণ এবং শেষগ্রাম যে মঘগণ কর্তৃক সর্বপ্রথম অধ্যুষিত হয়, তাহা অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই স্থানগুলি আরাকানের সীমান্ত প্রদেশের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। চাক্‌মারাজ আরাকান হইতে বিতাড়িত হইয়া চট্টগ্রামের নবাবের কাছে এই সমুদয় গ্রাম লইয়াই বারদেশে বসতি স্থাপনের অনুমতি লাভ করিয়া থাকিবেন। আর সেই সময় কতিপয় মঘও যে চাক্‌মাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে। ইহার সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পরেও আরাকানের অবশিষ্ট কোন কোন চাক্‌মা এবং তত্রত্য মঘগণের একযোগে পলায়ন সংবাদ পাওয়া যায়। ৭৮২ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মসম্রাট সম্পূর্ণরূপে আরাকান জয় করেন, সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগ পাইয়া বহুসংখ্যক আরাকানবাসী নিরীহগণের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠনপূর্বক চট্টগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আরাকানের শাসনকর্তা, চট্টগ্রামের সরদার (Chief)

প্রাচীন বাসস্থান

মঘরাজার পত্র

সমীপে সেই সকল দুষ্ট লোকদিগকে প্রত্যর্পণের নিমিত্ত বন্ধুভাবে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও এযাবৎ চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে রক্ষিত আছে। ইহাতে পাওয়া যায় —

> "ডোমকান চাক্‌মা, কি কোপা লাইছু, মুরুঙ্গ, এবং অপর কতিপয় আরাকানবাসী এক্ষণে আপনার স্বীমান্তপর্বতে আশ্রয় লইয়াছে। অধিকন্তু তাহারা নাফ্‌নদীর মোহনায় জনৈক ইংরাজকে হত্যা করিয়া সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, অপহরণ করিয়া নিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি সসৈন্যে তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আপনার সীমায় আসিয়াছি। তাহারা দস্যুতাচরণের দ্বারা সম্রাটকে অমান্য করিয়া, স্বরাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছে।
>
> "ইহাদিগকে এবং যে সকল মঘ কোন সময়ে দেশ হইতে পলাইয়া আসে — তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া আপনার কর্তব্য নহে, আপনার রাজ্য হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়াই আপনার উচিত। তাহা হইলে আমাদিগের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং পথিক ও ব্যবসায়ীগণ নিরাপদ হইবে।
>
> "যদি আপনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া না দেন, তবে আমি প্রয়োজনানুরোধে সশস্ত্র সৈন্যদলের সহিত, তাহারা আপনার রাজ্যে যে কোন অংশে থাকুক — খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হইব।
>
> "মহম্মদ ওয়াছিন দ্বারা আমি এই পত্র পাঠাইলাম। ইহা পাইয়া হয়ত আপনার রাজ্য হইতে আমার প্রজাগণকে তাড়াইয়া দিবেন, অথবা যদি তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে চাহেন, তবে অবিলম্বে উত্তর পাঠাইবেন।"

'জুমিয়াপাড়া'র প্রায় ১৭ মাইল উত্তরে 'ধাঁমাই পাড়া' অদ্যপি বর্তমান। চাক্‌মাদিগের প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় 'ধাঁমাইগোছার' বসতি হইতে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিদুত্তরেই "ধুর্যাদীঘি" 'ধুর্যা' - বংশের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ধাঁমাইপাড়া ও ধুর্যাদীঘির মধ্যভাগে দুইটি "পাগলাবিল"[(৪৮)] বাঘখালী নদীর দক্ষিণে সমুদ্রপ্রান্তে "পাগলামুড়া, এবং "গাভুরমুড়ি" নদীর নিকটবর্তী আর একটি 'পাগলাবিল', প্রভৃতি কীর্তিপীঠসমূহ চাক্‌মাদিগের প্রাচীন নরপতি "পাগলারাজাকে" অমর করিয়া রাখিয়াছে।

চাক্‌মা আখ্যা

অলিকদমের নিকটবর্তী নদীত্রয় — 'মাতামুড়ি', 'গাভুরমুড়ি' এবং 'বুড়ামুড়ি' নামে প্রখ্যাত। ইহাদের সকলেরই সাধারণ আখ্যা 'মুড়ি' অর্থাৎ 'মুড়া' (পাহাড়) - নিঃসৃতা। স্রোতোবেগানুসারে মাতা, গাভুর (যুবক) এবং বুড়া (বৃদ্ধ) বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। 'গাভুর' শব্দটি চাক্‌মাদিগের মধ্যে সবিশেষ প্রচলিত, এখনও তাহাদের সমাজে (অবিবাহিত) যুবককে নির্দেশ করিতে ইহা ভিন্ন তেমন কোন শব্দ নাই। অপরতঃ,

(৪৮) মাঠবিশেষ। এদেশে এমনকি চট্টগ্রামেও মাঠকে "বিল" বলা হইয়া থাকে।

চাক্‌মাগণের মধ্যে দেখা যায়, গুণ বা কার্য লইয়া ব্যক্তি বা বংশ প্রভৃতির আখ্যা প্রদত্ত সুতরাং স্রোতের বেগে — মাতা, বুড়া ও গাভুর কল্পনায় বিশেষণ ঠিক করিয়া, পাহাড় (মুড়া) হইতে প্রবাহিত স্রোতস্বতীর 'মুড়ি' অভিধা ইহারাই দিয়াছে — নিশ্চিত অনুমান করা যায়। এবং চাক্‌মাগণ যেরূপ অনুকৃতিবাদী তাহাতে, নাকের (নাসিকার) ন্যায় "টেক" (বাঁক) দেখিয়া বর্তমান "টেক্‌নাকের"(৪৯) নামও ইহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত — সহজে বুঝা যায়।(৫০)

এই "মাতামুড়ি" নদীতে অলিকদমের কিয়দ্দুরে "তৈন্‌ছরী" নাম্নী উপনদী আসিয়া পতিত হইয়াছে। ইহারাই তীরভূমিতে মঘদিগের (সম্ভবতঃ সেনাপতি ছেন্দুইজার) সহিত চাক্‌মারাজার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এতৎসম্বন্ধে একটি গান আছে —

"যুদ্ধ হৈল্ তৈন্‌ছরী —
মোড়ের মাথায় যে দিলাক্
দুন রাজার মিল হনাক্।।"

প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র

অর্থাৎ 'তৈনছরীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যখন নদীর মোড়ের মাথায় গর্ভস্থ চর ভাসিয়া উঠিল, তখন — শীতকালে উভয় রাজার মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইল।' এই বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আর এই অলিকদমেরই পার্শ্ববর্তী পর্বত-নিঃসৃতা বাঘখালী নদীর উত্তরপারে "চাক্‌মাকূল" এবং দক্ষিণ পারে "রাজাকূল" নামে দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। শুনা যায়, মঘরাজার সহিত চাক্‌মাপতির বিবাদ মীমাংসিত হইয়া এই বাঘখাল নদী উভয় রাজ্যের সীমা নির্ধারিত হইয়াছিল। ফলতঃ, ইহা অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ পাওয়া যায় না। যতই বিরুদ্ধ প্রমাণ খুঁজিয়াছি, বিশ্বাস ততই দৃঢ়তর হইয়াছে। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, বাঘখালীর উত্তরতীরে "ওয়াংঝাগোছার" প্রাচীন বসতিস্থান 'ওয়াংঝামুড়া' মস্তক উত্তোলন করিয়া অতীত গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

সীমা নির্দেশ

অনন্তর 'গাভুরমুড়ি" দিয়া ক্রমশ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে নদীতীরের অনতিদূরে "রাজাবিল" নামে প্রকাণ্ড মাঠ এবং তাহার প্রায় ১৫ মাইল ব্যবধানে "রাজবাড়ী" অভিধেয় গ্রাম ও 'তক' উপনদীর 'রাজঘোটা' প্রভৃতি পাওয়া যায়। এসকল স্থান এখনও চাক্‌মারাজার জমিদারীভুক্ত রহিয়াছে। পরে শঙ্খনদ পার হইয়া

(৪৯) টেক্‌নাক চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশবর্তী উপদ্বীপ বিশেষ।

(৫০) কেবল ইহা নহে, চাক্‌মাগণ তখন যেসকল স্থানে ছিল, এখানে আসিয়াও তাহাদের সেই পূর্ববাসস্থানের নামানুকরণে সোয়ানক্ (শুভলঙের অপর নাম), রাইন্‌খ্যাং, চারিখ্যাং, খারিখ্যাং, সাবেক্ খ্যাং, লাবেক খ্যাং প্রভৃতি নামকরণ করিয়াছে এবং এখানে, তাহাদিগের প্রদত্ত রাঙাপান্যা, মাণিকছরী, ঝগড়াবিল প্রভৃতি নূতন আখ্যাও যথেষ্ট। পরন্তু ইহাদের অনুকরণ প্রবৃত্তি এতই প্রবলা যে, এই পার্বত্য চট্টগ্রামেই ৫/৬ মাইল অন্তরেও একনামে দুই জায়গার আখ্যা বিরল নহে।

খালবিশেষের দ্বারা কিছুদূর আসিলে শিলকনাম্নী উপনদীর উৎপত্তিস্থলে উপনীত হওয়া যায়। এই শীলকতাতে ভূতপূর্ব চাক্‌মারাজা শুকদেব রায়ের অক্ষয় যশোমন্দির "শুকবিলাস" অবস্থিত।

শুকবিলাস

অদ্যাপী তদীয় 'বিলাস' পুরীর ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা, দীঘি এবং চতুষ্পার্শ্ববেষ্টিত পরিখা ইত্যাদি প্রাচীন রাজমহিমা দর্শক সাধারণকে জানাইতেছি, ইহাও অদ্যপি চাক্‌মারাজার শাসনাধীন।

শিলক যে স্থানে আসিয়া কর্ণফুলিতে[৫১] আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহারই পার্শ্বে রাঙ্গুনিয়া পরগণা অবস্থিত। সাধারণে ইহাকে "রাউন্যা" বলে। চাক্‌মাগণ পরিত্যক্ত জুমকে "রান্যা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং সহজেই প্রতীত হইতেছে যে, চাক্‌মাদিগের আবাদিত জুমের 'রান্যা'য় লোকবসতি হইয়াছে। অনুমান তিন শতাব্দী পূর্বে এই পাড়াময়দেশ ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ক্রীড়াস্থল ছিল। এখনও এদেশের সর্বত্র আবাদ হয় নাই, এবং আম-কাঁঠাল প্রভৃতি গ্রামোপযোগী বৃক্ষাদিও প্রাচীন নহে। অত্রত্য "গোঁয়াইর বিল"[৫২] জঙ্গলাকীর্ণ দেখিয়াছে,

"রা(উ)ন্যা" বা রাঙ্গুনিয়া

এমন অনেক লোক অদ্যাপি জীবিত পাওয়া যায়। নূতন আবাদিত জমির ন্যায় রাঙ্গুনিয়ার উর্বরতা চট্টগ্রাম ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ। অন্নক্লিষ্ট অনেক দরিদ্র এখনও সুবিধা পাইলে তথায় গিয়া বসতি স্থাপন করিতেছে। চট্টগ্রামে একটি কথাই রহিয়াছে, — "হাতে কাঁচি[৫৩] কোমরে দা, ভাত খাইলে রাউন্যা যা"। সারার্থ এই — 'যদি স্বচ্ছন্দে উদরনিষ্পত্তি করিবার আশা কব, তবে হাতে কাস্তে ও কোমরে দা লইয়া রাঙুনিয়ায় যাও' এই বাক্যে আরও কিছু সত্য আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে কৃষির উপকরণ দা এবং

---

(৫১) কর্ণফুলী — লুসাই পর্বতের অন্তর্গতলুংলের অনতিদূরবর্তী পর্বতশ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭০ মাইল। কর্ণফুলী উৎপত্তিস্থান হইতে প্রায় ১৩৫ মাইল পথ গিরিকন্দরের কোলে কোলে ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্রঘোনায় আসিয়া সমতলভূভাগ পাইয়াছে। ঠেগা, বড়হরিণা, কাচালং, শুভলং, চেঙ্গী, রাইনখ্যং, কাপ্তাই, শিলক, ইচ্ছামতী ও হালদা প্রভৃতি ইহার সর্বপ্রধান উপনদী তন্মধ্যে শেষোক্তটিই প্রধান। কর্ণফুলীর উত্তরতীরে - প্রায় মোহনারই সন্নিধানে চট্টগ্রামনগর অধিষ্ঠিত। পূর্বেই একস্থলে বলিয়াছি, ইহার কিয়দংশ "কাঁইচা" বা 'কাঞ্চী' নামে প্রথিত কিন্তু ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে সমুদয় কর্ণফুলী নদী একমাত্র কাঁইচা নামেই উল্লিখিত আছে। বোধ হয় ইহা দেখিয়াই কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন (A fly at the wheel – P. 184) "ইহার আদিম নাম 'কাঁইচা খাল'। কর্ণফুলী নামকরণ সম্বন্ধে তিনি একটি আখ্যানও বলিয়াছেন। তাহা যথা— "কোন সময়ে চট্টগ্রামের জনৈক মুসলমান শাসনকর্তার বেগমের "কর্ণফুল" (নিম্নকর্ণাভরণ বিশেষ) এই নদীজলে পড়িয়া যায়। বেগম তাহা উদ্ধার করিতে যাইয়া জলমজ্জিত হইয়াছিলেন। তদনুসারে ইহার 'কর্ণফুলী' আখ্যা হইয়াছে। কিন্তু এদেশে প্রসিদ্ধি আছে, দক্ষযজ্ঞ ত্যক্তপ্রাণা সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ভোলানাথ যখন ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ভগবতীর কর্ণফুল, ফেণী (উর্ধকর্ণভরণবিশেষ) ও শঙ্খ গহনাত্রয় চট্টগ্রামের নদীতিনটিতে পতিত হইয়াছিল, সেই হইতে নদীত্রয়ের বর্তমান নাম নির্দিষ্ট হইযাছে।

(৫২) গোঁয়াইর বিল একটি প্রকাণ্ড মাঠ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ মাইল এবং প্রস্থে প্রায ৩ মাইল হইবে, এখনও সম্পূর্ণ আবাদ হয় নাই। বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইলে সমুদ্রপ্রায় বোধ হয়।

(৫৩) চট্টগ্রামে 'কাস্তে'কে সাধারণত 'কাঁচি' বলা হয়।

কাস্তে মাত্র সঙ্গে লইবার উপদেশ আছে, এই দুইটি জুমিয়াদের অনন্যোপকরণ। অতএব সহজেই ধরা যায়, কৃষকগণ তদ্দেশে চাক্‌মাদিগেরই অনুসরণ করিয়াছিল।

রাজকীয় কীর্তিপাঠ

বাড়ুনিয়ায় চাক্‌মারাজার বিস্তৃত অধিকার এবং অপরাপর প্রধান দেওয়ানগণেরও 'ছোট-বড়' অনেক প্রাচীন জমিদারী রহিয়াছে। এখানে ভূতপূর্ব চাক্‌মারাজা ধরমবক্স খাঁর মহিয়সী মহিষী কালিন্দী রানীর স্থাপিত (পদ্দোয়া) "রাজারহাট" ও "রানীর হাট" এবং 'ধাঁমাই গোছার' কীর্তি-চিহ্ন 'ধাঁমাইর হাট' সুদূর ভবিষ্যৎ ধরিয়া চাক্‌মা প্রভাব ঘোষণা করিবে। সম্ভবতঃ রাজা জানবক্স খাঁ-ই এখানে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কালেক্টর সার হেন্‌রী কটনের[৫৪] মতও এইরূপ[৫৫] দেখা যায়। অনন্তর জানবক্স খাঁ-ই বোধ হয় রাজধানীস্থাপিত গ্রামের নাম "রাজানগর" রাখেন। রাজবাড়ী অবশ্য ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে। সম্মুখে "রাজার দীঘি" পরবর্তী রাজা টব্বর খাঁ কর্তৃক খোদিত হইয়াছিল। তৎপার্শ্বে যে অন্য একটি "রাজার হাট" আছে, তাহা রাজা জব্বর খাঁর কীর্তি বলিয়াই অনুমিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিস্তার

'জুম' চাক্‌মাদিগের সর্বপ্রধান উপজীব্য। এজন্য তাহাদিগের আবাসস্থানের স্থিরতা থাকে না। কেননা, এক বৎসর যেখানে জুম করা হয়, ৫/৬ বৎসর যাবৎ পতিত না থাকিলে তাহাতে আর জুম করা চলে না। তাই নিয়ত নূতন স্থানে জুমক্ষেত্র অনুসন্ধান আবশ্যক হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানও পরিবর্তিত হইয়া থাকে, আবার জুমের নিমিত্ত পাহাড় প্রয়োজন। এই কারণে চাক্‌মাগণ ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামে[৫৬] ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পরন্তু রাজধানী বহুকাল ধরিয়া রাজনগরে ছিল। পরে যখন চাক্‌মাগণের প্রায় সকলেই এই পার্বত্যপ্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন শাসনকার্যের সৌকর্যার্থ সম্ভবতঃ রাজা জব্বর খাঁ পার্বত্য - চট্টগ্রামের প্রায় মধ্যবর্তী কর্ণফুলী নদী দ্বারা ত্রিপার্শ্ববেষ্টিত রাঙামাটিতে[৫৭] এক অস্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেন। রাজা মধ্যে মধ্যে পরিদর্শনপলক্ষ্যে

(৫৪) সার্ হেনরী কটন পরে আসামের চিফ্ কমিশনার হইয়াছিলেন। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ ভারতহিতৈষী। এক্ষণে স্বদেশে (লন্ডনে) থাকিয়াও সতত ভারতবাসীর মঙ্গল চেষ্টায় নিরত।

(৫৫) Revenue History of Chittagong, P. 189।

(৫৬) এইস্থান আদিমকালে কুকিদিগের বিভিন্ন শাখার অধিকারে ছিল। চাক্‌মাদিগের প্রাবল্যে তাহারা ক্রমেই উত্তর পূর্বাভিমুখে সরিয়া গিয়াছে।

(৫৭) কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য প্রভাবে এই উপনগরী "রঙ্গমতী" আখ্যা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ রাঙ্গামাটিনাম্নি ক্ষুদ্র উপনদী ও কর্ণফুলী নদীর সঙ্গমস্থলেরই পার্শ্ববর্তী স্থান রাঙামাটি নামে প্রসিদ্ধ। এই

আসিলে এখানে থাকিতেন। এইরূপে রাজা ধরমবক্স খাঁর সময় পর্যন্ত চলিয়া যায়। তদীয় মহিয়সী মহিষী কালিন্দী রানীর শাসনকালে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রামের

রাঙামাটি

ব্রিটিশ-প্রতিনিধির বাসস্থান ও গবর্নমেন্টের যাবতীয় অফিসাদি চন্দ্রঘোনা হইতে রাঙামাটি উঠিয়া আসে। তখন রানী বাধ্য হইয়া তদীয় অস্থায়ী আবাস শৈল ইংরাজ-কর্তৃপক্ষকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে এখনও চাক্‌মাধীশ্বরের সযত্ন-রোপিত দুইটি কাঁঠাল গাছ রহিয়াছে। এই রাজবাসস্থানেরই ভিত্তির উপর ব্রিটিশ শাসনকর্তার সুরম্য "বাংলা" অধিষ্ঠিত হয়। কাপ্তেন লুইন ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে "Barn-House" (খামার বাড়ী) নামকরণ করিয়াছিলেন[৫৮]।

অনন্তর রানী কালিন্দী কর্ণফুলীর পরপারে অপর এক আবাসস্থান নির্মাণ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন প্রয়োজন না ঘটিলে তিনি রাজনগরের বাড়ী পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যু

বর্তমান রাজবাটী

হইলে, দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণের প্রস্তাবে বিভাগীয় কমিশনার ইহাও উল্লেখ করেন যে* "যদি কাহাকেও জাতি বিশেষের সর্বময় কর্তা স্বীকার করিযা লওয়া হয়, তাঁহার পদোচিত সম্মান অব্যাহত রাখিতে হইলে — তাঁহাকে সেই জাতির মধ্যে বাস করিতে হইবে, প্রজাগণ যেন সহজেই তাঁহার নিকটে যাইতে পারে। সুতরাং বাবু হরিশ্চন্দ্র ডেপুটি কমিশনারের শাসনাধীন প্রদেশের মধ্যেই থাকিবেন[৫৯]। চট্টগ্রামে তাঁহার কিছু জমিদারী আছে। ডেপুটি কমিশনার বলেন, তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছেন। জাতিবিশেষের কর্তৃত্বরূপ গুরুতর ভার হইতে কিঞ্চিন্মুক্ত থাকিতে (?) তিনি (রাজনগর) 'দেশে'+[৬০] থাকিতেই ইচ্ছা করেন।" তদানীন্তন লেপ্টেনান্ট গভর্নর বাহাদুর কমিশনার মহোদয়েব এতাদৃশী প্রস্তাবনায় আদেশ দিলেন যে "দেখা যায়

*Letter No. 988, Dated 10 12 1873

+Letter No. 154, dated 21.1.1874

পার্বত্য প্রদেশের স্থানগুলির নামকরণে ইহাই সাধারণ নিয়ম। রাঙামাটি চট্টগ্রাম হইতে নদীপথে ৬৫ এবং স্থলপথে (হাটহাজারী ও রাউজান ধরিয়া) ৪৬ মাইল। কমিশনারেব "সোযালো" (Swallow) নামক ষ্টিমার সচরাচর বৃহস্পতিবার আসিযা শনিবার প্রত্যাবৃত্ত হয়, ভাড়া সর্ব নিম্নশ্রেণীর এক টাকা। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান নগর। সুতরাং থানা, আদালত ও ফৌজদারী বিচারালয়, জেলখানা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাম অফিস, জেলা স্কুল ইত্যাদি সবই আছে। সর্বোপরি ইহাব প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর, স্বাস্থ্যও মন্দ নহে। অনেকেই এস্থলে ভ্রমণোপলক্ষে আসিয়া থাকেন।

(৫৮) A fly on the wheel, p 373

(৫৯) লেপ্টেনান্ট গভর্নর বাহাদুরের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীর পত্রেও এইরূপ আদেশ ছিল।

(৬০) এ পুস্তকে চাক্‌মাদিগের অনুকরণে "দেশ" শব্দে পার্বত্য প্রদেশেব বহির্ভূত চট্টগ্রামাদির সমতল দেশ (Plain) বুঝানো হইয়াছে।

পাহাড়ে চাক্‌মাদিগের মধ্যে থাকিয়া রাজকীয় কর্তব্য পালন হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য হইবে এবং তিনি কালিন্দী রানীর ন্যায় বাঙ্গালিগণ দ্বারা (যাহাদিগকে চাক্‌মাগণ বিন্দুমাত্র ভালবাসে না) পরিবেষ্টিত হইয়া "দেশে" বাস করিতে ইচ্ছা করেন। সেই নিমিত্ত ইহা বলা যায় যে, পার্বতীয়গণের মধ্যে বাস করিবার জন্য তাঁহার সহিত বন্দোবস্তির এক শর্ত থাকিবে, এবং তজ্জন্য তাহাকে জেদ করাও হইবে।" সেই কারণে রাজধানী রাঙামাটিতে স্থানান্তরিত হয়, এবং তদবধি চাক্‌মারাজগণ এখানে স্থায়িরূপে বসবাস করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১) আবাসস্থান (২) লোকসংখ্যা (৩) বংশ বিভাগ

১

পার্বত্যচট্টগ্রামের পরিমাণ ফল ৫০৭৪০৪ বর্গ মাইল। এই সুবৃহৎ প্রদেশে আসিয়াও চাক্‌মাদিগের বিস্তার-বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই। এই নিমিত্তই বোধ হয়, কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক ইহাদিগকেও স্থিতিহীন জাতি (Nomedic tribe)-ভুক্ত করিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসর হইতে ইহারা পার্বত্য ত্রিপুরায়ও আশ্রয় গ্রহণ আরম্ভ করিয়াছে। কাপ্তেন লুইনের মতে কালিন্দী রানীর অত্যাচারই ইহাদের এদেশ পরিত্যাগের প্রধান কারণ। আবার তাঁহার পরবর্তী ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ. ডবলিউ. পাউয়ার বলেন,* "অধিক সংখ্যক চাক্‌মা ২ নম্বর সার্কেলের ফেনীতীরে বসবাস করে। তাহারা নিষ্কর ভোগদখলেই অভ্যস্ত হইয়াছে। যখন করের দাবী হয়, তখনই নদীপথে পার্বত্য ত্রিপুরায় চলিয়া যায়।" কিন্তু "রাজমালা"য় দেখিতে পাই,+ "চীন-লুসাই অভিযানকালে কুলিধরার ভয়ে প্রায় দশ সহস্র চাক্‌মা পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরায় উপনীত হইয়াছিল।" এই রূপে "নানামুনির নানামত" থাকিলেও আমরা পুনরায় বলিব, জুমের নিমিত্ত নিত্যনূতন ভূমির প্রয়োজন হওয়াতেই তাহারা বাধ্য হইয়া এদেশে ওদেশে ঘুরিতেছে। তথাকার ভূমির উর্বরতাও কিঞ্চিৎ অধিক থাকিবার সম্ভাবনা। জীবিকানির্বাহ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বুঝিলে লোক তৎপ্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মদীয় এই বাক্যের সমর্থনকল্পে বলিতে পারা যায়, জুমোপযোগী উৎকৃষ্ট ভূমির লোভে গত ৩/৪ বৎসরে প্রায় পাঁচ সহস্র পরিবার চাক্‌মা, গভর্নমেন্টের শাস্তির ভয় উপেক্ষা করিয়া, মাইয়নী রিজার্ভে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা জেল খাটিতে প্রস্তুত, তথাপি জুমের জন্যে যে উৎকৃষ্ট ভূমি পাইয়াছে তাহা ছাড়িতে চাহে না। অগত্যা গভর্নমেন্টকেই বাধ্য হইয়া "রিজার্ভ" ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। সে যাহাই হইক, বর্তমানে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য ত্রিপুরায় মাত্র চাক্‌মাদিগের বসতি আছে। কিন্তু কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামেই ইহাদের সংখ্যা অপর দুই জিলার সম্মিলিত সংখ্যার প্রায় নয়গুণ হইবে। মঘ, ত্রিপুরা, মুরুং, পাংখোজ, বনজুগী ইত্যাদি লইয়া এই পার্বত্য চট্টগ্রামের যাবতীয় অধিবাসী সংখ্যার প্রায় তৃতীয়াংশেরও অধিক চাক্‌মা। আর যে সকল চাক্‌মা অদ্যাপি চট্টগ্রামে আছে, বলাবাহুল্য তাহারা — জুমের প্রলোভনে পড়িয়া যাহারা অন্যত্র যায় নাই, তাহাদেরই বংশধরমাত্র।

পার্বত্য ত্রিপুরায় বিস্তার

*Letter No. 317, Dated 20.4.1876

+প্রথমভাগ, চতুর্থ অধ্যায় - ৩১ পৃষ্ঠা

পার্বত্য অঞ্চলের লোকবসতিতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি লইয়া বিভিন্ন "আদম" (গ্রাম) গঠিত, কারণ পরস্পরের আচার-ব্যবহারে এমনকি কথাবার্তায় পর্যন্ত পার্থক্যনিবন্ধন বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে সমাজ না থাকিলেও নয়, পরকীয়

নির্ভরতা মনুষ্যের এক বিশেষ ধর্ম। আমরা সমাজ-জীব। সমাজ না থাকিলে যেন বাঁচিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু জুমের লাঞ্ছনায় এই পার্বতীয়রাজ্যের "আদম" গুলিতে

পার্বতীয় গ্রামের অবস্থা

পরিবার সংখ্যা তত অধিক থাকিতে পারে না। ৫০/৬০-এর অধিক পরিবার বেষ্টিত "আদমের" সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বিগত সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৯৬ খানি গ্রামের মধ্যে ৫০০ শতের অনধিক লোকবিশিষ্ট ২১১, তদধিক হাজার পর্যন্ত লোক লইয়া ৬৬ হাজার হইতে দুই হাজার পর্যন্ত লোকের ১৮ এবং সর্বাপেক্ষা ঊর্ধ্বসংখ্যা ২৩৭০ জন লোকবিশিষ্ট একখানি মাত্র গ্রাম আছে। "আদমের" প্রতিষ্ঠাতা বা আদমবাসীদিগের প্রধানতম ব্যক্তির নামেই "আদম" প্রথিত হইয়া থাকে।

প্রথম পরিচ্ছেদে দেখাইয়া আসিয়াছি, চাক্‌মারাজা ও (রিগ্রাছা শ্রেণীর) বোমাংরাজা বহু দিন হইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। অনন্তর ইংরেজাধিকারে

স্বজাতীয় প্রজা

মঘদিগের পালেংছা শ্রেণী হইতে উত্তরাংশের জন্য অপর এক সরদার (Chief) নিয়োজিত হন, তিনি মঙরাজা[৬১] নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বে ইহারা কেবলমাত্র স্ব স্ব জাতির উপরেই কর্তৃত্ব করিতেন। প্রজা যেখানে থাকুক না কেন, স্বজাতীয় রাজার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য ছিল। অনন্তর যখন এই রাজাদিগের সার্কেল (Circle) নির্দিষ্ট হইবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, সেই সময়ে কাপ্তেন লুইন বলেন*, — "...... সত্য বটে, সামান্য কয়েক ঘর চাক্‌মা ফেণীকূলে (প্রস্তাবিত মঙ্ সার্কেলে) বাস করিতেছে। কিন্তু তাহাদিগকে (চাক্‌মাদিগের শাসনকর্ত্রী কালিন্দী) রানীর সার্কেলে উঠিয়া যাইতে আদেশ দিতে পারা যায়।" সুতরাং তাহাদিগকে জাতীয় শক্তির শাসনাধীনে রাখিতে মাননীয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টেরও প্রখর দৃষ্টি ছিল। কিন্তু

*Letter No. 532, Dated 1.7.1872

সার্কেল বিভাগ

কার্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট চাক্‌মা সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং মঙ্ সার্কেলের সীমা[৬২] নির্ধারিত করেন।+ তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, রাজগণ স্ব স্ব সার্কেলের এলাকাধীন গভর্নমেন্টের কর্মচারী ভিন্ন অপরাপর প্রজামাত্রকেই শাসন করিতে পারিবেন। সুতরাং এই অধিকারে বাস

+Letter No. 1 1985-797

(৬১) ইংরাজী Bohmong এবং Mong শব্দের অনুকরণে বোমাং ও মঙ্ লিখিতে হইল। সাধারণ্যে ইহারা 'পোয়াংরাজা' এবং 'মানরাজা' নামে প্রসিদ্ধ।

(৬২) বর্তমানে

চাক্‌মা সার্কেলের পরিমাণ ২৫৮৫.০০ বর্গমাইল তন্মধ্যে ৮৮৯ বর্গ মাইল গভঃ রিজার্ভ

বোমাং সার্কেলের পরিমাণ ১৮৩৫.০৫ বর্গমাইল তন্মধ্যে ৩৬২৩ বর্গ মাইল গভঃ রিজার্ভ

মঙ সার্কেলের পরিমাণ ৬৫৩ বর্গমাইল গভঃ রিজার্ভ নাই।

করিলে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তত্তৎ প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে [৬৩]। ইহাতে বিজাতীয় রাজার অধীনে জাতিগত অভ্যন্তরীণ বিচারাদি ভাল চলিবে না আশঙ্কা করিয়া প্রজাসাধারণ বিচলিত হইল, তাহারা ইচ্ছামত সার্কেল হইতে সার্কেলান্তরে ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে এত বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল যে ১৮৯২ সালের আইনদ্বারা গর্ভনমেন্ট উক্ত সার্কেল বিভাগ দৃঢ়তর করিবার কালে চাষীদিগের নিমিত্ত এক বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। যথা — " (ষোড়শ) — দেশান্তর গমন ও তজ্জনিত অনুপস্থিতি এবং পলাতকগণ।

"চাষী রায়তের এক সার্কেল হইতে অন্য সার্কেলে পরিবর্তন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না হইলেও তৎপ্রতি অনুৎসাহ প্রদর্শিত হইবে। কোন চাষী রায়ত সে যে সার্কেল, তালুক এবং মৌজা ছাড়িতে ইচ্ছা করে, তাহার যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত দেশ পরিবর্তন কবিতে পারিবেক না। চিফ্ তালুক দেওয়ান ও হেড্‌ম্যান ঈদৃশ দেশান্তর গমনের ইচ্ছাযুক্ত দায়িক এবং তদীয় সম্পত্তি (স্থানীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ) এসিস্টান্ট কমিশনারের আদেশ প্রাপ্তি পর্যন্ত আবদ্ধ রাখিতে পারিবার ক্ষমতাশালী। পলায়িত কালের যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ না করিলে কোন পলাতককে পূর্বপরিত্যক্ত সার্কেলে পুনর্বসতি করিতে দেওয়া হইবে না।"

জুমিয়াদের স্থান পরিবর্তন

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, "জুম" চাক্‌মাগণের প্রধান উপজীবিকা, সুতরাং ইহাদের প্রায় অধিকাংশই জুমিয়া প্রজা। পরবর্তী নিয়মে গভর্নমেন্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু জুমের উপযুক্ত ভূমির নিমিত্ত তাহারা সার্কেলান্তরে যাইতে বাধ্য হয়। একবার কয়েক পরিবার মিলিয়া কোন নূতন স্থানে

১৯০১ অব্দের আদিমসুমারী মতে অধিবাসী সংখ্যা —

	চাক্‌মা সার্কেল	বোমাং সার্কেল	মঙ্ সার্কেল
চাক্‌মা	৩৬২০৭	১৯৪২	৬১৮০
মঘ	৬২২৩	২১৭৭৯	৬৭০৪
ত্রিপুরা	১৬২৭	৩২০৩	১৮৫১'
কুকি	৬৭৮	১৪৬৮	—
কুমি	১		
মুরুং	৩০৮	১০২৩২	—
পাঙ্খো ও বনজুগী	---	৯৩৭	
মুসলমান	২০৫৬	২৭২৮	১২২
হিন্দু ও অপর	১৬৯২	১৭৮৩	৩৮১
মোট	৪৮৭৯২	৪৪০৭২	৩১৮৯৮
প্রতি বর্গমাইলে	১৮ ৮৬	২৪ ০১	৪৮.৮

(৬৩) পরন্তু ১৮৯৮ ইংরাজীর এক গভর্নমেন্ট পত্রে (No 543 P.D.) দেখা যায়, রাণী কালিন্দীই এ সম্বন্ধে গভর্নমেন্টকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। কেননা তিনি ১৮৬৯ অব্দে বোমাংরাজাকে শঙ্খনদীর দক্ষিণপার্শ্ববর্তী চাকমাপ্রজার উপর তাঁহার কোন দাবী নাই বলিয়া এক লিখিত একরারনামা প্রদান করিয়াছিলেন। নতুবা এই পত্রে সরকারপক্ষ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মাত্র চাক্‌মারাজাই সমগ্র চাক্‌মাজাতির অধিনায়ক ছিলেন।

"আদম" স্থাপন করিলে, সেখানে থাকিয়া যে কয়েক বৎসর জুমোপযোগী ভূমি পাইতে পারে ——ততকাল বেশ স্থায়ী আবাসের মত "মায়া-মমতা" দেখায়, আম কাঁঠালের গাছ পর্যন্ত তুলিয়া থাকে। ৪/৫ বৎসর পরে তথা হইতে জুমের ভূমি সংগ্রহ দুঃসাধ্য হইলে "আদম" বাসী সকলের পরামর্শক্রমে স্থানান্তরে গিয়া অপব এক নূতন "আদম" সংস্থাপিত করে।

স্থায়ী নিবাস

তাহাতে মতভেদ হইলে কোন কোন পরিবার অপর "আদমে" বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আবার কোন নূতন পরিবার আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া থাকে। এইরূপে একই জীবনে কত যে পরিবর্তন ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা নির্ণয় নাই। সুখের বিষয়, বর্তমানে অনেকে লাঙলের চাষের দিকে মনোযোগ দিয়াছে। ইহাতে, আবাদ করিয়া তুলিতে পারিলে প্রতিবৎসর এক ভূমিতেই চাষ চলে। সুতরাং তদ্দারা একস্থানে স্থায়ীভাবে থাকিবার সুবিধা পাওয়া যায়। এই কারণেই সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই চাষ ধরিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্থায়ী বাড়ীও বিনির্মিত হইতেছে। তবে এখানকার জমিতে স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। তাই অনেকে পরিপাটী 'বাড়ীঘর' করিতে সাহস কবে না। পক্ষান্তবে বাড়ীঘরের প্রতি মমতা না জন্মিলে স্থান পরিবর্তনের লোভও অসম্বরণীয় হয়। বস্তুতঃ ভাসমান্ জীবন কতই না কষ্টদায়ক!

"আদমের" পরিবারগুলি যথাসম্ভব ঘন সন্নিবিষ্ট। এমন কি, অধিকাংশ "আদম" দেখিতে একবাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। অনেক পরিবারে একাধিক গৃহ নাই। একান্নবর্তী পরিবারে লোকসংখ্যা অধিক হইলে মাত্র ততোধিক গৃহ প্রয়োজন হয়। কেবল

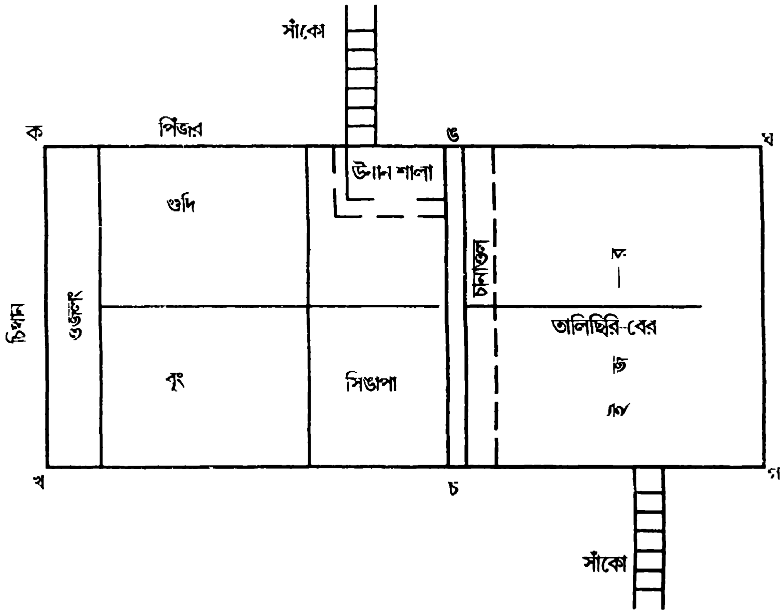
আবাস প্রথা

ধনবান ও সমাজে সম্ভ্রান্ত মহাশয়দের "ঢেঁকীশাল" (ঢেঁকীঘর) "গরুর উরা" (গোয়াল ঘর) প্রভৃতি দু'এক খানি অতিরিক্ত গৃহ থাকে। সচরাচর প্রধান গৃহ প্রায় চারিহাত উচ্চ মঞ্চোপরি প্রস্তুত হয়। "ঢেঁকীশালা"দি অতিরিক্ত ঘরগুলি ব্যতীত আর সমস্তই একমঞ্চে গ্রথিত এবং সেই সমতল মঞ্চে "ইজর" (অঙ্গিনা) ও গঠিত হইয়া থাকে। 'উঠানামা'র নিমিত্ত সদর ও খিড়কিব পথে দুইখানি "সাঁকো" (ধাপ) দেওয়া হয়। এই সিঁড়ি রাত্রিকালে গাছের হইলে উল্টাইয়া এবং বাঁশের হইলে সরাইয়া রাখে, যেন চোর অথবা কোন হিংস্রজন্তু উঠিবার সুবিধা না পায়। এই সকল মঞ্চগৃহ দেখিতে বড়ই সুন্দর। চলাফেরা, কাজকর্ম সমস্তই যেন দ্বিতলের উপব হইতেছে। জলতোলা এবং দৈবপ্রয়োজন ব্যতিরেকে বড় একটা নামিতে হয় না। সাধাবণ পরিবারে এই মঞ্চেব নিম্নে মোরগ ও শূকরেব "লূব" থাকে। সম্ভবতঃ হিংস্রক জন্তু হইতে আত্মরক্ষা করিবতেই মঞ্চের ব্যবস্থা হইয়া আসিয়াছে। মতান্তরে — ব্রহ্মদেশবাসী হইতে তাহারা ইহা অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে সন্দেহ হয়,



কারণ, অপরাপর পার্বতীয় জাতির মধ্যেও এই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পাহাড়ী কেহ কেহ বলে, মৃত্তিকায় শয়নে অকালে চুল পাকিয়া যায়, তজ্জন্য বাসগৃহ মঞ্চবিশিষ্ট হওয়াই প্রশস্ত। ইহা অবশ্য আনুষঙ্গিক যুক্তি। জানিনা ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি কতদূর কার্য করিতেছে। সে যাহা হউক অধুনা সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে মঞ্চ ব্যবস্থা উঠিয়া যাইতেছে এবং তাঁহাদের গৃহগুলিও বাঙ্গালী - 'বাঙালা' অনুকরণে সংস্কার লাভ করিতেছে।

ঘরগুলি প্রায়ই বাঁশদ্বারা প্রস্তুত। অনেক সম্ভ্রান্ত স্থায়ী অধিবাসী গাছের খুঁটি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। "কুরুক্‌পাতা", "পিডালিপাতা", বাঁশপাতা এবং ছনের ছানিই সচরাচর প্রচলিত। বাঁশ চতুর্দিকে সুলভ হইলেও তদ্বারা ছানি অদ্যাপি দেওয়া আরম্ভ হয় নাই। সাধারণ পরিবারের ঘরখানি প্রায়শ নিম্নাঙ্কিত নক্সায় গঠিত —



বলাবাহুল্য এই ঘরগুলির দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থই বৃহত্তর। চিত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, যথা — ক খ গ ঘ একই মঞ্চে নির্মিণ। গ ঘ ঙ চ "ইজর" অর্থাৎ সম্মুখীন প্রাঙ্গণ, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ অনাবৃত। ইহার মঞ্চের বাখারীগুলিতে কিছু কিছু ফাঁক থাকে, বাহির হইতে আসিয়া পা ধুইলে তাহাতে জল সরিয়া পড়িতে পারে। "ইজর" ভিন্ন অপরাংশের উপর অর্থাৎ ক, খ, চ, ঙ একখানি দোচালা গৃহ। গৃহ-মধ্যের মঞ্চে বাঁশের চ্যাঁচাড়িগুলি এমন সুন্দরভাবে পাতা হয় যে, তদুপরি গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা করে। চাল কিছু নীচু, ইজরের কতেকাংশ গৃহবহির্ভূত চালের দ্বারা রক্ষিত থাকে, সেই ছাঁচ্‌তলাকে "চানাওল" বলা হয়। "ওজলং" বারেন্দা বিশেষ। তদ্ভিন্ন সমুদয় গৃহ চারি প্রধা কামরায় বিভক্ত। "গুদি"—

ঘরের বিবরণ

শয়ন কক্ষ, "বুং" বা "কুদি" — ভাণ্ডারখানা, গোলা ইত্যাদি, "সিঙাপা" অতিথি-অভ্যাগতের নিমিত্ত রক্ষিত এবং অবশিষ্ট কামরার কিয়দংশ ঘেরিয়া "উনানশাল" অর্থাৎ পাককক্ষ প্রস্তুত হয়, বাকী অংশে বসিয়া আহারাদি চলে। "গুদি" বা "সিঙাপা"র মধ্যস্থলে ঈষদুচ্চ একটি বেদী রাখা হয়, তাহাতে শীতকালে অগ্নিরক্ষা করিয়া থাকে। "ওজলঙের" বহিঃপার্শ্বের নাম "চিথান" এবং বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগকে"পিঁজর" বলে। বিবাহিতের সংখ্যা লইয়াই শয়নকক্ষ কমবেশ হয়, অবিবাহিতেরাও "সিঙাপা"য় থাকে। "সাঁকো" (সিড়ি) সচরাচর একখানি গৃহের সম্মুখে এবং অপর একখানি "উনানশালের" পার্শ্ব দিয়া থাকে। বর্তমানে কোন কোন বাড়ীতে অবরোধ প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা হইতেছে। "ইজরের" মধ্যখানে বেড়া ("আলছিরিরের") দিয়া অন্দর-মহল বিভাগ করে, একপার্শ্বে ক্ষুদ্র একখানি দ্বার থাকে মাত্র। এবং "সিঙাপা" ও "উনানশালের" মধ্যবর্তী দ্বার বন্ধ করিয়া তাহা "ইজর" ও "উনানশালের" মধ্যে খুলিয়া লয়। কিন্তু ভদ্র পরিবার ভিন্ন সাধারণ চাক্‌মাগণ যদৃচ্ছাক্রমে এবম্বিধ পর্দা খাটাইতে পারে না। তজ্জন্য তাহাদিগকে রাজানুমোদন গ্রহণ করিতে হয়।

আদমের এই ঘর ভিন্ন, জুমিয়াগণ বন্যপশুর উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষা করিবার নিমিত্ত জুমক্ষেত্রের মধ্যস্থিত উচ্চতম শৃঙ্গোপরি আর একখানি গৃহ প্রস্তুত করে, যেন তাহা থাকিয়া সমুদয় জুমক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করা চলে। পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে নির্মিত হয় বলিয়া চাক্‌মাগণ ইহাকে "মইন ঘর"(৬৪) নামে অভিহিত করে। ইহা তিন চারি মাসের ব্যবহার্যোপযোগী করিয়া অতি সামান্য ভাবেই প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু দূর হইতে সেই শৈলশৃঙ্গপরি গৃহ অতিশয় মনোরম দেখায়। কাপ্তেন লুইন বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছেন, "This reminds one of Isaiahis solitary lodge in a garden of cucumbers!" অর্থাৎ "ইহা কোনও ব্যক্তিকে ঈশার সশা-বাগানের মধ্যস্থিত নির্জন বাসস্থান স্মরণ করাইয়া দেয়!"

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য ত্রিপুরায় মাত্র চাক্‌মাদিগের বসতি আছে। ১৯০১ ইংরাজীর আদম সুমারীতে দেখা যায়,—

জেলার নাম	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
চট্টগ্রাম	৪৬৭	৪১২	৮৭৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২৩,৫২৬	২০,৮০৩	৪৪,৩২৯
পার্বত্য ত্রিপুরা	২,৪৩২	২,০৭৮	৪,৫১০
সর্বমোট	২৬,৪২৫	২৩,২৯৩	৪৯,৭১৮

সুতরাং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য ত্রিপুরার সমষ্টিতেও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় নবমাংশ মাত্র। তন্মধ্যে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামে —

(৬৪) মইন্‌-শৃঙ্গ, ঘর-গৃহ = শৃঙ্গগৃহ অর্থাৎ শৃঙ্গোপরি নির্মিত গৃহ

চাক্‌মা সার্কেল		বোমাং সার্কেল		মঙ্ সার্কেল	
৩৬,২০৭		১,৯৪২		৬,১৮০	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১৮,৯৫৩	১৭,২৫৪	১,১০৯	৮৩৩	৩,৪৬৪	২,৭১৬

বাস করিতেছিল। তাহা হইলে বোমাং সার্কেল এবং মঙ সার্কেলের যোগফল চাক্‌মা সার্কেলের চতুর্থাংশও নহে। পক্ষান্তরে মঙ্ সার্কেলের সহিত তুলনায় চাক্‌মা সার্কেলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক বটে, কিন্তু বোমাং সার্কেলে তাহার বিপরীত। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য ত্রিপুরার স্ত্রীলোকের পরিমাণও চাক্‌মা সার্কেলের সহিত প্রায় সমানুপাত হইবে।

অনুপাত

পক্ষান্তরে ইহাদিগের মোট সংখ্যা—

১৮৭২ সালের গণনায় ২৮,০৯৭

১৮৮১ সালের গণনায় ২২৬

১৮৯১ সালের গণনায় ৪২,৫৫৬

১৯০১ সালের গণনায় ৪৯,৭১৮

আশ্চর্যের বিষয়, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় এই ২২৬ জন মাত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে! ১৮৭২ সালে ২৮,০৯৭ এবং ১৮৯১ সালেও ৪২,৫৫৬; সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কিরূপে এত কমিয়া যাইতে পারে? প্রত্যুত সার্ রিজলীও লিখিয়াছেন, "আদম সুমারিতে এরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে যে, তাহার কোন কারণ দিতে পারি না।" গণনায় এত ভুল হওয়াও অসম্ভব। এইমাত্র অনুমান করা যায়, গণনাকারিগণ পার্বত্য প্রদেশের চাক্‌মাদিগকে অপর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে ১৮৭২ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্যন্ত স্থূল হিসাব করিলে, এই গত ২৯ বৎসরে শতকরা বার্ষিক ২.৬৫ জন বাড়িয়াছে, তাহাতে কিন্তু শেষ দশ বৎসরের বৃদ্ধির গড় বার্ষিক শতকরা ১.৭৪ জন মাত্র।

বৃদ্ধির গড়

৩

কোন কোন ইতিহাস লেখক বিশেষতঃ কাপ্তেন লুইন এবং তদীয় অনুবর্তী সার্ রিজলী চাক্‌মাজাতিকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখাইয়াছেন, যথা—চাক্‌মা, টংচঙ্গ্যা এবং দৈংনাক। কিন্তু আরাকানের ইতিবৃত্ত লেখক কর্নেল কেইরী (ছেক) অর্থাৎ চাক্‌মা ও দৈংনাকদিগকে পরস্পর বিভিন্ন জাতি বলিয়া নির্দেশ করেন। তিনি বলেন*

শাখা-তথ্য

"দৈংনাকেরা 'খিম্‌-বা-নাগো' নামে পরিচয় দেয়। সম্ভবতঃ তাহারা দাসরূপে আগত বাঙ্গালী দিগের সন্তান-সন্ততি হইবে, কালে — আবহাওয়ার পরিবর্তনে আকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে। ইহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।" কাপ্তেন লুইন ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন + "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি (কর্নেল ফেইরি) ভুল করিয়াছেন। দৈংনাকেরা যে চাক্‌মাগণেরই অন্যতম শাখা তাহা সর্ববাদি-সম্মত। অনুমান ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা জানবক্স খাঁর শাসনকালে দৈংনাকেরা পিতৃকুল পরিত্যাগ করিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধীয় গোলযোগই ইহার প্রধান কারণ। রাজা তাহাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত বিবাহ চালাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা পুরুষ পরম্পরাগত প্রথার বিরোধী। এজন্য তাহারা অস্বীকৃত হয় এবং পলায়ন করে। যাহা হউক, এক্ষণে দৈংনাকেরা ক্রমে ক্রমে ভূতপূর্ব স্বজাতীয়দিগের সন্নিহিত হইতেছে। কক্সবাজারের পাহাড়ে কয়েক পরিবারের বাস দেখা যায়। তাহারা এখনও পূর্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে। তাহারা বলিয়া থাকে, — তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কর্ণফুলতীরে বাস করিত। যদিও দীর্ঘকাল আরাকান-বাস-নিবন্ধন তত্রত্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে বিকৃত বাঙ্গলাশব্দও অনেক আছে। বলাবাহুল্য, সার রিজ্‌লীও স্বচ্ছন্দে ইহার অনুসরণ করিয়াছেন (৬৫)।

*Bengal Asiatic Society's Journal No. 117, P.

+ The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein P.-64-65

সত্যকথা বলিতে কি, ইহারা সকলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দৈংনাকেরা চাক্‌মাজাতির শাখাবিশেষ, তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাহাদের এই বিভিন্নতা উল্লিখিত কারণে নহে। দৈংনাক শব্দটি হইতেও বুঝা যাইতেছে, ইহার মূল ব্রহ্মদেশে। "দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং" অর্থাৎ "আরাকান কাহিনী" হইতে পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, খৃষ্টীয় ১৩৩৩-৩৪ সালে আরাকানাধীশ্বর মেঙ্গদির প্রধানমন্ত্রী উচ্চব্রহ্মের মইচাগিরিতে চাক্‌মারাজাকে পরাজিত করিয়া, ১০,০০০ চাক্‌মাপ্রজার সহিত তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া আনেন। এই প্রজাগণকে আরাকানের অন্তঃপাতী "এংখ্যং" এবং 'ইয়ং খ্যং' নামক স্থানদ্বয়ে বসতি করিতে দেওয়া হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্বতন উপাধীও পরিবর্তিত করিয়া "দৈংনাক" আখ্যা দিয়াছিলেন। কর্নেল ফেইরী কেন ইহা জানিতে পারিলেন না বুঝিলাম না। পক্ষান্তরে কাপ্তেন লুইন কিরূপে দৈংনাক ও টংচঙ্গ্যাদিগকে বিভিন্ন দেখাইতেছেন, ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। অনেক প্রাচীন চাক্‌মাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, 'দৈংনাক' শব্দটিও তাহাদের অশ্রুত। পরন্তু মঘেরা টংচঙ্গ্যাদিগকেই দৈংনাক নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই দুই নামধেয় জাতি নিশ্চিতই অভিন্ন। কাপ্তেন লুইন দৈংনাকদিগের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, কক্সবাজারের নিকটবর্তী পাহাড়বাসী ছাক্ (Tsac-Burm)

ঐতিহাসিক ভ্রম

(৬৫) Vide - "Tribes and castes of Bengal" P. 170

দিগের প্রতিই লক্ষ করা হইয়াছে। ইহাদের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ চাক্‌মা-সাদৃশ আছে কিন্তু কথাবার্তায়

ছাক্ সম্প্রদায়

মঘীশব্দ যথেষ্ট, এবং আচারগত বৈলক্ষণ্যও বিস্তর পরিলক্ষিত হয়। মামাতভগ্নী না হইলে ইহারা বিবাহ করিতে পারে না, সেই কারণে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা অত্যধিক। বিবাহের পণস্বরূপ কন্যাকর্তাকে সহস্রাধিক ডিম দিতে হয় ইত্যাদি —

অনন্তর কাপ্তেন লুইন টংচঙ্গ্যাদিগের অপর কাহিনী বলিয়াছেন*, "১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরমবক্স খাঁর রাজত্বকালে ৪০০০ টংচঙ্গ্যা চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে আসিয়াছিল, তাহারা ফাপ্রুনামা তাহাদের অন্যতমকে দলপতি মনোনীত করিতে চাহে, কিন্তু রাজা ধরমবক্স খাঁ ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অধিকাংশ আরাকানে প্রত্যাবর্তন করে। বর্তমানে (১৮৬৯ খৃঃ অব্দে-এখানে) ইহাদিগের সংখ্যা ২৫০০। প্রাচীনেরা আরাকানী ভাষায় আলাপাদি করে, পরবর্তী

টংচঙ্গ্যা কাহিনী

পুরুষ অন্যদের (অর্থাৎ চাক্‌মাদিগের) অনুকরণে বিকৃত বাঙ্গলা ব্যবহার করিয়া থাকে"। ইহার সহিত আমাদের মত সম্পূর্ণ এক নহে, যাহা কিছু সামান্য আপত্তি, সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। অপর একজন লেখক (৬৬) বলেন +"(পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের পর বিজয়গিরি) আর স্বদেশে না যাইয়া সখ্যভাবে আরাকানরাজের সহিত আরাকানেই অবস্থান করেন। এই সময়ে তংচঙ্গীয়াগণ অর্থাৎ আরাকানের পাহাড়ী জাতির অপর এক সম্প্রদায় তাঁহাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া চাক্‌মার অনুকরণে কথাবার্তা কহিতে শিখিলেও, চাক্‌মাগণ তাহাদিগকে আপন সমাজভুক্ত করিয়া লয় নাই, এমনকি, বিবাহাদির কার্যে কোনরূপে ইহাদের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই। চাক্‌মারা সাধারণতঃ ইহাদিগকে একটুকু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।" প্রবন্ধ লেখক 'আরাকানের পাহাড়ী - তচংঙ্গীয়াদিগের' আর কোন পূর্ব বিবরণ দেখাইয়া যান নাই। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই মনে হয়, তাঁহার এ ধারণা — "পেঙ্গ্যাওয়াদি - আরেদফুং"-এর বর্ণনার সামান্য রূপান্তর মাত্র। 'এংখ্যং' ও 'ইয়ংখ্যং' বাসী দৈংনাকেরাই 'আরাকানের পাহাড়ী — তংচঙ্গীয়া' হইবে। অতএব এক্ষণে আমরা আরও দৃঢ়তার সহিত দৈংনাক এবং টংচঙ্গ্যাদিগকে এক অভিন্ন জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

*The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein P.-64-66

+"পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চাক্‌মা ভাষা" - "অঞ্জলী", ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১১৫ পৃঃ

যাহা হউক আলোচিত মূল চাক্‌মাদিগের বিবরণী - বিশ্লেষণই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য।

গোষ্ঠী ও গোছা

সুতবাং যেসকল শাখার সহিত উহাদের সামাজিক কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদিগের কথা লইয়া অযথা সময়ক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন। বর্তমানে চাক্‌মাগণ বহুবিধ "গোষ্ঠীতে" (বংশে) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার নানা "গোষ্ঠী" হইতে কতিপয়

(৬৬) যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ইনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুলসমূহের প্রবীণ ডেপুটী ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বড়ুয়া।

পরিবার লইয়া ভিন্ন ভিন্ন "গোছা"(৬৭) গঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন "গোষ্ঠীর" যে কয় পরিবার এক স্থানে বাস করে, তাহারা অধ্যুষিত স্থান, সন্নিহিতা নদী, বা দলের প্রধান ব্যক্তির নাম কি তদীয় পৌরুষ-প্রসিদ্ধিযুক্ত "গোছায়" আখ্যাত ও পরিচিত হয়। অদ্যাপি অপরিচিত চাক্‌মাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে, — "তুমি কার গোছা" অর্থাৎ কোন্ গোছা-ভুক্ত? উত্তরে যে গোছার নাম করে, তদ্দ্বারা জানিতে পারা যায় — তাহারা কোন প্রসিদ্ধ দলপতির ক্ষমতাধীন! এমন কি, বাড়ী কোথায়, — তাহারও অনেকটা ধারণা ইহাতে জন্মে। কালক্রমে এক গোষ্ঠীর লোক নানা গোছার অধিকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং "গোষ্ঠী" পরিচয় "গোছার" তত্ত্ব জানিবার সুবিধা এক্ষণে নাই। এক "গোছার" কোনও "গোষ্ঠী"-সম্ভূত কেহ যদি অপর "গোছার" অধীনে গিয়া বাস করে, কিছুকাল পরে যখন পূর্ববর্তী "গোছার" সহিত তাহার যাবতীয় সম্পর্ক চলিয়া যায়, তখন হইতে তাহাকে শেষাবলম্বিত "গোছায়" অভিহিত করা হয়। কিন্তু পুরুষের "গোষ্ঠী" কোন রূপেই পরিবর্তিত হয় না, বিবাহে স্ত্রীলোকের অবশ্য গোষ্ঠ্যন্তর ঘটে। যদি কোন বিধবা শিশুসন্তান লইয়া ভিন্ন গোছা ও ভিন্ন গোষ্ঠীতে পুনঃ পরিণীতা হয়, তাহা হইলে সেই মহিলার "গোষ্ঠী" ও "গোছা" পরিবর্তিত হয় বটে। কিন্তু পূর্বস্বামীজ শিশুর পিতৃ-গোষ্ঠী অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাহারা যতদিন যাবৎ মাতার "গোছার" তত্ত্বাবধানে রহে, ততদিন তাহাদের "গোছায়" পরিচিত হয়, অনন্তর স্বাধীন ভাবে অন্য "গোছা" অবলম্বন করিলে তাহা পরিবর্তিত হইয়া যায়। এক কথায়-পিতৃকূল লইয়া "গোষ্ঠী" এবং বাসস্থান-ভেদে "গোছা" আখ্যাত হইয়া থাকে। অধুনা মৌজা-বিভাগ হইয়া বংশমর্যাদা-নির্বিশেষে যোগ্যতা বিবেচনায় "হড়্‌ম্যান" (Headman) নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হওয়াতে গোছাবিচারে ক্রমেই অসুবিধা ঘটিতেছে। কালে বোধ হয় "গোছা" আখ্যাই বিলুপ্ত হইবে।

চাক্‌মাদিগের বংশ বিভাগে তিব্বতীয় এবং দার্জ্জিলিঙের লিম্বুদিগের সহিত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে(৬৮)। নামগুলিতে পূর্বপুরুষের আশ্চর্য সাহসিকতা এবং ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকটিত হয়। কোন "গোষ্ঠীর" পূর্বপুরুষের কাহারও উপবেশনে 'পিড়া' ভাঙ্গিয়াছিল, এজন্য তদীয় বংশধরেরা "পিড়াভাঙ্গা গোষ্ঠী" নামে পরিচিত। সেইরূপ জনৈক কুড়ে ব্যক্তির "গোষ্ঠী"

অপূর্ব্ব আখ্যা

"কুর্য্যা" (৬৯) বিশেষণে আখ্যাত হইয়াছে। এইরূপ "ভূত", "কাঁকড়া", "রণপাগলা" ইত্যাদি নানা "গোষ্ঠী" আছে। অবশ্য বংশের প্রধান ব্যক্তিরই বিশেষত্ব লইয়া "গোষ্ঠীর" বিশেষণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। "গোছার" আখ্যাও দলপতির গৌরব প্রকাশক, বা আবাসস্থানের(৭০), কি সন্নিহিতা নদীর নামবাচক হয়।

(৬৭) সংস্কৃত গুচ্ছ শব্দ হইতে বাঙ্গালার গোছা শব্দ উৎপন্ন। চাক্‌মাদিগের এই "গোছা" আখ্যাও সমষ্টি পদ-বাচক। কিন্তু তাহাদের উচ্চারণ এত বিকৃত যে, "গোছা" বলিতে "গোঝা" এবং "গোষ্ঠী" বলিতে "গুত্তি" শুনায়।

(৬৮) Vide - Tribes and castes of Bengal, P. 59

(৬৯) ইহারা এবং চট্টগ্রামেরও কোন কোন স্থানের লোকেরা কুড়ে অর্থাৎ অলসকে কুর্যা বলিয়া থাকে।

(৭০) মঘদিগের মধ্যেও বসতিস্থানের নামানুসারে বংশের আখ্যা হয়।

ধুর্যা, কুর্যা, ধাবানা, পিড়াভাঙা ইত্যাদি নেতৃচতুষ্টয়ের নামানুসারেই সর্ব প্রথমে চারিটি গোষ্ঠী গঠিত হয়। এই চারি গোষ্ঠী লইয়াই বংশ বিভাগ আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে তাহাদিগের বংশধরেরা বিস্তৃত-অতিবিস্তৃত হইয়া স্বাধীনভাবে স্ব স্ব নামানুসারে গোষ্ঠীর নাম প্রচার করে। স্থলবিশেষে বা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব লইয়া রহস্য করিতে করিতেও তৎবংশধরেরা সেই কৌতুক-গর্ভ আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। যেমন, — কেহ খুব বেশী কলা খাইত, তাহার বংশীয়েরা "কলা গোষ্ঠী", এক পরিবারে সাত সহোদর ছিল, তাহাদিগের বংশধরেরা "সাত ভাইয়া গোষ্ঠী" প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র চাক্‌মাসমাজ কত যে গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়াছে নির্ণয় করা দুরূহ। আমি বহুল চেষ্টায় এ-যাবৎ ১৩৩ ত্রয়োত্রিংশত্যধিক শত সংখ্যক গোষ্ঠীর সন্ধান পাইয়াছি। যথা — ধুর্যা, নিনান্দ্যা, কাঠ্যোয়া, রামদালিকা, মুলিখাজা, ভেলে, কাত্তুয়া, বোয়া, নানুকতুয়া, পোয়াকামার্যা, কোমরেং, জান্দর, গুইয়া, তুদা, ধাবানা, মিঠা, নোয়ান্যা, কার্বুয়া, সিংহাসর্প, আনন্দ্যা, কলা রাঙ্যাছিলন্যা, বাদালী, সেবার্যা, সকুয়া, মানিয়া, চাদং, করম্যা, সল্যা, পঁচা, ইচাপঁচা, ক্ষাংথং, বামনচেগে, কাঁকড়া, শেঠ্যা, পুংঝা, চগড়া, মুখচোরা, পিড়াভাঙা, কুর্যা, বালকা, বরৈবেচা, কলাচেম্, কাঙ্, তিনভেদা, বড়কুর্যা, ছোটকুর্যা, চায়্যা, বগা, ভবা, তদেগা, সামঝা, সাতভাইয়া, সুরেশ্বরী, পেড়ংছ্যরী, নেন্দার, তেতৈয়া, আইনাপুনা, কাউয়া, ভদং, ভূত, ক্যক্‌দড়া, অমরী, ভিদ্দিলী, ওয়াংঝা, গজাল, লৌহঝাত্তেয়া, নাদক্‌তুল, হাগরা, ভেঙেয়া, বুংচেগে, মেস্তর, লুলাং, ভুরুমা, চেগে, বহলা, বান্যাব, মঘ, গোদা, সিঙিরাপুনা, চৈদানী, চানৈ, দোজা, কপান্যা, সম, সর্দার, কাগুনিকাল, বেৎকাবা, কয়ল্, কাশমাণিক, হাতীপুংঝা, ইন্দরতালা, কালাপিলাবাপ, ভুলা, কালাবাঘা, পিঙরভাঙ্গ, কাল, শেষ্যা, রসিরী, বাবুরা, গজাল্যা, মানাইয়া, লোহাকন্দা, বাঘওঝা, করেংগিরি, ভগতপ, সেবেয়া, নারাণ, ধেচ্যোয়া, আমু, শিক্ষা, রাক্‌কোয়াবাপ্, আগুনিকণা, রণপাগলা, কাক্কিনা, ফাট্টোয়া, জাদি, পার্বোয়া, বরৈয়া, সরইয়া, জাল্যা, শেলছ্যা, শেলপাত্যা, চাওন্যা, পৈয়ব, মুলিয়া, তালুকদার, খাট্যাল, চেলীপুনা, মেন্দর, চর্কডা, মৈষচরা, কালা-পেনজাঙি ইত্যাদি। এরূপ গোষ্ঠী আরও যে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, থাকিলেও তৎপরিমাণ অতি সামান্যই হইবে।

বংশ বিভাগ

ধুর্যা, কুর্যাদি নেতৃগণ যাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিত, তাহারাও চারি দলে বা "গোছায়" বিভিন্ন ছিল, এবং তৎসমুদায় "গোছা" ও অধ্যুষিত স্থানের নাম, বা আধিনায়কের নাম কি বিশেষত্ব অথবা দলের কোন বিশেষ কার্যানুসারে নানাবিধ আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ধুর্যার বর্ণ উজ্জ্বল এবং গলা ও পা লম্বা ছিল বলিয়া, তাহার অধীন লোগদিগকে অপরেরা "বগা (বক) গোছা"র লোক বলিত। কুর্যার দল তৈনছরীতীরে বাস করিত বলিয়া তাহারা "তৈন্যা গোছা" নামে অভিহিত হয়। ধাবানার গোছার বুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তাহারা মুড়ি নদীর তীরে বাস করিত বলিয়া "মুনিমা গোছা" নাম হইয়াছে, অপর

কাহারও মতে ধাবানা অতি পবিত্রাচারী ছিলেন,— তজ্জন্য তাঁহার দলের আখ্যা "মুনিমা গোছা" দেওয়া হইয়াছিল। পিড়াভাঙার দলের যাহারা নদীপথে লামিয়া গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা "লার্মা গোছা" নামে অভিহিত, আর যাহারা ধাইয়া অর্থাৎ পলাইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের আখ্যা "ধামাই গোছা" হয়। এইরূপে প্রাচীন চারিগোছা হইতে শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হইয়া বর্তমানে একত্রিশ গোছা পর্যন্ত হইয়াছে। এস্থলে তত্তৎ গোছা ও গোষ্ঠীগুলি লইয়া ইহাদের সমাজের আধুনিক অবস্থা যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল —

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদুৎপত্তি বিবরণ	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম
১। বগা গোছা — এই গোছার সর্দারের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, এবং পা ও গলা লম্বা ছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে সকলে 'বগা' (বক) নামে ডাকিত।	ধূর্য্যা, নিনান্দ্যা, কাঠ্যোয়া, রামদালিকা, মুলিখাজা, ভেলে, কাত্তুয়া, বোয়া, নানুকতুয়া, পোয়াকামার্যা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত সূর্য্যচন্দ্র তালুকদার।
ক) দার্য্য গোছা — এই গোছার সর্দার মাথায় ভীমরাজের পালক গুঁজিত বলিয়া।	কোমরেং নানুকতুয়া, কত্তুয়া ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র তালুকদার
খ) পোমা গোছা —	জান্দর, গুইয়া, তুদা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত রাজকুমার তালুকদার
গ) পোয়া গোছা — এক সময়ে কোন গ্রামে বয়োবৃদ্ধাগণ জুম কাটিতে গিয়াছিল, বাড়ীতে শিশুসন্তান ব্যতীত আর কেহই ছিল না। এমন সময়ে কুকিরা আসিয়া সেই গ্রাম আক্রমণ করে। শিশুগণ একমাত্র "কামঠাগুলি"র সাহায্যে আত্মরক্ষা	কাক্কিনা, ফাটোয়া, কয়ল্ ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত নীলরথ তালুকদার

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদুৎপত্তি বিবরণ	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম
করিয়াছিল বলিয়া, অপূর্ব বীরত্বপূর্ণ সেই বালকগণের বংশধরেরা বালক অর্থাৎ "পোয়া" গোছা নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ ধরমবক্স খাঁর সময় এই গোছার তালুকদার অল্পবয়স্ক ছিল বলিয়া, মহারাজ এই গোছার লোককে পরিহাসপূর্বক 'পোয়া গোছা'র লোক বলিতেন, সেই হইতে এই আখ্যা।		
ঘ) চেক্‌কবা গোছা —		শ্রীযুক্ত বিজয়গিরি তালুকদার
ঙ) লচ্চর গোছা —	ভিদ্দিলী, ওয়াংঝা, গজাল, পিড়াভাঙা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত পঞ্চারাম তালুকদার
২। তৈন্যা গোছা— তৈনছরীর তীরে বসবাস হইতে।	কুর্যা, ধুর্য্যা, মুলিয়া, পৈয়ব ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত কৈলাসধন তালুকদার
ক) ওয়াংঝা গোছা — "ওয়াংঝা বিল" বাসীদিগের আখ্যা।	কাঁকড়া, শেঠ্যা, পুংঝাঁ ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত রাজা ভুবন-মোহন রায়
(ক-১) ফেদুংজা গোছা —	মুলিয়া, কপাল্যা, পুংঝা, কাশমাণিক, ইন্দুরতালা, কালাপিলাবাপ ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দেওয়ান
খ) বড়চেগে গোছা —	খাট্যাল, লোহাকন্দা, চেলীপুনা, ইন্দুরতালা পুংঝা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রধন তালুকদার
গ) কাম্ভেই গোছা —	মেন্দর, কালাপেনজাঙি ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র তালুকদার
ঘ) বুংছা গোছা —	কাঁকড়া, মৈষচরা, চর্কডা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত পুরখাঁ দেওয়ান

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদুৎপত্তি বিবরণ	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম
৩। মুনিমা গোছা — মুড়ি নদীর নামানুসারে বা পবিত্রাচারী বলিয়া।	ধাবানা, মিঠা, নোয়ান্যা, কার্বুয়া, সিংহাসর্প, আনন্দ্যা, কলা, রাঙাছিলন্যা, বাদানী, সেবার্য্যা, সকুয়া, মানিয়া, চাদং, করম্যা, সল্যা, পঁচা, ইচাপঁচা, ক্ষাংথাং, বামনচেগে ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ান
ক) মুনিমাচেগে গোছা —	সকুয়া, শেলপাত্যা, শেলছ্যা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত কিনাধন তালুকদার
খ) ফাক্‌সা গোছা —	বালকা, বরৈবেচা, কলাচেম্, কাঙ্, তিনভেদা, বড়কুর্য্যা, ছোটকুর্য্যা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দেওয়ান
গ) আমু গোছা — সল্যা আমুর নামানুসারে	গোদা, ধুর্য্যা, মঘ, সিঙিরাপুনা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত মানিকচন্দ্র তালুকদার
ঘ) চেগে গোছা — দুঃখ্যা চেগের নামানুসারে	লুলাং, ভুরুমা, কাঁকড়া, ধাবানা, বহলা, বান্যাব, পিড়াভাঙা, মঘ ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত সূর্যমণি খিসা
ঙ) খেয়ং চেগে গোছা —	চৈদানী, চানৈ, দোজা, কপাল্যা, সম, সর্দার, কাগুনিকাল, বেৎকাবা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত নীলচন্দ্র দেওয়ান
চ) লেবা গোছা — উচ্চারণে জড়তা নিবন্ধন এই দলের প্রধান ব্যক্তির আখ্যা 'লেবা' দেওয়া হইয়াছিল।		শ্রীযুক্ত ভাগ্যধন তালুকদার
ছ) উচ্ছুরী গোছা —		শ্রীযুক্ত শশিকুমার দেওয়ান

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদুৎপত্তি বিবরণ	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম
জ) নারাণ বা কুরাকুট্যা গোছা — ইহাদের উপর রাজলিয়ে মোরগ কুটিবার ভার ছিল বলিয়া শেষোক্ত আখ্যা হইয়াছিল। পরে ইহারা পার্বত্য ত্রিপুরায় পলাইয়া গিয়া, তত্রত্য মহারাজ কর্তৃক 'নারাণ' খ্যাতিলাভ করিয়াছে।	নেন্দাব, সুরেশ্বরী, তেতৈয়া, আউনাপুনা, পঁচা, কাউয়া, ভদং, ভূত, ক্যকদড়া অমরী ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত গঙ্গামাণিক দেওয়ান
ঝ) বোম গোছা —	আমু, পার্বোয়া, জাদি সরইয়া, বরৈয়া, বাদালী, পিড়াভাঙা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তালুকদার
(ঝ-১) রাঙ্গী গোছা — রাঙ্গী পানসরী নামক ব্যক্তির নামানুসারে।	লৌহ ঝাত্তোয়া, ভেঙেয়া, বুংচেগে, কাল, পিড়াভাঙা, মেন্দর, চেগে ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত কর্ণচন্দ্র তালুকদার
(ঝ-২) কুদুগা গোছা —	ভুলা, কালাবাঘা, কাল, পিঙরভাঙা ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত হরিধন দেওয়ান
৪(ক) লার্মা গোছা — নামিয়া গিয়াছিল বলিয়া।	পিড়াভাঙা, চায্যা, বগা, ভবা, তদেগা, সামঝা, সাতভাইয়া ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত যুবরাজ দেওয়ান
(ক-১) পেডংছারী গোছা —	পেডংছারী, কুর্যা, মুলিয়া, পৈয়ব ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত কিনারাম তালুকদার
(ক-২) হাইয় গোছা —	কুর্যা, ধুর্যা, মুলিয়া, পৈয়ব, জাল্যা, সল্যা, পিড়াভাঙা, তালুকদার ইত্যাদি। ,	শ্রীযুক্ত নীলধন তালুকদার
খ) ধামাই গোছা — ধাইয়া অর্থাৎ পলাইয়া গিয়াছিল বলিয়া।	চাওন্যা, সকুয়া, হাগরা, হাতী, পিড়াভাঙা, সুরেশ্বরী, বাঘওঝা, করেংগিরি, আগুনিকশা, রাককোয়াবাপ, নাদক্ তুল, কাঁকড়া ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদুৎপত্তি বিবরণ	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম
(খ-১) চাঁদগ গোছা —	সর্দার, শেষ্যা, রসিরী ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দেওয়ান
(খ-২) বাবুরা গোছা —	বাবুরা, গজাল্যা, মানাইয়া, লোহাকন্দা, ভগতপ ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত অক্ষয়মণি তালুকদার
*বড়ুয়া গোছা — পূর্বে বাঙালী বড়ুয়াগণ রাজালয়ের ভৃত্য কর্ম করিত। ইহাতে অসুবিধা ঘটিতেছে দেখিয়া, পাগলা রাজার সময়ে দেওয়ান-তালুকদারেরা পরামর্শকরতঃ তজ্জন্য বিভিন্ন গোছা হইতে প্রায় দেড়শত প্রজা দিয়া এই গোছা সৃষ্টি করেন। ক্রমে ইহাদিগের বংশ বর্ধিত হইয়া অধুনা প্রায় সহস্র পরিবার হইয়াছে। বড়ুয়াদের কার্য করিত বলিয়া, ইহাদের আখ্যাও 'বড়ুয়া গোছা' হইয়াছে।	প্রায় সকল গোষ্ঠীর লোকই এই গোছায় আছে।	শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দেওয়ান

ধুর্যা, কুর্যা, ধাবানা, পিড়াভাঙা "গোষ্ঠীর" সম্মান অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। "মুনিমা-গোছার" "ধাবানা-গোষ্ঠী" বহুকাল যাবৎ রাজবংশ-গৌরব ভোগ করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষরাজা ধরমবক্স খাঁর কোন সুসন্তান না থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মহিয়সী মহিষী কালিন্দী রানীর হস্তে শাসনভার আইসে, তিনিও পরলোক গমন করিলে দৌহিত্র "ওয়াংঝা-গোছার" "কাঁকড়া-গোষ্ঠী"জ হরিশ্চন্দ্র রায় সিংহাসন লাভ করেন। সেই হইতে এই "কাঁকড়া-গোষ্ঠী"ই রাজবংশ হইয়াছে। "কুবাকুট্যা-গোছার" "নেন্দা গোষ্ঠীর" সঙ্গেই রাজ পরিবারের

*এই গোছা রাজপাড়ালিয়া নামেও প্রসিদ্ধ। ইহারা পূর্বকালে রাজার সিপাহী শাস্ত্রীর কার্যও করিত; ইত্যাদি তাবৎ কার্যের জন্য জুমকর হইতে মুক্ত ছিল। রাজা হরিশচন্দ্রের রাজত্বের প্রথমাংশেও ইহাদিগকে কোন কর দিতে হইত না, পালাক্রমে রাজ বাড়ীতে পাহাড়া দিত ও অপরাপর কর্ম করিত। অনন্তর একদা তাহারা দেওয়ান ভৈরব চন্দ্রের প্ররোচনায় একটি শিকারলব্ধ বড় হরিণের রাজ প্রাপ্যাংশ দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে, রাজাবাহাদুর তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের উপর কর ধার্য করেন। তদবধি অপরাপর রায়তের ন্যায় ইহারাও জুমাদির খাজনা দিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে রাজার খাস মৌজাতেই বাসা হইয়াছে।

বিবাহ-সম্বন্ধ সমধিক প্রচলিত। ভূতপূর্ব রাজা ধরমবক্স খাঁর তিন বিবাহ এবং বর্তমান রাজা বাহাদুরের উভয় বিবাহ এই বংশের সহিত হইয়াছে। বর্তমানে মুনিয়া, ধামাই, ওয়াংঝা, তৈন্যা, বগা, কুরা কুট্যা ও লার্মা গোছা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী।

প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ হয়। কোন্ নিগূঢ় কারণে জানিনা, "ধামাই-গোছা" এবং "কুরাকুট্যা-গোছার" মধ্যে চিরবৈরিতা চলিয়া আসিতেছে। মেলা-মজিলিসে এই দুই দলের সাক্ষাৎ ঘটিলেই সংঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী; নিতান্ত কারণ না পাইলে 'গায়ে পড়িয়া ঝগড়া' লাগিয়া যায় ইহাতে একদল অন্যদলের যথাসাধ্য অনিষ্ট করিতেও ছাড়ে না। ১৩১১ সনের (রাজনগরের) "মহামুনি মেলায়" আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি, একদিনের মধ্যেই ৮ বার মারামারি লাগিয়াছিল। কারণ খুঁজিয়া পাইলাম, একদল যথানিয়মে দক্ষিণ হইতে বাম-অভিমুখী মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিল, বিরুদ্ধপক্ষ তদ্‌বিপরীত দিগাভিমুখে প্রদক্ষিণের চেষ্টা করিয়া সংঘর্ষণ ঘটাইয়াছে। এবম্বিধ কলহকালে "ধামাই-গোছা"র সহিত "বড়ুয়া-গোছা"ও যোগদান করে, কিন্তু তথাপি "কুরাকুট্যা-গোছার" পরাজয় কম হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১) রাজাবলী এবং তাহাদের কার্যালোচনা
(২) রানী ও কুমার জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা বিজয়গিরি, ছিরীতমা ছাক্, ইয়াংজ, চজুং, মংছুই, মরেক্যজ, চনুই (কোংলাপ্রু) প্রভৃতি কতিপয় চাক্মা রাজার শাসন বিবরণী দেখাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে আর ও যে কত রাজা নশ্বর প্রভুত্ব পরিচালনা করিয়া অতীত গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, জানিবার উপায় নাই। ততোধিক আক্ষেপের বিষয়, বর্তমানের অনতি দূরবর্তী শতাধিক বৎসরের চাক্মারাজগণ সংক্রান্ত কোন সংবাদ পাইতেছি না। "দেস্যাওয়াদি-আরেদফুং" ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত খোঁজ-খবর রাখিয়াছে। তাহার পর আরও প্রায় ৬৫ বৎসরকাল ধরিয়া আরাকানাধিপতি চট্টগ্রাম শাসন করেন, কিন্তু "আরাকানের রাজমালা"য় তদানীন্তন কোন বিবরণীতেই চাক্মারাজ্য সম্বন্ধে কিছুর উল্লেখ নাই।[৭১]

ইতিহাসের দুর্গতি

মোগলদিগের শেষ প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। তাঁহাদের কোন কাগজপত্রেও ইহাদের তত্ত্ব পাওয়া যায় না। পরন্তু ইংরাজ রাজের "রেভেনিউ (বোর্ড) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার বাহাদুরের নিকট ১৪৯৯ নম্বর পত্রে লিখিয়াছেন, "The Rajahs of the Chittagong hills were orginally appointed by the suffrages of the Joomiahs, Kookees, and other inhabitants and not by the sovereign of the country as usual. They were all independent, paid no tribute or revenue to the Mogul Govt. until the muggy year 1077 M.S. 1715 A.D." ইহার অর্থ : পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজগণ জুমিয়া, কুকি, এবং অপরাপব অধিবাসীদিগের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইতেন, সাধারণতঃ যেইরূপ "দেশের" ভূপতি[৭২]

বোর্ডের পত্র (কিয়দংশ)

(৭১) অন্যত্র আছে, — সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা যৎকালে বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ত্রিপুরেশ্বর কল্যাণমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র নক্ষত্র রায় (রাজ্য পাইয়া নাম ধরিয়াছিলেন - ছত্রমাণিক্য) সিংহাসনারূঢ় জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ)। গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অদ্যাপি কাচালঙের মাইয়নী সরিত্তীরে এই ত্রিপুরা-রাজার সরোবর, সুফল বৃক্ষ, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ চিহ্ন রহিয়াছে (The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein)। এতদ্ভিন্ন কান্দ্যার মুখের নিকটে, কাচালঙের মোহনা সমীপে, ও চেঙ্গীর ইটছরীতে ইষ্টকস্তূপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। যতদূর সম্ভব এসকল স্থানে মঘদিগের "জাদি" কিংবা ত্রিপুরাদের দেবমন্দির ছিল। অনেকে এ সমুদয়কে চাক্মারাজার প্রাচীন কীর্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাই ইহা এখানে জানাইয়া রাখা হইল।

(৭২) এখানে সম্ভবতঃ কোন উচ্চতম রাজশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কর্তৃক হইয়া থাকে, এখানে, সেরূপ নহে। তাঁহারা সকলেই স্বাধীন ছিলেন, ১০৭৭ মঘী— ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল গভর্নমেন্টকে রাজস্ব বা খাজনা দেন নাই।"

চাক্‌মারাজার স্বাধীনতা

সুতরাং মোগলাধিকারের এই কয়েক বৎসর যে যে চাক্‌মা রাজা স্বাধীন ছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু কোন্ সময়ে কি সুযোগে যে তিনি বা তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। অনুমানে বোধ হয়, মঘ রাজার প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা যে মুকুট রায় ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ মসহৌদীর আক্রমণে ভীত হইয়া মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন, তাঁহারই দুর্বল শাসনে চাক্‌মাবাজা স্বাধীনতা হস্তগত করিয়াছিলেন। আরাকানরাজ পুনরায় চট্টগ্রাম অধিকার করেন বটে, কিন্তু দুর্ধ্যর্ষ মোগলের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে এই পার্বত্য রাজ্যের প্রতি তাদৃশী দৃষ্টি নাও রাখিতে পারেন। কেননা দেখা যায়, অতঃপর অন্যতম শত্রু ত্রিপুরারাজ বিপ্লবাভিভূত হইলেও তিনি নীরব ছিলেন। যাহা হউক এই স্বাধীন কালেব কেবলমাত্র একজন রাজার কীর্তি-কাহিনী এখনও জাগ্রত দেখিতে পাই। তিনি "পাগলা রাজা" আখ্যায় সাধারণ্যে বিদিত।

পাগলা রাজা

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, চট্টগ্রামের দক্ষিণ ভাগে "পাগলা বিল" "পাগলা মুড়া" প্রভৃতি পাগলা রাজার যশঃস্তম্ভ সমুদয় তদীয় নাম অক্ষত রাখিয়াছে। বস্তুতঃ তথায় পাগলা রাজার "নাম ডাক" খুবই অধিক। "বগাগোছাব" "ধুর্যা গোষ্ঠী" সম্ভূত শ্রীযুক্ত সূর্যচন্দ্র তালুকদার গ্রন্থকারের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন—"দক্ষিণে শঙ্খ-মাতামুড়ির (তীরবর্তী) মঘেরা চাক্‌মা রাজাকে 'পাগলা রাজা' বলিয়া ডাকে, এবং পাগলা রাজার লোক বলিলে অনেকে ভয় করে। আমি যখন মাতামুড়ি যাই, তখন মঘেরা পাগলা রাজার নাম তুলিয়া থাকে ও অনেক ভয় করে। তৈন ছরার মুখে পাগলা রাজার ঘরভিটা আছে বলিয়া আমাকে বলিয়াছিল। সেই ঘর-ভিটার মাঠও আমাকে দেখাইয়াছে। সেই মাঠটি আমিও দেখিয়াছি, তথায় পাগলা রাজা বলিয়া অনেক খ্যাতি আছে।" এই মাঠে এক সময়ে মঘরাজার সহিত চাক্‌মারাজার যে যুদ্ধ লাগিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ঘর ভিটা

পাগলা রাজার প্রকৃত নাম কি সে খবব কেহই বাখে নাই। পরন্তু 'পাগলা রাজা' আখ্যা হইবার কারণ এবং তদানুষঙ্গিক অনেক কথা লইয়া সুদীর্ঘ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শুনা যায়, তিনি অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন ও নিরন্তর কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনায় তৎপর থাকিতেন। এ সম্বন্ধে একটি গান আছে—

কিংবদন্তী

"মুনি তপসী ধ্যান গরে।[৭৩]
পাগলা রাজা আপন চিৎ-কল্‌জা।[৭৪]
খৈ-নাই[৭৫] স্যান[৭৬] গবে।।"

(৭৩) "গবে" করে। (৭৪) "চিৎ-কল্‌জা" হৃদপিণ্ড। (৭৫) "খৈ-নাই" খসাইয়া বাহির করা। (৭৬) "স্যান" স্নান।

অর্থাৎ "পাগলা রাজা আপন হৃদ্‌পিণ্ড বাহির করিয়া স্নান এবং মুনি-তপস্বী (প্রায়) ধ্যান করিতেন।" তাঁহার এই সাধনা অতি গোপনে হইত। আরাধনাকালে 'উঁকি' দেওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। একদা রানী কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া স্বামীর গুপ্ত-সাধনার কারণানুসন্ধানে অভিলাষিণী হইলেন। রাজা ধ্যান-মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিবার অব্যবহিত পরেই মহিষী পশ্চাদ্বর্তী জানালার ফটকে যাহা দেখিলেন, অচিন্তনীয় ব্যাপার—রাজা অন্ত্রাদি বাহির করিয়া ধৌত করিতেছেন! তদ্দর্শনে বিস্ময় ও ভয়-বিহ্বলা রানী ভীতি - বিজড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাতে রাজার সাধনা ভঙ্গ হইল;কিন্তু তিনি অন্ত্রগুলিকে আর যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারিলেন না। এই কারণে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া পড়িল। ক্রমে তিনি যথার্থ পাগল হইলেন; লোকজনকে কাটিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। প্রজাগণ প্রাণভয়ে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পলাইতে লাগিল। সমুদয় রাজ্য ব্যাপিয়া রাষ্ট্র-বিপ্লব সূচিত হইল। অবশেষে রানী গত্যন্তর না দেখিয়া কতিপয় প্রধান ব্যক্তির পরামর্শে রাজাকে নিহত করেন এবং দৈবজ্ঞান প্রভাবে পুনর্জীবন লাভের সম্ভাবনা সন্দেহ করিয়া সেই শব বর্তমান "পাগলা মুড়া" হইতে পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত করেন। এই গর্হিত কার্যের নিমিত্ত রানীর বড় দুর্নাম রটিয়াছিল। এখনও তাঁহার শাসন-সময়কে "কাটুয়া কন্যার আমল" অর্থাৎ "হত্যাকারিনী কন্যার শাসনকাল" বলা হয়। পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চলে "পাগলা রাজা" শিশুদের কাছে অদ্যাপি জুজুসদৃশ — নাম করিলে তাহাদের যাবতীয় আবদার থামিয়া যায়।

কৃচ্ছ্র-সাধনা

কাটুয়া কন্যার আমল

'পাগলা রাজার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। তাঁহার হত্যার পর কিছুদিন বিধবা মহিষী রাজত্ব চালাইয়াছিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হইলে রাজ্যভার কাহার হস্তে সমর্পণ করা যায়, মহা সমস্যা উপস্থিত হইল। অনন্তর সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয়, তৈনছড়ীর মুখে (মোহনায়) একটি বংশসিংহাসন স্থাপন করা হউক। কোন নির্দিষ্ট দিনে ধুর্যা, কুযআ, ধাবানা, পিড়ভাঙা প্রভৃতি চাক্‌মাজাতির সর্বপ্রধান নেতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি সর্ব প্রথমে আসিয়া তাহাতে অধিরোহণ করিতে পারিবেন, রাজ-সিংহাসনও তাঁহার হইবে। নির্দিষ্ট দিনে সর্বাগ্রে ধুর্যা আসিয়া প্রোক্ত সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পরে ধাবনা এবং ক্রমে পিড়াভাঙা ও কুর্যা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ধুর্যার এক বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তিনি রাত্রিভাগে তাড়াতাড়ি পোষাক পরিধান করিতে ভুলে প্রণয়িনীর বক্ষ-বন্ধন বস্ত্র[৭৭] দ্বারা "খবং" (পাগড়ি) বাঁধিয়াছিলেন,[৭৮] প্রভাতালোকে তাহা দেখিতে পাইয়া সকলে অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন। ইহার ফলে ধুর্যার রাজত্ব লাভ তো দূরের কথা, অধিকন্তু সমাজের উচ্চ পদবী হইতেও অধঃচ্যুত হইলেন। তাঁহার উপাধি "তালুকদার" হইয়া গেল।

রাজ-নির্বাচন

---

(৭৭) চাক্‌মাগণ ইহাকে "খাদী" বলে। তদ্বিবরণ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

(৭৮) এই "খবং" সম্বন্ধেও বিস্তারিত মন্তব্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

ধাবানাই রাজ-সিংহাসন লাভ করিলেন। তদবধি কালিন্দী রানী পর্যন্ত এই বংশই পুরুষানুক্রমে রাজত্ব ভোগ করিয়া (৭৯) গিয়াছেন। অধিকন্তু শুনা যায়, তৎকালে পিড়াভাঙা অর্থাৎ ধামাই গোছার নেতা রাজার দক্ষিণ-মন্ত্রী এবং কুর্যা অর্থাৎ তৈন্যা গোছার নেতা বাম-মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েন।

পরন্তু পাগলা রাজার অত্যাচার এবং প্রজাগণ কর্তৃক রাজনির্বাচন কথার প্রতিকূলে কোনও তর্ক পাওয়া যায় না। প্রবাদ যেখানে কালের করাল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তথায় তাহাকে আর বিশ্বাস না করিবার কথা কি? সুতরাং মোগলের অধীনতা স্বীকার করিবার পূর্বেই যে পাগলা রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহাও নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যায়। কারণ, স্বাধীনতা না থাকিলে কেহই তাদৃশ ভীষণ অবাধ অত্যাচার করিতে সমর্থ হয় না, যদি পাগলা রাজার উপর মোগল বা অপর কোন শক্তির প্রাধান্য থাকিত, তবে নিশ্চিত তাঁহাবা ইহাতে বাধাদান করিতেন, এবং রেভেনিউ বোর্ডের পত্রেও অবশ্য তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যাইত। এস্থলে অত্যাচারিতেরাই হস্তক্ষেপ করিয়াছিল মাত্র। অধিকন্তু বোর্ডের পত্রদ্বারা জানা যায়, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজগণ জুমিয়া প্রভৃতি অধিবাসীদিগের সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইতেন, সাধারণতঃ যেরূপ সমগ্র দেশের ভূপতি দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকে, এখানে সেরূপ নহে। উক্ত রাজ-নির্বাচনেরও তাদৃশী প্রথা অবলম্বিত দেখা যায়। মাননীয় বোর্ড যে তাহা জানিয়াই এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতেও বা অবিশ্বাস্য কি আছে?

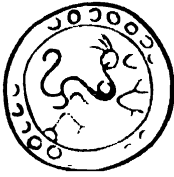
রাজবংশের তথ্য নির্ণয়ে ঐতিহাসিক উপকরণ গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব হইতে কি সাহায্য লাভ হয়, চেষ্টা করা যাউক। তবে ভারতের অদৃষ্ট বৈগুণ্যে সেই পথও তেমন সুগম নহে। এই পক্ষে রাজভবনে একটি কামান এবং কয়েকটি মুদ্রা (ছাপ-মোহর) মাত্র পাইয়াছি। পূর্বে "কালু খাঁ" ও ফতে খাঁ নামধেয় দুইটি কামান ছিল। একদা নিশাকালে দৈবযোগে "কালু

(৭৯) আবার কেহ কেহ এই রাজনির্বাচন কাহিনী সেই প্রাচীন উপকথা অনুকরণে বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সাক্ষ্যে শুনা যায়, পাগলা রাজাকে হত্যার পর বহুদিন ধরিয়া চাক্‌মাগণ অরাজক অবস্থায় পড়িয়া ছিল। অনন্তর নিতান্ত অসুবিধা দেখিয়া সকলের পরামর্শমতে প্রাচীন রাজবংশে কেহ আছে কিনা অনুসন্ধান চলিতে থাকে। রাজবংশের কেবল এক বিধবা একমাত্র পুত্র লইয়া জনৈক মঘের আশ্রয়ে তখনও জীবিত ছিল। সেই সময়ে একদা উক্ত বিধবা স্বীয় সন্তানকে বৃক্ষছায়ায় রাখিয়া গৃহকর্তার সহিত জুমের কাজ করিতেছে, এমন সময়ে গৃহকর্তা সেই মঘ তাহার নিকট দিয়া যাইতে দেখে - বালকের শিরোপরে ফণাবিস্তার পূর্বক এক সর্পরাজ ছায়া প্রদান করিতেছে। মঘ অগ্রসর হইতেই সাপটি চলিয়া গেল। অতঃপর সেই মঘ বালকের সৌভাগ্য সমাগত বুঝিতে পারিয়া, ক্রোড়ে গ্রহণ করতঃ তাহার মাতৃ-সমীপে লইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে কোন দিন তাহাদের অবস্থা পরিবর্তন ঘটিলে, যেন সে বা তাহার পরিবার সাহায্য লাভ করিতে পারে এবংবিধ প্রতিজ্ঞা করাইয়া, তৎপর সমুদয় বিবৃত করে। এই কথা ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। প্রাগুক্ত রাজবংশধর অনুসন্ধিৎসুরা ইহা জানিয়া বালককে হস্তিপৃষ্ঠে গ্রহণপূর্বক আনয়ন এবং সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

খাঁ' পার্শ্বপ্রবাহিতা কর্ণফুলী-গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। (৮০) সেই রাত্রে রাজা স্বপ্নেও ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। "ফতে খাঁ" বর্তমানে রাজপুরীর বিচারগৃহপার্শ্বে পড়িয়া আছে। হায়, তাহার প্রবল হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত প্রভাব-গৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অগ্নি নির্বাপিত হইলে অঙ্গারের আর মূল্য কি? আজ "ফতে খাঁর" অবস্থা স্মরণ করিলে বোধ হয়, ইহা শত শত নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ।

প্রত্ন-তত্ত্ব

যে কয়েকটি মোহর আছে, তন্মধ্যে দুইটি কেবল রাজকীয় চিহ্নসূচক। তাহার একটির প্রতিকৃতি পার্শ্বে রহিল। অপরটি একই ছবির ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। সম্ভবত ইহা "সিংহধবজা" হইবে। পুরাকালীন রাজগণ হনুমানধবজ, সূর্যবাণ, চন্দ্রবাণ প্রভৃতি নানা চিহ্নাঙ্কিত ছাপ ব্যবহার করিতেন, অধুনা তাহা কেতনপৃষ্ঠে শোভা পাইয়া থাকে। আর আটটি মুদ্রা পারসিতে উৎকীর্ণ। তন্মধ্যে বহু চেষ্টাতেও দুইটির পাঠোদ্ধার করা যায় না, অপর একটিতে খোদিত আছে "আল্লা হু রার্বী" অর্থাৎ 'পরমেশ্বর পালন কর্তা' পারসি লিখিত অবশিষ্ট পাঁচটির মধ্যে প্রাচীনতম মুদ্রার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে ঃ— "ফতে খাঁ: ১১৩৩ হিং"





সুতরাং খৃষ্টাব্দের ১৭১৪-১৫ সনে "ফতে খাঁ" নামক জনৈক চাক্‌মা রাজার শাসন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। এতদ্ভিন্ন হোয়াগ্‌গার কিয়দ্দুর উপরে কর্ণফুলীর তীরভূমি অদ্যাপি "ফতে খাঁর চর" নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বে যে "ফতে খাঁ" নামধেয় কামানের কথা লিখিত হইয়াছে, শুনিতে পাই, তাহা এই "চরে" পাওয়া যাওয়াতেই উহা "ফতে খাঁর" নামে অভিহিত। সম্ভবত এক সময়ে এই "চরে" চাক্‌মারাজ "ফতে খাঁ" সহিত মোগলের সংঘর্ষণ লাগিয়াছিল, তদবধি ইহা "ফতে খাঁর চর" আখ্যা পাইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব, উক্ত যুদ্ধে পরাজিত পক্ষ যে কামান ফেলিয়া পলায়ন করে, পরে তাহা চাক্‌মারাজার হস্তগত হয়। পক্ষান্তরে প্রাগুক্ত রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে প্রকাশ, "১০৭৭

ফতে খাঁ বা জল্লোল খাঁ

(৮০) রাঙামাটি নাম্নী ক্ষুদ্র উপনদী যেখানে আসিয়া কর্ণফুলীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিন্নিম্নে প্রকাণ্ড জলাবর্ত আছে। ইহার জল খুব গভীর, তাই স্থানীয় কথায় "কুম" নামে আখ্যাত। সাধারণে ইহাকেই (কালু খাঁ) কামানের 'কুম' নামে অভিহিত করে। শুনিয়াছি, কেহ কেহ এই বিংশ শতাব্দীর প্রবল বৈজ্ঞানিক প্রতাপের মধ্যেও রাত্রিকালে ঐ জলাবর্তপৃষ্ঠে কামানের খেলা দেখিয়া ভীষণ ভয় পাইয়াছে। এবংবিধ কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া কোন কোন পাঠকের সমালোচনায় হয়ত গ্রন্থকারও বাতুল পদবাচ্য হইতেছো, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত আস্থা না থাকিলেও দেশের এবং দশের মুখে যাহা জানা যায় -- তাহা লিখিয়া যাইতে বাধ্য।

মঘী ইংরাজী ১৭১৫ খৃঃ অব্দে রাজা জাবুল খাঁ[৮১] কিছু 'কার্পাস কর'[৮২] দিবার বন্দোবস্তে ফরকসাহ এবং মহম্মদ সাহ হইতে জুমিয়াদিগের সহিত নিম্ন-প্রদেশের বেপারীদের বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। এখানে বলিয়া রাখি যে, কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন* — "জামৌল খাঁ প্রায় ১৭১৫ খৃঃ অব্দে মোগল উজির দুমক সাহকে প্রথম কার্পাস-কর দেন। কিন্তু আমরা চট্টগ্রামের শাসনকর্তা দিগের তালিকায় দেখিতে পাই, ১৭১২ খৃঃ অব্দের পর চট্টগ্রামের নবাবী পদ উঠিয়া গিয়া তৎস্থলে নায়েবী পদের সৃষ্টি হয়। মীর এওজি, এয়াছিন খাঁ, অলিকো খাঁ ও মীর্জা বাকর — এই চারিজন নায়েব ১৭১৩-২৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত চট্টল শাসন করেন। সুতরাং উক্ত দুমক সাহ কে? সে যাহা হউক, ফতে খাঁ এবং জল্লাল খাঁর শাসন বিবরণ এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, এই নামদ্বয়ে কিছুতেই বিভিন্ন ব্যক্তির কল্পনা করিতে সাহস হয় না। কেননা ফতে খাঁর মুদ্রায় যখন ১১৩৩ হিজরী খোদিত, তখন নিশ্চিতই ১৭১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় শাসন আরম্ভ হইয়া থাকিবে। আর এদেশে তাঁহার যেরূপ 'নাম ডাক' আছে, তাহাতে কোনরূপে মনে করা যাইতে পারে না যে, এক বৎসরেরও অল্প সময়মধ্যে ফতে খাঁর রাজত্বের অবসান হইয়াছিল, তাহা সম্ভব হইলে এত দীর্ঘকালস্থায়িনী কীর্তি কখনই তিনি লাভ করিতে পারিতেন না। আমাদের বিশ্বাস, চাক্‌মারাজ জল্লাল খাঁ ১১৩৩ হিজরী অর্থাৎ ১০৭৭ মঘিতে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া "ফতে খাঁ" আখ্যা পাইয়াছিলেন, (এই মুদ্রাও সম্পূর্ণ মোগলানুকরণে পারসি বর্ণে ও হিজরী সনে খোদিত) এবং উত্তরকালে তিনি সেই মোগল-দত্ত আখ্যাতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে বিচারভার পাঠকগণের হস্তে। যত দিন যাবৎ এতদ্বিরুদ্ধে কোন প্রবলতর প্রমাণ পাওয়া না যায়, সেই পর্যন্ত এই ধারণাকেই সত্যের আসনে অধিষ্ঠিত রাখা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে আমি বর্তমান রাজা বাহাদুর প্রমুখ অভিজ্ঞ মহোদয়বর্গের নিকট স্বাভিমত উপস্থিত করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই মদীয় মীমাংসা অনুমোদন করিয়াছেন।

*The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein P.-63

রাজা সেরমুস্ত খাঁ

অনন্তর আমরা পুনরায় মাননীয় বোর্ডের পত্রখানি অবলম্বন করিলাম। কারণ, চাক্‌মারাজগণের এই দ্বিতীয় স্তবক আলোচনায় ইহাই সর্বপেক্ষা প্রাচীন — লিখিত উপকরণ। (জল্লাল খাঁর স্বীকৃত) এই কর কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিত দেওয়া হইয়াছিল না। ১০৯৯ মঘী অর্থাৎ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে

(৮১) আবার কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন "জামৌল (Jamaul) খাঁ (The H.T. of Ctg. and the Dewellers therein - p.64)। কিন্তু সমুদয় চাক্‌মা সমাজে তিনি জল্লাল খাঁ নামেই পরিচিত। জাতিগত বিকৃত উচ্চারণে বিদেশীযগণ ভ্রমে পড়িবারই সম্ভবনা, তাই আমরা তাঁহাকে জল্লাল খাঁ নামেই প্রকাশ করিলাম।

(৮২) "কার্পাসকর" অর্থাৎ করস্বরূপ প্রদত্ত কার্পাস। পূর্বকালে বিনিময় ব্যবস্থা এত অধিক ছিল যে, রাজস্ব পর্যন্ত উৎপন্ন ধন দ্বারা প্রদত্ত হইত। অদ্যাপি এই পাহাড়ে বিনিময় ব্যবসা সমধিক চলে। এমনকি কুকিদের অনেকে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে না, তাহারা সমান ওজনে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বদল করিয়া লয়। বেপারীরা দুই টাকা মূল্যের একমণ লবণ দিয়া তৎপরিবর্তে ছয় টাকা মূল্যের একমণ কার্পাস লাভ করিয়া থাকে।

জুমবঙ্গের[৮৩] শাসনকর্তা সেরমুস্ত খাঁ[৮৪] গভর্নমেন্টের কার্পাস-কর প্রদান করিয়া ইহা (অর্থাৎ পূর্ব বন্দোবস্ত) সজীব (Revive) করিয়াছিলেন এবং পৃথক খাজানা দিবার স্বীকারে অতিরিক্ত কুলালা মৌজাস্থ জঙ্গলের বন্দোবস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইংরাজাধিকার আরম্ভ

এই সমুদয় রাজস্ব ১১৩৭ মঘাব্দ[৮৫] ইংরাজী ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিত রূপে পরিশোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১১৩৮ মঘী ইংরাজীর ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন রাজা সের দৌলত খাঁ উভয় খাজনাই বন্ধ করিয়া দেন, এবং রাঙ্গুনিয়া প্রভৃতি স্থানের গোলা (দোকান) লুণ্ঠন করেন, এই কারণে তাঁহাকে আক্রমণের জন্য ১১৩৯ মঘী ইংরাজী ১৭৭৭ সনে এবং ১১৪২ মঘী ইংরাজী ১৭৮০ অব্দে যথাক্রমে মিঃ লেন এবং মিঃ ওটর মারের নেতৃত্বাধীনে দুইবার অভিযান প্রেরিত হয়, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ১১৪৪ মঘী ইংরাজী ১৭৮২ অব্দে সের দৌলত খাঁর পুত্র জানবক্স খাঁ রাজা হইলেন, কিন্তু তিনি প্রাপ্য খাজনার অতি অল্প অংশ মাত্র পরিশোধ করিয়াছিলেন। এস্থলে পুনরায় ঐতিহাসিক-বিভ্রাট উপস্থিত হইল। বোর্ডের উপরোক্ত পত্রাংশের সহিত অপর ঐতিহাসিকের অনৈক্য ঘটিতেছে। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জুমবঙ্গের শাসনকর্তা সেরমুস্ত খাঁ গভর্নমেন্টের কর শোধ এবং নূতন এক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছিলেন*— "Raja Sookdeb Roy A.D. 1737 made settlement with Government" অর্থাৎ রাজা শুকদেব রায় ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া যান নাই। আমরা এই বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য হইতে রেভিনিউ বোর্ডের দলিলকেই অধিকতর মূল্যবান মনে করিতেছি। লুইন মহোদয় সম্ভবতঃ এই বন্দোবস্তের কথা সেরমুস্ত খাঁর স্থলে লিখিতে শুকদেব রায়ের নামে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কেননা উক্ত বিবরণী, এক স্তম্ভে রাজাদের নাম ও অপর স্তম্ভে অনুষ্ঠিত কার্যের কথা লিখিয়া তালিকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

*The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein p.-64

(৮৩) বঙ্গদেশের যে অংশে 'জুম' করা হইত, তাহাকেই 'জুমবঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে এইরূপ "জুমনওয়াবাদের" উল্লেখ পাওয়া যাইবে।

(৮৪) পরন্তু এই সেরমুস্ত খাঁকে ইহাদের অনেকে আদি রাজা বলিয়া মনে করেন। এমনকি মহিয়সী কালিন্দীরানীও মহামুনি মন্দিরের প্রস্তর ফলকে লিখিয়া গিয়াছেন, — "অত্র চট্টগ্রামস্থ পর্বতধিপতি আদৌ রাজা সেরমস্থ খাঁ"। এ সম্বন্ধে একটিগানেও আছে, "আদি রাজা সেরমৎ খাঁ রেগ্রিং ছিল বাড়ী" ইত্যাদি। "সরমৎ খাঁ আদি রাজা, তাঁহার বাড়ী রোয়াং (বর্তমান নাম আরাকান) দেশে ছিল তিনি স্বদেশে -- চম্পক নগরে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন শুনিয়া মঘরাজা কিয়ৎপরিমাণ জায়গীর প্রদান করিলেন।" ইত্যাদি নানা কথা আছে। আমরা তৎসমুদয় উপকাহিনী দূরে ফেলিয়া বোর্ডের পত্রখানিকেই সত্যের আসন দিলাম।

(৮৫) ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধি দ্বারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মীর মহম্মদ কাসেম খাঁর হস্তে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নায়েব-নবাবী প্রদান করিয়া প্রতিদান স্বরূপ বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর প্রদেশ লাভ করেন। সুতরাং সেই সঙ্গে এই ক্ষুদ্র চাকমা রাজ্যও তাঁহাদের অধীন হয়। ইহার অল্পদিন পরে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্শ্ববর্তী স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যও ব্রিটিশের কুক্ষিগত হইয়াছিল।

সুতরাং বন্দোবস্তিখানির কথা মুদ্রাকর প্রমাদে পূর্ববর্তী রাজা সেরমুস্ত খাঁর নামের পার্শ্বে রাখিতে পরবর্তী রাজা শুকদেব রায়ের নামের পার্শ্বে বসানও বিচিত্র নহে।[৮৬]

উপরে রেভেনিউ বোর্ডের পত্রকে বিশ্বস্ত স্থির করা গেল বটে, কিন্তু তাহাতে শুকদেব রায়ের কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয়, তাহাতে তাঁহার নামোল্লেখের কোন প্রয়োজনও ঘটে নাই। লেখা আছে, ১৭৩৭ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৭৫ খৃঃ অঃ পর্যন্ত রাজস্বাদি নিয়মিতরূপে দেওয়া হইয়াছিল। বোধ হয়, ইতোমধ্যে শুকদেব রায়ের রাজত্বও চলিয়া গিয়াছে। তদীয় শাসনকালে রাজস্বঘটিত কোন উচ্ছৃঙ্খলতা বা পরিবর্তন ঘটে নাই বলিয়া বোর্ডের পত্রে কোন উল্লেখ না থাকিবারই কথা। লুইন সাহেবের লেখা ছাড়িয়া দিলেও শুকদেব রায়ের রাজত্ব কখনও অস্বীকার করা যায় না। শিলকতীরে "শুকবিলাস" নামক তদীয় মনোরম পুরীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি কেন, আরও বহুকাল ধরিয়া লোকলোচন আকৃষ্ট করিবে। এতন্নিকটবর্তী "তরফ শুকদেব রায়" ও তাঁহার অমর কীর্তি! চাক্‌মারাজার জমিদারী-মধ্যে এই তরফই নাকি সর্বাপেক্ষা বড়। আর এক প্রমাণ, রাজভাণ্ডার হইতে হস্তগত মুদ্রাগুলির একতম। পার্শ্বে ইহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল। কিন্তু উক্ত নিম্ন-রেখাঙ্কিত স্থল অর্থাৎ "সহায়" এবং "১২১৯" পাঠ দুরূহ; অনুমানে ধরা হইয়াছে মাত্র। তাহাতে 'রায়' এবং '১১১৯' ও পাঠ করা যায়। পরন্তু "শুকদেব সহায়" কোন অর্থগর্ভ নহে, আর "১২১৯" ধরিলে কোন হিসাবে সময় ঠিক করা যায় না। অথচ যদি '১১১৯' ধরা যায়, তাহা মঘাব্দ[৮৭] মনে করিয়া সহজে সিদ্ধান্ত-পথে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। সেই হিসাবে রাজা শুকদেব রায় ১৭৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ইহাতেও যাঁহারা শুকদেব রায়ের রাজত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত নিয়ে—মহামুনি মন্দির-বক্ষে স্থাপিত প্রস্তর ফলকে পুণ্যবতী কালিন্দী রানী যে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে হুবহু তুলিয়া দিলাম — "আদৌ রাজা সেরমস্থ খাঁ তৎপর রাজা শুকদেব রায় অতঃপর রাজা সেরদৌ খাঁ পরে রাজা জানবক্স খাঁ অপরে রাজা টববর খাঁ অনন্তর রাজা জববর খাঁ আর্যপুত্র রাজা ধরম্ বক্স্ব খাঁ তৎ-সহধর্মিনী আমি শ্রীমতী কালিন্দী রানী"।

রাজা শুকদেব রায়

শুকদেব সহায় ১২২৯



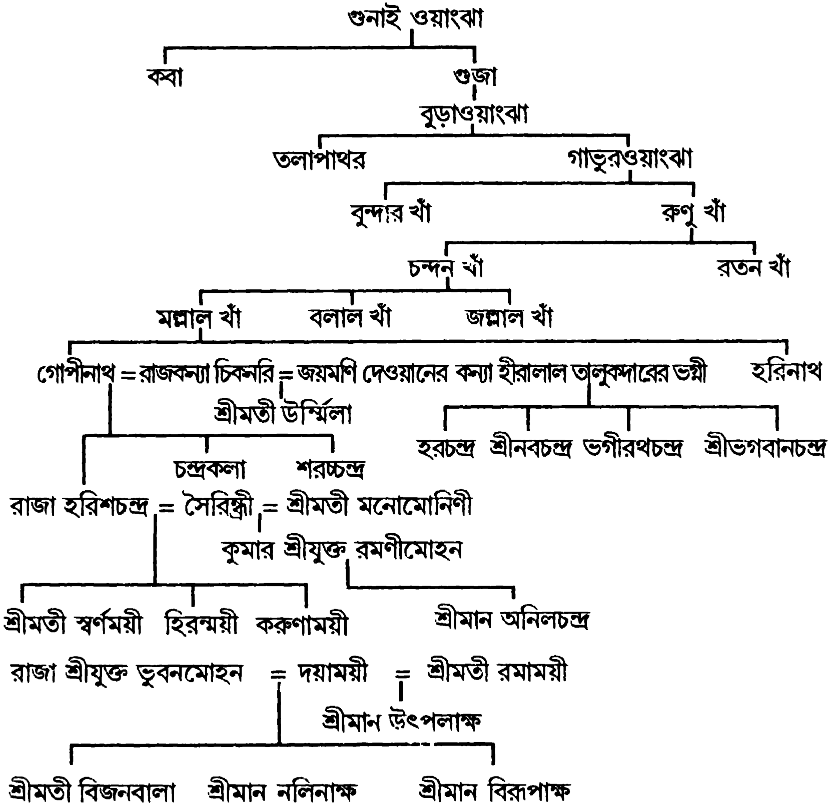
রাজা সেরদৌলত খাঁ

বোর্ডের পত্রখানি পাঠে অনুমান হয়, সেরদৌলত খাঁ, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পূর্বপুরুষ নির্দিষ্ট গভর্নমেন্টের উভয়বিধ রাজস্ব বন্ধ করিয়া দেন। নতুবা হঠাৎ বিদ্রোহী হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। তিনি যে কেবল রাজ-কর বন্ধ করিলেন এমত নহে, পরন্তু রাঙ্গুনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের দোকানপাট লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(৮৬) অথবা তাঁহার সংগৃহীত সংবাদেও ভুল থাকিবে, তাঁহার এরূপ ভ্রমের কথা পূর্বেও আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি, এবং বলিতে কি, ইহাই শেষ ভুল নহে।

(৮৭) এসময়ে চারিদিকে মঘাব্দার প্রাধান্য ছিল। খৃষ্টাব্দের তাড়নায় বর্তমানে ইহা রাজদরবার হইতে নির্বাসিত হইয়া উত্তমর্ণ এবং ব্যবসায়ীদিগের দপ্তরে আশ্রয় লইয়া আছে।

এই কারণে ১৭৭৭ ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে মিঃ লেন এবং মিঃ ওটরমারের নেতৃত্বাধীনে তাঁহার বিরুদ্ধে দুইবার অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, (But to no Purpose) কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। কাপ্তেন লুইনও এই রাজদ্রোহিতা স্বীকার করিয়াছেন। তৎসঙ্গে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, উক্ত অভিযানদ্বয়ে সেরদৌলত খাঁ ভিন্ন তদীয় অন্যতম আত্মায় রণু খাঁও লক্ষ্যীভূত ছিলেন।[৮৮] এই রণু খাঁ বর্তমান রাজাবাহাদুরের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ[৮৯] ও সাধারণের নিকট সেনাপতি বলিয়া পরিচিত। অনেকে কর্ণফুলীর তীরবর্তী নরেরটিলা'য় "রণু খাঁর খেদা"[৯০]র ভগ্নাবশেষ নির্দেশ করিয়া থাকে।[৯১] দৌলত খাঁর পুত্র রাজা জানবক্স খাঁর সময়েও তাঁহার বিস্তর প্রাধান্য ছিল শুনিতে পাই, তিনি রাজা মহোদয়ের ভগ্নীপতি ছিলেন।



(৮৮) Vide - The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein p. 64.

(৮৯) এ স্থলে কুল-লতিকাকারে বর্তমান রাজবংশের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

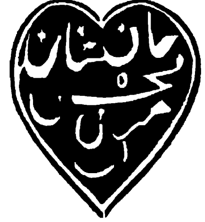
(৯০) "খেদা" হাতী ধরিবার খোঁয়ার বিশেষ। জঙ্গল হইতে হাতীগুলিকে 'খেদাইয়া' অর্থাৎ তাড়াইয়া ইহাতে আবদ্ধ করা হয় বলিয়া "খেদা" আখ্যা হইয়াছে।

(৯১) আমরা রণু খাঁর বংশধর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ানের নিকট হইতে তাঁহার ব্যবহৃত রেসমী কাপড়ের একটি পেন্টুলন পাইয়াছি। তাহার উচ্চতা ৪ ফিট ১/২ ইঞ্চি এবং বেষ্টনী ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি। ইহা হইতে তাঁহার অবয়ব অনুমান করুন।

পূর্বে যে 'পাগলা রাজা'র বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, কেহ কেহ এই সেরদৌলত খাঁকেই "পাগলা রাজা" বলিয়া সন্দেহ করেন। যদিও তাহাদের এবম্বিধ সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তথাপি সাধারণের এই অমূলক ধারণা নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি

ভিত্তিহীন সন্দেহ

বিদ্রোহাচরণ এবং রাঙ্গুনিয়ার ব্যবসায়ীদিগের দোকান লুণ্ঠন প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধে কয়েকটি ঔদ্ধত্যের অভিযোগ আছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে পাগলা-গারদে নিক্ষেপ করা কোন মতেই উচিত নহে। তাঁহার ওকালতি লইলে বলা যায়, তখন তিনি অধীনতা অস্বীকার করিবার কিঞ্চিৎ সামর্থ্যবান ছিলেন, সন্দেহ নাই। বোর্ড নিজেই লিখিয়াছেন, দুই দুইবার অভিযানেও কোন ফল হয় নাই। পক্ষান্তরে রাজ্য-লুণ্ঠনাদি রাজাদিগের সাধারণ ধর্ম, ইহা চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। সেরদৌলত খাঁ কখনই অপুত্রক 'পাগলা রাজা' হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ বোর্ডের পত্রে নিশ্চয়ই সেরদৌলত খাঁর লুণ্ঠনাদি অপরাধের সঙ্গে পাগলা রাজকৃত ভীষণ অত্যাচার কাহিনীরও উল্লেখ থাকিত। আরও একটি কারণে আমরা এই সন্দেহ ভ্রান্তিমূলক — প্রমাণ করিতে পারি। পূর্বে আমরা চাক্‌মাদিগের ক্রমোত্তর গতি দেখাইয়াছি। সেই নিয়মে রাজা শুকদেব রায় আসিয়া রাঙ্গুনিয়ার অনতি "শুকবিলাস" পুরী স্থাপন করেন। যদি পরবর্তী রাজা সেরদৌলত খাঁই কথিত পাগলা রাজা হন, তবে বহু দূরবর্তী দক্ষিণে 'পাগলাবিল', 'পাগলামুড়া' এবং তৈনছড়ী কূলে 'পাগলা রাজার বাড়ীভিটা' কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই রূপ নানা কারণে আমরা এই সন্দেহকে ভিত্তিহীন স্থির করিয়াছি।



"রাজা জানবক্স খাঁ জমিদার"

রাজা জানবক্স খাঁ

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা সেরদৌলত খাঁর পুত্র রাজা জানবক্স খাঁ সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার মোহরে—"রাজা জানবক্স খাঁ জমিদার" খোদিত আছে। তিনি নিজেকে "জমিদার" বলিয়া কেন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অন্য কোন কারণ বুঝিতে পারি না। সার হেনরী কটন মহোদয়ও লিখিয়াছেন* — "প্রাচীন কাগজপত্র সমুদয় জানবক্স খাঁ ও রণু খাঁর বিবরণীতে পরিপূর্ণ। যদিও জানবক্স খাঁ জমিদার বলিয়া কথিত কিন্তু বহুকাল ধরিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।"

*Revenue History Chittagong p.-63

"১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ (পূর্বোক্ত) কার্পাস মহাল খাজনার দফাবিশেষ ছিল।"[৯২] "কার্পাস মহাল বলিতে বুঝায়, যাহাতে পাহাড়জাত কার্পাস কর-ইজরাদার হইতে নগদ টাকায় আদায় হইত। এই ইজারাদার আবার চট্টগ্রামের প্রান্তদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রণু খাঁর সহিত

(৯২) Revenue History of Chittagong. P. 189.

বার্ষিক ৫০১ মণ[৯৩] কার্পাসের চুক্তি করিয়াছিলেন।"[৯৪] সেই সময়ে "চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল মাননীয় গভর্নর জেনেরাল (লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস) বাহাদুরের নিকট লিখেন, রণু খাঁ নামধেয় জনৈক পর্বতবাসী কোম্পানীকে কার্পাসের ব্যবসায়ের নিমিত্ত সামান্য কর দিয়া থাকেন, আমি এখানে আসিয়াছি যাবৎ তিনি করদাতাদিগের মন্দ ব্যবহার বা বিদ্রোহমানসে কয়েক মাস পূর্বে কোম্পানীর ভূম্যাধিকারীদের উপর অকারণ রাজকীয় দাবির বহির্ভূত নানাবিধ শুল্কভার চাপাইয়া অতিশয় অত্যাচার করিয়াছেন। অনেকে তাঁহাকে (কথিত রণু খাঁকে) ধরিবার জন্য নানা আশ্বাসে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পারা যায় নাই। কেননা রণু খাঁ স্বীয় বাসস্থান হইতে পলায়ন করেন। অনন্তর তিনি দ্বিতীয় পত্রে জানাইয়াছিলেন, 'রণু খাঁ বর্তমানে অধিকতর সৈন্য একত্রিত করিয়াছিলেন এবং অন্তস্তলবাসী আগ্নেয়াস্ত্রে অনভিজ্ঞ[৯৫] উলঙ্গ কুকিগণকে অধিক সংখ্যায় সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছেন।' ইহার পর রণু খাঁর তাদৃশী অবাধ্যতায় যাবতীয় আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পাহাড়ীগণকে ইংরাজাধিকৃত চট্টগ্রামের হাটে বাজারে আসিতে দেওয়া হইত না। ফলতঃ ইহাতেই কৃতকার্য হওয়া গিয়াছিল, অতঃপর তাঁহার (রেণু খাঁ) সম্বন্ধে কোন কথা শুনা যায় নাই।"[৯৬] "কিন্তু এই বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ সময়ে ইজারাদার স্বীয় নির্ধারিতরাজস্ব চট্টগ্রামের কোষাগারে (Treasury) খুব ক্বচিৎ দিয়াছেন।"[৯৭]

চট্টগ্রামের শাসন কর্তার পত্র

এখানে রণু খাঁ নামেই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইল। বস্তুতঃ রণু খাঁ, রাজা জানবক্স খাঁর প্রধান দেওয়ান এবং সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার হাত দিয়া সমুদয় কার্য হইত বলিয়া দোষভারও তদীয় স্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা বর্তমানেও বিরল নহে। গভর্নর জেনারেল বা লেপ্টেনান্ট গভর্নর যে সকল আদেশ করেন, সাধারণতঃ তৎসমুদয় তাঁহাদের চিফ্ সেক্রেটারীর নামে প্রচারিত হয়। কিন্তু অনেকস্থলে

জানবক্স খাঁ ও রণু খাঁ

(৯৩) কিন্তু বোর্ডের পত্রে আছে, "দেখা যায়, ৫০০ মণ কার্পাস কর স্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহা ইজারাদারকে দেওয়া হইত, তিনি তৎপরিবর্তে গভর্নমেন্টকে নগদ টাকা দিতেন"। আবার কাপ্তেন লুইন বলেন, "১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের কার্পাস পরিমাণ কমিয়া ৫০০ মণ ধার্য হইয়াছিল"। (The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, p. 64)। কটন মহোদয়ের মন্তব্য এবং বোর্ডের পত্রে একমণের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস - "শূন্য সর্বথা পরিত্যজ্য" সংস্কারে রাজস্ব ৫০০ মণ কার্পাস নির্ধারিত থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে ৫০১ মণ দেওয়ার রীতি ছিল। গভর্নমেন্ট যাহা পাইয়াছেন, বোর্ড তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। আর কাপ্তেন লুইনও অনুমানে তাহাতে সায় দিয়া থাকিবেন।

(৯৪) Revenue History of Chittagong, p. 20.

(৯৫) কুকিগণ তখনও বন্দুকের ব্যবহার জানিত না, সুতরাং কোন লোক চালের উপর উঠিতে পারিলেও তাহাদের হাত হইতে কোন রূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিত।

(৯৬) See - The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein - p. 21 and A Statistical Account of Bengal. Vol. VI, p-18. পরন্তু তারকবাবু এই সকল ঘটনার সংবাদ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল একবার এই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠে, লুসাই সর্দার রামু খাঁ নিকটস্থ গ্রামসমূহে নানারূপে উৎপাত করিয়াছিল। ভারতের তদানীন্তন গভর্নর হেষ্টিং সাহেব যাইয়া তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু অল্পে সে উপদ্রব প্রশমিত হইল।"

(৯৭) Revenue History of Chittagong, p. 18.

সেক্রেটারী মহাশয়েরাই দোষের ভাগী হইয়া থাকেন। বোর্ডের পত্রেও উপরিউক্ত কথার কিয়দংশ আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে আছে, "রাঙ্গুনিয়া পরগণাবাসী জানবক্স খাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে[৯৮] ইজারাদারের অনেক খাজনা বাকী পড়িয়া যায়। তন্নিমিত্ত ১৭৮৩, ১৭৮৪ এবং ১৭৮৫ এই তিন বৎসরের রাজস্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং দেশের শান্তি রক্ষার জন্য এসময়ে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়।" "তখন জানবক্স খাঁ (মহাপ্রুং) দুর্গে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু অধীনে আনিয়াছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ঘটে।"[৯৯] "১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জানবক্স খাঁ প্রেসিডেন্সিতে গভর্নর জেনারেলের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন[১০০] এবং তদীয় পার্বত্যপ্রদেশে শান্তি রক্ষা করিবেন স্বীকারে পূর্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।"[১০১] কিন্তু তখনও কোন বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। "এমনকি, যাঁহার প্রতাপে জানবক্স খাঁ (ইংরাজের) বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, (চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্তা) সেই মিঃ হরুইনও তাঁহার নিকট হইতে কোন বন্দোবস্ত আদায় করিতে পারেন নাই।"

ইজারাদার প্রথাচ্ছেদ

"১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মেই বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রধানকর্তা মিঃ হারিস (Mr. Harris) রেভেনিউ বোর্ডকে অনুরোধ করেন যে 'চুক্তি (ইজারা) দারের হস্তে পার্বত্য প্রদেশীয় কার্পাসের একচেটিয়া বাণিজ্য প্রথা রহিত করা হউক, এবং এই বন্দোবস্ত একেবারে জুমিয়া বা জমিদারগণের সহিত হওয়া উচিত। কেননা তাহাদের স্বভাব ভাল এবং বাসস্থান নির্দিষ্ট (?)। যেখানে তাহারা পুরুষানুক্রমে থাকে, তাহাতে কিছু দাবীও আছে।' তিনি আরও বলেন, "প্রত্যেক প্রদেশ স্মরণাতীত কাল হইতে লোকসংখ্যানুসারে কার্পাস করের পরিমাণ লইয়া গঠিত হইত। জুমিয়া অর্থাৎ রায়তগণ কর্ষিত ভূমির বিস্তৃতি হিসাবে খাজনা দিত না, সেই কর পরিবার হিসাবে প্রত্যেক পরিবারে যত অধিক ব্যক্তি বিবাহিত

(৯৮) কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন, "রাজা (জানবক্স খাঁ) প্রজার উপর সবিশেষ অত্যাচার করিতেছিলেন। সেই হেতু অনেকে আরাকান পলাইয়া যায়।" (The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein p. 64)

(৯৯) Revenue History of Chittagong - P. 189.
কিন্তু "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত"কার তারকবাবু লিখিয়াছেন (৭৬ পৃষ্ঠা), "খৃষ্টীয় শতাব্দীর ১৭৪৮। জানবক্স নামে এক ব্যক্তি চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে উৎপাত আরম্ভ করিতেছিল। কর্তৃপক্ষের আদেশ মতে জেলার কালেক্টর তাহাকে দেশ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন।" তাঁহার এই সন নির্দেশ কিছুতেই যে ঠিক নহে, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। তদ্বিষয়ক দুচারিটি প্রমাণ উপরেই দেওয়া গেল। বোধ হয় ৮৪ স্থলেই ৪৮ হইয়াছে।

(১০০) কিংবদন্তী আছে, যে সময়ে জানবক্স খাঁ পলায়ন করেন, তাঁহার সঙ্গে প্রজারাও পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন একজন গর্ভবতী রমণী শারীরিক ক্লেশভার বহন করিতে না পারিয়া রাজাকে স্বগত গালি দিতেছিল। দৈবযোগে জানবক্স খাঁ তাহা স্বকর্ণে শুনিতে পান, ইহাতে তাঁহার মনে এমনি আঘাত লাগে যে, তিনি আর যুদ্ধ না করিয়া ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং কলিকাতায় গিয়া বড়লাট সাহেবের নিকট উক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(১০১) A letter of the Board of Revenue.

থাকে, তাহাঁদের খাজনা নির্দ্ধারিত হইবে, বিবাহের পূর্বে রাজস্বের দাওয়া চলিবে না। এই প্রস্তাবমতে ১৫ই জুন গভর্নমেন্ট আদেশ করেন যে, পার্বত্য কার্পাসের ইজারাদারের প্রথা রহিত হইবে এবং কালেক্টর কার্পাসের কর উঠাইয়া দিয়া জুমিয়া বা জমিদারদিগের সহিত পরিমিত (তঙ্কায়) জমা ধার্য করিবেন। তিনি সেই সঙ্গে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন যে, যদি তাহারা ঐ রাজস্ব নিয়মিতরূপে চালায় তবে তাহা আর বৃদ্ধি করা যাইবে না।"(১০২) অতঃপর এদেশে অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত হয়। কিন্তু "১৫ই সেপ্টেম্বর কালেক্টর এই ইজারাদার প্রথা রদ করিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া পাঠান এবং ৯ই ডিসেম্বর পুনরায় এ সম্বন্ধে গভর্নমেন্টে লেখালেখি করেন। অবশেষে মীমাংসিত হইল যে, পাহাড়ীদের নিকট হইতে কর স্বরূপ কার্পাস আদায় করিবার নিমিত্ত গভর্নমেন্টপক্ষ হইতে জনৈক কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন, তিনি পরে সংগৃহীত কার্পাস প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিবে।"(১০৩)

রাজস্বে তঙ্কা প্রবর্তন

১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর কালেক্টর, জানবক্স খাঁর অধিকারভুক্ত পার্বত্য প্রজাগণের উপর ভূমির রাজস্বের ন্যায় কর প্রবর্তিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন, বোর্ড ১৭৯১ ইংরাজীর ৯ই ফেব্রুয়ারী অনুমতি দেন যে, জানবক্স খাঁ এযাবৎ যে কার্পাস-কর প্রদান করিতেন, তৎপরিবর্তে তাঁহার উপর পরিমিত তঙ্কায় নির্ধারিত হউক এবং অপরাপর সর্দারগণ কার্পাসের বিনিময়ে তঙ্কায় রাজস্ব খাজনা দিতে স্বীকার না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের নিকট হইতে কার্পাসই গৃহীত হইবে, তাহা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।"(১০৪)

বন্দোবস্ত

"১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই কালেক্টর জানাইয়াছিলেন, বাঙ্গলা ১১৯৭ এবং ১১৯৮ সনের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং এই প্রথম দুই বৎসর দশশালা বন্দোবস্তির অন্তর্নিবিষ্ট করা গিয়াছিল, এ সকল বন্দোবস্তে জানবক্স খাঁর উপর ১৮১৫ টাকা কর নির্ধারিত হয়।"(১০৫)

"১১৯৮ সনের নিমিত্ত জুমিয়ারা যে কর দিতে সম্মত হইয়াছিল, দশশালা বন্দোবস্তির অবশিষ্ট সময়ের জন্য সেই খাজনাই স্থির থাকিতে বোর্ড ও গভর্নমেন্ট আদেশ করেন। এবং এই সঙ্গে ইহাও বলা ছিল যে, জুমিয়াগণের আবাদ বিস্তারে মোট জমা কোনরূপে বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা ঘটিলে, যেন বোর্ডকে জ্ঞাপন করা হয়।"(১০৬)

(১০২) Revenue History of Chittagong. P. 189.

(১০৩) A letter of the Board of Revenue আবার 'Chittagong Gazetteer' এ দেখিতে পাই, এসমুদয় কার্পাস ঢাকার ফ্যাক্টরিতে চালান যাইত।

(১০৪) A letter of the Board of Revenue.

(১০৫) Revenue History of Chittagong. P. 190.

(১০৬) বাদসাহী আমলের রৌপ্য তঙ্কা সিক্কাটাকা নামে প্রথিত। ইহা ওজনে আঠার আনা, সুতরাং মূল্যও অপেক্ষাকৃত অধিক।

"বাঙ্গালা ১১৯৯ হইতে ১২০৬ সন পর্যন্ত (অর্থাৎ দশশালা বন্দোবস্তির অবশিষ্ট আট বৎসর) কেবল "জুমবঙ্গ" মাত্র জানবক্স খাঁর নামে বার্ষিক ১৭৫৫ সিক্কাটাকা জমায় বন্দোবস্ত ছিল এবং অপরাপর জুমমহলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে বিভিন্ন জমায় নির্দিষ্ট ছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ যাবৎ এই জুম বঙ্গের জমার কোন পরিবর্তন হয় নাই। সেই সনে উত্তরাধিকারী সূত্রে রাজা ধরমবক্সের হস্তে উক্ত জুমবঙ্গ রাজ্যভার অর্পিত হয়।" ইহাও বোর্ডের সেই পত্রাংশ। রাজা জানবক্স খাঁ এবং রাজা ধরমবক্স খাঁর মধ্যে আরও দুইজন রাজা শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই পত্রে রাজা শুকদেব রায়ের নামের ন্যায় তাঁহাদেরও উল্লেখ নাই। তাহাদের সময়ে রাজস্বঘটিত কোন গোলযোগ ঘটে নাই বলিয়া রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে বিশেষভাবে নামোল্লেখ না থাকিবার কথা — সম্পূর্ণ পত্র পাঠেও ইহা সহজে প্রতীতি হয় আমরা পূর্বেও একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, রাজা জানবক্স খাঁ রাঙ্গনিয়ার রাজবাড়ী স্থানান্তরিত করেন এবং রাজানগর গ্রামও তাঁহা দ্বারা গঠিত হইয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া তিনি যদি অপর কোনও সৎকার্য করিয়া থাকেন, দুরন্ত কাল সেই গৌরব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার করাল কবলে এইরূপে কত যে মহীয়সী কীর্তিলহরী বিলীন হইয়াছে ও হইতেছে, কে তাহার সন্ধান লয়?

দেখা যায় ১২০৬ বাঙ্গলা—ইংরাজী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ যাবৎ জুমবঙ্গের বন্দোবস্তি রাজা জানবক্স খাঁর নামেই চলিয়াছিল, সুতরাং এই সময় পর্যন্ত তদীয় শাসন এবং এই বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। অপর কোনরূপেও ইহা অবধারিত করিবার উপায় নাই।

রাজা টব্বর খাঁ

জানবক্স খাঁর তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনান্তে যুবরাজ টবর খাঁ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। রাজানগরের রাজবাড়ীর সম্মুখীন সুবৃহৎ "রাজার দীঘি" ইহারই খোদিত বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু টবর খাঁর ভাগ্যে অধিক দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই, অল্প দিন, খুব বিশ্বাস দুই বৎসরও অতীত না হইতেই তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অনন্তর দ্বিতীয় ভ্রাতা জবর খাঁর হস্তে রাজ্যভার পতিত হয়। তাঁহার মোহরে আমরা

রাজা জব্বর খাঁ

যেসকল সংবাদ পাই, তাহাতে তদীয় রাজত্ব বিবরণ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহার বাঙ্গলা এই —



"শ্রীশ্রীজয়কালী জয় নারায়ণ
জব্বর খাঁ ১১৬৩।"

সুতরাং ১১৬৩ মঘাব্দ অর্থাৎ ১৮০১-০২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে, মোহরমধ্যেও "শ্রীশ্রীজয়কালী জয়নারায়ণ" নাম শীর্ষোপরি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ কোন্ সময় হইতে যে ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হয়, তাহা জানিতে পারা যায় না। রাজা শুকদেব রায়ের নামটিতে হিন্দুত্বের গন্ধ পাওয়া

যায় বটে, কিন্তু পূর্ববর্তী আর কোন রাজার নিকটে বোধ হয় হিন্দু দেবদেবী এত উচ্চতম সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। রাজা জব্বর খাঁ এই যে বীজ রোপণ করিয়া যান, কালে তাহা হইতে বৃক্ষোদ্গম হইয়া শাখা পল্লববান হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে আবার বৌদ্ধ-ধর্মবাত্যায় বিগতশ্রী-শুষ্ক কাণ্ডমাত্র অধুনা অবশিষ্ট আছে! যাহা হউক, তিনি যে সমুদয় সৎকার্য করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজানগরের ভবন পার্শ্বে স্থাপিত "রাজার হাট"ই তাঁহার অক্ষয় কীর্তিপীঠ।

রাজা জব্বর খাঁ দশবর্ষাধিক কাল রাজ্য শাসন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠাধিকার বিধান (Law of Priomgeniture) মতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডোলপেজ সুরসুরী জীবিত থাকিতেও জব্বর খাঁর পুত্র ধরমবক্স খাঁ[(১০৭)] ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্বোক্ত বোর্ডের পত্রে আছে, — "তিনি স্বেচ্ছাক্রমেই জুমবঙ্গ ও জুমনওয়াবাদের রাজস্ব ৭০০ টাকা অধিক দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে

রাজা ধরমবক্স খাঁ

এপ্রিল বোর্ড ধরমবক্স খাঁর সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিতে স্বীকার করেন এবং আরও প্রকাশ করেন যে, এই বন্দোবস্ত কখনও কার্পাস মহালের করবৃদ্ধি মানসে হইতেছে না, মাত্র পূর্বতন ভূম্যধিকারীদিগের সঙ্গে যে জমায় চলিয়াছিল, এখনও তাহাই থাকিবে। এই করারে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ২৭০৫ টাকা জমায় দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্তি স্থাপিত হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অতিরিক্ত ৭০০ টাকা হ্রাস হইয়া পুনরায় ২০০৫ টাকা জমা স্থিরীকৃত হইয়াছিল।"

রাজা ধরমবক্স খাঁর সময় হইতে উঁহাদের সম্বন্ধে নানা বিবরণ অদ্যাপি সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও তৎকালীন লোক জীবিত আছেন, তাঁহাদের প্রমুখাৎ আমরা অনেক তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। রাজা প্রায়শঃ রাঙামাটি বাস করিতেন বটে, কিন্তু রাজানগরেই তাঁহার প্রধান বাসস্থান নিরূপিত ছিল। তিনি রাঙামাটির নিকটবর্তী বহুবিস্তীর্ণ সমতলভূমি আবাদ করিয়াছিলেন. তাহা "ধর্মখিল" নামে প্রথিত হইতেছে। আবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্গুনিয়া হইতে বিশেষ সাহায্যদানে অনেক ঘর মুসলমান আনাইয়া তথায় বসবাস করাইয়াছিলেন; তাহাদের বংশধরগণ বর্তমানে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্বাহ করিতেছে। বস্তুতঃ রাজা ধরমবক্স খাঁর সুশাসনে প্রজাবৃন্দ যথেষ্ট সুখভোগ করিয়াছে। তিনি একাধারে তেজ ও ক্ষমার আকর ছিলেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তদীয় শাসনকাল আরও বহুকাল ধরিয়া সাধারণের স্মৃতি অধিকার

প্রজারঞ্জন

করিয়া রখিবে। তাঁহার সময়ে পূর্বাঞ্চলের অসভ্য কুকিদিগেরও কোন উপদ্রব-সংবাদ পাওয়া যায় নাই, অথচ তৎপূর্বে ও পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস তাহাদের অত্যাচার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। প্রজাগণ তাঁহাকে "মহারাজা" আখ্যায় গৌরবান্বিত করিয়াছিল।

(১০৭) সকলে তাঁহাকে "আঠার মাস্যা ধরমবক্স" বলিয়াই জানে। কেননা তিনি নাকি পিতৃ বিয়োগের ১৮ মাস পরে ভূমিষ্ঠ হন ... এই সুদীর্ঘকাল মাতৃগর্ভেই ছিলেন। এইরূপ সন্দিগ্ধজন্মা ব্যক্তিদ্বারা রাজসিংহাসন এবং জাতিতে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে—আশঙ্কায় বা পিতৃব্য ডোলপেটা সুরসুরির স্বার্থসাধনোদ্দেশে তৈন্যাগোছার অন্যতম নেতা ধরমবক্সকে একদা কৌশলে বলি দিতে গভীর অরণ্যে লইয়া যায়। রাজপক্ষীয়েরা সন্ধান পাইয়া ইংরাজ পক্ষের বরকন্দাজের সাহায্যে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন।

কাপ্তেন লুইনের কথায় পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, '১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মূল চাক্‌মাজাতির অন্যতম শাখার প্রায় ৪০০০ টংচঙ্গ্যা এদেশে আসিয়াছিলেন। রাজা ধরমবক্স তাহাদের একতমকে সর্দার বলিয়া অস্বীকার করায় অধিকাংশ পুনরায় আরাকানে প্রত্যাবর্তন করে। ইহাতে অবশ্য রাজা ধরমবক্সের প্রতি চঙ্গ্যা প্রজাদিগের অসন্তোষ জ্ঞাপিত হয়, কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিতেছি, টংচঙ্গ্যা প্রজারা তাঁহার প্রতি এতাদৃশ অনুরক্ত ছিল যে, চট্টগ্রাম শহরে উপযুক্ত বাসস্থান অভাবে রাজার থাকিবার অসুবিধা ঘটে দেখিয়া তাহারা চাঁদদ্বারা বর্তমান "রাজকুঠি"(১০৮) খানি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং কি ইহাতেও রাজা ধরমবক্সের প্রতি টংচঙ্গ্যাদিগের অসন্তোষ বিশ্বাস করা যায়?

টংচঙ্গ্যা প্রজা

হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহারও সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এমনকি, তিনি পিতার অনুকরণে মোহরেও খোদাইয়াছিলেন, —

"জয় কালী সহায়
ধরমবক্স খাঁ।"



তাঁহার সময়ে হিন্দুধর্ম সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তিনি যাবতীয় হিন্দুপর্ব পালন করিতেন এবং বাড়ীতে প্রতিদিন হিন্দুদেবদেবীর পূজার্চনা হইত। রাঙামাটির রাজপুরীতেও মহা আড়ম্বরে এক জয়কালী স্থাপন করিয়াছিলেন। দৈনিক কালী পূজার নিমিত্ত যথাবিহিত ব্রাহ্মণ নিয়োজিত ছিল। কথিত আছে, তাঁহাকে মন্ত্র দিয়া স্বর্গত রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য(১০৯) মহোদয়ও "মহারাজ" উপাধি লাভ করেন, তদবধি তাঁহার বংশধরগণও "মহারাজ ভট্টাচার্য" অখ্যায় বিখ্যাত। বস্তুতঃ চট্টগ্রামে এই ব্রাহ্মণবংশ সবিশেষ সম্মানিত। রাজা গুরুদেবকে(১১০) ৭৪ নম্বর লাট উল্লেখে ৫৮২ দ্রোণ

ধর্মাভাব

(১০৮) ইহা সুবৃহৎ এবং গঠন প্রণালী অতিশয় মনোমোহকর। এই শহরে তাদৃশ সুরম্য প্রাসাদ আর নাই। কিছুকাল হইতে তথায় বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর বাস করিয়া থাকেন। চাক্‌মারাজ তজ্জন্য মাসিক দেড়শত টাকা করিয়া ভাড়া পান।

(১০৯) এই মহারাজ রত্নেশ্বর ভট্টাচার্যই (চট্টগ্রাম) ধলঘাটের কানুন গোয়দের বাড়ীতে জনৈক শিষ্যের কালীপূজা অতি অল্প সময়ে সমাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, তৎকর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মর্মাহত হইয়া কালীর বুকে দায়ের আঘাত করেন, তাহাতে সেই বিদীর্ণ মৃন্ময় বক্ষ হইতে অবিরল ধারায় শোণিত বহির্গত হইতে থাকে। তখন উক্ত শিষ্য সপরিবারে তদীয় চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। অতঃপর চট্টগ্রামের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১১০) বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, — চট্টগ্রামে বাসকালীন একদা চাক্‌মারাজ একাকী (চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী) ভ্রমণ-ছলে আপন জমিদারী পরিদর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু অমনোযোগিতায় কিছু অধিকদূর আসিয়া পড়েন। এহেন সময়ে হঠাৎ তাঁহাকে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে আক্রমণ করে। তথায় এই দৈবদুর্বিপাক হইতে মস্তক রক্ষা করিবারও উপযুক্ত আশ্রয় নিকটে ছিল না। মহাবিপদে পড়িয়া তিনি ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিলেন। এই রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য দূর হইতে ইহা অবলোকন করিয়া স্বীয় পর্ণছত্র মহারাজকে প্রদান করিলেন। তাঁহার এতাদৃশ ত্যাগস্বীকারে অত্যধিক পরিতুষ্ট হইয়া চাক্‌মারাজ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিকটবর্তী উচ্চস্তূপে আরোহণ করতঃ চতুর্দিকে যতদূর দেখা যায়, তৎসমস্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজদরবারেও তাঁহার প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহাতে মহারাজ আরও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "মহারাজ ভট্টাচার্য" উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি হইতে তাহা বংশগত হইয়া পড়িয়াছে।

(প্রায় ১৯১০০ বিঘা) ২৭৪০৬ নম্বর তালুকে রাধাকৃষ্ণ-নয়াবাদ-ভূমি দান করিয়াছিলেন। তদীয় বংশধরেরা অদ্যাপি সেই ব্রহ্মোত্তর মাত্র ৪৪ টাকা রাজস্বে ভোগদখলকার ও মালগুজার আছেন। ইহা ছাড়া. রাজা ধরমবক্স খাঁর সময়ে রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের খুব যাতায়াত ছিল, এখানে তাহাদের বিলক্ষণ দু'পয়সা প্রণামীও জুটিত এবং রাজদরবারে হিন্দুজ্যোতির্বিদগণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, রাজা প্রায় কার্যেই তাহাদের সহিত গ্রহনক্ষত্রের ফলাফল আলোচনা করিতেন।

সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার কিছুকাল পরে রাজা ধরমবক্স একদা সৈন্যসামন্তাদি সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহির্গত হন। বহুদূর কণ্টকাকীর্ণ শিলময় পথ-পর্যটনে রাজা অতিশয় পিপাসাকাতর হইয়া পড়িলেন, জলান্বেষণে চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল। একজন আসিয়া জানাইল যে, কিয়দ্দূরান্তরে শৈলশৃঙ্গোপরি (কুলাকুট্যা গোছার) গুজাং চাক্‌মার

অপূর্বমিলন[১১১]

আবাস আছে। রাজা সেখানে বিশ্রাম লাভাশায় চলিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন. বৃদ্ধ গুজাং সধর্ম্মিনীর সহিত জুমক্ষেত্রে বীজ বপন করিতেছেন। আচম্বিতে তাহার আলয়ে মহারাজের পদার্পণ দেখিয়া দম্পতি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞানে হর্ষপুলকিত এবং ভক্তিবিনয়াবনত হৃদয়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিলেন। অধিকন্তু তাহাদের পর্ণকুটিরশোভিনী অপরূপ সুষমাময়ী মৃগাক্ষিণী দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যারত্নের সৌন্দর্য-সুধা মহারাজার শ্রমকাতর প্রাণে অধিকতর প্রীতিদান করিয়াছিল। তদীয় সুকোমল করকিসলয়বাহিত মৃন্ময় ঝারিপূর্ণ সুশীতল বারিপানে তাঁহার পিপাসার শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অনিমেষ লোচনে সুন্দরীর চঞ্চল নয়নোপরি দৃষ্টি যোজনা করিয়া রহিলেন! তাহাতে কিশোরী মহারাজের চিত্ত-চাঞ্চল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইষদাস্য-আস্যে মস্তক অবনত করিলেন। এদিকে সূর্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিতেছেন দেখিয়া, বিহঙ্গমকুল নানাতানে সঙ্গীত ধরিয়া কুলায়াভিমুখে ছুটিল, সহচরগণ দিবাবসান সংবাদ জ্ঞাপন করিলে হঠাৎ মহারাজার চৈতন্যোদয় হইল। অনন্তর তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বাড়ীতে আসিয়াও মহারাজ সেই সুন্দরী-মূর্তি-চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দর্শনাভিলাভেই মনোদূত অনুক্ষণ ঘুরিতে লাগিল, রাজকার্যে আর যথারূপ দৃষ্টি রহিল না। পরে আর মনোবেদনা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, একদিন প্রিয়তম বয়স্যের নিকটে হৃদয়কপাট উদ্‌ঘাটিত করিলেন। তিনি অপরাপর পাত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কাঁটাছরী হইতে প্রাগুক্ত গুজাং চাকমাকে সপরিবারে রাজবাড়ীতে আনাইলেন। গুজাং দেওয়ান পদবী লাভ করিলেন, তাহাদের যাবতীয় দুঃখ নিরাকৃত হইল। বলা, বাহুল্য দুহিতারত্ন কালাবিবিকে কালিন্দীরানী নাম দিয়া মহারাজ পাটেশ্বরী করিলেন। এরূপে কিছুকাল গত হইলে কালিন্দীর গর্ভে কোন সন্তানাদি জন্মিতেছে না দেখিয়া, রাজা তদীয় জ্ঞাতিভগিনী আটকবিবিকে[১১২] বিবাহ করেন। তিনি

(১১১) এই সমুদয় বিবরণী রাজ সরকারের ভূতপূর্ব কর্মচারী বেতাগী (চট্টগ্রাম) নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকমল দাস মহোদয় সঙ্কলিত হস্তলিখিত কাহিনী হইতে গ্রহণ করিলাম।

(১১২) কেহ কেহ ইহাকে আতপবিবি নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

সাধারণের নিকট "মধ্যমাঠাকুরাণী" আখ্যায় পরিচিতা ছিলেন। এই "কুরাকুট্যা গোছার" দৌলত খাঁর বাড়ীতেও মহারাজার প্রায়শঃ যাতায়াত ছিল। ক্রমে তিনি দৌলতের কন্যা হারিবিবির সহিত প্রণয়াবদ্ধ হইয়া পড়েন। অবশেষে তাঁহাকেও বিবাহ করিয়া "ছোটরানী" করিলেন কিন্তু এসকল সপত্নী-সহবাসেও কালিন্দী রানীর প্রতি মহারাজার ভালবাসার তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। তিনি নিরন্তর কালিন্দীর প্রেমপ্রবাহে মগ্ন থাকিতেন। অতঃপর বড়রানীর গর্ভচিহ্ন দেখা গেল। তিনি যথাকালে এক সুলক্ষণ তনয় প্রসব করিলেন। অদৃষ্ট বিড়ম্বনা — দুরন্ত কৃতান্ত অকালে রাজপরিবারের স্নেহনিধিকে অপহরণ করিল, কালিন্দী রানীর সন্তানভাগ্য এইখানেই পর্যবসিত হইল। পরে কনিষ্ঠা রানী হারিবিবির এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল মেনকা ওরফে চিকণবিবি। অনন্তর কয়েক বৎসর পরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে(১১৩) বাঙ্গলা ১২৩৯ সালের আষাঢ় মাসে মহারাজ ধরমবক্স সকলকে অসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া রাঙামাটি রাজপ্রাসাদ হইতে লোকান্তর গমন করেন।

বিবাহ

সন্তানলাভ

লোকান্তর

ধরমবক্স খাঁর মৃত্যুর পর দেশে অরাজকতা পড়িয়া গেল। অগত্যা "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস" হারিবিবির অবিবাহিতা তনয়া চিকণ বিবির অভিভাবক স্বরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কন্যাই সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হওয়াতে হারিবিবি অতিশয় অহঙ্কার করিয়াছিল, তিনি বড় রানীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এমনকি তাঁহার মতমাত্রও জিজ্ঞাসা না করিয়া ওয়াংঝাগোছা-কাঁকড়া গোষ্ঠীসম্ভূত পূর্বকথিত রণুখাঁর প্রপৌত্র গোপীনাথ দেওয়ানের সহিত হারিবিবি স্বীয় কন্যা চিকণবিবির বিবাহ দিলেন এবং রাজনগরের নিকটবর্তী সোনাইছরী গ্রামে ভিন্ন বাড়ী নির্মাণ করাইয়া কন্যা ও জামাতার সহিত কালিন্দী রানী হইতে পৃথক্‌ভাবে বাস করিতে লাগিলেন আর এদিকে পতিবিরহ বিধুরা বড়রানী সপত্নী বিদ্বেষবহ্নিতে দিন দিন জ্বলিয়া পুড়িয়া অহর্নিশ দয়ারসাগর ভগবানকে স্মরণ করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন!

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস

অবশেষে যখন বিপক্ষের আক্রমণ অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন কালিন্দী গভর্নমেন্ট সমীপে পরলোকগত স্বামীর রাজত্ব-শাসনভার পাইবার প্রার্থনা করেন। তাহাতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট ইহার মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত, ধরমবক্স খাঁরই সগোছা এবং সগোত্রজ বর্তমান রাজচন্দ্র দেওয়ান প্রভৃতির জ্যেষ্ঠতাত শুকলালখাঁকে বার্ষিক ২৪২১৺১ পাই জমা দিবার স্বীকারে পার্বত্য প্রদেশের "সরবরাহকারিত্ব" প্রদান করেন। ইহাও আদেশ ছিল যে, সরবরাহকার প্রাণপণ চেষ্টায় যাহয় কিছু অতিরিক্ত সংগ্রহ করিতে পারিলেও,

শুকলাল খাঁ

(১১৩) কিন্তু কাপ্তেন লুইন এস্থলে ভীষণ ভুল করিয়াছেন। 'The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein" নামক পুস্তকে রাজা ধরমবক্স খাঁর মৃত্যুকাল ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ লিখিয়া গিয়াছেন (See P. 64)। তাহা পাঠে বর্তমান গ্রন্থাকারও ভ্রমে পড়িয়াছিলেন, পরিশেষে অনেকানেক কাগজপত্র দৃষ্টে সংশোধিত হইয়াছে।

তাহা কালেক্টারিতে দাখিল করিতে হইবে। এই বন্দোবস্ত মাত্র ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ যাবৎ চলিয়াছিল। চট্টগ্রামের জমিদারীভার সীতাকুণ্ডথানার অন্তঃপাতী কাটগরনিবাসী আমানত আলী নামক জনৈক মুসলমানের হস্তে সমর্পিত ছিল। আর পার্বত্য প্রদেশের শাসনকার্য যে দুই ব্যসর কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হস্তে ছিল, তাহাতে কোন প্রকার নূতন পরিবর্তন হয় নাই, সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য নির্বাহিত হইয়াছিল। পরে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কালিন্দী রানী বার্ষিক ২৫৮৩।।২ পাই জমায় ইজারা গ্রহণ করেন।

"১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রানী এই ইজারা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ইহা সরকার বাহাদুরের খাসেই শাসিত হইয়াছিল। পরে পুনরায় রানীর সহিত দুই বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত হয়। পরিশেষে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট কালিন্দী রানীকে মৃত স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির সরবরাহকারিনী সাব্যস্ত করেন।" পরন্তু বলা থাকে যে, তাঁহাকে ইতোমধ্যে জাত হরিশ্চন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র নামক

Commissioners Letter no. 988, dt. 10.12.1873

রানী কালিন্দী

চিকণবিবির নাবালক পুত্রদ্বয়ের(১১৪) উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং হারিবিবি, আটকবিবি, চিকণবিবি ও জামাতা গোপীনাথের যথোচিত ভরণপোষণ চালাইতে হইবে। তখন হারিবিবি আর উপায়ান্তর না দেখিয়া কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে রাজানগরের বাড়ীতে আসিলেন এবং জেষ্ঠারানীর পদধারণে স্বীয় দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দয়াবতী কালিন্দী রানী সপত্নীর করুণ প্রার্থনায় ক্রোধদ্বেষ বিস্মিত হইয়া কনিষ্ঠা ভগিনীপ্রায় হারিবিবিকে বাহুযুগলমধ্যে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর

ক্ষমা

তাঁহাকে সবিশেষ আশ্বস্ত করিয়া স্বীয় কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্র নির্বিশেষে চিকণবিবি গোপীনাথ ও হরিশ্চন্দ্র-শরচ্চন্দ্রকে নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। কালক্রমে হারিবিবি সোনাইছরী বাড়ীতে ভবলীলা সাঙ্গ করেন, তিন মাসের মধ্যে চিকণবিবিও রাজানগর প্রাসাদ হইতে মাতার পদানুসরণ করিলেন, আবার কিছুদিন পরে হায়—দশ বৎসরের বালক শরচ্চন্দ্রও মাতা এবং মাতামহীর সেবায় ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। উপর্যুপরি এই সকল বিপদপাতে বড়রানী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। জামাতা গোপীনাথকে নিজালয়ে রাখিয়া, ক্রমান্বয়ে আরও দুই বিবাহ করাইলেন(১১৫) একমাত্র দৌহিত্র — রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী হরিশ্চন্দ্রকে শি
নিমিত্ত রানীর প্রগাঢ় যত্ন ছিল, তজ্জন্য যাহা কিছু সম্ভব, তিনি তৎসমুদয় করিয়াছিলেন।

(১১৪) এতদ্ভিন্ন চিকণবিবির এক কন্যাও জন্মিয়াছিল। তাহার নাম রাখা হয় চন্দ্রকলা। কিন্তু এই কন্যা এক বৎসর অতিক্রম না করিতেই ভবধাম পরিত্যাগ করে।

(১১৫) চিকণবিবির মৃত্যুর পর গোপীনাথ দেওয়ান প্রথমে কালিন্দী রানীর ভ্রাতা জয়মণি দেওয়ানের কন্যা কান্দরীকে বিবাহ করেন। তদীয় গর্ভে উর্মিলা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। কাচালং -- কাট্টলীবাসী শ্রীযুক্ত নীলচন্দ্র দেওয়ানের সহিত উর্মিলার বিবাহ হইয়াছিল, তিনি এখনও জীবিত আছেন। পরন্তু কান্দরীর মৃত্যু হইলে গোপীনাথ দেওয়ান পুনরায় আমুগোছার চিকণ খাঁর কন্যা হীরালাল তালুকদারের ভগ্নী শ্রীমতী জানকীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার হরচন্দ্র, নবচন্দ্র, ভগীরথচন্দ্র ও ভগবানচন্দ্র চারিপুত্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র অধুনা লোকান্তরিত;নবচন্দ্র এবং ভগবানচন্দ্র রাজমহলের বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার মিঃ এইচ.এ.ককারেল ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী সমীপে যে পত্র * দেন তাহাতে দেখা যায়,—"প্রায় ১৮৫৫ খৃঃঅব্দে রানীর দরখাস্তের উপর রেভিনিউবোর্ড তাঁহার রাজস্বের হিসাব পুনর্নির্ধারণের অনুমতি প্রদান করেন। 'প্রাচীন কার্পাসমহলের বিষয়' বিবেচনা করিয়া (২০৮৫/৩ সিক্কা খাজনায়) তাহা ধরমবক্স খাঁর মৃতা কন্যা চিকণবিবির শিশু পুত্রের নিমিত্ত রক্ষা করা হইয়াছিল। এই বন্দোবস্ত তখনও সম্পাদিত হয় নাই। কিন্তু ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কালেক্টর কর্তৃক (প্রতিবেশী সর্দার) বোমাংকে যে বন্দোবস্তি দেওয়া হইয়াছিল, কালিন্দী রানী সেই মর্মে মালিকী-বন্দোবস্তি প্রার্থনা করিলে — তাহা প্রদত্ত হয়। এই আদেশে বুঝা যায় যে, রানী নিজেই এই বন্দোবস্তি করিয়াছিলেন। ইহা কায়েমী অর্থাৎ চিরস্থায়ী; রানী অধিকারিনী বলিয়া পরিকীর্তিকা। তিনি উত্তরাধিকারিণীর দাবি যাহাতে অসঙ্গত বলিয়া পরিবর্তিত হইতে না পারে, সেই ক্ষমতা লাভের নিমিত্ত বন্দোবস্তি চাহিয়াছিলেন।

*Letter No. 988

বন্দোবস্ত

যাহা হউক, অনন্তর হরিশচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রানী তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। বহু অনুসন্ধানের পর আত্মীয়-স্বজনদিগের পরামর্শক্রমে লার্মা-গোছার-পিড়াভাঙগোষ্ঠিজ রত্ন খাঁ দেওয়ানের[১১৬] কন্যা মূর্তিমতি লক্ষ্মীস্বরূপা সৈরিন্ধ্রীর সহিত রাজানগর প্রাসাদে মহা সমারোহে শুভপরিণয় কার্য সম্পাদন করেন। এই বিবাহে চট্টগ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং পার্বত্য প্রদেশের প্রায় সমগ্র অধিবাসী আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঢাকা হইতে গায়ক বাদ্যকর প্রভৃতি আনা হয়, একপক্ষকাল ধরিয়া গীতবাদ্যাদি চলিয়াছিল। এতাদৃশ আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহ চাক্‌মাসমাজে এযাবৎ হয় নাই। রানীর সুবন্দোবস্ত গুণে এই বিরাট ব্যাপারেও কোন ত্রুটি ঘটে নাই। ইহার অনেকদিন পরে হরিশচন্দ্রের অভিপ্রায়ানুসারে রত্ন খাঁ দেওয়ানের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা শ্রীশ্রীমতী মনোমোহিনীকেও তাঁহায় বিবাহ করাইয়াছিলেন।

হরিশচন্দ্রের বিবাহ

মাত্র এই সমুদয় কার্য লইয়াই মহীয়সী কালিন্দী রানীর শাসনকাল অতিবাহিত হয় নাই। কি উৎকট রাজনৈতিক সংঘর্ষণে, কি গুরুতর সমস্যাপূর্ণ ধর্ম ও সামাজিক বিপ্লবে, সর্বত্রই তদীয় মহতী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে এ পর্যন্ত যতজন রাজ্যভার পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়া সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অব্যবহিত নিয়ে একমাত্র কালিন্দী রানীর নামই সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় তথাপি কোন কোন স্বার্থ পীড়িত মহাপুরুষের কৃপায় তাঁহার নির্মল চরিত্রের উপর বিকৃত বর্ণ ফলিত হইয়াছে। আমরা উভয় পক্ষ হইতে যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসমুদায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছি, নিরপেক্ষ পাঠক বিচার করিবেন।

(১১৬) রত্ন খাঁ দেওয়ানের নাসিকা অতিশয় উন্নত ও সূঁচালো (চুচ্যাং) ছিল বলিয়া সকলে তাঁহাকে "চুচ্যাং দেওয়ান" নামে অভিহিত করিত।

কাপ্তেন লুইন স্বয়ং একস্থলে লিখিয়াছিলেন* — "১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমরা পার্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরীণ মিতব্যয়িতায় মুখ্যভাবে হস্তক্ষেপ করি নাই। সেই বৎসর ত্রিপুরা জেলার নিকটবর্তী কুকিগণ (খন্ডলের) ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রজাদিগের উপর কয়েকবার হত্যাপূর্ণ অত্যাচার করিয়াছিল[১১৭]। এই বিপ্লবসমূহ এরূপ ভীষণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, গভর্নমেন্টের ভয় ক্রমেই দৃঢ়তর হইয়াছিল। অবশেষে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত এই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে একজন সুপারিন্টেডেন্ট নিযুক্ত হন।" এবং এই বৎসরের "১লা আগষ্ট ২২ আইনানুসারে (সুপারিন্টেডেন্টের শাসনাধীন) পার্বত্য প্রদেশকে চট্টগ্রাম হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র জেলা স্বরূপে পরিগণিত করা হয়।" কিন্তু "চট্টগ্রামের কালেক্টর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে যাবৎ (অত্রত্য) খাজনা সংগ্রহ সংক্রান্ত কাগজাদি সুপারিন্টেডেন্টকে প্রদান করেন নাই।" পরে "১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই (নব গঠিত) জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর পদবী সুপারিন্টেডেন্টের পরিবর্তে ডেপুটি কমিশনার আখ্যা হয়। তিনি এই পার্বত্য প্রদেশের যাবতীয় শাসন ও বিচারকার্য চালাইবার ক্ষমতা লাভ করেন, এবং সেই সময়ে এই জেলা সব ডিভিসনেও বিভক্ত হয়। নিম্নতম কর্মচারীদিগের উপর তথাকার ভার থাকিত।" এতদ্ভিন্ন তখন বিচারাদি চালাইবার নিমিত্ত গভর্নমেন্ট হইতে কয়েকটি বিশেষ বিধি নির্ধারিত হয়। যথা ১। পাহাড়ীদের মধ্যে অভিযোগ ঘটিলে পক্ষসমর্থনাথ উকিল-মোক্তারাদি কোন আইন-ব্যবসায়ী দিতে পারা যাইবে না। ২। ষ্টাম্পের প্রয়োজন হইবে না, যথাসম্ভব স্বল্প খরচায় আইনানুসারে সরল ও ন্যায় বিচার প্রদান করিতে হইবে। ৩। জাতীয় আচার ও সংস্কার মানিতে হইবে, এবং তৎপ্রতি সম্মান দেখাইবে। ৪। ডেপুটি কমিশনার ম্যাজেষ্ট্রেট-কালেক্টরের পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন। একমাত্র বিভাগীয় কমিশনারের নিকট তদীয় বিচারের "আপিল" চলিবে এবং গুরুতর অভিযোগের শেষ মীমাংসাও তিনি করিবেন। পরিশেষে ১৮৯২ অব্দে লুসাই পর্বত ইংরাজের

*The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein P.-23

জেলাগঠন

A Statistical Account of Bengal - Vol III, P.-18

Revenue History Chittagong P.-190

The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein P. 23

বিচার ব্যবস্থা

(১১৭) তাহারা প্রায় ১৬০ জন ইংরাজ প্রজা হত্যা করে, এবং শতাধিক লোক ধরিয়া লইয়া যায়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ 'রাজমালা'র ৩৬১ ৩৬৭-৩৭০ পৃষ্ঠায়ও আছে। পরবর্তী জানুয়ারীতে আবার তাহারা উৎপাত আরম্ভ করে, সেই সময়ে ত্রিপুরেশ্বরের উদয়পুরাদি ধ্বংস করিয়া কালিন্দী রাণীর অধিকৃত কয়েকখানা গ্রাম পুড়িয়া দেয়। তখন রাণীর প্রার্থনানুসারে, তাহাদের দমন করিতে ইংরাজ সৈন্যগণ "৭৬ বল" (ইহার পরিচয় ১২০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেওয়া হইল) পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ইহাতেই তথা হইতে ১ মাইল দূরস্থিত বিদ্রোহী কুকিরাজ রতন পুইয়ার অধিকারস্থ প্রজাগণ ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া পলাইয়া যায়। অনন্তর সেই সনে রতন পুঁইয়া আত্মসমর্পণ করে।

অধিকৃত হইয়া গেলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন কার্যাদি চট্টগ্রাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা হয়। ১৯০০ সনে এথাকার নিমিত্ত ভারত গভর্নমেন্ট এক বিধান 'পাস' করেন, পরিশিষ্ট ভাগে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

ইংরাজ গভর্নমেন্ট

বস্তুতঃ এই পার্বত্য প্রদেশ স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত হওয়া অবধি অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কর্মে গভর্নমেন্টের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পূর্বে চট্টগ্রামের অধীনে অবস্থান কালে নিরীহ পাহাড়ীগণের প্রকৃত অভাব-অভিযোগাদি জ্ঞাপন করা দুঃসাধ্যই ছিল। জেলা-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী চন্দ্রঘোনায় বিচারালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও পাহাড়ীদিগের অসুবিধা বহু পরিমাণে নিরাকৃত হয়। এখানে বসিয়াই আগারুয়া (যাহারা উপরে গিয়া বাঁশবেতাদি কাটিয়া আনে)-দের নিকট 'ট্যাক্স' আদায় করা হইত। অনন্তর ইহাদের আরও অধিকতর সুবিধা-মানসে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সমুদয় অফিস পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় কেন্দ্রস্থল—রাঙামাটিতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আবার সহৃদয় গভর্নমেন্ট শেষোক্ত বিশেষ ব্যবস্থা কয়টি দ্বারা পাহাড়ীদিগের সহজে সুবিচার পাওয়ার পথও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অন্তরের সহিত স্বীকার করি যে, মাননীয় ইংরাজ গভর্নমেন্ট ঈদৃশী নীতিতে প্রজাসাধারণের সুখসমৃদ্ধি অশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তদ্দারা দেশীয় রাজার ব্যক্তিগত প্রাধান্য উচ্ছেদ প্রায় হইয়াছে। "রাজমালা" কারও ইহা লিখিয়াছেন,* "১৭৮২ শকাব্দে (গভর্নমেন্ট) পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করেন। তদবধি ক্রমে ক্রমে চাক্‌মাসরদারদিগের রাজশক্তি হরণ পূর্বক তাহাদিগকে সাধারণ জমিদারশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।"

*৩৩৪ পৃষ্ঠা

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট চাক্‌মারাজার ১৪ ও ৮৬ নম্বর 'লাট' নিলাম করিতে চাহিলে কালিন্দীরানী তাহাতে আপত্তি উত্থাপিত করেন। ইহাতে চট্টগ্রামের কালেক্টর ১৮৬৬ ইংরাজীর ২রা জানুয়ারী যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। —

প্রাচীন সীমা

"আবেদনকারিণী সমুদয় লাটের বিক্রি সম্বন্ধে বলেন, এই সমস্ত ভূমি তদীয় সত্ত্বাধিকৃত জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত, গভর্নমেন্টের খাস নহে। তিনি বাঙ্গালা ১১৭০ সনের ৬ই শ্রাবণ, ইংরাজী ১৭৬৩ সালে ঘোষণার উপর নির্ভর করিয়া এই আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে তদানীন্তন চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রধান কর্তা মিঃ হারি ভেরিলষ্ট সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ফেণী হইতে শঙ্খ এবং নেজামপুর রাস্তা (বোধ হয়, ইহা বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকাভিমুখে প্রবাহিত রাস্তা — Dacca Trunk Road) হইতে কুকিরাজ্য পর্যন্ত সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ রাজা সেরমুস্ত খাঁর জমিদারীর কার্পাসমহালভুক্ত, এবং আদেশ ছিল, — গভর্নমেন্টের রাজস্ব চালাইলে ইহা, তাঁহার দখলেই থাকিবে। আর অধস্তন কর্মচারিগণকে বারণ করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার পরবর্তী উত্তরাধিকারীদিগের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা না হয়। ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, যদি এই দাবি বজায় রাখা যাইতে পারে,

তবে কোন আইন-সঙ্গত উপায়ে ইহা রানীর পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। উক্ত ঘোষণায় সীমাবদ্ধ পার্বত্য প্রদেশের সর্বত্রই রানীর স্বত্ব সমভাবে বর্তিবে।

(স্বাক্ষর) এ, স্মিথ, কালেক্টর"

এই কৈফিয়ত দেখাইয়া কালেক্টর মিঃ স্মিথ ১৭ই জুলাই (১৮৬৬ খৃঃ অঃ) রানীর দাবী অগ্রাহ্য করেন। রানী মাননীয় বোর্ড-সমক্ষে ইহার আপিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ড ১০ই সেপ্টেম্বর ১৪৯৯ নম্বর পত্রযোগে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়কে জানাইয়াছিলেন,— "কালেক্টর অতি সাবধানতার সহিত ইহার বিচার করিয়াছেন। পতিত জমির উপর রানীর কোনও স্বত্ত্ব নাই। তিনি পাহাড়ী জুমিয়াদিগের সরদার। রানী ভূমির কর গ্রহণ করিতে পারেন না, কেবল মাত্র 'পারিবারিক-কর'[১১৮] লইয়া থাকেন। কালেক্টর সাহেব বিবেচনা করেন যে, গভর্নমেন্টই পতিত ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী, তাহা অপর কোন প্রকার স্বত্ব দ্বারা ভারগ্রস্ত হয় না। অতএব এই আপিল অগ্রাহ্য করা হইল।"

রাজকীয় স্বত্ত্ব

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট লেপ্টেনান্ট টি. এইচ্. লুইনকে 'কাপ্তেন'[১১৯] রাজসম্মান দিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিন্টেডেন্ট স্বরূপে পাঠান। পরে অবশ্য যথাসময়ে তিনি "ডেপুটি কমিশনার এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধি" পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৫ই মে তিনি অত্রত্য কার্যভার গ্রহণ করেন। ফলতঃ তাঁহার হস্তেই এদেশে ব্রিটিশের অধিকার ও প্রাধান্য সুদৃঢ় হয়। সাধারণ লোকেরাও আরও বহু কাল ধরিয়া "লুইন সাহেব'কে স্মৃতিমধ্যে সযত্নে রক্ষা করিবে। কিন্তু কেন জানিনা প্রথম হইতে কালিন্দী রানীর উপরে তিনি সন্দিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি স্থাপন করেন। উভয়েই লোকাতীত প্রতিভাশালী এবং কার্যদক্ষতায় অসীম ধন্যবাদার্হ! সংস্কারবাদী মাইকেলের কথায় বলা যায়, — "কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা, দোঁহে রিপুভাবে!" লুইন মহোদয় তদীয় "এ ফ্লাই অন্ দি হুইল" (A Fly on the wheel) নামক গ্রন্থে রানী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষেপতঃ তাহা উল্লেখ করিতেছি, "রানী বৃদ্ধ বিধবা ছিলেন। তিনি কতিপয় স্বার্থসংপৃক্ত মন্ত্রীর পরামর্শে চলিতেন এবং আমি যতকাল (চট্টগ্রাম) পার্বত্য প্রদেশে ছিলাম সর্বদাই মদীয় বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। প্রথমবারে রানী আমার বিচারের বিরুদ্ধে প্রথমে কমিশনারের নিকটে, পরে হাইকোর্টে "আপিল" করেন। যাহাহউক, আমি বড়ই সতর্ক হইলাম। যখন কোথাও সন্দেহ হইত, তাহা বন্ধুবর কমিশনার মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত স্থগিত রাখিতাম, এইরূপে আমার কোন ত্রুটী ধরিতে পারা যায় নাই। পরে আমার উপর নানা দোষারোপ করিয়া কলিকাতায় কতকগুলি (বেনামী) "উড়োচিঠি" প্রেরিত হয়। বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট কৈফিয়ত দিবার নিমিত্ত

Page - 326

অনুযোগ

(১১৮) ১০৫ পৃষ্ঠার পাদ টীকায় এই 'পারিবারিক-কর' পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

(১১৯) Captain in Her Majesty's lath Regiment.

আমার নিকটে সেই সমস্ত প্রেরণ করেন। বস্তুতঃ এই যুক্তিশূন্য অপবাদগুলি খণ্ডন করিতে আমাকে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই। এইরূপে নানা উত্তেজনাপূর্ণ বেনামী চিঠি ও আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। অনন্তর লেপ্টেনান্ট গভর্নর আমার বিরুদ্ধে বহুবিধ অবিচার ও অত্যাচার বিবরণী সম্বলিত সাতজন পাহাড়ী নেতার স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দরখাস্ত প্রাপ্ত হয়েন। এ সম্বন্ধে আমার কার্যস্থলে অনুসন্ধান করিতে তিনি চট্টগ্রামের কমিশনারকে লিখেন। কমিশনার আসিয়া উক্ত আবেদনে স্বাক্ষরকারী নেতা সাতজনকে ডাকাইলেন। কিন্তু সকলেই এই অভিযোগ এবং স্বাক্ষর অস্বীকার করেন। অধিকন্তু অনেকে মদীয় শাসনে সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া কমিশনার সমীপে আবেদন করিলেন। শুনিয়া সুখী হইলাম. ইহাদের মধ্যে বর্তমান বোমাং রাজা মংক্রও একজন। এবং মঙ্রাজা ক্যজচাঁই স্বয়ং গিয়া কমিশনারকে অনুরোধ করেন যে আমাকে এই পার্বত্য প্রদেশ হইতে যেন স্থানান্তরিত করা না হয়।"

Page - 327

"পরন্তু এই অনুসন্ধান-ফলে আমি উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম এবং আমার কার্যদক্ষতার ধন্যবাদসূচক পত্রও পাইয়াছিলাম। রানীর (?) নিগ্রহ-চেষ্টা সত্ত্বেও যে উন্নতি হইল, তজ্জন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমার সম্মানের উপর আক্রমণে বিফলমনোরথ হইয়া, অবশেষে তিনি (?) মদীয় জীবননাশে কৃতসংকল্পা হইলেন। একদা আমি "মহামুনি-মেলা"[১২০] হইতে, অতিশয় ক্লান্ত শরীরে বাসায় আসিয়া কিছু আগেই ঘুমাইতে যাই, কিন্তু ঘুম হয় না। কিয়ৎক্ষণ পরে চুরুট জ্বালাইতে উঠিয়া দেখিলাম, দীপশলাকার বাক্সটী নাই, চাকরেরা আমার আবাস শৈলের নিম্নস্থিত তাহাদের বাসগৃহে চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, একখানি জানালা খোলা রহিয়াছে। আমার সন্দেহ হইল। বালিসের নীচে প্রত্যহ রাত্রিকালে গুলিভরা একটি পিস্তল থাকিত, তাহা

Page - 328

হনন চেষ্টা

লইয়া নিঃশব্দে বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং উক্ত জানালার কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া সতর্কতার সহিত দেখিয়া রহিলাম। ফুস্‌ফুস্ মন্ত্রণা হইতেছিল, দরজার পথে চারিজন মনুষ্যের ছায়া পড়িল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে তাহাদের বর্শাও ক্ষীণ জ্বলিতেছিল। তখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা হইতেছিল যে, কে প্রথমে প্রবেশ করিবে। অনন্তর একজন ঢুকিয়া আমার শূন্য শয্যার উপর ছুরিকাঘাত করিতে লাগিল। আর অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারি নাই। তাহাদের তাড়াইতে পিস্তলের সহিত ভীষণ চীৎকারে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। তথায় এক কর্কশ শব্দ উঠিল! আমি দুর্বৃত্ত কাপুরুষের উপর পিস্তল ছুড়িলাম। পরে প্রহরী এবং চাকরেরা আসিল. এক মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল! তাহাদের মধ্যে একজন আহত হইয়াছিল এবং এক পার্শ্বে দুইটি বর্শা পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া "বাঙ্গালা" হইতে পশ্চাৎ অভিমুখে রক্তধারা দৃষ্ট হইল। বলা বাহুল্য, তাহারা সকলেই পলাইয়াছিল; কে কে যে ইহাতে লিপ্ত ছিল.

Page - 329

Page - 330

(১২০) মল্লিখিত "মহামুনি" শীর্ষক প্রবন্ধে এই মেলার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য ঃ "কোহিনুর" ফাল্গুন চৈত্র, ১৩১১।

তাহা আমি কোনরূপে বাহির করিতে পারি নাই। শুনিয়াছিলাম, রানীর উত্তেজনাতেই ইহা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবার উপযোগী প্রমাণ পাই নাই। অতঃপর কিছুদিন আমার নিদ্রা যাওয়ার সময় বারান্দায় একজন প্রহরী থাকিত। পরে যখন আমার বন্ধু মঙ্‌রাজার উপদেশে শয়নকক্ষ পবিত্র স্থানে পরিবর্তিত করিয়া সেখানে তাঁহার প্রদত্ত একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, তদবধি আমি সেই পবিত্র মূর্তির রক্ষণাধীনে নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতাম।"

কোন নিশ্চিত প্রমাণ না পাইয়াই এরূপে তিনি রানীর উপর অযথা নানা প্রকারে দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে, চাক্‌মাদিগের মধ্যে বর্শার ব্যবহার নাই। আর এতাদৃশ গুরুতর কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত কোন বিজাতীয় লোককে বিশ্বাস করা রানীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। তখনও কুকির উপদ্রব সম্পূর্ণ দমিত হয় নাই, তাহাদের কর্তৃক যে ইহা ঘটে নাই, কে বলিবে? বিশেষত কোন বিচারকর্তার বিরুদ্ধে 'আপিল' করিলেই যে শত্রুতাচরণ করা হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। স্বার্থে আঘাত পড়িলেও প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে লোক প্রত্যক্ষে আসিতে ভয় পায়। সুতরাং নাম গোপন করিয়া প্রকৃত অভাব অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা সর্বত্রই দুর্বল মানবের পক্ষে একমাত্র উপায়, তাহাতে আবার প্রাচ্য দেশের[১২১] প্রতি এত কটাক্ষ কেন? এ সকল যে কালিন্দী রানীর যোগে হইয়াছিল, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দুঃখের বিষয় জানিতে পারিলাম না, যে সাতজন পাহাড়ী নায়কের নাম আবেদনপত্রে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাঁহারা কোন জাতীয়? বিচারকার্যে ডেপুটি কমিশনারের সহিত দেশীয় রাজা হইতে প্রজার সম্পর্ক কম ছিল না। অতএব বোমাং ও মঙ্‌রাজা তদীয় শাসন-বিচারে সন্তোষ প্রকাশ করিলেও রানী নীরব থাকায়, তাঁহার উপরেই যাবতীয় সন্দেহের আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। বোমাং ও মঙ্‌রাজার এরূপ গায়ে পড়িয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার কারণও ছিল। এই নূতন রাজা মস্‌ফ্রুল তিনিই বোমারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অন্যতঃ তাঁহার কৃপা না ঘটিলে বোধ হয় এখন পর্যন্ত আমরা মঙ্‌রাজার নাম শুনিতাম না। কেননা আমরা প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি, পূর্বে মঙ্‌রাজার স্বতন্ত্র কোনও রাজ্য ছিল না। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুঞ্জধামাই নামধেয় জনৈক মঘসর্দার ৭/৮ শত পরিবার প্রজা লইয়া চাক্‌মা রাজাকে বার্ষিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা "মাটিপোড়া খাজানা"[১২২] দেওয়ার স্বীকারে সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন।[১২৩] তিনি পরে ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে সরিয়াছেন। কুঞ্জধামাইর পুত্র ক্যজচাঁই, কাপ্তেন

অপবাদ খণ্ডন

(১২১) কাপ্তেন লুইন "এ ফ্লাই অন দি হুইলে" পূর্বোক্ত উড়োচিঠির কথা উত্থাপন করিবার সূচনায় বলিয়াছেন,— "Next a very harassing mode of attack was adopted, and one much in favour in the East." – Page 326.

(১২২) "মাটিপোড়া খাজানা" অর্থাৎ জুমকর। জুম জ্বালাইতে মাটিও পোড়া যায় বলিয়া, ইহাকে "মাটিপোড়া" বলা হইয়াছে।

(১২৩) ইনি নাকি বোমাং-এর অধিকার হইতে পলাইয়া আইসেন, তজ্জন্য মোকর্দমা হয়।

লুইনের শাসনকালের প্রথম ভাগেও কালিন্দীরানীকে এই রাজস্ব দিয়াছেন। শুনিয়াছি, রানীর তদানীন্তন নায়েব — বর্তমান গ্রন্থকারের প্রাতঃস্মরণীয় মাতামহ চট্টগ্রাম ফটিকছড়ী থানার অন্তঃপাতী ধুরুঙ্গগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গত হরগোবিন্দ রাহা মহোদয় এই "মাটিপোড়া খাজানা" উক্ত মঘ সরদার হইতে আদায় করিয়াছিলেন, এবং অন্যতম নায়েব শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দেওয়ানও সেই কর উশুল[১২৪] করিয়াছেন। — অদ্যাপি তিনি জীবিত[১২৫] লুইন ক্যজচাঁইর ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নাকি চাক্‌মারানীর কর বন্ধ করিতে পরামর্শ দেন। পরে তিনি গভর্নমেন্টে বিস্তর লিখিয়া চাক্‌মারাজ্য হইতে মঙ্‌রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া লয়েন। কালিন্দী ইহার জন্য বঙ্গীয় গভর্নমেন্টে "আপিল" করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৭০ খৃঃ অব্দে তাঁহার দাবি অগ্রাহ্য হয়।[১২৬] সুতরাং কেবল ক্যজচাঁই কেন, মঙ্‌ রাজ্যের উপভোগকারী পুরুষানুক্রমে সকলেরই কাপ্তেন লুইনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য।

মঙ্‌রাজার বিবরণ

ক্যজচাঁইর সহিত লুইনের সৌহার্দ্য-নিদর্শন দুই এক স্থলে দেখাইয়া আসিয়াছি। পাঠকবর্গের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ করিতে এস্থলে আর একটি চিত্র তদীয় "এ ফ্লাই অন্‌ দি হুইল" হইতে তুলিয়া দিলাম :- "মঙ্‌ চিফের বাসস্থান মাণিকছড়ীতে পৌঁছিলে রাজার নিজগৃহের এক বৃহৎ কামরায় আমি রহিয়াছিলাম। ইহা অবশ্য বিশেষ অনুগ্রহের লক্ষণ। এযাবৎ কোনও ইংরাজ পুরুষ এতাদৃশ পারিবারিক আত্মীয়তার মধ্যে স্থান পায় নাই। আমার মাধ্যাহ্নিক ভোজনের সামগ্রী (মঙ্‌) রানীর নিজ তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুত হইয়াছিল। Page - 359 পরিবেশনকালে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, সুকোমল অঙ্গুলিনিচয় দ্বারা কয়েকটি বিশেষ মনোনীত সামগ্রী নির্দেশ পূর্বক, আমাকে খাইতে অনুরোধ এবং জেদ্‌ করিয়াছিলেন। বেতসাগ্র, বংশমূল প্রভৃতি অনাস্বাদিতপূর্ব দ্রব্যও আমি সাহসের সহিত খাইয়াছিলাম। অনন্তর গৃহকর্ত্রী অতিথি-সৎকারের উদ্দেশ্যে ঈষৎ হাসিতে হাসিতে আসিয়া মৎসম্মুখে একটি পিত্তল পাত্র স্থাপন করিলেন। ইহাতে তৈলেভাজা নরম চারিটি

সৌহার্দ

(১২৪) ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থায় সার্কেল বিভক্ত হইয়া গেলে, গিরিশবাবু মঙ্‌রাজার অধিকার মধ্যে পড়েন। মঙ্‌রাজার ম্যানেজার বাবু পূর্ণেন্দ্র দাসকে প্রথম কর দিবার সময় গিরিশবাবু সবিষাদে বলিয়াছিলেন, — "হায় অদৃষ্ট — এই হাতেই মঙ্‌রাজা হইতে খাজানা আদায় করিয়াছি, আবার এই হাতেই মঙ্‌রাজাকে খাজানা দিতে হইতেছে!"

(১২৫) এস্থলে পরম দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পুস্তকের এই অংশ লিখিত হওয়ার কিছুকাল পরেই তিনি পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(১২৬) এ সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের কফুরিয়ত এই (Letter no. 543 P.D. dated - 7.10.1898) যে, "The first Mong Raja having been an Arracanese Mug whom it was convenient to the Government to place over the tribes in the north, as being the most important person in those parts." তাঁহারা বলেন, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই পার্বত্য প্রদেশ স্বতন্ত্র জিলারূপে গঠিত হইলে উত্তরাংশের শাসনকার্য ভাল চলিতেছে না দেখা গেল। যদিও ইহা চাক্‌মাচিফের নাম মাত্র

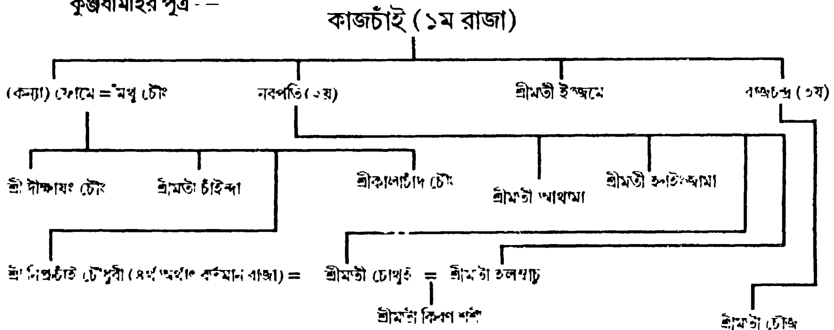
শ্বেতকীট(১২৭) ছিল। তিনি তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যোগে তাহার একটি লইয়া আমার কম্পিত ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি ধন্যবাদ দিয়া অনিচ্ছাসূচক হাসির সহিত তাহা দূরে ফেলিলাম। কিন্তু যখন তাঁহাকে সন্তোষজ্ঞাপনের চেষ্টা করিয়াও মুক্তিলাভ অসম্ভব বুঝা গেল, তখন আমার সদ্ব্যহারের সম্মান রাখিবার নিমিত্ত সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। পরে বিদায় কালে রাজার অনুরোধে তাঁহার ক্ষুদ্র বালক-নরপতিকে স্বীয় পুত্রবৎ সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।"

ইহা হইতেই সম্ভবত কাপ্তেন লুইন মনে করিয়াছিলেন যে, পার্বত্য দেশে অবরোধপ্রথা নাই। তাই তিনি অতঃপর একবার কালিন্দী রানীর সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু রানী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তজ্জন্য তিনি সবিশেষ কুপিত হইয়া, কতিপয় পাহাড়ীকে দাসরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ছলনায় — কালিন্দীরানীকে বন্দী করিতে উপযুক্ত সংখ্যক সিপাহী সমভিব্যাহারে সহকারী মিঃ রেইনীকে পাঠাইয়াছিলেন। রেইনী প্রথমে রাজবাড়ীতে উপনীত হইয়া দাসরূপে আবদ্ধ লোকগণকে তলব করেন, রানী তাহাতে কোনও বাধা দেন নাই। পরন্তু তাহারা সকলে একবাক্যে স্বেচ্ছাকৃত চাকরী স্বীকার করিয়া যায়। তখন রেইনী আর কোন পথ না পাইয়া বিফল মনোরথে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহাতে কাপ্তেন লুইনের নির্যাতন-স্পৃহা দূর না

অবরোধ ভাঙ্গিবার চেষ্টা

অধিকারে ছিল, কিন্তু ফলে দূরে থাকাতে লোকজনের উপর প্রকৃত শাসন চলিত না। কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, তাহা তৎক্ষণাৎ জানাইতে পারে এমন কোন উপরিস্থ তথায় না থাকাতে, বড়ই অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। ক্যজচাঁই সেইখানকার সম্মানিত ও অবস্থাপন্ন ছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাই তাঁহাকে তত্রত্য সরদার মনোনীত করেন।

অধিকন্তু শুনা যায়, ক্যজচাঁইকে "ধামাই" না ডাকিয়া "মঙ্রাজা" বলিবার নিমিত্ত কাপ্তেন লুইন দেশে বিদেশে ঢেঁড়া পিটাইয়াছিলেন। সুতরাং এই "মঙ্রাজা" পদবী লুইনেরই প্রদত্ত হইবে। সে যাহা হউক এস্থলে আমরা মঙ্রাজবংশের একখানি তালিকা প্রদান করিলাম ঃ



(১২৭) চাকমারাও এই পোকা খায়। তাহারা ইহাকে "মিদুং পোগ" বলিয়া থাকে। বাঁশের মধ্যে পাওয়া যায়। নিতান্ত ক্ষুদ্র পাওয়া গেলে নবোদ্গত বাঁশে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে রাখে এবং মুখে ছিপি দেওয়া হয়। সেই বাঁশের অভ্যন্তর ভাগ খাইয়া কিছু বড় হইলে ঐরূপে অন্য বাঁশে রাখে, এই প্রকারে বাঁশ পরিবর্তন দ্বারা পোকাটি ক্রমে বৃহত্তর হইয়া থাকে। অনন্তর ভাজিয়া খাইতে নাকি বেশ আস্বাদ লাগে। ইহা বড়ই তৈলাক্ত।

হইয়া বরং ঘৃতপ্রক্ষিপ্ত-অনলবৎ আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আর শেষে তিনি "হাতে না পারিয়া দাঁতে" — কাগজে কলমে রানীর যথাসম্ভব অনিষ্ট করিয়া যান।

লুইন মহোদয়ের বাঙ্গালী - বিদ্বেষ(১২৮) ঘটিবার কারণ আমরা সবিশেষ অবগত নহি। উপসংহার ভাগে তচ্চিত্রিত বাঙ্গালীর ছবিও দেখাইব। পরন্তু তিনি কালিন্দীরানীর সমালোচনায় বাঙ্গালী কর্মচারিগণকেও অনুযোগ-ভাগী করিতে যাইয়া একস্থলে লিখিয়াছেন* - "সততা মত-বিরোধী রানী এবং তদীয় বাঙ্গালী মন্ত্রীগণ ভিন্ন জেলার সমস্ত নায়কদিগের সহিত আমার সদ্ভাব ছিল।" বোধ হয়, তিনি এবম্বিধ মন্তব্য সম্বলিত একখানি গুপ্ত লিপি বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দিয়াছিলেন। কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক সেই সময়েই অস্থায়ী কমিশনার লর্ড এইচ. ইউলিক ব্রাউন বঙ্গীয় গভর্নমেন্টে লিখিয়াছিলেন, +"কালিন্দী রানী ব্যতীত অন্যান্য রাজা ও প্রজাগণ লুইনের সবিশেষ প্রাধান্য স্বীকার করে।" আরও আছে, "এখানে পার্বত্য প্রদেশের অনিষ্টের একমাত্র কারণ, পার্বতীয় শাসন কার্যের বিষম অন্তরায় — স্বরূপিনী, বাঙ্গালী মন্ত্রীর পরামর্শ-পরিচালিতা কালিন্দী রানী, তহশীলদার বিনিয়োগের পরিবর্তে অবিবেচকতার সহিত পাট্টা দিয়া, বহুকাল প্রচলিত পদ্ধতির উচ্ছেদে চাক্‌মাদিগের অসন্তোষৎপাদন এবং প্রজা সাধারণের অশেষ অনিষ্ট ঘটাইয়াছেন। পার্বত্যগণ তালুকের জমির ন্যায় বন্দোবস্তি-ভুক্ত হইয়া থাকে। প্রায়শঃ বঙ্গালীরাই (জুমিয়াদের কর বাড়াইয়া ও নিজেদের কমিশন না দিয়া) উচ্চ হারে বন্দোবস্তি গ্রহণ করে। ইহাতে দেওয়ান প্রথা বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। গ্রাম্য বিচারাদির নিমিত্ত বন্দোবস্ত নাই। পাট্টাদারেরা কিয়দংশ রাখিয়া অবশিষ্ট তালুক বিক্রয় করে। তন্নিমিত্ত পাহাড়ীদিগকে (অধিকারীর সঙ্গে সঙ্গে) একগ্রাম ছাড়িয়া অপর এক নূতনগ্রাম গঠন করিতে হয়। এই সমুদয়ে শাসন কার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। কালিন্দীরানীর প্রার্থনার মধ্যে দুইটি প্রধান। ১। তাঁহাকে দৌহিত্রের ম্যানেজারস্বরূপ গণ্য না করিয়া চাক্‌মাদিগের শাসনকর্ত্রীরূপে স্বীকার করা হউক, এবং ২। তাঁহাকে নির্দিষ্ট করে বন্দোবস্ত দেওয়া যাউক। অনেক চাক্‌মা প্রজা চাষের জমি প্রার্থনা করিয়াছে, ইহাতে কালিন্দী রানীর স্বীয় প্রজার প্রতি অবজ্ঞা এবং বাঙ্গালীদিগের যোগে শাসন-অত্যাচার সূচিত হয়। পাহাড়ীগণ বলে, 'তিনি (কালিন্দী রানী) আমাদিগকে বাঙ্গালীর মুন্সেফিতে(১২৯) ছাগলের মত বিক্রয় করেন' চাক্‌মারা তদীয় অধীনতাপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে চায়, কেননা তিনি অধীশ্বরীর কোনও কর্তব্য পালন করেন না। প্রজাগণ যখন সর্দার কর্তৃক উৎপীড়িত হয়, তাহারা আর তাঁহাদের

অনুযোগে কালিন্দীরানী ও বাঙ্গালী কর্মচারী

*A fly on the wheel-P. 37

+Letter no. 421, dated 12.11.1808

(১২৮) এ সম্বন্ধে তদীয় "A Fly on the Wheel"-এ বিস্তৃত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। "The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein" এর উপসংহারও লিখিয়াছেন, with the Bengalees I have never been accord".

(১২৯) পাট্টাগ্রহিতা বাঙ্গালীগণ চট্টগ্রামের মুন্সেফিতে প্রজাদের নামে নালিস উপস্থিত করিতেন।

অধীনে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, খাস মৌজায় আশ্রয় দেওয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র যদি শীঘ্র রাজ্যভার গ্রহণ না করেন তবে তাঁহার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে — আমি আশ্চর্য হইব না! কারণ, এখনই তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে। অনেকে খাস মৌজায় বন্দোবস্তি প্রার্থনা করিয়াছে। এই তালুকদারী-প্রথা রহিত হইয়া চাক্‌মাদিগের মধ্যেও রোয়াঝা[১৩০] নিয়োজিত হউক। দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আমি যাহা প্রস্তাব করি, তিনি (কালিন্দী রানী) সমস্তেরই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।" স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে-লর্ড ব্রাউন যাহা লিখিয়াছেন, এতৎসমুদয়ই কাপ্তেন লুইনের ধারণার প্রতিধ্বনি মাত্র! পরন্তু রানীর মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পরবর্তী, লুইন মহোদয়ের স্থলাভিষিক্ত মিঃ এ. ড্‌বলিউ. বি. পাউয়ার[১৩১] ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ৪৭২ নম্বর পত্রে সেই 'সংস্কারে' বিভাগীয় কমিশনারকে লিখিয়াছিলেন, — "ধরমবক্সের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী কতিপয় অসৎমন্ত্রীর হাতে পড়িয়া অপরাপর কুনীতির মধ্যে — হিন্দু আইনানুসারে পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ এবং মনুষ্য-তালুকের অংশ বিক্রয় অনুমোদন করিয়াছিলেন।"

এইরূপে বিড়াল শাবকে বাঘের উপদ্রব প্রচারিত হইয়া[১৩২] রানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্রমেই গুরুতর হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য বাঙ্গালী কর্মচারীগণও নিমিত্তভাগী হইয়া পড়িয়াছেন। যে সমুদয় বাঙ্গালী মন্ত্রণা-দাতার স্কন্ধে রাজপুরুষেরা দোষারোপ করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (বাড়ী - কোনিসহর, চট্টগ্রাম) এবং জগন্মোহন গুহ (বাড়ী - ভূষি, চট্টগ্রাম) এই দুইজনই প্রধান ছিলেন। রানী প্রায়শঃ তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন। কিন্তু সাধারণ্যে তাঁহাদের কোন অপবাদ নাই, অধিকন্তু সচ্চরিত্রতারই প্রসিদ্ধি আছে। তবে হইতে পারে, তাঁহারা স্ব-জাতিবাৎসল্যে কোন কোন বাঙ্গালীর প্রতি অনুচিত অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে নিরীহ চাক্‌মাগণ উৎপীড়িত হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের পক্ষ-সমর্থনার্থ এই মাত্র অনুমান করা যায়, নতুবা তাদৃশ ভীতিব্যঞ্জক বর্ণনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে রানীর প্রকৃতি যাদৃশ বিকৃত ভাবে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গীয় গভর্নমেন্টও বিরক্ত না হইয়া পারেন নাই। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী সেক্রেটারী মিঃ আস্‌লি ইডেন মহোদয় ২৭০ নম্বর পত্রে চট্টগ্রামের কমিশনারকে

(১৩০) "রোয়াঝা" - এই পার্বত্য প্রদেশীয় মঘ ও ত্রিপুরাদিগের গ্রাম্যমণ্ডলের উপাধি। তিনি কর আদায় এবং গ্রাম্য সাধারণ বিচারাদি নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।

(১৩১) ইনি ১৮৭১ খৃঃ অব্দের ৩রা জুলাই পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম পলিটিকেল এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারই দ্বারা পার্বত্য ত্রিপুরার প্রান্ত এবং লুসাই প্রদেশের সীমা নির্ধারিত হয়।

(১৩২) কথিত আছে, এক ব্যক্তি কোনও বাজারের রাস্তার পার্শ্ববর্তী "খানায়" একটি ক্ষুদ্র বিড়ালশাবক দেখিয়া যায়। কিন্তু সে গিয়া অপর এক জনের নিকট বর্ণনা করে যে, "বাজারের রাস্তার পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড বিড়াল দেখিয়া আসিলাম" পরে ২য় ব্যক্তি অপরকে "অপূর্ব বিরাটাকৃতি মার্জার", ৩য় ব্যক্তি অন্যজনকে "ব্যাঘ্রাকার মার্জার", ৪র্থ ব্যক্তি একবারে "বাজারে সাক্ষাৎ বাঘ নামিয়াছে" সংবাদ দিল। পরে জনরব উঠিল যে "বাজারে বাঘ আসিয়াছে, তাহার উৎপাতে বাজারবাসী ইতস্ততঃ পলাইতেছে" ইত্যাদি।

জানাইয়াছিলেন — "মাননীয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর দুঃখের সহিত বলিতেছেন যে, যদি রানী এরূপে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার কার্যে বারম্বার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন, এবং তদীয় প্রকৃতি সংশোধন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সরবরাহকারিণী হইতে পদচ্যুত করা যাইবে। অপর দুই (বোমাং ও মঙ্) রাজা বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইলে, কালিন্দীরানীর কোন ওজর-আপত্তি শুনা যাইবে না। লেপ্টেনান্ট গভর্নর তাঁহার প্রতিবাদ খণ্ডনে প্রস্তুত আছেন।" ফলতঃ স্থানীয় শাসনকর্তার কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া রানী কর্তৃপক্ষের অতিশয় বিরাগভাগিনী হইয়াছিলেন। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। পরন্তু তিনি যে গভর্নমেন্টের প্রতি সাতিশয় আস্থাবতী ছিলেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিগত সিপাহিবিদ্রোহকালে যখন ব্রিটিশ-রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তখনও তিনি কর্তৃপক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। এদেশে কালিন্দী রানীর সময়ের লোক এখনও যাঁহারা বর্তমান আছেন, তাঁহার কথা তুলিলে সকলেই 'হায়-হায়' করিয়া থাকেন! এমন কি দূরবর্তী চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র বালক-মুখে পর্যন্ত তদীয় প্রাতঃস্মরণীয় নাম শুনিতে পাওয়া যায়[১৩৩]। পাঠক বিচার করুন, ইহা অত্যাচারের অভিশাপসন্তপ্ত সকরুণ আর্তনাদ, কি সুকৃতি-মন্দিরের অনন্ত আবর্তি।

কর্তৃপক্ষের বিরাগ

পরন্তু রানীর শাসনকালের এইমাত্র অভিযোগ শুনিতে পাই, তাঁহার সহোদর জয়মণি দেওয়ান ফকির অনুরাম চাক্‌মার শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া উপদেশ পায় যে, যদি কেহ "চেঙ্গী" উপনদীর করদ সরিৎ 'নূনছরী'র উৎপত্তি স্থানে হ্রদমধ্যস্থিত গোলাকৃতি শিলাখণ্ডোপরি সাতজন হিন্দুকে বলি দিতে পারেন, তাহা হইলে সেই শিলাখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া "সাত রাজার ধন মাণিক" তাহার করতলগত হইবে। জয়মণি এই অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ৭ (সাতজন) হিন্দু বেপারীকে সবলে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে একজন ধূর্ত-চূড়ামণি নাপিত ছিল। অপর ছয়জনকে বলিদানের পর, নাপিতকে স্নানের নিমিত্ত নদীতে লইয়া গেলে, সে ডুব দিয়া অদৃশ্য হয় এবং অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিয়া সে চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে যাবতীয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে। তাহাতে জয়মণি বন্দী হন, এবং অবশেষে নানা চেষ্টায় অব্যাহতি লাভ করেন। জয়মণিকৃত আরও কয়েকটি অত্যাচারে বাস্তবিক প্রজাসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। উৎপীড়িত জনগণ কাতরকণ্ঠে —

নরবলি

"রাজার শালা জয়মণি,
রক্ষা কর কালিন্দীরানী"।

বলিতে বলিতে দয়াময়ী রানীর চরণতলে স্মরণ লইত। সেই শোকময় কোলাহল অদ্যাপি লোকের কর্ণে প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে। ইহা হইতেও রানীর ন্যায়পরায়ণতার প্রতি সাধারণের ভক্তিমত্তার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

(১৩৩) বর্তমান গ্রন্থকার অতি বাল্যকালেই পূজনীয়া মাতৃদেবী সকাশে মহীয়সী কালিন্দী রানীর কীর্তিকাহিনী শুনিয়াছিলেন। সেই অবধি তদীয় বিস্তারিত জীবনী জানিতে তাঁহার অতিশয় আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

কালিন্দী রানীর শাসন বিবরণী যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা-নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। চন্দ্রের কলঙ্ক প্রায় তাঁহার কেবল মাত্র একটী অবিবেচকতার কাজ হইয়াছিল — 'মনুষ্য-তালুক' সৃষ্টি এবং তদংশ বিক্রয়ে ক্ষমতা প্রদান। নিন্দাকারিগণ এই ছিদ্র পাইয়াই নানা বিশেষণে সাজাইয়া তাঁহার দুর্নাম গাথা বাহির করিয়াছিলেন।

মানুষের তালুক

ইহার কুফল পূর্বে বুঝিতে পরিলে রানী কখনই এই নূতন পদ্ধতি চালাইতেন না। 'দেশে' যে মালাকার, লগ্নাচার্য, ভাট ও আদ্য পুরোহিতদিগের যজমানের-তালুক আছে, সেই অনুকরণেই বোধ হয় তিনি স্বীয় প্রজাদিগের তালুক গঠন করিয়াছিলেন। এবং উহাদের মধ্যে যেমন যজ্‌মান-তালুকের স্বেচ্ছানুরূপ অংশ ক্রয় বিক্রয় আছে, এই প্রজা-তালুকেও সেই অধিকার দান করেন। কিন্তু তখন তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, তাহার প্রজা-তালুকের অংশ বিক্রয়ে তালুকদারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের বাসস্থানও স্থানান্তরিত করিতে হয়। যজ্‌মান-তালুকে সে অসুবিধা নাই। কেননা তৎসীমা "চৌহদ্দি" দ্বারা নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজাপরিবার লইয়া প্রজা-তালুক গঠিত হইত। তবে ইহাকে তাঁহারা যেরূপ ভীষণ বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, ফলে তাহা নহে, এখানে আমরা তৎপাট্টার এক প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম,

শ্রীমতিকালিন্দী
রাণী

শ্রীমতী কালিন্দীরাণী
(স্বাক্ষর)

"পাট্টা কবুলকরার দাদেবকবুলিয়ত শ্রী ঈশানচন্দ্র দেওয়ান পিছরে লবণ খাঁ দেওয়ান মৃত সাকিন কাচালং জোমবঙ্গ থানে কাচালাং প্রতি কামি দামি ইস্তিমেরারি তালুকি পাট্টা পত্রমিদং আগে আমার জমিদারির অধীন কার্পাস মহাল সংক্রান্ত তোমার সাবেক

পাট্টা

মুরচি তালুকদার মোট পাক্কা[১৩৪] ১১ ঘরের কাতে ১৭৩ ঘর রায়তের সালিয়ানা হস্তবুদ মবলক ১১২।। ৯১০ গণ্ডা কোম্পানী বেশী ৭৯৬ গণ্ডা পুণ্যাহ নজর ১ টাকা চিনার খরচা ১ টাকা আগচলি ৫ টাকা হদিশ আমলা আন ৪ টাকা সাকুল্যে মং ১৩০।। ১৬ গন্ডা বাদস্বরূপ ২দ০ বাকিস্থিত ১২৮, ১৬ গন্ডা খাজানার পরে তুমি তালুকী পাট্টা পাওয়ার দরখাস্ত করিবায় তাহা মঞ্জুর ক্রমে তোমা হইতে কামি দামি ইস্তিমিরারী তালুকী কবুলিয়ত লইয়া কামি দামি ইস্তিমিরারী তালুকী পাট্টা দিতেছি যে নিরূপিত খাজনা বাজে রকম সহ সনা বসন তুমি ও তোমার পুত্র পুত্রাদি ক্রমে নিচের লিখিত কিস্তিমতে চালান সম্বলিত আমার জমিদারী সেরেস্তাতে দাখিল করি দিয়া দাখিলা লইবা ও লইবেক শটামিতে কিস্তমতে খাজানা আদায় না কর ও না করে প্রচলিত কানুন জারিতে ও আগমস্য যাহা কানুন প্রচলিত হয় তদ্বারাহ খাজনা গং তোমার মাল মনকুলা স্থাবর সম্পত্ত্যাদি ক্রোরক ও নিলাম বিক্রি পূর্বক আদায় লইতে কোন ওজর না

(১৩৪) দশ কাঁচাঘর অর্থাৎ পরিবার লইয়া এক পাকাঘর গণনা হইত। পূর্বে প্রতি কাঁচাঘরের বারসের করিয়া কার্পাস কর স্বরূপ নির্দিষ্ট ছিল, জানবক্স খাঁর সময় তাহা মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়।

করিবা ও না করিবেক। ভেটবেগার নজর স্বীকার খাইন মাথট রসদ পল্টন খয় খরচা ও সাদি ক্রিয়াতে নজরানা ও খরচা পূর্ব মতে ও যখন যাহা উপস্থিত হয় এবং হুজুরের অঙ্ক বেশী হয় সর তালু ⸱দারানমতে দিবা ও দিবেক তাল কা হেবা খারিজ আমার হুকুম বিনা না করিবা বে আইনী কোন কর্ম না করিবা কর তোমার নিজে নিশা করিবা তালুকাতে কোন ফৌজদারী মোকর্দমা উপস্থিত হয় তৎশীঘ্রহ হুজুরে অথবা আমার নিকট এতেলা করিবা তালুকার রায়ত উৎবৃদ্ধ হয় নিরূপিত জমামতে তুমি ও তোমার উত্তরাধিকাবান ভোগবান থাকিবা ও থাকিবেক রায়ত ফতেফেরাল হয় খাজানা আদায়ের পক্ষে কোন ওজর না করিবা ও না করিবেক জব্দ জরীপে আমার মালিকীতে তোমার তালুকা ধরাইবা তালুকার রায়ান রাণা রাণী ঘিসা সাবেকমত দখলে রাখিবা এতদর্থে কামি দামি ইস্তিমিরারী তালুকা পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩১ মং তারিখ ২ আষাঢ়—"

ইহা দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, তালুকদারগণের জমা নির্দিষ্ট ছিল, কিস্তীবন্দীমতে তাহা চালাইয়া এবং সময় বিশেষে রাজব্যাপারাদির চাঁদা দিয়া তাহারা পুরুষানুক্রমে বন্দোবস্ত মহালের উপসত্ত্ব ভোগদখল করিতে পারিতেন। এই আয় দায়ভাগমতেই বিভক্ত হইত, অর্থাৎ কোন তালুকদারের মৃত্যু হইলে মহাল তৎপুত্রগণের মধ্যে তুল্যাংশে বিভাজিত হইয়া পড়িত। যাহা হউক, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি ২৯৫ নম্বর পত্রে বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের জনৈক সেক্রেটারী চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারকে লিখিলেন যে, "বিগত ১২ই নবেম্বরের ৪২১ নম্বর (লর্ড ব্রাউনের প্রাগুক্ত) পত্রের প্রস্তাবানুসারে মাননীয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর (রায়াঝা অর্থাৎ) হেডম্যান (Headman) নিয়োগ প্রথা অনুমোদন করেন।

হেড্‌ম্যান নিয়োগ

ইহারা গ্রামবাসী কর্তৃকনির্বাচিত হইয়া রাজা-দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। ডেপুটী কমিশনারের নিকট ইহাদিগের একখানি তালিকা থাকিবে। রাজারা যাবতীয় পরিবর্তন-সংবাদ তাঁহাকে যথাসময়ে জানাইবেন। হেডম্যানেরা রাজাদের নিমিত্ত "কেপিটেসন টেক্স"[১৩৫] (পারিবারিক কর) আদায় করিবেন এবং যে কোন অভিযোগ ডেপুটি কমিশনারের নিকট জানাইবেন। (মোকর্দমা উপস্থিত হইলে) তাহা চালাইবার ও সাক্ষ্য যোগাইবার ভার তাঁহাদের উপরই থাকিবে। তাঁহারা সাধারণতঃ ডেপুটি-কমিশনারের আদেশ পালনে বাধ্য রহিবেন। .... অনুরোধ করিতেছি যে, রানীকে জানাইবেন — তিনি এযাবৎ এই সম্বন্ধে যতসব আবেদন করিয়াছেন, তৎসমস্তেরই মীমাংসায় লেপ্টেনান্ট গভর্নর রানীকৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সরবরাহকার অপেক্ষা উচ্চতর পদবী অস্বীকার করেন। যতদিন পর্যন্ত সপত্নী-দৌহিত্র বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় তাঁহার হস্তে এই সম্পত্তি ও জাতীয়ভার

(১৩৫) "কেপিটেসন টেক্স" (Capitation Tax) — ইহার প্রকৃত অর্থ "লোক প্রতি কর"। মিঃ পাউয়ার বলেন (See - letter no. 872, date 17.6.1875), "এই ভুল নামটি আরাকান হইতেই আসিয়াছে। ইহা প্রাপ্তবয়স্ক পাহাড়ীদিগের মাথাগণনায় (অর্থাৎ লোক প্রতি) কর মাত্র। কিন্তু এখানে যে কর গ্রহণ করা হয়, তাহা পরিবার প্রতি অর্থাৎ পরিবার মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক একাধিক থাকিলেও, অতিরিক্ত কর দিতে হয় না।" এই জন্য "কেপিটেসন টেক্সের" অনুবাদ এই পুস্তকে "পারিবারিক কর" করা হইল।

রাখিতে সম্মত থাকেন, ততদিন রানী কর্তৃপক্ষের আদেশ ও অভিমত পালনপূর্বক কার্য চালাইবেন। তাঁহাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি সরদারের প্রতিনিধি মাত্র। এই পার্বত্য প্রদেশে তাঁহার কোনও স্বত্ব নাই। ... লেপ্টেনান্ট গভর্নর আপনাকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন যে, (আপনি সম্পূর্ণ বিবেচনার সহিত ইহার উপায় বিধান করিয়া) রানীর শাসনসম্বন্ধীয় কার্যাবলীতে পার্বত্য প্রথার জন্য জেদ করিতে পারেন, এবং তাঁহাকে যাবতীয় তালুকদারী ও ইজারা রহিত করিতে আদেশ দিতে পারেন। ঐ সকল তালুকদারেরা যদি জাতিতে চাক্‌মা হন, তবে তাঁহারাই রোয়াঝা অর্থাৎ হেড্‌ম্যান হইবেন। রানী যদি স্বয়ং পাহাড়ে বাস করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্রবাবু তথায় বাস করিবেন এবং ডেপুটি কমিশনারের সহিত স্বয়ং সম্পর্ক রাখিবেন। যদি দেখা যায় যে রানী ইহাতে বাধা দিতেছেন বা গভর্নমেন্টের প্রতি তদীয় কর্তব্যে শৈথিল্য প্রদর্শিত হইতেছে তখন তাঁহাকে সরবরাহকার হইতে পদচ্যুত করিতে গভর্নমেন্ট ইতস্ততঃ করিবেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

ফলতঃ অতঃপর সীমাবিশেষবর্তী অধিবাসীদের উপর হেড্‌ম্যান নিয়োজিত হইলেও তাদৃশ পারিবারিক-কর গ্রহণের কোন এক সাধারণ পরিমাপ ছিল না। হেড্‌ম্যানেরা অধীন প্রজাগণের সহিত একটা চুক্তি করিয়া লইতেন। অনন্তর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট এক "রিজলিউসনে" প্রকাশ করেন যে, "১৮৬৯ সনে প্রত্যেক জুমিয়া-পরিবারের উপর ৪ টাকা খাজনা নির্ধারণের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। কাপ্তেন লুইন বলেন, এ সময়ে কোন সাধারণ পরিবর্তন বা নূতন নির্ধারণ উচিত নহে। তবে গভর্নমেন্ট ধর্মাধিকরণে এতৎসম্পর্কীয় বিচার নিষ্পত্তির সময় ৪টাকা হিসাবে মীমাংসিত হইবে" বস্তুতঃ কাপ্তেন লুইনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই (১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে) এখানে "পারিবারিক-কর" প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৮৭৪ অব্দে বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট বলেন, এই জুমকর রাজস্বের ভিত্তিস্বরূপেই গৃহীত হইবে।

জুমকর নির্ধারণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হইবার পূর্বে কর্ণফুলী নদীর শুল্ক একমাত্র চাক্‌মা রাজারই অধিকারে ছিল। তজ্জন্য মোগল বা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে কোন রাজস্ব দিতে হইত না। কিন্তু ক্রমে ইহাতে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং হাত পড়ে। তখন কালিন্দী রানীর সহিত —১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ৭৫৬৬ টাকা জমায় ইহার বন্দোবস্ত হয়। পরে পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লুইন এই বন্দোবস্তে রানীর বার্ষিক লাভ কত হইতেছে, জানিতে চাহেন, রানী তদুত্তরে পূর্বোক্ত পাঁচ বৎসরের যে আয় তালিকা পাঠাইয়াছিলেন[১৩৬]। তাহা হইতে লুইন মহোদয় প্রথম তিন বৎসরের হার কষিয়া বার্ষিক ২২৮৬ টাকার অর্ধেক ১১৪৩ টাকা, বন্দোবস্ত ব্যতিরেকেই কালিন্দী রানীকে বার্ষিক দিয়া কর্ণফুলীর শুল্ক আদায় ভার গভর্নমেন্টের বনবিভাগের (Forest Dept.) হস্তে গ্রহণ

কর্ণফুলী নদীর শুল্ক

(১৩৬) শুনিতে পাই, পাছে গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব বর্দ্ধিত করেন বা একবারে খাস করেন, সেই ভয়ে আয় তালিকায়

করিবার প্রস্তাব করিলেন। গভর্নমেন্ট এই নূতন অধিকার সাগ্রহে অনুমোদন করেন, পরন্তু রানীকে লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত (১৮৭২ সালের) লুসাই অভিযানে[১৩৭] তদীয় ব্যবহার বুঝিয়া স্থির করা হইবে আশ্বাসে বিবেচনাধীন রাখিলেন। অনন্তর সেই অভিযানের সাহায্যে সন্তুষ্ট হইয়া সহৃদয় গভর্নমেন্ট ৯ই অক্টোবরের (১৮৭২ সাল) ৫৭৬৩ নম্বর পত্রে পূর্বোক্ত ১১৪৩ টাকা চাক্‌মারাজার বার্ষিক জমা হইতে বাদ দিবার স্বীকার করেন। তদবধি কর্তৃপক্ষ এই বার্ষিক ১১৪৩ টাকা লুসাই অভিযানে চাক্‌মা সরদারের কৃত সাহায্যের পুরস্কার বলিয়া নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন।[১৩৮] রানী যে সকল ক্ষমতাশালী হেডম্যানকে দিয়া গভর্নমেন্টের এতাদৃশী সহায়তা করিয়াছিলেন, কথিত পুরস্কারের অংশ তাহাদিগকেও ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। যাহা হউক, অদ্যাপি চাক্‌মারাজ গভর্নমেন্টের রাজস্ব হইতে এই টাকা মুক্তি পাইয়া থাকেন।

রানীর রাজত্ব-বর্ণনা শেষ করিবার পূর্বে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আর দু'চারিটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। প্রকৃতি কার্যে প্রতিভাত হয়, ইহা বিজ্ঞানসম্মত ধ্রুব সত্য। লোকে যাঁহাদিগকে একান্ত গোঁড়া বলিয়া মনে করে, সেই দার্শনিক মহাশয়দেরও এইমত। এস্থলেও রানীর প্রকৃতি উপলব্ধি করিবার জন্য কোন উপকথা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুমহৎ কার্যাবলীই অনুষ্ঠাত্রীর সহৃদয়তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। রাঙ্গুনিয়ার "রানীর হাট" বোধ হয় যুগ যুগান্তর ধরিয়া তদীয় কীর্তি ঘোষণা করিবে। ইহার পূর্বে তিনি স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশে পদ্দোয়ায় "রাজার হাট" স্থাপন করিয়া ছিলেন। সর্বোপরি তাঁহার "মহামুনি" প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি মহাবিষুব সংক্রান্তিতে যাত্রীসঙ্গম ও সপ্তাহাধিককাল স্থায়ী বিরাট মেলার ব্যবস্থা — তাঁহার অক্ষয়কীর্তি! মহামুনি-মন্দির-বক্ষে স্থাপিত প্রস্তরফলকে

রানীর কার্য

লাভ সংখ্যা খুব কম করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু "ঠকাতে গেলেই ঠকিতে হয়" রানী আপন ফাঁদেই আপনি জব্দ হইলেন। অধুনা ইহার আয় যাবতীয় ব্যয় বাদেও লক্ষাধিক টাকা হইবে। রানীর সময়ে কি ২০/২৫ হাজারও ছিল না?

(১৩৭) ১৮৭০-৭১ খৃঃ অব্দে কুকিরা পুনরায় কাছাড়ে উপদ্রব আরম্ভ করে। সেইবার তাহারা কতিপয় ইংরাজ চাকরকে হত্যা করিয়াছিল, এবং নবম বর্ষ বয়স্কা মেরী উইনচেষ্টার নাম্নী এক ইংরাজ তনয়াকে লইয়া যায়। তখন এই ১৮৭২ অব্দে কাছাড় দিয়া একদল সৈন্য জেনারেল বুসিয়ারের এবং আর একদল চট্টগ্রাম দিয়া জেনারেল ব্রাউনলোর নেতৃত্বাধীনে তাহাদের আক্রমণ করে। ভারতের ভূতপূর্ব সেনাপতি ও ট্রান্সভালের ভীষণ সমর বিজয়ী লর্ড রবার্টস্ তখন লেপ্টেনান্ট কর্নেলরূপে দলে ছিলেন। (কুকি সর্দার ভলোনেলের নামানুসারে লর্ড রবার্টস তদীয় প্রিয় অশ্বের নাম "ভলোনেল" রাখেন, সেই ঘোড়া ১৮৭৭ ১৮৯৬ পর্যন্ত তাঁহার বাহক ছিল। স্বর্গীয়া সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আদেশে কাবুল বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ ভলোনেলের দেহ চারিটি সুবর্ণ পদকে সুশোভিত হয়।) চট্টগ্রামের সৈন্যদলই মেরী উইনচেষ্টার প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়াছিল। এস্থলে বলিয়া রাখি, সেই দুঃসময়ে স্বর্গত রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর উক্ত কাছাড় সৈন্যদলের সহিত ছিলেন, তাঁহার তদানীন্তন সাহস ও বিক্রমের কথাও গৌরবের সহিত উল্লেখযোগ্য। অনন্তর এই বর্বরজাতি হইতে এদেশ রক্ষা করিতে কর্তৃপক্ষ রাঙামাটিতে ৬৫৬ জন সিপাহী রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে মার্টিনী হেন্‌রীর বন্দুকসহ ১৩৮ জন মাত্র আছে।

(১৩৮) Vide - Commissioner's letter no. 998 dated 10th December, 1873

তিনি যে বিনীত নিবেদন(১৩৯) লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে তাঁহার অলৌকিক উদারতা — অত্যুজ্জ্বল ধর্মোন্মাদনা সহজেই প্রতীত হইয়া থাকে। যেরূপ শুনিতে পাই, সেই সময়কার তুলনায় বাঙ্গালা ভাষাতে তাঁহার বেশ দখল ছিল। রানীর লিখিত অপর কোন লিপি পাওয়া যায় না, আমরা বহু যত্নে তদীয় একটি স্বাক্ষর মাত্র এস্থলে রক্ষা করিতে পারিলাম। —

শ্রীমতিকালিন্দী রানী (স্বাক্ষর)
শ্রীমতী কালিন্দী রানী

বলা বাহুল্য তাঁহার আমলেই বাঙ্গালার সর্বপ্রথম প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছি, বহুদিন পরে পারসীর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা গেল। পক্ষান্তরে তাঁহারই সময়ে (১৮৩৭ খৃঃ অব্দে) গভর্নমেন্ট বিচারালয় প্রভৃতিতেও পারসি স্থলে ইংরাজী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা মুসলমানদিগের পক্ষে আক্ষেপের কারণ, সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাদের এই কথা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া উচিত যে, রাজভাষা ছায়ার ন্যায় রাজার অনুগামী হইতে বাধ্য, তাঁহাদের প্রাধান্যকালেও এই নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। এদিকে রানীর সহানুভূতিতে সমগ্র চাক্‌মা সমাজেই বাঙ্গালা ভাষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

এক্ষণে রানীর ধর্মাভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে। সাহস সহকারে বলা যায় যে, ইহাতে তিনি সমুদয় স্ত্রী-সমাজেরই মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ধনসম্পত্তিতে মগ্ন রহিয়া, এমন রাজ্যাধীশ্বরী হইয়াও তাঁহার মত ধর্ম্মচর্যা করিয়াছেন, এহেন রমণীর উদাহরণ বর্তমান যুগে নিতান্ত বিরল! তিনি পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিতা হইলেও সকল ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আলিঙ্গন করিতেন। বিশেষতঃ হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সমাজে তাঁহার এরূপ নিরপেক্ষ ও মাখামাখি ভাব ছিল যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে আপনাদের দলভুক্ত মনে করিতেন।

রানীর ধর্ম্মভাব

হিন্দুধর্মে—

তাঁহার মত ভক্ত কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। স্বর্গীয় গোকুল চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি ৭/৮ জন ব্রাহ্মণ প্রতিনিয়ত রাজালয়ে থাকিতেন। তাঁহারা প্রত্যহ বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা ইত্যাদি করিয়া তৎচরণামৃতসহ নির্মাল্য দান, এবং প্রাতঃ ও সায়ংকালে রানী-সকাশে বিভুনাম কীর্তন করিতেন। এতভিন্ন শনিবারে শনিপূজা, বৎসরান্তে নবগ্রহার্চনা, শ্রাবণে বিষহরী, আশ্বিনে ভগবতীদুর্গা ও লক্ষ্মী—কার্তিকে দীপান্বিতা ব্রতসংযুক্ত কালী — মাঘে সরস্বতী পূজা এবং ফাল্গুনে দোলমঞ্চে রাধাকৃষ্ণের সেবা প্রভৃতি নিত্তনৈমিত্তিক ব্রত পূজাদি যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইত। ফাল্গুনের অমাবস্যায় বিরাট সমারোহে রাজানগর হইতে চারি মাইল উত্তরবর্তী কালীপুরে কালীপূজা

(১৩৯) ১১৩ পৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইল।

হইত। তথায় এক ইষ্টকময় কালীমন্দির ছিল[১৪০]। রানী উক্ত তিথিতে পার্শ্বপ্রবাহিতা ইচ্ছামতী[১৪১] উপনদীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া শুচি হইতেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ দান-দক্ষিণা দিয়া শি.বিকা-রোহণে স্বকীয় "গোলবদনী" প্রভৃতি ১৮টি সুসজ্জিত হস্তী ও বহু অনুচর পূর্ণ নানা আড়ম্বরের সহিত কালীপুর যাইতেন। তথায় যথাবিধি পূজা, বলি প্রভৃতি হইয়া না গেলে তিনি আহার্য গ্রহণ করিতেন না। পরদিন তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালেও পূর্বরূপ আনন্দোৎসব চলিত।

তদীয় প্রাত্যহিক উপাসনা পদ্ধতি আরও মহত্তর ছিল। বাস-ভবনের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠ তিনি পূজার নিমিত্ত নির্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তাহাতে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিলই না, এমনকি তাহা পরিষ্কার করিবার ভারও রানী স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। মালাকার প্রতিদিন পুষ্পচয়ন করিয়া বহিঃপার্শ্বস্থ নাগদন্তকে সাজি তুলিয়া রাখিত। তিনি অবগাহনান্তে পট্টাম্বর পরিধান পূর্বক পুষ্পপাত্র সাজাইয়া পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিতেন, পূজাকালে অষ্টোত্তরশত ঘৃতদীপ যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। প্রজ্বলিত শ্বেতচন্দনে মৃগনাভি মিশ্রিত গুগগুল ধূপ পুড়িয়া চতুর্দিক আমোদিত করিয়া তুলিত এবং থাকিয়া থাকিয়া ঘণ্টা রবসংযুক্ত শঙ্খের ভৈরব হুঙ্কারে সমন্তাৎ বিকম্পিত হইত! তৃতীয়বার বাদ্যধ্বনি হইয়া গেলে, পূজক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপাদোদক্ ও ব্রহ্মপাদোদক এবং রজত থালায় শুভ নির্মাল্য লইয়া বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেন। পূজা সম্পন্ন হইয়া গেলে প্রিয় সহচরী দুইজন বাহুযুগল ধারণ করিয়া তাঁহাকে দ্বিরদ-রদনির্মিত সিংহাসনে উপবেশন করাইত। অনন্তর দ্বিজবর শিরোপরি আশীষ পুষ্প প্রদান করিলে তিনি উল্লিখিত পাদোদক গ্রহণ পূর্বক আহারার্থে গমন করিতেন।

নিত্যপূজা

রাজসভায় প্রায়শঃ শাস্ত্রালোচনা চলিত। তিনি পর্দান্তরাল হইতে শ্রবণ করিতেন এবং আবশ্যক বা সন্দেহ স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন। একদা এরূপ আলোচনা কালে তিনি সমবেত সুধীগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পূর্ব জন্মকৃত কোন্ পাপে ইহলোকে পুত্রহারা এবং অকালে পতি-বিয়োগ যন্ত্রণা পাইতে হয়। বলা বাহুল্য এই প্রশ্নে রানী স্বীয় হতভাগ্যের কারণই জানিতে চাহিয়াছিলেন। পণ্ডিত মণ্ডলী নানা আলোচনার পর স্থির করিলেন, 'কর্ম্মবিপাক' নামক শাস্ত্র পাঠে ইহা নির্ণীত হইবে। অনন্তর সকলের নির্দেশক্রমে চট্টগ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত পরলোকগত রামমণি ন্যায়বাগীশ এবং গোপীনাথ শিরোমণিকে আনাইয়া শুভদিনে উক্ত শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করা হয়। রানী স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্বক অজিনাসনে উপবেশন করিয়া ভক্তিভাবে তাহা শ্রবণ করিতেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পাঠের পর নির্ধারিতহইল, পূর্বজন্মে অপরের পতিকে বশীভূত করিয়া স্বামীবিরহ যন্ত্রণা প্রদান করিলে

পাপতত্ত্ব

(১৪০) এই কালিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কালীর নামেই বোধ হয়, গ্রামের নাম কালীপুর রাখা হইয়াছিল। ইহা কালিন্দী রানী যা ৩৭ পূর্ববর্তী চাকমারাজারই কীর্তি চিহ্ন হইবে।

(১৪১) 'ইচ্ছামতী' ও প্রাগুক্ত 'শিলক' নাম্নী উপনদীদ্বয় পরস্পর বিপরীতাভিমুখ হইতে আসিয়া কর্ণফুলী নদীর একই স্থানে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই মহাসঙ্গম সন্নিধানে ইচ্ছামতী দেবীর মন্দির আছে। চট্টগ্রামের হিন্দুসমাজ দেবী ইচ্ছামতী এবং তদীয় স্রোতোধারার প্রতি সবিশেষ ভক্তিপরায়ণ। প্রতিদিনই তথায় কাহাকেও না কাহাকে মানস দান করিতে দেখা যায়। বিস্তারিত বিবরণ ১৩১০ সনের "সাহিত্যে" ইচ্ছামতী শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বালবৈধব্য ভোগ অবশ্যম্ভাবী[১৪২], এবং হিংসাপরবশে পর পুত্রের জীবন বিনষ্ট করিয়া থাকিলে ইহজন্মে নিশ্চিত পুত্রহারা হইতে হইবে[১৪৩]। উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া চতুর্দশী তিথিতে শিবপূজা পূর্ব্বক রৌপ্য বৃষারূঢ় সুবর্ণ হরগৌরী প্রতিমা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, এবং সুবর্ণোপবীত বিষ্ণুর নামে উৎসর্গ করিয়া হোমান্তে ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলে, যথাক্রমে বৈধব্য ও মৃতবৎসা (গর্ভস্রাব) দোষ হইতে মুক্তি পায়[১৪৪]। বলাবাহুল্য, তিনি অনতিবিলম্বেই বহু অর্থব্যয় ও কঠোর শ্রমস্বীকারে উক্ত পুণ্যব্রতদ্বয়ের অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর তিনি এক মহান্নদানও করিয়াছিলেন, তাহাতেও প্রায় ২৮০০০ টাকা ব্যয় হয়।

মুসলমান ধর্মেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি রাজভবনের (রাজানগর) সম্মুখীন বৃহৎ সরোবরের উত্তরবর্তী জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে একখানি মসজিদ্ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে 'আজান' এবং যায়ং সময়ে প্রদীপ দিতে একজন বিশুদ্ধাচারী খোন্দকার নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। প্রতি 'জক্ষা' অর্থাৎ শুক্রবারে খোন্দকার, মৌলবী, কাজী প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া, বাহিরের ঘরে আধমণ দুগ্ধের পায়সান্ন রন্ধন করত — হজরতের সরামতে খোদার নামে নিবেদনান্তর অনেকানেক মুসলমানকে খাওয়াইতেন। এতদ্ভিন্ন নানাস্থানে মসজিদের সাহায্যার্থ রাজসরকার হইতে অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

মসজিদ্ নির্মাণ

বৌদ্ধ ধর্মে — প্রথমতঃ সাধারণ প্রসক্তিমাত্র ছিল। অনন্তর এক সময়ে আরাকান হইতে সংঘরাজ এবং হার্‌বাঙের গুণামেজু নামক প্রসিদ্ধ ভিক্ষুদ্বয় আসিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মে প্ররোচিত করেন[১৪৫]। তাঁহাদের প্রমুখাৎ ভগবান্ সম্বুদ্ধের চরিতামৃতকাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি

(১৪২) "যান্যং পতিং বশীকৃত্য স্বামিবিচ্ছেদবহ্নিনা। পীড়য়েৎ স্ত্রিয়মন্যাঞ্চ বালবৈধব্যমেতি সা।।"
--- ইতি চৈত্র মাহাত্ম্যম্।

(১৪৩) "কদনং হিমহাঘোরং পরপুত্রাভিঘাতনং। নিরয়ং
বিবিধং ভুক্তা যোষিজ্জন্ম অবাপ্যচ।।
অজস্রং গর্ভস্রাবজং দুঃখং পরম দারুণং।
মরণা দ্বৈপর তচ্চ দুর্ব্বহং যন্ন শক্যতে।।"
ইতি ভৃগুবাক্যম্
(ইহা গর্ভস্রাবের কারণ হইলেও, মৃতবৎসা সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা এই হেতু নির্দেশ করেন।)

(১৪৪) "উমামাহেশ্বরী কার্য্যা প্রতিমা স্বর্ণ সম্ভবা। ত্রিকর্ষস্য তদর্দ্ধস্য কর্ষাস্যাপিমিতস্য চ।। দ্রব্য শাঠ্যং ন কুর্ব্বীত সর্ব্বথা হিতমিচ্ছুকঃ। স্থাপয়েৎ শ্বেত বস্ত্রাঢ্যে রাজতে বৃষভে শুভে।। ব্যাঘ্রাজিন সমাকীর্ণে সংস্থাপ্যাভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ। উপবাসেন তত্রাদৌ চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতঃ।। শৈবং সাহস্রিকং হোমং কুর্য্যাদ গৌর্য্যাশ্চ যত্নতঃ। প্রাপ্তে প্রভাত সময়ে স্নত্বা সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ।। আহূয় বেদবিদুষো ব্রাহ্মণান্ পরিপূজ্য চ। অর্পয়েৎ প্রতিমাং শম্ভোর্বৈধব্যদোষ শান্তয়ে।। শৃণু রাজন্। প্রবক্ষ্যামি দানং বৈধব্য নাশনং। উমা মাহেশ্বরং নাম যা নারী কুরুতে ব্রতং।। সধবা শ্রদ্ধয়া যুক্তা শৃণু প্রাপ্নোতি যৎ ফলং। জন্ম জন্মান্তরে ক্বপি বৈধবং লভতে নহি। ইতি অত্রিবাক্যং! "যজ্ঞোপবীতং কুর্ব্বীত কাঞ্চনস্য স্বশক্তিতঃ। রৌপ্যপাত্রে চ সংস্থাপ্য পলার্দ্ধে নার্দ্ধতোপি বা।। গন্থি প্রদেশে দেয়ন্তু মৌক্তিকং বাপিরাজতং। প্রক্ষাল্য পঞ্চগব্যেন গায়ন্দ্র্যা তাম্রভাজনে।। অজে পাত্রোপরিস্থন্তু ধারয়েদুপবীতকং। গন্ধ পুষ্পাক্ষৈর্ধূপৈর্নৈ বেদ্যৈরপি ভক্তিতঃ।। চতুর্ব্বাহুং বিভুঃ বিষ্ণুং শঙ্খ চক্র গদাধরং। প্রপূজ্য কারয়েদ্ধোহমং মন্ত্রৈর্বৈষ্ণব সংজ্ঞকং।। তিলাজ্যমধুনা মিশ্রং যবৈরষ্টোত্তরং শতং। হোমান্তে ব্রাহ্মণে দেয়ং শ্রদ্ধয়া চোপবীতকং।।"
ইতি ভৃগুব্যক্যং।

(১৪৫) কেহ কেহ এ সম্বন্ধে সিংহলে অধীতবিদ্য হরি ঠাকুর নামক জনৈক চট্টগ্রামবাসী ভিক্ষুর দাবিই অগ্রগণ্য বলিয়া থাকেন।

বিমুগ্ধ হইলেন এবং অনতিকালবিলম্বে শুভদিনে যথাবিধি তদ্‌ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। পরে ইহাদেরই উপদেশে রাজানগর রাজভবনের পূর্ব পার্শ্বে সুরম্য নবরত্ন মন্দির প্রস্তুত করিয়া— চট্টগ্রাম, আরাকান ও লঙ্কাদেশের নানা ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ পূর্বক মহাসমারোহে বাঙ্গালা ১২৭৩ সনের ৮ই চৈত্র দিবসে আরাকানের অনুকরণে "মহামুনি" স্থাপন করেন। তৎ-মন্দিরের আংশিক চিত্র এই। —



মন্দিরের বক্ষেই প্রস্তরফলকে খোদিত আছে, — (১)

"শ্রী শ্রী ভোক্ত

ফড়া

বিজ্ঞাপন

সর্বসাধারণের অবগতার্থে এ বিজ্ঞাপন, প্রচার করিতেছি যে, অত্র চট্টগ্রামস্থ পর্বতাধিপতি আদৌ রাজা সেরমস্থ খাঁ তৎপর রাজা যুকদের রায় অতঃপর রাজা সের দৌলত খাঁ পরে রাজা জানবক্স্ব খাঁ অপরে রাজা টর্ব্বর খাঁ অনন্তর রাজা জর্বর খাঁ আয্যপুত্র রাজা ধরমবক্স্ব খাঁ তৎসহধর্ম্মিণি আমি শ্রীমতি কালিন্দীরানি আপোন অদৃষ্ট সাফল্যাভিলাসে তাহানদ্বিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাযুচক নমস্কার প্রদান করিলাম মদীয় পূর্ববর্ত্তির ধর্মাথে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধিসাধন জন্য দ্বিগ্‌দ্বেসিয় অনেকানেক যুধিগণ কর্তৃক সাস্ত্রানুসারে ১২৭৬ বাঙ্গালার ৮ চৈত্র দিবসে অত্র রাজানগর মোকামে স্থলকুল রত্নাকর "চিঙ্গ" সংস্থাপন হইয়াছে তাহাতে আজম্মাবধি বিনা করে বৌদ্ধধর্ম্মালম্বি ঠাকুর হইতে পারিবেক উল্যেখিত পুণ্যক্ষেত্রের দক্ষিণাংশে শ্রীশ্রী ছাইক্য মুনি স্থাপিত হইয়া তদুপলক্ষে প্রত্যেক সনাখেরিতে মহাবিষুব যে সমারোহ হইয়া থাকে ঐ সমারোহেতে ক্রয় বিক্রয় করণার্থে যে সমস্থ দোকানি ব্যাপারি আগমন করে ও মঙ্গলময় মুনী দরর্শনে যে সমস্থ জাত্রিক উপনিত হয়, তাহারার দ্বিগ হইতে

প্রস্তর-লিপি

কোন প্রকারের মহাষুল অর্থাৎ করগ্রহণ করা জাইবেক না ইদানিক কি ভবিষ্যতে উল্যেকিত ব্যক্তিগণ হইতে ইহা লঙ্ঘন করিয়া কর গ্রহণ করি বা করাই কি করে বা, করায় তবে এই জর্ম্মে ঐ জর্ম্মে এবং জর্ম্মে জর্ম্মে মহাপাতকি পাত্র পরিগণিত হইবেন।

কিমাধিক মিতি * * *"

এই অনুশাসন লিপির অক্ষরে অক্ষরে রানীর প্রগাঢ় বুদ্ধ বিশ্বাস এবং অমানুষিক উদারতা প্রতিভাত হইতেছে। সুখের বিষয়, তদীয় উপযুক্ত উত্তরাধিকারিগণ কায়-মনোবাক্যে উক্ত "রানীর আদেশ" প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

অতঃপর রানী অন্তিমে পুত্রকার্য হইবে না বলিয়া, একটি মহাদানে ব্রতী হইলেন। তাহাতে সাধারণ পরিবারে যাহা যাহা প্রয়োজন, তৎসমস্তই পর্যাপ্ত পরিমাণে চট্টলের ভিক্ষুগণকে সম্প্রদান করেন এবং এই সঙ্গে ব্রাহ্মণকেও একপ্রস্ত (Set) রজত বাসন দান করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, প্রায় দুই সহস্র রবাহূত নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মকে ১।০ পাঁচসিকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হয়। অগণিত ভিক্ষুকও সমবেত হইয়াছিল, ভোজনে ও পারিতোষিক লাভে সকলেই পরিতুষ্ট হইয়া যায়। কিছুকাল পরে পুনঃ পূর্বোক্ত ভিক্ষুদ্বয় এবং উনাইনপুর (চট্টগ্রাম) - নিবাসী চন্দ্রকুমার ভিক্ষু রাজভবনে উপস্থিত হন, সেই সুযোগে রানী প্রায় সপ্তাহকাল ধরিয়া তাঁহাদের মুখে বুদ্ধ - প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন। অনন্তর অবোধ চাক্‌মা প্রজাসকলের মধ্যে ধর্মজ্ঞান বিস্তার-কামনায় অমিয় বুদ্ধচরিত পালি হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত করাইতে সঙ্কল্প করেন। এই পণ্ডিতবর্গের মতানুসারেই নয়াপাড়া (চট্টগ্রাম) নিবাসী কুল লোথক দ্বারা ব্রহ্মভাষার "থাদুত্তোয়াং" নামক পুস্তকের অনুবাদ করাইয়া, বাবু নীলকমল দাস কর্তৃক লিখাইয়া লন। এই পুস্তকের নাম দেওয়া হইল — বৌদ্ধরঞ্জিকা।" ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্মবিবরণ হইতে ধর্মপ্রচার, নির্বাণ-ঘোষণা এবং পরিশেষে প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের উপর যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিয়া তিরোভাব ইত্যাদি সমুদয় কথা সরল পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। পরে তিনি ইষ্টকময় 'ক্যং'[(১৪৬)] নির্মাণে মনোযোগ দেন। সর্বাঙ্গীণ চেষ্টায় যথাসম্ভব সত্বর মন্দির প্রস্তুত হইল। কিন্তু কি দৈব্য-দুর্বিপাকে — উপরের কার্য শেষ করিয়া মিস্ত্রীগণ অবতরণ মাত্র সর্বোচ্চ চূড়াটি ভূপতিত হইয়া গেল। রানী এই দুঃখাবহ সংবাদে অতিশয় মর্মাহতা এবং ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তিতা হইলেন, মন্দির পুনর্গঠনের নিমিত্ত লোক নিয়োজিত করিলেন। তখন শারদীয় পূজা সমুপস্থিত, দুইজন পূজক ব্রাহ্মা ব্যতীত হিন্দুকর্মচারিগণের আর সকলেই বিদায় পাইয়াছিলেন। কেবলমাত্র বাবু নীলকমল দাসের উপর আদেশ রহিল, বিজয়া দশমীতেই বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া আসিতে হইবে। পরবর্তী মাসে 'ক্যং'[(১৪৭)] প্রতিষ্ঠার কামনা আছে, সেই সময়ে চাক্‌মাদিগের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্ত তিনি ইতিমধ্যে শীঘ্রই কলিকাতা গিয়া ১০০০ এক হাজার "বৌদ্ধরঞ্জিকা" মুদ্রিত করিয়া আনিবেন।

ধর্মপ্রচার চেষ্টা

(১৪৬) লিপিখানি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, সুতরাং ভাষা বা বর্ণাশুদ্ধি মার্জিতব্য।

(১৪৭) 'ক্যং' -- বৌদ্ধমঠ।

কিন্তু হায় — সেই ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১২৮৩ সনের ৫ই আশ্বিন বিপুল শারদীয় উৎসবের সময় রানী স্বীয় পূজাগৃহে বসিয়া প্রাত্যহিক ইষ্টসাধনা করিতেছিলেন, এহেন সময় গৃহমধ্য হইতে ঘোর দৈবনির্ঘাত-ধবনি উত্থিত হইল। তাহাতে ভয় পাইয়া প্রিয় সহচরীদ্বয় অতি সন্তর্পণে কপাট খুলিয়া দেখিতে পাইল, রানী নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপপ্রায় নিশ্চল ভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে রহিয়াছেন। ইহাতে তাহারা আরও ভয়াতুর হইয়া "মা-মা" আহ্বানে রানীর হস্তাকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিলেন, "কেন তোমরা পূজাগৃহে প্রবেশ ও আমাকে অসময়ে স্পর্শ করিয়াছ?" তাহারা কাতরতার সহিত অবিবেচকতার নিমিত্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিল। প্রিয়তমা সখিগণের কাতর নিবেদনে রানী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, "যা হউক এক্ষণে আমাকে বিছানায় লইয়া চল।" অতঃপর তাহারা অতিসাবধানে রানীকে পর্যঙ্কোপরি লইয়া গেল, কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার বক্ষস্থলে এক সাংঘাতিক বেদনা উপস্থিত হইল। তাহা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তিনি যুবরাজ হরিশ্চন্দ্রকে ডাকাইলেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র যুবরাজ সহধর্মিনীদ্বয়ের সহিত রানীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি মুমূর্ষাজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'হরিশ এই লও তোমার — ধনসম্পত্তি রাজ্য সকলই তোমার, আশীর্বাদ করি, — ভগবানের কৃপায় তুমি দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সংসারের সুখে কালাতিপাত করিতে থাক, স্বধর্মে মনোনিবেশ করিয়া পুত্রবৎ প্রজাপালনে তৎপর হও। আমি যাইতেছি, আমাকে জন্য অই স্বর্গীয় দূত রথ লইয়া শূন্যমার্গে অপেক্ষা করিতেছে, আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আমা-র জ-ন্য—কাঁ-দি-ও-না"। এই শেষ হইল — বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের প্রাণপাখীও মর্তের এ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তখন করুণ আর্তনাদে রাজপুরীতে যে কি ভীষণ কোলাহল উঠিয়াছিল, সে বর্ণনা করিয়া ফল নাই(১৪৮)। কিন্তু হায়! রানীর চিরাভীপ্সিত ক্যাং-উৎসর্গ এবং বৌদ্ধরঞ্জিকা বিতরণ(১৪৯) হইল না! অবশেষে যথাসময়ে মহামুনি মন্দির ও কং-ভবনে মধ্যভাগে চন্দনকাষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ ঘৃত সহযোগে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সমাহিত হইল। এক্ষণে তদুপরি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রানীর অমরকীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

রানীর স্বর্গযাত্রা

ডেপুটি কমিশনার কাপ্তেন লুইনের পত্রে রানী কালিন্দীর মৃত্যু(১৫০)-সংবাদ জানিয়া অস্থায়ী কমিশনার মিঃ এইচ্.এ. কোকারেল বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট সমীপে "বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়

(১৪৮) এইমাত্র বলিলেই সম্ভবতঃ যথেষ্ট হইবে যে, রানীর মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া তদীয় প্রিয় হস্তিনী "গোলবদনী" কর্ত্রীর শ্মশানে গড়াইতে গড়াইতে — কাঁদিয়া কাঁদিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, অবশেষে নাকি তাহাকেও প্রায় চল্লিশ টাকার নববস্ত্রমণ্ডিত করিয়া সৎকার করা হইয়াছিল।

(১৪৯) শুনা যায়, পরিশেষে রাঙামাটি স্কুলের আদি শিক্ষক হামিদ মহোদয়ের সম্পাদকতায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা বহুকষ্টেও তাহা কিরূপ হইয়াছিল – দেখিতে পাইলাম না।

(১৫০) পরন্তু মধ্যমা ঠাকুরানী আটকবিবি আরও কিছুকাল ইহলোকে ছিলেন। চট্টগ্রামের ভীষণ ঝটিকার বৎসর (১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাহাদুরের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্বন্ধে এবং চাক্‌মাজাতির পারিবারিক করের বন্দোবস্তির ও শাসনকার্যের সুবিধান নিমিত্ত প্রাচীন পদ্ধতিমতে তাহাদের জাতীয় শৃঙ্খলাবিধান বিষয়ক এক "গোপনীয় পত্র" *প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাননীয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর কমিশনারমহোদয়ের প্রায় যাবতীয় প্রস্তাবই অনুমোদন করেন। রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ্‌.এল. ডেম্পিয়ার কমিশনারকে জানাইলেন+ ঃ-

*Letter No. 988, Dated 10.12.1873

* *
* * * * *

+Letter No. 154, Dated 21.01.1874

"২। রানী চাক্‌মাদিগের প্রদত্ত খাজনার সরবরাহকার মাত্র ছিলেন। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সত্ত্ব পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গভর্নমেন্টের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী ২৯৫ নম্বর পত্রে লেপ্টেনান্ট গভর্নর রানীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবি এবং সরবরাহকারিণী অপেক্ষা উচ্চতর পদবী অস্বীকার করেন — বিশেষরূপে মীমাংসিত এসকল কথা রানীকে অবগত করাইতেও লিখিয়াছিলেন।

"৩। ইহা প্রস্তাব হয় যে, হরিশ্চন্দ্রের সময় পর্যন্ত এই সরবরাহকার প্রথা চলিবে। জমা সম্বন্ধে (যাহা নাকি আপনার পত্রের ৭ম হইতে ৯ম "প্যারায়" বিবৃত হইয়াছে) গভর্নমেন্ট অপরাপর জাতির নিমিত্ত পূর্বে যাহা অনুমোদন করিয়াছেন, সেই পরিবার প্রতি চারি টাকা হারে পারিবারিক-কর ধার্য হইবে। ইহা হইতে এক টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ হেড্‌ম্যান, দুই টাকা সরবরাহকার হরিশ্চন্দ্র পাইবেন এবং অবশিষ্ট এক টাকা রাজস্ব গভর্নমেন্ট গ্রহণ করিবেন। যদিও ৪টাকা করিয়া প্রত্যেক পরিবার হইতে কর গ্রহণ করা সাধারণ নিয়ম রহিল, কিন্তু সরবরাহকার চাক্‌মাগণ হইতে এই খাজনা কম বা বেশী যাহাই হউক না কেন, সেই পূর্ব প্রচলিত প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিতে কাপ্তেন লুইন প্রস্তাব করেন নাই। ইহাও প্রস্তাবিত হয় যে, যতদিন পর্যন্ত কোন বিবাদবিসম্বাদ ব্যতিরেকে তাহারা এইভাবে চলিতে পারে, ততদিন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এ সমুদয় প্রস্তাব অনুমোদিত হইল।

"৪। এই কর নির্ধারণের পূর্বে যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল, যাহা বর্তমানে চলিতেছে, তাহার গণনা ও রেজেস্টারী শেষ করা আবশ্যক। ইহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কালিন্দী রানীর সহিত যে সকল সর্তে বন্দোবস্তি হইয়াছিল, সেই করারে কর আদায় করিবার নিমিত্ত হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা হইল। আপনি দেখাইয়াছেন, এই অস্থায়ী বন্দোবস্ত ১০৮১।৪ পাইতে হইবে, ইহা রানী কালিন্দীর সময়ের ২০৮৫/৪ সিক্কা (অর্থাৎ টাকা ২২২৪।৪ পাই) জমা হইতে লুসাইবিদ্রোহে সাহায্য করায় ১১৪৩ টাকা বাদ গিয়া অবশিষ্ট থাকে। এই অভিযান কালে গভর্নমেন্ট হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র বিশেষ সন্তোষের সহিত দেখিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত

তাঁহাকে তত্ত্বাবধান-ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছিল।(১৫১) তাহা উল্লেখ করিয়া লেপ্টেনান্ট গভর্নর এই প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত অনুমোদন করেন। হরিশ্চন্দ্রকে ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, কর স্থায়িরূপে হ্রাস করা হইল না।

"৫। লেপ্টেনান্ট গভর্নর আরও ইচ্ছা করেন যে, ন্যূনজমাতে অস্থায়ী বন্দোবস্তি দিতে ইহা স্বীকার করাইয়া লওয়া হউক, তিনি চাক্‌মাদিগের গণনা এবং রেজেষ্টারী সম্পাদন বিষয়ে রাজভক্তিপূর্ণ সাহায্য করিবেন, অন্যথা শাস্তিস্বরূপ পূর্বজমা ২০৮৫।৪ পাই দিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন "৬। ইহাও প্রস্তাব করা যায় যে, হরিশ্চন্দ্রের বাসস্থান পার্বত্যদিগের মধ্যে রাখিবার নিমিত্ত এই বন্দোবস্তির একসর্ত থাকিবে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে জেদ্ করাও হইবে।" অনন্তর গভর্নমেন্টের সরবরাহকার স্বরূপে "রাজা"(১৫২) পদবী দিয়া হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। বলা বাহুল্য এতদিন পরে "মুনিমা গোছার" "ধাবানা" বংশ হইতে "ওয়াংঝা গোছার" কাঁকড়া" বংশ রাজগৌরব লাভ করিল। তাঁহার সময়ের দুইটি মোহর প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটিতে অঙ্কিত আছে, —

রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর

"শ্রীহরিশ্চন্দ্ররায় বাহাদুর"

অন্যটিতে —

"শ্রীযুক্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর"

বাদামী আকারে উভয় মুদ্রাতেই ইংরাজী ও বাঙ্গালায় এই নাম দুইটি খোদিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এসময় হইতে মুদ্রাগুলির আকার এবং অক্ষর মার্জিত হইতে আরম্ভ হইল।

রাজত্বভার গ্রহণ করিয়াই হরিশ্চন্দ্র সর্বপ্রথমে এই পার্বত্য-প্রদেশে লাঙ্গলের চাষ প্রবর্তিত করেন।(১৫৩) তাঁহার দ্বিতীয় কার্য রাঙামাটি-রাজবাড়ীর পার্শ্ববর্তী "সিঙিনালা" নামধেয় সুবিশাল ভূমি আবাদ। এস্থান পূর্বে ঘোরতর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, ব্যাঘ্র-বরাহাদি হিংস্র বন্য জন্তু সতত বিচরণ করিত। এক সময়ে যে স্থানের নাম মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হইত, — রাজা

(১৫১) অধিকন্তু এই লুসাই অভিযানের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া সহৃদয় বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট চট্টগ্রামের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ হেঙ্কী (Hanke) মহোদয়ের যোগে হরিশ্চন্দ্রকে ১৫০০ টাকা মূল্যের সুবর্ণ ঘড়ী ও চেইন এবং "রায়বাহাদুর" -- রাজসম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ঘড়ী ও চেইন অদ্যাপি বর্তমান রাজাবাহাদুর ব্যবহার করিতেছেন।

(১৫২) গভর্নমেন্টের সরবরাহকার স্বরূপে রাজা অর্থাৎ ভূমি সম্বন্ধে যাবতীয় সত্ব গভর্নমেন্টের খাস অধিকার ভুক্ত। রাজা কেবল অধিবাসীদিগকে শাসন করিবেন এবং তাহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজস্বের এক নির্দিষ্ট অংশ পারিতোষিকস্বরূপে বাখিয়া অবশিষ্ট যথাসময়ে গভর্নমেন্টে দাখিল করিবেন।

(১৫৩) বরাদমের নীলচন্দ্র দেওয়ানও এই লাঙ্গলের চাষ প্রবর্তনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। গভর্নমেন্টের পত্রেও ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। See - The Deputy Commissioner's letter no. 472, dated 17.6.1875.

হরিশ্চন্দ্রের চেষ্টায় আজ তাহা শ্যামল শস্যে পরিবৃত হইয়া দর্শকের নয়ন পরিতৃপ্ত এবং কৃষক কুটির ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ করিতেছে। কেবল এই দুই কার্যেও তিনি অমর হইয়া থাকিবেন।

সিঙিনালা আবাদ

রাজা হরিশ্চন্দ্রের শাসন-প্রারম্ভেই বঙ্গীয় গভর্নমেন্টে এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে চারিপ্রধান ভাগে[১৫৪] বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। ডেপুটি কমিশনার মিঃ পাউয়ার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ৪৭২ নম্বর পত্রে বিভাগীয় কমিশনারকে লিখিয়াছিলেন, "আমার মত এই, যে সকল জুমিয়া কোন রাজার অধিকার ছাড়িয়া খাসমহালে জুম করিবে, তজ্জন্য তাহাদিগ হইতে খাজনা ৪ টাকা স্থলে ৫ টাকা লওয়া হইবে এবং তাহার দুইটাকা যে রাজার অধিকার হইতে সে প্রজা আসিয়াছে, তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। চাক্‌মাদিগের কতকাংশ ফেণীকূলে বাস করিয়া থাকে। সেখানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০০ তিন হাজার। ইহাছাড়া চাক্‌মাসার্কেলের উত্তর সীমায় — চেঙ্গী উপত্যকাতে কতিপয় চাক্‌মা বসতি আছে। তাহাদিগের উপর হস্তক্ষেপ করা অবিবেচকতার কার্য্য হইবে। রাজা হরিশচন্দ্র উত্তর-পূর্ব সীমা নির্ধারণ কালে আপত্তি উত্থাপিত করেন। বোধহয় তিনি প্রজাগণের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ স্থান পাইতে উত্তরে চেঙ্গী ও কাচালঙের উপত্যকা এবং পূর্বে ছার্থে ও উনিপাম পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত চাহেন। এই আপত্তিতে আমার উত্তর এই, তিনি একটি উৎকৃষ্ট অংশ পাইয়াছেন। সেখান হইতে চাক্‌মাগণ (কুকি) আক্রমণ ভয়ে পলাইয়াছে, সেই চেঙ্গী উপত্যকা আমরা ত্রিপুরা ও পালৈংছা (মগুরাজার) জাতিকে দিব। চাক্‌মাদিগের রেজেষ্টারী প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহার ফল এযাবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। যাহা হউক জানা যায় যে, ইহাতে ৮৩টী তালুক (অর্থাৎ এক এক হেড্‌ম্যানের অধীন করদ মৌজা) আছে। স্থলতঃ ১৭৯৬ পরিবার খাজনা দেয় এবং ৫৮৯ পরিবার নিস্কর। বোধ হয়, মোটের উপর কিছু বেশী হইবে।"

সার্কেল-বিভাগ প্রস্তাব

আবেদন

সার্কেল বিভাগে রাজা হরিশচন্দ্র যে আপত্তি করেন, এ স্থলে সেই আবেদন পত্রখানির অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

"বর্তমান মাসের ৫ই তারিখের ডেপুটি কমিশনার বাহাদুরের পরওয়ানায় জানিতে পারিলাম, গভর্নমেন্ট পার্বত্য রাজাদিগের শাসিতব্য প্রদেশের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা মাত্র স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশবাসী জুমিয়াগণ হইতে পারিবারিক-কর আদায় করিতে পারিবেন, স্ব-জাতীয় সকলের নিকট হইতেই খাজানা আদায় চলিবে না। আবেদনকারী নিম্নোক্ত প্রার্থনাগুলি বিচার ও আদেশের নিমিত্ত উপস্থিত করিতেছে।

"২। গভর্নমেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, এই জেলা চারিটি করদ সার্কেলে বিভক্ত হইবে। তাহারই মীমাংসাকল্পে বিভাগীয় কমিশনার লর্ড ইউলিক ব্রাউন, ডেপুটি কমিশনার কাপ্তেন

(১৫৪) (১) চাকমা সার্কেল, (২) বোমাং সার্কেল, (৩) মঙ্ সার্কেল এবং (৪) খাসমহাল।

লুইন এবং পার্বত্য রাজগণকে লইয়া স্বীয় আবাসভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এতাদৃশ বিভাগে সকলেই সমস্বরে আপত্তি করেন। কমিশনার এ সমস্ত ঘটনা গভর্নমেন্টকে জানাইলে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই মর্মে আদেশ হইল যে, দরখাস্তকারী এবং অপরাপর রাজাগণ স্ব স্ব বংশীয় প্রজাগণ যেখানেই বাস করুক বা জুম করুক না কেন, কর আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু আবেদনকারীর অসৌভাগ্য নিবন্ধন প্রাগুক্ত প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত হইয়াছে।

"৩। আবেদনকারীর নিমিত্ত নির্দ্ধারিত ক্ষুদ্র সার্কেলে অনেক ছনখোলা রহিয়াছে, কাজেই জুমের উপযোগী ভূমি অত্যল্প মাত্র। প্রার্থিকের দুই-তৃতীয়াংশ রায়ত এই সার্কেলে এবং এক তৃতীয়াংশ সীমার বাহিরে বাস করে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণী এই আবেদনের ৪র্থ ও ৫ম দফায় লিখিত হইল। এই আবেদনকারী প্রার্থনা করে, যেন প্রাচীন রীতিতে গভর্নমেন্টের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আদেশানুসারে স্ববংশজ সকলের নিকট হইতেই পারিবারিক-কর পাইতে পারি।

"৪। দরখাস্তকারীর প্রজাগণ দক্ষিণে কাপ্তাই (কর্ণফুলীর উপনদী বিশেষ), উত্তরে ফেণী, পূর্বে কুকিপ্রদেশ এবং পশ্চিমে পার্বত্য প্রদেশের সীমা পর্যন্ত স্মরণাতীতকাল হইতে জুম করিয়া আসিতেছে। কয়েকজন মাত্র বন্দোবস্তি প্রাপ্ত মঘ ও ত্রিপুরা এতন্মধ্যে জুম করিত এবং তাহারা একিবারে গভর্নমেন্টে খাজনা দখিল করিত। কিন্তু আবেদনকারী ও তাহার পূর্ববর্তীগণ সমুদয় চাক্‌মাপ্রজা হইতে পারিবারিক-কর আদায় করিয়াছে, এবং গভর্নমেন্টকে নিয়মিত কর দিয়া তাঁহাদের লভ্যাংশ উপভোগ করিয়াছে। প্রার্থী সবিনয়ে জানাইতেছে যে, ১ নম্বর সার্কেলে সমস্ত রায়তের উপযুক্ত স্থান নাই। কেননা, জুম করিবার যথেষ্ট জমি পাওয়া যাইবে না। অবশ্য আপনি অবগত আছেন, জুমের নিমিত্ত প্রতি বৎসর নূতন ভূমি প্রয়োজন হয়। একবার জুম করা হইলে সেই ভূমিতে ৮/১০ বৎসরের মধ্যে আর জুম চলে না।

"৫। ১ নম্বর সার্কেলের বহির্ভূত যে সকল স্থান চাক্‌মাগণ কর্তৃক অধ্যুষিত, এস্থানে তাহা উল্লিখিত হইল। কাচালঙের উপনদী শিশুকের তীরবর্তী স্থান, — ইহার মোহনা হইতে এক্‌দিনের পথ পর্যন্ত, চেঙ্গীর উপনদী গাইঙ্খাছ্‌রীর মোহনা হইতে তিন দিনের পথ পর্যন্ত তীরবর্তী স্থান, ধুরুং উপনদীর তীরবর্তী স্থান মঙ্ সার্কেলান্তগর্ত কেংলাছরী, নাভাঙা এবং ফেণীকূল, আবেদনকারীর কতকগুলি প্রজা ত্রিপুরামহারাজের রাজ্যে বাস করে। বর্তমান নিৰ্দ্ধারিত সীমা যদি পরিবর্তিত না হয় তবে প্রার্থিকের পারিবারিক-কর আদায়ের ক্ষমতা অনেকাংশে তাবৎ রাজাদিগের হাতে পড়িবে। আপনি বিবেচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে কত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। চাক্‌মারা কখনও অন্য কাহাকেও পারিবারিক-কর দেয় নাই। কেবল তাহাদের নিজ রাজাকেই দিত। তাহারও এক্ষণে অন্যকে কর দিতে আপত্তি করিতেছে। দরখাস্তকারী প্রার্থনা করিতেছে যে, গভর্নমেন্টের নূতন আদেশে তাঁহাকে যে সমগ্র চাক্‌মাজাতির অধীশ্বর করা হইয়াছে, সেই প্রদত্ত আদেশে যেন কার্যকর হয়।

"৬। চাক্‌মাদিগের অধ্যুষিত স্থানসমূহ চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে — বড় কলের[১৫৫] উপরে খাসমহাল, মাইয়নী রিজার্ভ, মঙসার্কেল, ও চাক্‌মা বা আবেদনকারীর সার্কেল। ইহা দৃষ্ট হইবে যে, যদিও বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থাতে চাক্‌মাগণ ইচ্ছামত স্থানে জুম করিতে পারে, তথাপি আবেদনকারীর কতকগুলি প্রজা পার্বত্য ত্রিপুরায় চলিয়া গিয়াছে। আপনি বিবেচনা করিতে পারেন, তাহাদিগকে আনিয়া সমুদয় চাক্‌মাগণকে দরখাস্তকারীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট সার্কেলের সীমার মধ্যে পুনরায় স্থাপন করা কতদূর সম্ভবযোগ্য হইতে পারে!

"৭। আবেদনকারীর প্রার্থনা এই, আপনি সাতিশয় দয়া পূর্বক এই দরখাস্তখানি গভর্নমেন্টের সুবিচারের নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন, যেন প্রার্থী বর্তমান প্রচলিত রীত্যনুসারে বাসস্থান-নির্বিশেষে সমগ্র চাক্‌মাজাতি হইতে কর আদায় করিতে পারে।"

ডেপুটি কমিশনার মিঃ পাউয়ার এই আবেদনপত্র বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পাঠাইতে তদুপরি এই স্বাভিমত * জানাইয়াছিলেন ঃ- "আপনি দেখিবেন, কত অধিক সংখ্যক চাক্‌মা ২ নম্বর (মঙ্) সার্কেলের ফেণী তীরে বাস করে। রাজভক্তিমাত্র তাহাদিগকে একত্র রাখিবার পক্ষে সহায়তা করে। তাহারা সম্ভবতঃ পুরুষ পরম্পরাবদ্ধ রাজাকে ছাড়িয়া অপর বিজাতীয় রাজার শাসনাধীনে যাইতে হইবে ভয়ে পার্বত্য ত্রিপুরায় পলাইয়া যায়। কাপ্তেন লুইনকৃত শাসনাধিকারের সীমা-নির্দেশের প্রস্তাবে চাক্‌মারাজা এবং তদীয় প্রধান প্রধান দেওয়ানগণ আপত্তি করিয়াছিলেন। আমি বিশেষরূপে বলি যে, যদি গভর্নমেন্ট পূর্বপ্রস্তাবিত সীমা পুনর্নির্দিষ্ট না করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত করিতেন, তাহা হইলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের আপত্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। আমি মনে করি — সীমা পুনঃপরিবর্তিত হইয়া চাক্‌মাগণকে তাহাদের পুরুষ পরম্পরাবদ্ধ রাজার অধীনে জুম আবাদ করিতে আরও অধিক স্থান দেওয়া যাউক। কিন্তু বিষয়টি নিতান্ত সহজ নহে। ১ নম্বর সার্কেলের বহির্ভূত চাক্‌মাগণকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ স্ব স্ব রাজাকে ছাড়িয়া কম সুবিধাজনক স্থানে বসবাস করিতে দেওয়া যাইতে পারে। ইহা নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিতে হইবে — চাক্‌মাগণের যদিও চাষ-আবাদ নিত্য পরিবর্তনশীল, এবং তাহারা ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যায়, কিন্তু মূল আবাসস্থান স্থায়ী।" অতঃপর গভর্নমেন্ট বিশেষ ধীরতার সহিত ইহার মীমাংসা করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ বৎসব ধরিয়া আন্দোলন-আলোচনার পরে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর আদেশ* বাহির হয়,—এই (পার্বত্য চট্টগ্রাম) জেলা তিন সার্কেল ও দুই

*Letter no. 319
Dated 20.4.1876

(১৫৫) "বড়কল" - মোহনা হইতে প্রায় একশত মাইল উপরে কর্ণফুলীর সর্বনিম্ন জলপ্রপাতমালা। ইহা ছোটবড় ৮/১০টি জলপ্রপাত লইয়া প্রায় দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। নদগর্ভ শিলাময়, যাবতীয় জিনিষাদি নামাইয়া বড় সাবধানে নৌকা নিতে হয়। জিনিষ টানিবার জন্য নদীপারে এই দুই মাইল ট্রামের বন্দোবস্ত আছে। প্রপাতগুলির মধ্যে তিনটি সর্বাপেক্ষা বড়। তন্মধ্যে মধ্যেরটিই ভয়ানক, প্রায় ১৪/১৫ হাত উচ্চ হইতে ভীষণবেগে জল পতিত হয়, তাহাতে প্রায় ৬/৭ হাত গভীর এক আবর্ত ঘটে। বিস্তারিত বিবরণী ২৫শে ফাল্গুনের (১৩১১ সন) "জ্যোতিঃ" তে দ্রষ্টব্য।

থাসমহলে বিভক্ত হইবে। —

"১ নম্বর, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সার্কেল ঃ

*Letter no. 1985 - 797 L.R.

"উত্তর-কাচালঙ ফরেষ্ট রিজার্ভ, গাইন্ধাছরী কেংলাছরী, নাভাঙা ছরার উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত তথা হইতে ধুরুঙের নিম্ন যাবৎ।

"পশ্চিম — ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের "কলিকাতা গেজেটের" প্রথম ভাগের ৮১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পার্বত্যপ্রদেশের নূতন সীমা পর্যন্ত।[১৫৬](১)

"দক্ষিণ — কর্ণফুলী নদী, সীতাপাহাড় রিজার্ভ, কাপ্তাই ও রাইন্‌খণ্ডের মধ্যবর্তী ঢৈলছরা পর্যন্ত এবং রাইন্‌খং রিজার্ভ।

"পূর্ব — ছৈচোল ও "বড়কল" পর্বতশ্রেণী।"

ইতোমধ্যে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারী কমিশনার মিঃ জন্ বিম্‌স পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে বঙ্গীয় গভর্নমেন্টে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট* উপস্থিত করেন। তাহাতে তিনি হরিশ্চন্দ্রের বাঙ্গালীভাব দেখাইবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন ঃ "(স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার) কাপ্তেন গর্ডনের বর্ণনায় দেখা যায় রাজা হরিশ্চন্দ্র বাঙ্গালী পদ্ধতির লোক এবং তাঁহার হিন্দুধর্মানুযায়ী নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানদ্বারা চাক্‌মাগণ অনেক পরিমাণে সেই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। ....

রাজা হরিশচন্দ্রের বাঙালীভাব

*Letter no. 21

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র। চট্টগ্রামে তদীয় জমিদারী আছে। তিনি বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক। বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁহার এত ঝোঁক যে, তিনি হিন্দুপর্ব ও ভোজাদি পালন করিয়া থাকেন। তিনি অপরাপর সরদারের মত তাঁহার লোকজনের সঙ্গে তত অধিক পরিমাণে পুরাতন জায়গীর সম্বন্ধীয় সম্পর্ক রাখেন না। রাজা আপনাকে হিন্দু বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। চট্টগ্রামের বাঙ্গালী রায়তগণের মধ্যে থাকিতেই তাঁহার ইচ্ছা। স্বজাতীয় প্রজাগণের প্রতি তদীয় চেষ্টা অতি অল্প।"

আমরা যতদূর দেখিতেছি, কমিশনার মহোদয় কাপ্তেন গর্ডন ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। বস্তুতঃ হরিশ্চন্দ্র বাঙ্গালীসমাজকে ভালবাসিতে গিয়া নিরর্থক কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। পূর্বেও এরূপ ভালবাসায় রানীর প্রতি কাপ্তেন লুইনের বিষদৃষ্টি দেখাইয়া আসিয়াছি। পরন্তু উক্ত পত্রেরই প্রত্যুত্তরে* মহামান্য লেপ্টেনান্ট গভর্ণর দেওয়ানগণের ক্ষমতা শক্তিযুক্ত ও রাজা হরিশ্চন্দ্র যাহাতে তাঁহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন, তদুপযোগী প্রস্তাব অনুমোদন করেন।" ইহার কারণস্বরূপ

*Letter No. 1078-450 L.R. - dated

(১৫৬) চন্দ্রঘোনার সন্নিকটবর্তী ত্রিপুরাসুন্দরী নাম্নী উপনদীই এই সীমা কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিতেছে।

লিখিয়াছিলেন[১৫৭] "রাজা তদীয় জাতির সুখ-সুবিধার নিমিত্ত প্রকৃত কোন তত্ত্বাবধান লয়েন না, উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির আর্থিক আয় হইতে তাঁহার যাবতীয় অভাব পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে বরাবরই কর্তব্য পরিহার করিতেছেন।"

পরে যখন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন ডেপুটি কমিশনার মিঃ এল. আর. ফরবস্ বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর সমীপে অএত্য রাজাদিগের রাজস্ব বৃদ্ধি প্রস্তাবে এক পত্র* দিয়াছিলেন, তাহাতে চাক্‌মারাজ-সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য এবং নিম্নোক্ত যুক্তিতে জমা বৃদ্ধির কথা প্রকাশ ছিল ঃ-

*Letter No. 565

"রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর—

তাঁহার সার্কেলে অবস্থিত পরিবার সংখ্যা	-	৫০১১
মঙসার্কেল হইতে তিনি যত পরিবারের কর পান	-	১০৫৮
		৬০৬৯
শতকরা ১৫ হিসাবে বিধবা, বিপত্নীকে, খিসা প্রভৃতিতে বাদ	-	৯১০
		৫১৫৯
যত ঘর স্বাধীন বন্দোবস্তি করিয়াছে - ১২৬৫		
তাহা হইতে শতকরা ১৫ হিসাবে		১০৭৬
বিধবা, বিপত্নীক, খিসা প্রভৃতি বাদ - ১৮৯		
		৬২৩৫ ঘর
অর্থাৎ (প্রতি পরিবারে এক টাকা করিয়া ধরিলে রাজস্ব)		৬২৩৫ টাকা
১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবরের ৫৭৬৩ নম্বর গভর্নমেন্ট পত্র মতে ১৮৭২ সালের লুসাই অভিযানের সহায়তার জন্য মুক্ত খাজনা	-	১১৪৩ টাকা
সুতরাং দাতব্য রাজস্ব —	-	৫০৯২ টাকা

বলা বাহুল্য, কমিশনার মহোদয়ও তাহা যথাসত্বর বঙ্গীয় গভর্নমেন্টে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তখন সহৃদয় গভর্নমেন্ট হইতে প্রত্যুত্তর* আসে, — "ডেপুটি কমিশনার ১০৮১।৪ পাই জমাকে ৫০৯২ টাকা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু লেপ্টেনান্ট গভর্নর একসঙ্গে এত বৃদ্ধি

(১৫৭) ইহার ইংরাজীটুকু এই, - "The Raja takes no real interest in the management of his tribe, and all that need be secured to him is a reasonable amount of pecuniary profit from the position which he has inherited but the duties of which he persistently evades."

যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না।[১৫৮] পরন্তু ইহা বুঝা যায় যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র এক্ষণে রাঙামাটিতেই থাকেন, যদি তিনি তদীয় প্রজাগণের সম্বন্ধে অধিকতর পরিমাণে জাতীয় কার্যে যোগদান করেন, এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতিপত্তিশালী হন, তাহা হইলে লেপ্টেনান্ট গভর্নর বড়ই আহ্লাদিত হইবেন।"

*Letter No. 1985-797 L.R. dated 1.9.1881

স্থানীয় রেসিডেন্ট অর্থাৎ গভর্নমেন্ট-প্রতিনিধির হস্তেই দেশীয় রাজন্যবর্গের নিয়তিচক্র পরিচালিত হইতেছে। তাহারা যখন যেভাবে যাহা বলেন, কর্তৃপক্ষকে তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিচার-ব্যবস্থা করিতে হয়। সুবিধান বা নিপীড়নে সাধারণ যাহাতে মহামান্য গভর্নমেন্টের হাত দেখিতে পায়, বস্তুতঃ তাহা রাজকীয় প্রতিনিধির মন্ত্রণা-ফল মাত্র। কর্তৃপক্ষ আর বেশী তলাইয়া দেখিতে পারেন না, তেমন দেখিবার অবসরও নাই। সুতরাং স্থানীয় রাজ-পুরুষকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে সুখ-সুবিধা দুই আছে, নতুবা ধনে মানে অধঃপাতে যাইতে হয়। পূর্বে দেখাইয়াছি, রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতি স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার মিঃ ফর্‌বসের অনুকূল মন্তব্যে সহৃদয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর রাজাবাহাদুরের কার্যে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালে মিঃ ফর্‌বসের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটে। তখন তিনি হরিশ্চন্দ্রের শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত রাজকার্য পরিচালনে অক্ষম বলিয়া গভর্নমেন্টে রিপোর্ট করেন। তদুত্তরে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে রাজকার্য হইতে অপসৃত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সহৃদয় কমিশনার সার এইচ্. জে. এস্. কটন মহোদয়ের অনুরোধে গভর্নমেন্ট রাজার পদচ্যুতি আদেশ প্রত্যাহার করিয়া রাজকর্ম-নির্বাহে হরিশ্চন্দ্রের সাহায্যার্থে এক কৌন্সিল মনোনীত করিলেন ইহাতে —

ঁনীলচন্দ্র দেওয়ান	-	বাড়ী বড়াদম (চেঙ্গী)
ঁঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস,	-	বাড়ী ধলঘাট চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান	-	বাড়ী কামিলাছরী
শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ান	-	বড়াদম (কর্ণফুলী)
শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ান	-	বাঁকছরী

সভ্য নিয়োজিত হন। ইহাদের মধ্যে কেবল স্থানীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফিসের ভূতপূর্ব ইংলিস ক্লার্ক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস মাত্র গভর্নমেন্টের মনোনীত সভ্য, আর সকলেই দেওয়ান, তালুকদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক সভ্যেরই মাসিক ৫০টাকা করিয়া বেতন চলিত।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর হইতে ১৮৮৫ সনের ২২শে জানুয়ারী যাবৎ এই কৌন্সিল রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সহায়তা করিয়াছিলেন। ২৩শে জানুয়ারী মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গলার ১১ই মাঘ শুক্রবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় শুক্রপক্ষের সপ্তমী তিথিতে রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর সুশীলা রানীদ্বয়, স্নেহের পুতুল পুত্রকন্যা এবং

(১৫৮) পরে ইহা ৩১৫৫ টাকা হইয়াছিল। ১৯০৬-০৭ হইতে দশ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ৪৫৫৩ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। বোমাং ও মঙসার্কেলেও যথাক্রমে পূর্বে ২৯১৮ টাকা ও ২৩১৪ টাকা ছিল, এক্ষণে ৫৭৭২ টাকা এবং ৩৪৭৮ টাকা হইয়াছে।

অপরাপর পরিবার-পরিজনকে অসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া একমাত্র দুশ্চিন্তার করাল কবলে ভবলীলা সাঙ্গ করেন। প্রথমা মহিষীর গর্ভে পুত্র ভুবনমোহন এবং স্বর্ণময়ী, হিরণ্ময়ী ও করুণাময়ী — কন্যাত্রয়ের জন্ম হইয়াছিল, কনিষ্ঠা রানী শ্রীশ্রীমতী মনোমোহিনী একমাত্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন — রমণীমোহনকে। স্বর্ণময়ী সর্বজ্যেষ্ঠা, 'তৈন্যা গোছা'র-'কূর্য্যা' বংশজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দেওয়ানের সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হইয়াছে। বিবাহে যৌতুক স্বরূপ রাজানগরে প্রায় তিনশত টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি এবং পার্বত্যপ্রদেশে শুভলং—মিতিঙাছরীর একটি সুবৃহৎ মৌজা প্রদত্ত হয়, রাজসরকার হইতেও স্বর্ণময়ী মাসিক ৫০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়া থাকেন। বর্তমানে তাঁহাদের এক পুত্র (নাম - পুলিনবিহারী) এবং তিন কন্যা (নাম - হেমনলিনী, নীলনলিনী ও প্রফুল্লনলিনী), অপর দুই রাজকন্যা বিবাহ না হইতেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রধানা রাজ্ঞী সৈরিন্ধ্রী বহুকাল পতিবিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে শূলরোগে ১৯০২ ইংরাজী ১৭ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৯ বাঙ্গালার ১লা আশ্বিন পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৫টার সময় পরলোক যাত্রা করিয়াছেন।

লীলা সাঙ্গ

রাজা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত নাবালকের পক্ষে উল্লিখিত কৌন্সিল শাসনকার্য নির্বাহ করেন। তখন পার্বত্যরাজ্য পরিচালনে পরলোকগত নীলচন্দ্র দেওয়ান সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ও শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ান সভ্য ছিলেন। চট্টগ্রামের জমিদারীর ভার শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ান ও পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাসের হস্তে ছিল। অনন্তর জুন মাস হইতে গভর্নমেন্ট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানকে পার্বত্য প্রদেশের এবং শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ানকে চট্টগ্রামের জমিদারীর ম্যানেজার করিয়া আর সকলকে বিদায় দেন। এইরূপে কয়েকবৎসর গত হইলে গভর্নমেন্ট চট্টগ্রামের জমিদারীর ভার ত্রিলোচন বাবুর হাত হইতে লইয়া চট্টগ্রাম "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের" তত্ত্বাবধানে অর্পণ করেন। কিন্তু পার্বত্যপ্রদেশের শাসনকর্তৃকবর্তমান রাজাবাহাদুরের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত কৃষ্ণবাবুর হস্তেই ছিল। শেষ কয়বৎসর তিনি রাজসরকার হইতে মাসিক একশত টাকা করিয়া বেতন পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পূর্বাঞ্চলে পুনরায় কুকিদিগের উপদ্রব আরম্ভ হয়। তজ্জন্য গভর্নমেন্টবাধ্য হইয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লুসইতে আবার অভিযান প্রেরণ করেন। কুকি দমিত হয়, এবং আনুষঙ্গিক ফলে লুসাই আসামভুক্ত ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সবডিভিসন হইয়া যায়। পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা হইতে এই শেষোক্ত প্রদেশ পুনরায় স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত হইয়াছে।

বিভিন্ন শাসন

যুবরাজ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাননীয় গভর্নমেন্টের আদেশে ১৮৯৭ ইংরাজীর ৭ই মে মোতাবেক ১৩০৮ (১২৫৯ মঘির) ২৫শে বৈশাখ স্থানীয় এসিস্টান্ট কমিশনার(১৫৯) মিঃ ডবলিউ.এন. ডেলিভিন (Delivine), সি. এস. মহোদয় রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে মহাসমারোহ সহকারে তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইনিই বর্তমান চাক্‌মা অধিনায়ক (Chakma

বর্তমান রাজা
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়

(১৫৯) ১৮৯১ ইংরাজীর ১৬ই নভেম্বর হইতে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান শাসনকর্তার পদবী এসিঃ কমিশনার হইয়াছিল, অনন্তর ১৯০০ ইংরাজীর ২রা মে হইতে ওৎপদবী সুপারিন্টেডেন্ট হইয়াছে।

Chief) তাঁহাকে খেলাত প্রদান উপলক্ষে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বেলভেডিয়া প্রাসাদে এক বিরাট দরবার[১৬০] অনুষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন প্রজারঞ্জক লেপ্টেনান্ট গভর্নর সার জন্ উড্‌বরণ মহোদয় বহু গণ্যমান্য দেশীয় এবং বিদেশীয় ভদ্রলোককে এসভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। দরবারে কার্য আরম্ভ হইলে, দুইজন আন্ডার সেক্রেটারী চাক্‌মাপতিকে সসম্মানে মাননীয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর-সমীপে লইয়া উপস্থিত হয়েন। তখন চিফ্ সেক্রেটারী মহোদয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর বাহাদুরের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলে, মাননীয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর এবং সমবেত ভদ্রমহোদয়বর্গ সকলেই স্ব স্ব আসন হইতে গাত্রোত্থান করেন। অনন্তর চিফ সেক্রেটারী মহোদয় 'রাজা' পদবী সংযুক্ত সনন্দখানি পাঠ করিয়া লেপ্টেনান্ট গভর্নর বাহাদুরের হস্তে অর্পণ করিলে, তিনি তাহা চাক্‌মাধিপতির হস্তে প্রদান করেন। তখন রাজা বাহাদুর প্রতিদানে মাননীয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর মহোদয়কে একটি সুবর্ণ মুদ্রা দান করেন। তিনি যথারীতি তাহা স্পর্শ মাত্র করিয়া রাজা বাহাদুরকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন[১৬১] "আপনি উত্তরাধিকারীসূত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মাজাতির অধিনায়কত্ব লাভ করিবার সময় যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা আজ আপনাকে বিভূষিত করা আমার সুখজনক কর্তব্য! আপনার জাতি সংখ্যায় অনেক এবং পার্বত্য প্রদেশের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া বাস করিতেছে, আপনার সার্কেলের শাসনপরিচালন দায়িত্বজনক এবং সবিশেষ চাতুর্য ও বুদ্ধি নৈপুণ্যসাপেক্ষ। আপনি যুবক, পরন্তু সুদীর্ঘ বাল্যকাল ধরিয়া "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্" কর্তৃক আচার ব্যবহারাদি শিক্ষা পাইবার এবং সুশিক্ষিত হওয়ার সুবিধা উপভোগ করিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি, স্থানীয় রাজপুরুষগণ হইতে সতত যে উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে প্রজাসাধারণের সুবিধা এবং স্বীয় গৌরবের সহিত আপনার সার্কেলের শাসন নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন।

খেলাত প্রদান

লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের বক্তৃতা

(১৬০) Vide the full description in the "Statesman" dated 16th December, 1898

(১৬১) His honor adderssing the Raja said :- "You have, on succession to the chiefship of the Chakma clan of the Chittagong Hill Tracts, received the title with which it is my pleasant duty to invest you to-day. Your clan is the most numerous, and occupies the largest section of the Hill Tracts and the management of your circle involves much responsibility, and demands the exercise of much tact and prudence. You are young, but enjoy the advantage of having been brought up during a long minority by Court of Wards and of having received a good education. I trust that, with the advice of the local officers, which will always be given to you, you will be able to manage the affairs of your circle with credit to yourself and advantage to your people. The government looks to you and the other chiefs of the Hill Tracts to assist in all measures which will contribute to improvement of the condition of hill tribes. It attaches great importance, as you are aware to the abandonment of their nomadic habits by the hillmen, and their adoption of plough cultivation wherever land is available

পার্বত্য জাতিসমূহের অবস্থার উন্নতিকল্পে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইবে, তৎসমুদয়ে আপনি এবং পার্বত্যপ্রদেশের অপরাপর অধিনায়কবর্গ সহায়তা করিবেন বলিয়া গভর্নমেন্ট আশা করেন। গভর্নমেন্ট পার্বতীয়দিগের স্থিতিহীন অভ্যাস পরিহার করিয়া, যেখানে স্থান পাওয়া যায় — তথায় লাঙ্গলের চাষ অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, ইহা আপনার জানা আছে।" অতঃপর রাজাবাহাদুর তদীয় আসনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সকলে আসন পরিগ্রহ করিলেন।

রাজা ভুবনমোহন ১৮৭৬ ইংরাজীর ৬ইমে মোতাবেক ১২৮২ বাঙ্গালার (১২৩৭ মঘির) বৈশাখ মাসে রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তদীয় ধীর-গম্ভীর ব্যবহারে পরিবার প্রতিবেশী সকলেই তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত। তিনি ১৮৮৮ সালে প্রথম বিভাগে উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেন, তজ্জন্য দুই বৎসর স্থায়ী বৃত্তি পাইয়াছিলেন। অনন্তর চতুর্দশ বৎসর বয়সে প্রথম বিভাগে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহাতেও মাসিক ৮টাকা করিয়া তিন বৎসর স্থায়ী বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তখন সদাশয় গভর্নমেন্ট বিশেষতঃ

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁহারই পাঠ-সৌকর্যার্থে রাঙামাটি মধ্য ইংরাজী স্কুলকে উচ্চ ইংরাজী শ্রেণীতে উন্নীত করেন। এসময়ে রাজসরকার হইতে এই স্কুলে মাসিক বিশ টাকা সাহায্য দিবার বন্দোবস্ত হয়। এক্ষণে তাঁহাদের কেহই পড়িতেছে না, রাজাবাহাদুর তথাপি সাহায্য বন্ধ করেন নাই। বর্তমান গ্রন্থকারও সেই বৃত্ত্যাংশ ভোগ করিতেছেন। মধ্যইংরাজী পাশের পর চারি বৎসরেই ভুবনমোহন প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বলাভ করেন। অতঃপর কলিকাতায় থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত তাঁহার ফাস্ট আর্ট পাশ করা ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে স্বাস্থ্যভঙ্গনিবন্ধন সুযোগ্য চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিদ্যালয় ছাড়িলেও তিনি অধ্যয়ন বিসর্জন দেন নাই, অদ্যাপি নিয়মিতরূপে নানা সংবাদ ও সাময়িক পত্র এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী অবসর সময়ে পাঠ করিয়া থাকেন।

রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি যাবতীয় কার্যের সুশৃঙ্খলাবিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাজধানীর পারিপাট্য সাধন সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। পূর্বে এই রাজভবনের অবস্থা অতি সামান্য মাত্র ছিল, যথোপযুক্ত গৃহাদিও ছিল না। যদিও অদ্যাপি রাজপুরীর সমকক্ষ হয় নাই, কিন্তু উন্নত জমিদার বাড়ী অপেক্ষা এক্ষণে মন্দ নহে এবং যাদৃশ আয়োজনের সহিত কাজ চলিতেছে, কালে নয়নমনোহরী হইবে — আশা করা যায়। রাজকীয় অফিস হইতে 'জমিদার দপ্তরের' আবর্জনাও বিদূরিত হইয়াছে। পরন্তু রাজা ভুবনমোহন আপন মুদ্রাতেও নূতন প্রথা অবলম্বন

কার্য

করিয়াছেন। তাহাতে নাম রাখা হয় নাই, ইংরাজিতে পরিধিপ্রান্তে — "চট্টগ্রাম এবং পার্বত্যপ্রদেশ" মধ্যে দুইটি হস্তী, দুইখানি তরবারী ও একটি কামান — রাজচিহ্নের উপরিভাগে ইংরাজিতে "চাকমারাজ" এবং তন্নিম্নে দেবনাগরী অক্ষরে হিতোপদেশের প্রধান নীতিসূত্র "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" খোদিত হইয়াছে। যে নীতিবাক্যকে

'মটো' করিয়া রাজকার্য পরিচালন করিতেছেন, তাহাতেই তদীয় শাসনপ্রণালী সহজে উপলব্ধি হইবে। তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাহা দিয়াই প্রজাবর্গের যথাসাধ্য উপকার করিতে তিনি সতত যত্নপরায়ণ। বিগত ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রজাগণকে বিশেষ সাহায্য করেন, এবং তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ এখন আর নিরীহ পাহাড়ীদিগকে সর্বস্বান্ত করিবার তত সুবিধা পায় না। বস্তুতঃ রাজনৈতিক স্বার্থ অব্যহত রাখিয়া ঈদৃশ প্রজারঞ্জন-তৎপর অতি অল্প রাজারই সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া গিয়া থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এমনকি ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণও তাঁহার ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট—একারণে মাননীয় গভর্নমেন্টের নিকটও তিনি বিশেষ সম্মান পাইয়া থাকেন। ধর্মে তিনি কোনও নূতন পরিবর্তন করেন নাই। মাতামহীর সঞ্জীবিত বৌদ্ধধর্মে রাজা হরিশ্চন্দ্রও আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্তমান রাজাবাহাদুরের সময়ে তাঁহারা এই ধর্মেই যেন দৃঢ়তম হইয়া আসিতেছেন।

২

১৮৯* খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ মোতাবেক ১৩০১ সনের ১৮ই ফাল্গুন রাজানগর রাজপ্রাসাদে অত্রত্য কাঁটাছরী নিবাসী 'কুরাকুট্যাগোছার" নেন্দাব গোষ্ঠিজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দেওয়ানের প্রথমা কন্যা দয়াময়ীর সহিত রাজা ভুবনমোহনের শুভ-পরিণয় কার্য মহাসমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ১৪ই ফাল্গুন দয়াময়ীর জন্ম হয়। সুতরাং পূর্ণ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয়, মাত্র দশবর্ষকাল রাজসংসার আলোকিত করিয়া ১৩১২ বাঙ্গলার ৭ই বৈশাখ, ইংরাজী ১৯০৫ অব্দের ২০শে এপ্রিল রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে কালান্তক সূতিকার প্রবল আঘাতে চিরকালের তরে এই পবিত্র দীপ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর তাঁহার সাহার্যে রাজাবাহাদুর কত যে সুখশান্তি উপভোগ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে তদীয় স্মৃতি উঠাইলে তাঁহার অপাঙ্গজাত অশ্রুকণা সাক্ষ্য দিয়া থাকে। রানী বহুদিন ধরিয়া রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, রাজাবাহাদুর প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার চিকিৎসাবিধান করেন। কিন্তু হায়! এত ঔষধ — এত শুশ্রূষা ব্যর্থ করিয়া করাল কাল বিকট বদন ব্যাদনে তাঁহার প্রাণভরা সুখ - বুকভরা আশা সমস্তই বিনষ্ট করিল। আমরণ পতিসেবা ও রাজসেবা করিয়া সেই স্বর্গীয় প্রতিমা স্বর্গে চলিয়া গেলেন, মহিলা-জীবনে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য-সুখ আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ আরও আশ্বাসের কথা, — তিনি মৃত্যুকালে স্বামীর কোলে অগাধ প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ—অশান্ত-স্নেহ পুত্তলিকা—একটি বালিকা এবং দুইটি বালক দিয়া গিয়াছেন।

দয়াময়ী স্বর্গগতা রানী

কন্যার নাম শ্রীমতী বিজনবালা, বয়স অষ্টমধ্যে উপস্থিত।[১৬২] জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নলিনাক্ষ ও কনিষ্ঠ শ্রীমান বিরূপাক্ষের বয়স যথাক্রমে ছয় ও চারি বৎসর। রানী মহোদয়া কেবল যে বিনয়-নম্র ব্যবহারে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন

পুত্র কন্যা

(১৬২) রাজাবাহাদুর পুত্রকন্যাগণের শিক্ষাদানের জন্য ফতেয়াবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিশ্বাস নামক জনৈক শিক্ষককে স্বীয় ভবনে রাখিয়াছেন। শ্রীমতী বিজনবালা বর্তমানে উচ্চপ্রাথমিকের পাঠ্য পড়িতেছে।

— তাহা নহে, তাঁহার অলৌকিক গুণ-সৌরভে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন। বিগত ১৩১১ সনের বোম্বাই প্রদর্শনীতে তাঁহার স্বহস্ত নির্মিত দু'খানি তসরের কাপড় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তসরের কারুকার্যে এই দুইখানিই বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করত দুইটি সুবর্ণপদক লাভ করিয়াছে বলিয়া তদানীন্তন নানা সংবাদ ও সাময়িক পত্রে বিঘোষিত হয়। ততোধিক প্রশংসার বিষয়, এই তসরের বস্ত্রখন্ডদ্বয় যে তথাকথিত প্রদর্শনীয় উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা নহে, পার্বতীয় রমণীগণ এইরূপ কারুকার্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ব্যবসায় লাভজনক হইবে কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্ত তাঁহার পূর্বনির্মিত এই বস্ত্রখণ্ডদ্বয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "লক্ষীর ভাণ্ডারে"(১৬৩) প্রেরণ করেন। তাঁহারাই বোম্বাই প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন। 'ভারতীয়'র ভূতপূর্ব সম্পাদিকা বঙ্গের মহিলাকুলনিধি শ্রীমতী সরলা দেবী ১৩১১ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, "চট্টগ্রামের পার্বত্যরাজ্যের রানীর স্বহস্ত প্রস্তুত দুইটি অতিসুন্দর বস্ত্রখণ্ডবঙ্গদেশের গৌরবের কারণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে "লক্ষ্মীর ভান্ডার" সুবর্ণ মেডেল পাইয়াছেন।"(১৬৪) ইহাতেই তদীয় শিল্পনৈপুণ্যের গৌরব উপলব্ধি হয় এবং তদুপলক্ষেই ২০শে ফাল্গুন স্থানীয় "জ্যোতিঃ" সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "এই দুর্দিনে" রানীর প্রশংসিত শিল্পনৈপুণ্য এবং তাঁহার ঐ মহোচ্চ আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া আমরা যে কি পরিমাণ আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া রাজসংসার আলোকিত রাখুন, তাঁহার চেষ্টায় আমাদের দীনা চট্টলভূমির গৌরব বৃদ্ধি হউক।"

শিল্প

আহা, তাহা আর হইল কই! দ্বিতীয়বারে রাজামহোদয় গত ৮ই অগ্রহায়ণ (১৩১২) মৃতরানীর জ্ঞাতি-ভগিনী, শ্রীযুক্ত গঙ্গামাণিক দেওয়ানের প্রথম কন্যা—শ্রীশ্রীমতী রমাময়ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আশাকরি বর্তমান রানীমহোদয়া স্বর্ণগতা দয়াময়ীর পুণ্যগৌরব লাভ করিয়া রানীর কীর্তিধ্বজা অক্ষুণ্ণ রখিবেন, ভগবান সমীপেও আমাদের এই প্রার্থনা। তাঁহার গর্ভে প্রথমে এক কন্যা জন্মিয়াছিল, কিন্তু অতি শিশু কালেই গতাসু হয়। অনন্তর ৩/৪ মাস গত হইল এক পুত্র লাভ হইয়াছে।

বর্তমান রানী

(১৬৩) অধুনা সেই "লক্ষ্মীভাণ্ডার" নাই, তাহার হস্তান্তর ও অবস্থান্তর উভয়ই ঘটিয়াছে।

(১৬৪) এই পুস্তকে স্বর্গীয় রানী মহোদয়ার প্রাপ্ত পদক দুইটির প্রতিকৃতি রক্ষা করিবার মানসে রাজাবাহাদুরের নিকট পদকদ্বয় চাহিয়াছিলাম। তিনি "লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের" কার্যাধ্যক্ষের কাছে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াও পদকসম্বন্ধীয় কোন কথা জানিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। অনন্তর আমি এই প্রতিকৃতি "লক্ষ্মীভাণ্ডারের' তৎকালীন সত্ত্বাধিকারিণী শ্রীমতী সরলা দেবী সকাশে লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তাঁহার সহকারী কার্যাধ্যক্ষ আমাকে লিখিয়াছিলেন :- "বোম্বাই প্রদর্শনীতে" চাক্‌মারানীর এবং ত্রিপুরার রানীর শিল্পকার্য একই আলমারীতে ছিল। প্রথমতঃ আমরা শুনিতে পাই যে, চাক্‌মারানীই সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পরে যখন পদক এবং তৎসঙ্গে সার্টিফিকেট আসিল, তখন দেখা গেল, পদকগুলি ত্রিপুরার রানীর নামে আসিয়াছে। পূজনীয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর মতে চাক্‌মারানীর কার্যই সুন্দর এবং পদক পাওয়ার উপযুক্ত ছিল এবং তাঁহারা এরূপই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু চাক্‌মারানী আদৌ কোন পদক পান নাই।" ইহাতে বুঝা যায়, গোলমালে পড়িয়া চাক্‌মারানীর প্রাপ্তব্য পদক ত্রিপুরারানীর নামে হইয়া গিয়াছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে কুমার রমণীমোহনের জন্ম হয়। তদীয় আবাল-প্রসিদ্ধ তেজীয়সী প্রতিভা এবং কার্যতৎপরতার কথা সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার কলিকাতায় অধ্যয়নকালে তিনিও তত্রত্য হেয়ার স্কুলে পড়িতেন। পরে তিনি রাজাবাহাদুরের কলেজ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী চলিয়া আসেন। এখানে থাকিয়া রাঙামাটি হাইস্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাশ করেন। অনন্তর তিনি চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দুর্দমনীয় ম্যালেরিয়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তিনি "ফাস্ট আর্ট" পাশ করিতে পারেন নাই! অনন্তর তিনি বিলাত গমনে অভিলাষী হন। কিন্তু রাজাবাহাদুর নানা কারণে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন নাই। বলিতে কি, এইখানেই তাঁহার ছাত্রজীবনের যবনিকা পতিত হইল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এযাবৎ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। ১৩১২ সালে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী সবলাবালার সহিত তদীয় শুভপরিণয় হইয়াছে। বৎসরাধিক গত হইল তাঁহাদের এক পুত্র লাভ হইয়াছে, শ্রীমানের নাম অনিলচন্দ্র।

কুমার শ্রীযুক্ত
রমণীমোহন রায়

রাজকীয় প্রথানুসারে(১৬৫) জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুতরাং এই পার্বত্যরাজ্যে কুমার বাহাদুরেরও কোন স্বত্ব নাই। তিনি মাত্র রাজসরকার হইতে নির্দিষ্ট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন এই পার্বত্য রাজ্যে অন্যতম হেড্ম্যানস্বরূপে তিনি "বন্দুকভাঙা" নামক সুবৃহৎ মৌজার পরিচালনভার পাইয়াছেন। কাগজে পত্রে এই সমস্ত পৃথক বন্দোবস্ত থাকিলেও, তাহা কেবল ভাবীকালের নিমিত্ত। বাস্তবিক তাঁহাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের যাদৃশ পবিত্র অনুরাগ দেখা যায়, বর্তমান স্বার্থ-সর্বস্বযুগে এরূপ কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণের চক্ষে তাঁহারা ভ্রাতৃ-প্রেমে, "রাম-লক্ষ্মণ" প্রায় প্রতীয়মান। বিমাতা হইলেও কুমার রমণীমোহন, রাজাবাহাদুরের মাতৃদেবী পরলোকগতা মহারানী সৈরিন্ধ্রীর প্রতি অসাধারণ ভক্তিমান্ ছিলেন। তাহার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার স্বর্গগতা আত্মার প্রীত্যর্থে এবং তদীয় স্মৃতি জাগরূক রাখিতে, কুমার বাহাদুর প্রতি বৎসর রাঙামাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্বোচ্চস্থানীয় পাহাড়ী ছাত্রকে "সৈরিন্ধ্রী মেডেল" নামধেয় একটি রৌপ্য পদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সবিশেষ চেষ্টাসহকারে রাজানগরে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্টঅফিস খুলিয়াছেন, তাহার নাম রাখিয়াছেন — পোষ্ট অফিস "রাজা ভুবন" ইহাও জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি নিঃস্বার্থ ভক্তিপরায়ণতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে কি?

সৌভ্রাত্র

দায়ভাগমতে কুমার রমণীমোহন চট্টগ্রামের জমিদারীর অর্ধেক অধিকারী। সম্প্রতি তৎসম্বন্ধেও তাঁহাদের মধ্যে এক বন্দোবস্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে রাজাবাহাদুর আপন অংশ হইতে তাঁহাকে বার্ষিক দুইশত আয়েব সম্পত্তি অধিক দিয়াছেন। — ধন্য ভ্রাতৃপ্রেম। বলা বাহুল্য, এই বন্দোবস্তও ভবিষ্যতের জন্য। এক্ষণে সম্পূর্ণ জমিদারীর ভারই কুমারবাহাদুরের

(১৬৫) Law of Primogeniture

হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় রাজানগর বাড়ীতে থাকিয়া জমিদারী শাসন করিয়া থাকেন। "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের" নীতিযন্ত্রে জমিদারীর কার্য প্রায় সুশৃঙ্খল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি আরও সংস্কার বিধান করিয়া সুচারুরূপে শাসন পরিচালন করিতেছেন। জমিদারীর "পুণ্যাহ" সচরাচর ভাদ্রমাসেই হইয়া থাকে, সে দৃশ্য যথার্থই হৃদয়াকর্ষক। কুমারবাহাদুর রাজানগর রাজপ্রাসাদকে "ফ্যান্সি ভিলা" (Fancy Villa) অর্থাৎ "সুরম্য পুরী" নামকরণ করিয়াছেন। তত্রত্য রাজবাড়ী সংলগ্ন মধ্য ইংরাজী স্কুলের উন্নতি বিধানের নিমিত্তও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কুমারবাহাদুর স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিই অতিশয় অনুরাগী। একসময়ে তিনি এই পার্বত্য প্রদেশের সমুদয় কার্পাসের একচেটিয়া ব্যবসায় খুলিবার চেষ্টা করেন কোন কারণে তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। তবে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধারণ ভাবেই কার্পাস ও তিলের ব্যবসায় চালাইতেছেন। সমস্ত পরের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া এখনও আশানুরূপ

জমিদারী

ফললাভ হয় নাই। পক্ষান্তরে কৃষিকার্যের প্রতি অতিশয় মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। তিনি চট্টগ্রাম-বিভাগীয় "কৃষিসমিতির" (Agriculture Committee) অন্যতম সভ্য। কৃষিবিষয়ক যখন যে নূতন গবেষণা বাহির হয়, তাহা অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া কার্যে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করেন। কোথাও সন্দেহ ঘটিলে তাহা লইয়া কৃষি সমিতিতে আলোচনা, অন্যথা সুপ্রসিদ্ধ "কৃষক" পত্রে জিজ্ঞাসা[১৬৬] করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি রাঙামাটির পার্শ্ব প্রবাহিতা কর্ণফুলীর অপর পারে এক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র (Model Garden) খুলিয়াছেন, বৎসরের যে কয়মাস রাঙামাটিতে থাকেন, তাহার অধিকাংশ

স্বাধীন ব্যবসায়

সময় রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া এই কৃষিক্ষেত্র সংলগ্ন সাধারণ গৃহে বাস করিয়া থাকেন। ইহার নাম রাখিয়াছেন "শান্তিকুঞ্জ"। নামটি যথার্থই হইয়াছে, হৃদয়বান লোক এখানে আসিলে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবেন।[১৬৭] পরিশেষে তদীয় শিকার নৈপুণ্যও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ রাজ-মহারাজগণ যেরূপ সিপাই-পল্টন লইয়া (!) পশুশিকারে বহির্গত হন, তিনি তাহা করেন না, প্রায়শই অনন্য-নির্ভর শিকারের মধ্যে এযাবৎ দুইটি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'ই বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত।

ফলতঃ ভুবনমোহন, রমণীমোহন কি বর্তমান রানী শ্রীশ্রীমতী রমাময়ীর জীবন-চরিত লিখিবার সময় এখনও বহুদূরে। তাঁহাদের জীবনের উৎকৃষ্টভাগ সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। প্রিয় পাঠকবর্গের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার জন্যই উল্লিখিত কয়েকটি স্থূল কথা এখানে বলিতে হইয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যৎ ইতিহাস বা জীবনী লেখকদিগেরও কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। কখনও এ আশা, কার্যতঃ সফল দেখিতে পাইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব!

(১৬৬) বাঙ্গালা ১৩১২ সনের আষাঢ় সংখ্যার 'কৃষক' দ্রষ্টব্য।

(১৬৭) কিছুদিন হইল, ইহা এখান হইতে চেঙ্গীতীরে তদীয় বন্দুকভাঙা মৌজায় উঠাইয়া নিয়াছেন। তথায়ও তাঁহার উৎসাহ প্রশংসাযোগ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১) রাজনীতি — শাসন প্রথা — রাজকীয় উৎসব
(২) তালুক ও তালুক দেওয়ান
(৩) মৌজা গঠন ও হেড্‌ম্যান নিয়োগ
(৪) কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১

রাজনীতি বলিলে সচরাচর যে অর্থ প্রতীত হয়, সেই "সাম দান-ভেদ-দণ্ড" একমাত্র স্বাধীন রাজারই পরিচালনার অধিকারী। অধীনের বিধি-ব্যবস্থাতেও স্বাধীনতা নাই, তাহাদিগকে সভয়ে ও সাবধান কর্তৃপক্ষের প্রদর্শিত পথ ধরিয়া কার্যনির্বাহ করিতে হয়। ১৮৬০, ১৮৮৪, ১৮৯২ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বিধান সমূহের(১৬৮) দ্বারা মাননীয় গভর্নমেন্ট ক্রমে এই পার্বত্য প্রদেশের সর্বময় প্রভুত্ব হস্তগত করিয়াছেন। ফলতঃ বর্তমানে এদেশ একরূপ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে শাসিত হইতেছে। রাজা এবং তদধীন হেড্‌ম্যানগণ স্ব স্ব নির্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত প্রজাবর্গের শান্তিরক্ষা ও করসংগ্রহ করিয়া পারিশ্রমিকস্বরূপ রাজস্বাংশ ভোগ করেন। সুতরাং এক্ষণে চাক্‌মা-রাজমহোদয়ক করদরাজসংজ্ঞাভুক্ত করা যাইতে পারে না। পূর্ববর্তী রাজাদিগের উন্নত প্রভাব-গৌরব যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই অতীতের প্রভামণ্ডিত চিত্রখানি বর্তমানের পার্শ্বে ধরিলে নিতান্ত শত্রুকেও ম্রিয়মান হইতে হয়। কিছুকাল পূর্বে যে চাক্‌মা নরপতি দীক্ষাদাতা গুরুকে পর্যন্ত "মহারাজ ভট্টাচার্য" উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, আজ সেই চাক্‌মাধীশ্বর অর্থহীন "রাজা" কার্যতঃ সরদার বা অধিনায়ক (Chief) উপাধি মাত্র সম্বল লইয়া আছেন। কালের কি বিচিত্র মহিমা। রাজা বাহাদুর "উদ্যোগী পুরুষসিংহ" হউন, "কাপুরুষ", আমরা ইহাতে বিধাতার হাত দেখিয়াই মনকে প্রবোধ দিব। কে বলিবে, তাঁহার শুভ-ইচ্ছা আরও কত না অভিনবত্ব দেখাইবে ?

অধঃপতন

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রধানতঃ এক ইংরাজ সুপারিন্টেডেন্টেরই কর্তৃত্বাধীন। অপর একজন এসিস্টান্ট সুপারিন্টেডেন্ট ও দুইজন সব ডেপুটি কলেক্টর তাঁহায় সাহায্য করিয়া থাকেন। চট্টগ্রামের কমিশনারের হস্তে এথাকার সেসন জজ এবং ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল অব পোলিসের ক্ষমতা ন্যস্ত, প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট হাইকোর্টের প্রভুত্ব ওপরিচালনা করেন। গভর্নমেন্টপোলিস(১৬৯)

(১৬৮) পরিশিষ্টের "মধ্যভাগে" ১৯০০ সালের বিবিধ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

(১৬৯) রুমা, লামা, কাচালং, চন্দ্রঘোনা, রামগড়, রাঙামাটি, বান্দরবন ও মাহালছরীতে সরকারী থানা আছে। যাবতীয় আবশ্যকীয় ঘটনাই পোলিসকে জানান হয়। একজন পোলিস কর্মচারী গড়ে ৩৭ বর্গমাইল প্রায় ৯০০ লোকের শান্তিরক্ষা করিতেছে।

কর্তৃক গুরুতর এবং পাহাড়ী ও ‘দেশের’ লোকসংসৃষ্ট ঘটনার অনুসন্ধান হয়, অপরাপর অভিযোগের বিচার-ভার সার্কেল চিফের উপর অর্পিত হইয়া থাকে। ইংরাজ-রাজপুরুষদের রিপোর্ট পাঠেও দেখা যায়, গুরুতর অপরাধ কদাচিৎ ঘটে। খুন ও গুরুতর জখম প্রায়ই হিংসা ও পানবশতঃ হয়। অপরাধী কদাচিৎ দোষগোপন ও বিচার অমান্যের চেষ্টা পাইয়া থাকে(১৭০)। বর্তমান রাজা বাহাদুর উচ্চতম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট-প্রায় ক্ষমতা মাত্র লাভ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন

বিচার ক্ষমতা

করেন। তবে তাঁহাদের হইতে অধিকতর সুবিধা অবশ্যই আছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে নির্দ্ধারিত মাননীয় বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের বিধান মতে তিনি নিম্নোক্ত কতিপয় গুরুতর অভিযোগ ব্যতীত স্বীয় সার্কেলের সাধারণ অধিবাসী কর্তৃক বিহিত যাবতীয় বিষয়েরই বিচার করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার জরিমানা, ক্ষতিপূরণ আদায় বা কয়েদ করিবার অধিকার আছে। যাহারা অর্থদণ্ড পরিশোধে অসমর্থ, তাহাদিগকে জেল খাটিতে হয়, রাজবাড়ীতেই জেলখানা আছে। কয়েদী দ্বারা রাজবাড়ী সংসৃষ্ট নানা কার্য করান গিয়া থাকে। স্থানীয় সুপারিন্টেডেন্ট রাজা বাহাদুরের নিষ্পত্তির পুনর্বিচার করিতে পারেন। ক্ষমতাতিরিক্ত বিচার্য যথা ঃ—

১। গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্ট কর্মচারী এবং গভর্নমেন্টের নিষ্পাদিত বিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

২। সাংঘাতিক আঘাত সংঘটিত এবং প্রাণনাশক অস্ত্র-ব্যবহৃত—তাদৃশ দাঙ্গার অভিযোগ।

৩। কাহারও বিরুদ্ধে খুনী, অজ্ঞানকৃত নরহত্যা, ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর আঘাত, বে-আইনী আটক, বলাৎকার*, মানুষ ভুলাইয়া নেওয়া* মানুষ চুরি* এবং অনৈসর্গিক দোষের অভিযোগ।

৪। জোরে গ্রহণ, দস্যুতা, ডাকাইতি, অনধিকার প্রবেশ এবং পরে সিঁদ দিয়া — ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি লইয়া গেলে, তজ্জন্য অভিযোগ।

৫। জালিয়াতির বিরুদ্ধে অভিযোগ।

৬। অস্ত্র আইন সংসৃষ্ট অভিযোগ, এবং

৭। বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর ইহার সপক্ষে যাহা নির্ণয় করিতে পারেন, তেমন অভিযোগ বা অভিযোগসমূহ।

*পাহাড়ীদের মধ্যে যে সকল বলাৎকার, মানুষ ভুলাইয়া নেওয়া এবং মানুষ চুরি প্রভৃতি ঘটে, তৎসমুদয়ের বিচারভারও রাজাবাহাদুরের হস্তে আছে। তিনি এইরূপ জাতীয়তা-সংপৃক্ত আরও কোন কোন অভিযোগের মীমাংসা করিতে পারেন।

(১৭০) অদ্যাপি সময়ে সময়ে হেড্ কোয়ার্টার হইতে বহুদূরবর্তী স্থানের বিকৃতমস্তিষ্ক কেহ, কেহবা ব্রিটিশ রাজের প্রতি হেয়জ্ঞান দেখাইয়া স্বকীয় অধীশ্বরত্ব ঘোষণা পূর্বক অশিক্ষিত রায়তগণ হইতে কর আদায়ের চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, কর্তৃপক্ষের স্বল্পায়াসেই তাহা দমিত হইয়া যায়।

গভর্নমেন্ট কর্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ, বাজারের দোকানদার ও ব্যবসায়ীগণ, মাছ ধরিবার গঙ্গনখোলার পাট্টাগ্রাহিগণ ব্যতীত রাজাবাহাদুরের সার্কেল মধ্যে যাহারা বসতি কি চাষ-আবাদ করে, তাহারা সকলেই তদীয় অধীন প্রজা বলিয়া পরিগণিত। হেড্‌ম্যানগণ রাজার ক্ষমতা ও শাসনাধীনে থাকিয়া তাহাদের হইতে খাজানা আদায় করিয়া থাকেন, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে খিসা (কর সংগ্রাহক), কারবারী (গ্রামের শান্তিরক্ষক), বিধবা, বিপত্নীক, অবিবাহিত, নূতন পৃথক (পরিবার), রোগী (অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠ পীড়িত প্রভৃতি), এবং যাহারা সম্ভ্রান্ত দেওয়ান বা তালুকদার বংশে জন্মগ্রহণ করিযাও হেড্‌ম্যান পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারা মাত্র খাজানা হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। পরন্তু জুমও করে, অথচ সঙ্গে লাঙ্গলের চাষ করিতেছে বলিয়া কেহ জুমকর হইতে রক্ষা পায় না, ইহা ছাড়া ১৯০০ সালের নিয়মানুসারে স্থিরীকৃত হয়, — কোন জুমিয়া যদি এক সার্কেলে বসবাস করিয়া অন্য সার্কেলে জুম করে, তবে তাহার আপন রাজাকে যাহা দিতে হয়, তদ্ব্যতীত যে রাজার সার্কেলে জুম করে তাহাকেও সম্পূর্ণ জুমকর দিতে হইবে। আর একই রাজার সার্কেলাধীনে এক মৌজায় বাস করিয়া অপর মৌজায় জুম করিলে, আপন হেড্‌ম্যানকে নিয়মিত প্রাপ্য দিয়া তদরিক্ত যে হেড্‌ম্যানর মৌজায় জুম করে, — তাঁহাকেও জুমকরের অর্ধেক দিতে হয়। এস্থলে চাক্‌মা রাজার "জুম রেজেস্টারী'র একটি "ফরমের" নমুনা দেওয়া হইল। এতদ্বারা অতি সহজেই তদীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং কর আদায়-ব্যবস্থা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। —

শাসন ব্যবস্থা

REGISTER OF JOOMIAHS

IN THE

OFFICE OF THE CHAKMA RAJAH'S ESTATE

Chittagong Hill Tracts, for the year ...

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
				যোগ (Addition owing to immigration)													
তালুকের নাম ও নম্বর	মৌজার নাম ও নম্বর, হেডম্যানের নাম	প্রজার ক্রমিক নম্বর	রায়তের নাম ও গ্রাম	সন ১২৬ মঘির মোট ঘরের সংখ্যা	হিল ত্রিপুরা হইতে আগত	মগ রাজার সার্কেল	বোমাং সার্কেল	কালেক্টরী	আরাকান	কুকি প্রবেশ	নূতন বেকল (New separation)	গোপনীয় ঘর প্রকাশ	অন্য মৌজা হইতে আগত	খাস মৌজা হইতে আগত	আনাভিকাইন্ড মৌজা হইতে আগত	সমষ্টি	৫ ও ১৭ ঘরের সর্বমোট

(Continued)

১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
	বিয়োগ (Reduction owing to emigration)												
হিল ত্রিপুরা পলায়ন	মঙ রাজার সার্কেল	বোমাং সার্কেল	কালেক্টরী	আরাকান	কুকি প্রদেশ	অন্যের সঙ্গে যোগ হওয়া	ডকরার (Double entry)	অন্য মৌজায় যাওয়া	খাস মৌজায় যাওয়া	আনতিষঙ্গিক মৌজায় যাওয়া	নির্বংশ	সমষ্টি	অবশিষ্ট

৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪
সকর			নিষ্কর								
জুমিয়া	জুমিয়া ও চাষা	সমষ্টি	ঘিসা	কারবারি	রাড়া (Widowers)	অবিবাহিত	নূতন বেলক ,	রোগী ইত্যাদি	প্রকৃত চাষা	মোট	মন্তব্য

এই পার্বত্য প্রদেশে সাধারণতঃ চতুর্বিধ কর প্রচলিত।

করের বিবরণ

১। জুমকর — ১৮৭৩ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখের বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের আদেশে পরিবার-প্রতি চারি টাকা নির্ধারিত হয়। তন্মধ্য হইতে গভর্নমেন্ট এক টাকা, রাজা দুই টাকা এবং হেড্‌ম্যান এক টাকা পাইয়া থাকেন। এতদতিরিক্ত হেড্‌ম্যানের প্রত্যেক পরিবার হইতে একজনের চারিদিন "বেগার" প্রাপ্য আছে, জুমিয়াগণ এই চারিদিন বেগারের পরিবর্তে টাকা একটি দিয়াও রক্ষা পাইতে পারে।[১৭১] পরবর্তী নিয়মে চিফ্‌গণের উপর দশবৎসরের জন্য এক নির্ধারিত জুমকর ধার্য হইয়াছে, প্রজাসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির সহিত ইহার কোন পরিবর্তন ঘটে না।

২। চাষের খাজানা।[১৭২] যদি কোন উপযুক্ত লোক এই পাহাড়ে লাঙ্গলের চাষের জন্য জমি চাহে, তাহা হইলে গভর্নমেন্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, রাজা অথবা হেড্‌ম্যান তাহাকে অনুমতি দিতে পারেন। প্রথম তিন-বৎসর জমি সম্পূর্ণ নিষ্কর দেওয়া হয়। অনন্তর স্থানীয় সুপারিন্টেডেন্ট মহোদয় কর নির্ধারণ করেন। কর একবার ধার্য হইলে দশ বৎসর যাবৎ তাহা অপরিবর্তিত থাকে। এই চাষের খাজনা রাজাবাহাদুরের শাসন ও পরিদর্শনাধীনে হেড্‌ম্যানগণ কর্তৃক আদায় হয়। অবস্থানুসারে ইহা রাজার হাত দিয়া বা একেবারে গভর্নমেন্টের উশুলকারির কাছেও দেওয়া যাইতে পারে।

৩। অকৃষ্ট ভূমিকর। সুপারিন্টেডেন্ট বাহাদুর কর্তৃক অকৃষ্ট ভূমি সকলের উপর কর নির্ধারিত হইলে, তাহা চাষের জমির তৌজিভুক্ত হয় এবং এই সমুদয়ে প্রাপ্ত রাজস্বও চাষের খাজনার নিয়মে গভর্নমেন্ট, রাজা ও হেড্‌ম্যানের মধ্যে ভাগবণ্টন হইয়া থাকে। কিন্তু রাজার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা খাটে না। তাহা সুপারিটেডেন্ট মৌজা হইতে পৃথক করিয়া স্বয়ং লাগিয়ত করিতে পারেন এবং তৎপরিচালন কার্য — তিনি যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, হয়ত হেড্‌ম্যানের যোগে অথবা নিজেও চালাইতে পারেন।

৪। ছন এবং গর্জন খোলা কর। — সুপারিন্টেডেন্ট বাহাদুরই ছনখোলা লাগিয়ত করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বৎসর বৎসর অথবা দশবৎসরের অনধিককালের নিমিত্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। পরন্তু ইহার খাজানা পূর্বোক্ত তৌজিভুক্ত হয় না, কিংবা চাষের বা অকৃষ্ট ভূমির করের ন্যায় বিভক্ত হয় না। জুম করের গভর্নমেন্টের প্রাপ্য অংশ এবং চাষের লব্ধ রাজস্ব প্রতিবৎসর মার্চ মাসের মধ্যেই সরকারে দাখিল করিতে হয়। অনন্তর রাজা ও হেড্‌ম্যানগণ উপরি-উক্ত বিধানে কৃষ্ট ও অকৃষ্ট ভূমি করের কমিশন ফেরত পাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন এখানে জলকর, বন্দুকের খাজানা, খোঁয়াড়-টেক্স, পারঘাটার টেক্স, আবকারী-টেক্স, ফরেষ্ট বিভাগের শুল্ক প্রভৃতি

(১৭১) সাধারণ পাহাড়িগণ এতদতিরিক্ত সরকার বাহাদুরকেও আবশ্যক হইলে বৎসরে ১৫ দিন করিয়া বেগার দিতে বাধ্য; তজ্জন্য তাহারা দৈনিক পাঁচ আনা করিয়া মজুরী পায়।

(১৭২) ১৮৭৫ অব্দে চাষ সংক্রান্ত কর মাত্রই ছিল না, ১৯০৩ ০৪ অব্দে ২২০০০ টাকা হইয়াছে।

যথা নিয়মে আছে। ইত্যাদি যাবতীয় বাবাদে ১৯০৩-০৪ সালে এই দেশ হইতে মোট ১৩৪০২৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। এসকল কর Financial year অর্থাৎ ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বৎসর ধরিয়া লওয়া হয়।

জাতীয় বিধান

রাজা বাহাদুর জাতীয় বিধান মতে হেড্ম্যান অর্থাৎ দেওয়ান ও তালুকদার, এবং খিসা বা কারবারীর বাড়ী ভিন্ন অপর কাহারও আলয়ে গমন করিতে পারেন না। দৈবযোগেওবা সাধারণ চাক্মাগৃহে পদার্পণ করিলে, তাহাকে অন্ততঃ খিসা কি কারবারী করিয়া দিতে হয়। রাজাদেশ ব্যতিরেকে সাধারণ পরিবারে কেহ কোন স্বর্ণাভরণ, এমনকি "বাহু", "চন্দ্রহার" এবং পায়ের "মল" প্রভৃতি রৌপ্যালঙ্কারও ধারণ করিতে কিংবা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ন্যায় অবরোধ-প্রথা প্রবর্তনেও সক্ষম নহে। কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট দেওয়ানের মাত্র এতাদৃশ আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আছে। পরন্তু সাধারণ চাক্মা পরিবারে কখনই স্বর্ণালঙ্কার ধারণের অনুমোদন লাভ করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন রাঙামাটিস্থ চাক্মা ও ত্রিপুরাগ্রামের উপর চাক্মারাজার কতিপয় বিশেষ প্রভুত্ব আছে। এই সকল গ্রামনিবাসী চাক্মা ও ত্রিপুরাগণ জুতা, মৌজা এবং খরম ব্যবহার করিতে পারে না, এবং একমাত্র তদীয় অনুমতি ব্যতীত প্রাগুক্ত অলঙ্কার ব্যবহার কিম্বা অবরোধ প্রবর্তন, এমনকি কাঁচা পাকা ঘর প্রস্তুত করিতেও অসমর্থ। এই কারণে রাজাবাহাদুরের অধীন প্রজাগণ ১। খাস মৌজাবাসীদিগের মধ্যে যাহারা উপরোক্ত বাধ্যতার অধীন, ২। জাতীয় সুবিধা ভোগে অধিকারী চাক্মা হেড্ম্যানের অধীন মৌজাবাসিগণ ৩। তাহাতে বঞ্চিত চাক্মা হেড্ম্যানের অধীন মৌজাবাসিগণ এবং ৪। চাক্মা ভিন্ন অপর জাতীয় হেড্ম্যানের অধীন মৌজাবাসিগণ ইত্যাদি — ভেদে শ্রেণী চতুষ্টয়ে চিহ্নিত রহিয়াছে।

রাজ-অফিস

রাজকীয় দপ্তরখানা, বিচারালয়, হাজত-ঘর ইত্যাদি সমস্তই আধুনিক সভ্যতানুমোদনে গঠিত। কাগজপত্র, হিসাবনিকাশ ও কতক পরিমাণে পৌরাণিক সংস্কার ছাড়িয়া আসিয়াছে। পাঠক "জুমরেজেষ্টারী" হইতেই তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। যে সমুদয় কার্যে গভর্নমেন্টের সহিত অতি অতিশয় নিকট সম্বন্ধ, তাহার বিচার-মীমাংসা (Proceeding) একমাত্র ইংরাজীতে সম্পাদিত। কেবল প্রজাকে লইয়া ব্যবহৃত কাগজ-পত্র বাঙ্গালায় চলিয়া থাকে। রাজাবাহাদুর নিয়মিত সময়ে অফিসঘরে আসিয়া বিচারাদি সুনির্বাহ করিয়া থাকেন। তা ছাড়া দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি রাজকীয় কর্মে ব্যয় করেন। বাবু পীতাম্বর দাস রাজাফিসের সর্বপ্রধান কর্মচারী, এতদ্ভিন্ন ইংরাজী কেরাণী (English Clerk) বাবু মধুচন্দ্র দেওয়ান, আমিন বাবু অধীনচন্দ্র বড়ুয়া, দ্বিতীয় মোহরের বাবু শুভঙ্কর বড়ুয়া এবং অন্যতম মোহরের বাবু কৃষ্ণকুমাব দাসের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। রাজকর্মের সুবিধার জন্য গভর্নমেন্ট অফিসের অনুযায়ী এই কার্যালয় বন্ধ দেওয়া হয়, সুতরাং প্রজাগণ এক সময়ে আসিলে উভয় ধর্মাধিকরণেরই সাহায্য পাইতে পারে।

"পুণ্যাহ"[১৭৩] ভারতীয় রাজন্যবর্গের এক অতি পবিত্র দিন। সাধারণ জমিদার মহলে পর্যন্ত এই শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহাজনদিগের "নূতন খাতা" ও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সময়ে তাঁহারা স্ব স্ব সম্পর্কিত জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া নানা আড়ম্বর সহকারে বৎসরের প্রথম প্রাপ্য গ্রহণ করেন। জুমের ধান ও তিলসূতা উঠিয়া গেলে, কার্তিক মাসে পাহাড়ীদিগের হাতে টাকা-পয়সা আসে। তখন তাহারা বৎসরের কর প্রদানে কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়। এই সুযোগ অপেক্ষা করিয়া চাক্‌মারাজ অগ্রহায়ণের প্রথমভাগে শুভদিন নির্দিষ্ট করিয়া পবিত্র 'পুণ্যাহ' কর্ম সম্পাদন করেন। এসময়ে তাঁহার অধীন যাবতীয় হেড্‌ম্যানগণ আহূত হইয়া প্রত্যেকেএক বা ততোধিক রৌপ্যমুদ্রা নজর এবং সংগৃহীত জুমকর হইতে আপনাদের প্রাপ্য অংশ বাদ রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ও সংগৃহীত চাষকর প্রদান করিয়া থাকেন। জাঁকজমক, গীতবাদ্যে ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য স্মরণ করাইয়া দেয়, আর দর্শকগণ সেই রামায়ণ-মহাভারত বিশ্রুত গৌরবমহিমার অপূর্ব স্ফুরণ দেখিয়া আনন্দে মজিয়া রহে। এই "পুণ্যাহ" উপলক্ষে স্থানীয় গভর্নমেন্ট হাইস্কুলও একদিনের নিমিত্ত বন্ধ থাকে। পুণ্যাহের দিন প্রাতে স্কুলবোর্ডিং-এর ছাত্রবর্গ এবং সমাগত হেড্‌ম্যানগণ রাজালয়ে ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। আনুষঙ্গিক ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক, পুরাকালে "মাংচী দেওয়ান" নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রজা রাজসমীপে প্রার্থনা করিয়া এই উৎসব উপলক্ষে মদ খাওয়ার নিমিত্ত দেওয়ান-তালুকদারগণের বংশ-মর্যাদানুসারে এক টাকা আট আনা ও চারি আনা ইত্যাদিক্রমে "ভাঙ্‌তি খরচ" পাইবার অনুমতিলাভ করেন। হেড্‌ম্যান প্রথা প্রবর্তিত হইলেও এই ব্যবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে, রাজসরকারের প্রধান কার্যাধ্যক্ষ পুণ্যাহান্তে দাখিলা দেওয়ার সময় হেড্‌ম্যানগণকে যথাযোগ্য "ভাঙ্‌তি খরচ" প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজকীয় উৎসব

একষট্টি পৃষ্ঠার টীকায় "রাজপাড়ালিয়া" দিগের বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে রাজপরিবারের দাসত্বকার্য সমুদয় করিতে রাঙামাটিতে কয়েক ঘর ত্রিপুরা আছে। ইহাদের পূর্বপুরুষদিগকে কোন ভীষণ দুর্ভিক্ষে তদানীন্তন চাক্‌মারাজা ক্রয় করিয়াছিলেন, তদবধি ইহারা চাক্‌মারাজার "গোলাম" আখ্যায় অভিহিত। চামর ঢুলান, ছত্রধারণ প্রভৃতি কার্য ইহাদিগেরই দ্বারা করান হয়। ইহাদের পূর্বপুরুষ প্রধানতঃ ত্রিপুরা ছিল। কালে মঘ, চাক্‌মা, টংচঙ্গ্যা প্রভৃতির শ্রেণীর লোকও এই জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ করিয়া[১৭৪] তাহাদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং অনেক অনাথ চাক্‌মা বালকও ইহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া তথাকথিত শ্রেণীভুক্ত হইয়া আছে।

রাজগোলাম

(১৭৩) ইহার বিস্তারিত বিবরণী ১৩০২ সনের মাঘ সংখ্যার "প্রবাহে" মল্লিখিত "চাক্‌মারাজার পুণ্যাহ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১৭৪) পরন্তু ইহাদিগের বিবাহবন্ধনকে "মানুষের চাষ" মাত্র মনে হয়। ভগ্নী-কন্যা, ভ্রাতৃ-কন্যা, শালীকন্যা, মাসী, পিসী, বড়শালী, ভ্রাতৃবধূ, ভগিনেয়বধূ, ভ্রাতৃপুত্রবধূ, বৈপিতৃবধূ, বিমাতা, সহোদরা-শ্বশ্রু এবং নানা শ্রেণীর শ্বশ্রু এমনকি সহোদরাকে পর্যন্ত বিবাহের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। লিখিতেও লজ্জা আসে, পুষ্পবতী নাম্নী এক রমণী সুরাধন নামে কোন ব্যক্তিকে প্রথমে ধর্ম পুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, অনন্তর পতিত্বে বরণ করিয়াছে!!! এরূপ পাশবদৃশ্য মনুষ্যনামধারী অপর কোন সমাজে আছে কি না, অবগত নহি।

২

চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রধানকর্তা মিঃ হারি ভেরিলষ্ট ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে চাক্‌মাধিপতির বিশাল স্বীকার করিয়াছিলেন, আমরা তাহা যথাস্থানে দেখাইয়া আসিয়াছি। তন্মধ্য হইতে কতকাংশ - সীতাকুণ্ডের পাহাড় প্রভৃতি চট্টগ্রাম জিলাভুক্ত হইয়াছে। পঞ্চমাংশেরও অধিক ৬৫৩.১ বর্গ মাইল মঙ্‌রাজা বে-দখল করিয়াছেন এবং আরও প্রায় তৃতীয়াংশ সীতাপাহাড় (১১), রাইনখ্যং (২২৮.৩), কাচালং ও মাইয়নী (৭৯৫) - একুনে ১০৩৪.৩ বর্গমাইল বনপ্রদেশ গভর্নমেন্টের "ফরেষ্ট-রিজার্ভে" রক্ষিত হইতেছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর নির্ধারিত "রাজা হরিশ্চন্দ্রের সার্কেল"ও অধুনা পরিবর্তিত। এইরূপে প্রায়ই চঞ্চলা চাক্‌মা রাজ্যলক্ষ্মীর অঞ্চল সঙ্কুচিত হইতেছে। গত ১৮৯৮ সনেও একবার এই সীমা নির্দেশ হইয়া গেল। তাহাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। যাহা হউক, বর্তমানে চাক্‌মারাজার অধিকৃত এই পার্বত্যপ্রদেশের পরিমাণ ফল — ১৫৯৭.৯ বর্গমাইল।

সীমা ও পরিমাণ

১৮৯১ ইংরাজীর লোকগণনা কার্যের সুবিধার নিমিত্ত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে চাক্‌মা সার্কেল ৯ (নয়) খণ্ডে (Block) বিভক্ত করা হয়। পরে ১৮৯২ সালের আইনে সেই বিভাগই স্থায়িরূপে অনুমোদিত হইয়া খণ্ডগুলি "তালুক" নামে অভিহিত হইয়াছে। তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ওল্ডেমের প্রস্তাবে এই সকল তালুকের উপর এক একজন "তালুক দেওয়ান" নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং এই ১৮৯২ সালের আইনে স্থিরীকৃত হয় যে, বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর কথিত তালুক - দেওয়ান নিযুক্ত করিবেন। প্রত্যেক তালুকের অধিবাসিবর্গ—কেবল গভর্নমেন্টের কর্মচারী এবং তাঁহাদের পরিবারেরা ব্যতীত আর যাহারা তালুকে চাষ করে বা বাস করে, সকলেই তত্তৎ দেওয়ানের ক্ষমতাধীন হইবে, তালুক দেওয়ানেরা স্ব স্ব তালুকান্তর্গত হেড্‌ম্যানদিগের বিচারের পুনর্বিচার, হেড্‌ম্যানের ক্ষমতাতীত কোন কোন অভিযোগের বিচার, তন্নিমিত্ত ১০০ একশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা, জরিমানা আদায়, ও এসিষ্টান্ট কমিশনারের আদেশ প্রাপ্তি যাবৎ আসামী আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন, এতদ্ভিন্ন লাঙ্গলের চাষে লব্ধ রাজস্ব হইতে রাজা ও হেড্‌ম্যানদিগের প্রাপ্যাংশ ভিন্ন তিনিও ১/৮ অংশ পারিশ্রমিকস্বরূপে প্রাপ্ত হইবেন, এই সকল বিধানানুসারে নিম্নোক্ত মহাশয়েরা তালুক-দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন —

তালুক ও তালুক দেওয়ান

তালুকের নাম		তালুক-দেওয়ান
১ নম্বর তালুক কাচালং	—	শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ান
২ নম্বর তালুক চেঙ্গী	—	নীলচন্দ্র দেওয়ান
৩ নম্বর তালুক মহাপ্রুং	—	শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ান
৪ নম্বর তালুক সত্তা	—	শ্রীযুক্ত কমলাঙ্গ চৌধুরী*
৫ নম্বর তালুক ইচ্ছামতী	—	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রোয়াজা*

৬ নম্বর তালুক রাঙামাটি	—	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান
৭ নম্বর তালুক রাজভবন	—	রাজার খাস
৮ নম্বর তালুক শুভলং	—	শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ান
৯ নম্বর তালুক বড়কল	—	শ্রীযুক্ত কুমার রমণীমোহন রায়

ইহাদের মধ্যে* তারাচিহ্নিত দুইজন মঘজাতীয়;এবং রাজা ও কুমার বাহাদুর ভিন্ন অবশিষ্ট পাঁচ জনও চাক্‌মাসমাজের মুখপাত্র ছিলেন। রাজাবাহাদুর ঈদৃশী ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা দেখাইয়া আপত্তি উত্থাপিত করেন, তাহাতে অবশেষে তালুক-দেওয়ান-প্রথা রহিত হইয়া যায়।

৩

এই সকল তালুক আবার ১২৪টি মৌজায় বিভক্ত। ফলতঃ ১৮৯২ এবং ১৯০০ সালের আইনে যথাক্রমে সার্কেল ও মৌজাবিভাগ দৃঢ়তর হইয়াছে। শেষোক্ত আইনমতে প্রত্যেক মৌজার পরিমাণফল ১$^{1}/_{2}$ বর্গমাইলের কম বা ২০ বর্গমাইলের অধিক হইবে না। যে যে স্থানে চাষের কাজ চলিতেছে, অথচ স্থায়ী বসতি আছে, প্রথমে সেই সকল স্থান মৌজা গঠিত হয়। কোনস্থানে মৌজাভুক্ত না হইলে অনির্দিষ্ট (undefined) ভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মৌজায় ৫০ একর উত্তম কৃষিযোগ্য ভূমি গভর্নমেন্টের খাস তত্ত্বাবধানে থাকে, তাহা "সার্বিস ল্যান্ড" (Service Land) অর্থাৎ জায়গীর বা চাকরাণের জন্য রাখা হয়। গ্রাম্য কার্যের জায়গীরস্বরূপ—হেড্‌ম্যান, পাটোয়ারী (খিসা) বা কারবারী কিম্বা যদি প্রহরী নিযুক্ত করা হয়, সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুর তাহাদের মধ্যে কার্যকালেব নিমিত্ত উক্ত ভূমি নিষ্কর ভোগদখল করিতে প্রদান করেন। প্রায় প্রতি হেড্‌ম্যানই ইহা হইতে ২৫ একর করিয়া পাইয়াছেন।

মৌজা গঠন

ইতিপূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, ধুর্যা-কুর্যা-ধাবানা-পিড়াভাঙা বংশচতুষ্টয় চাক্‌মাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহাদের পূর্বপুরুষ রাজার মন্ত্রীত্ব করিতেন, তাঁহাদের "দেওয়ান" পদবী ছিল। পাগলা রাজার বিধবা পত্নীর মৃত্যুর পর চাক্‌মা রাজসিংহাসনের অধিকারী নির্বাচনের সময় ধুর্যা ভ্রমক্রমে অপদস্থ হইয়া উচ্চসম্মান হারাইয়াছিলেন। পদচ্যুত হইয়া তিনি তালুক গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে পদবীও তালুকদার হইয়া যায়। উত্তরকালে বংশ বিস্তৃত হওয়ায় কুর্যা, পিড়াভাঙা, এমনকি—রাজপরিবার ব্যতীত ধাবানা বংশের আর সকলকেও সংসারযাত্রা পরিচালনের নিমিত্ত সেইরূপ তালুক গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তখনও ইহাদিগের দেওয়ান আখ্যা পরিবর্তিতহয় নাই।[১৭৫]

দেওয়ান ও তালুকদার

(১৭৫) সরকার, কানুনগো, মজুমদার প্রভৃতি পদবীগুলির ন্যায় "দেওয়ান" উপাধিও ক্রমে বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। তবে দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এই সামান্য অধিকারটুকুও হারাইয়া হীনতম অবস্থায় পড়িয়া রহিলে, কেহই আর তাহার "দেওয়ান" আখ্যা মানে না। তখন সে সাধারণ "চাক্‌মা" উপাধিতেই পরিচিত হইয়া থাকে।

এই মৌজাবিভাগের পূর্বে দেওয়ান ও তালুকদারগণ স্ব স্ব তালুকের দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রভৃতি সর্ববিধ কর্তৃত্ব করিতেন, কেবল প্রাণদণ্ডাজ্ঞার নিমিত্ত রাজানুমতি লইতে হইত। শেষে শেষে রাজা বাহাদুরকে প্রচুর পরিমাণে নজর দিয়া অনেকেই দেওয়ান নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা রায়তদের হইতে পরিবার প্রতি ৩/৪ টাকা করিয়া কর ও ১৫ দিন 'বেগার' বা তৎপরিবর্তে দুই টাকা অতিরিক্ত আদায় করিতেন। তাহা হইতে ঘর প্রতি আট আনা ও একজনের ১৫ দিন বেগার রাজাকে দিতেন। দেওয়ানগণ ইহা ছাড়া বৎসরের প্রথমজাত ফল ও হরিণ, শূকর, গয়াল প্রভৃতি শিকারলব্ধ প্রাণীর একখানি করিয়া 'রাণ'(১৭৬) প্রাপ্ত হইতেন। এবং — দেওয়ান পরিবারের বিবাহে প্রত্যেক ঘরকে এক টাকা করিয়া চাঁদা নির্দিষ্ট পরিমাণে ভোজ্য সামগ্রী ও মদ(১৭৭) দিতে হইত। সেইরূপ দেওয়ান-তালুকদারগণও রাজপরিবারের বিবাহে পাঁচ হইতে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা, নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী ও মদ্য দিতে বাধ্য ছিলেন। অতিপূর্বে অলঙ্কার ধারণ ও অবরোধ প্রবর্তনের অনুমোদন এবং শিকারলব্ধ প্রাণীর অংশ প্রাপ্তির ক্ষমতাও একমাত্র রাজার হাতে ছিল, অনন্তর কতিপয় দেওয়ান প্রভৃত নজর দিয়া তাদৃশ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক দেওয়ানের রায়ত নির্দিষ্ট ছিল, তাহারা যেখানে যাইয়া জুম-আবাদ করুক না কেন, আপন অধিনায়ককে খাজানা এবং 'বেগার' দিতে বাধ্য হইত। এ সকল দেওয়ান বা তালুকদারেরা রাজার নিকট হইতে প্রজাদিগের পরিবার হিসাবে পাট্টা গ্রহণ করিতেন। কোন বিশেষ কারণে এই নির্দিষ্ট প্রজাসংখ্যার হ্রাস হইলেও খাজানা কমিত না। সেইরূপ নির্দিষ্ট পরিবারের লোক বৃদ্ধিতেও রাজস্ব বর্ধিত হইত না। কোন দেওয়ান কি তালুকদারের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রজা-পরিবার অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় পুত্রদের মধ্যে সমান অংশে বিভক্ত হইত, অপুত্রক হইলে তাঁহার কন্যা বা অপর উত্তরাধিকারী, তদভাবে রাজার খাস অধিকারে যাইত। প্রজার সংখ্যাধিক্যহেতু দেওয়ানদিগের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, রাজা ধরমবক্স তাহা খর্ব করিতে কতিপয় অতিরিক্ত দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে রাজা ইচ্ছা করিলে স্বীয় অধিকার হইতে প্রজা লইয়া নূতন পাট্টা দিতে পারিতেন। কালিন্দীরানী এই তালুকাধিকারের অংশ বিক্রয়ের ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তাহাতে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় পুনরায় তাহা রহিত করেন।

অধিকার ও ব্যবস্থা

১৯০০ সালের আইনের ফলে যে সকল মৌজা নির্ধারিত হয়, গভর্নমেন্ট প্রজা-নির্দেশ অধিনায়কত্ব-দেওয়ান-তালুকদার প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেক মৌজার উপর এক এক একজন দলপতি নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদিগের রাজকীয় উপাধি "হেড্‌ম্যান" (Headman) হয়। গভর্নমেন্ট কর্মচারী ও তাঁহাদের পরিবার, বাজারের দোকানদার ও ব্যবসায়ীগণ এবং মাছ ধরিবার ও গর্জন খোলার পাট্টাগ্রহিতৃবর্গ ব্যতিরেকে

হেড্‌ম্যান

(১৭৬) "রাণ" - উরু সহিত সমস্ত পদ।

(১৭৭) বলিয়া রাখা ভাল, অত্রত্য পাহাড়ী সকলেরই স্ব স্ব প্রয়োজনোপযোগী মদ্য প্রস্তুতের অধিকার আছে, কিন্তু বিক্রয় করিতে পারে না।

মৌজায় যাহারা বাস করে কিম্বা চাষ-আবাদ করে, সকলেই হেড্‌ম্যানের কর্তৃত্বাধীন। তিনি "মোড়লের" ন্যায়; পরন্তু কার্য অধিকতর দায়িত্বজনক। হেড্‌ম্যানের কাজ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। যেমন - রাজস্ব আদায় এবং মৌজার শান্তিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ বিচার।

হেড্‌ম্যানগণ রাজস্ব আদায়ে খিসা ও কারবারিদিগের সহায়তা পাইয়া থাকেন, তজ্জন্য তাহারা স্বয়ং রাজস্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। গভর্নমেন্টের নূতন ব্যবস্থায় হেড্‌ম্যানেরা নিজেও ২৫ একর করিয়া "সার্বিস ল্যান্ড" ভোগ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। এই খিসা ও কারিকর ভিন্ন অবিবাহিত, বিধবা, বিপত্নীক, চিররোগী প্রভৃতি অসমর্থগণও কর হইতে অব্যাহতি পায়। অপরাপর জুমিয়া পরিবার হইতে ইহারা চারিটাকা জুমকর এবং চারিদিন 'বেগার' আদায় করেন। কেহ কেহ বেগারের পরিবর্তে খাজনারূপে এক টাকা অতিরিক্ত দিয়া রক্ষা লাভ করিয়া থাকে। এই 'বেগার' বা অতিরক্তি টাকা একমাত্র হেড্‌ম্যানেরই প্রাপ্য। তাঁহারা জুমকর হইতেও এক টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট রাজসরকারে দাখিল করেন। যদি কোন জুমিয়া এক হেড্‌ম্যানের মৌজায় বাস করিয়া অপর হেড্‌ম্যানের মৌজায় জুম করে, তবে তাহাকে যে হেড্‌ম্যানের মৌজায় বাস করে, তাঁহার সম্পূর্ণ রাজস্বাদি দিয়া যে হেড্‌ম্যানের মৌজায় জুম করে, তাঁহাকেও দুই টাকা জুম কর দিতে হয়। হেড্‌ম্যানগণ এই সমস্ত উল্লেখ আপন আপন জুমরেজেষ্টারী সেপ্টেম্বর মোতাবেক আশ্বিন মাসের পূর্বে রাজাবাহাদুর সমীপে পাঠাইয়া দেন। অনন্তর রাজকর্মচারিগণ মৌজায় মৌজায় গিয়া সেই তৌজী পরীক্ষা করিয়া আসেন। হেড্‌ম্যানেরা রাজপুণ্যাহে অন্ততঃ এক টাকা করিয়া নজর এবং স্বীয় মৌজার জুম করের অধিকাংশ প্রদান করিয়া থাকেন। উপযুক্ত রায়তকে তাহার ক্ষমতাসাধ্য জমিতে চাষ করিবার নিমিত্ত ইহারা অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু রাস্তার বাধা ঘটে, কি সাধারণের অসুবিধা হয় অথবা গভর্নমেন্টের আবশ্যকে আসিবার সম্ভাবনা থাকিলে কোন কৃষিযোগ্য ভূমি হেড্‌ম্যানদিগের দ্বারা লাগিয়ত হইতে পারে না। কোন বন্দোবস্তি ইহার অন্যথা হইলে তাহা একিকালে রহিত হইয়া যায়। কিম্বা যদি কোন ভূমি বন্দোবস্তিভুক্ত হইয়া যাওয়ার পর গভর্নমেন্টের আবশ্যকে আসে, তবে তাহা ক্ষতিপূরণ দিয়া খাস করিতে পারেন। এই সমুদয় চাষের ভূমির নিমিত্ত হেড্‌ম্যানদিগকে স্বতন্ত্র "জমাবন্দী" রাখিতে হয়। মাননীয় সুপারিন্টেডেন্ট বাহাদুরের নির্দেশ মতে এই কর্ষিত ও অকর্ষিত ভূমির রাজস্বও ইহারা আদায় করিয়া সরকারে দাখিল করেন, পরে টাকা প্রতি ৯৻ আনা হিসাবে কমিশন লাভ করেন। এই সকল রাজস্বাংশ ব্যতীত দেওয়ান বা তালুকদারগণের ন্যায় রাজক্ষমতালব্ধ কোন কোন হেড্‌ম্যানও অধীন প্রজাগণের মধ্যে কেহ কোন পশু শিকার করিলে তাহার একখানি "রাণ" পাইয়া থাকেন। আর যাঁহাদিগের তাদৃশ অধিকার নাই, তাঁহাদের রায়তেরা রাজাকেই উক্ত "রাণ" প্রদান করে। [১৭৮] পক্ষান্তরে রায়তের বিবাহাদি শুভানুষ্ঠানে এক বোতল মদ, এক 'বিড়া' পান ও ৮টি সুপারি দিয়া হেড্‌ম্যানকে "সালাম" জানায়, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে।

রাজস্ব আদায় ও ক্ষমতা

(১৭৮) পরন্তু ঈদৃশ স্থলে কোন চাক্‌মা গয়াল মারিয়া রাজপ্রাপ্য "রাণ" না দিলে ৫০ টাকা, শূকর বা বড় হরিণ স্থলে ২৫ টাকা এবং ছোট হরিণ স্থলে ৫ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

মৌজার শান্তিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় তাসংপৃক্ত বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার হেড্‌ম্যানগণকে সম্পাদন করিতে হয়, অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইলে নজরান এক টাকা প্রয়োজন। তাঁহারা পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদন্ড এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুরের আদেশ প্রপ্তি যাবৎ আসামী আবদ্ধ রাখিতে পারেন। ইহাদের অনেকেই জরিমানালব্ধ অর্থ ভোগ করিতে ক্ষমতাবান। অপরাপরকে কিয়দাংশ (সাধারণ মোকর্দ্দমায় সাত টাকা) মাত্র রাজাকে দিতে হয়। মানুষ ভুলাইয়া বা চুরি করিয়া নেওয়া প্রভৃতি ক্ষমতাতিরিক্ত গুরুতর অভিযোগগুলি হেড্‌ম্যানেরা রাজাবাহাদুরের নিকটে পাঠাইয়া দেন। পরন্তু উভয়ের সম্মতি থাকিলে মাত্র ইঁহারা দম্পতির বিবাহবন্ধনচ্ছেদ অনুমোদন করিতে পারেন, অন্যথা তাহা উচ্চতর আদালতে পাঠাইয়া দিতে হয়।

বিচার

উপযুক্তানুসারেই হেড্‌ম্যান নির্বাচিত হয়, তবে বংশ গৌরবের প্রতিও কিঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকে। সুতরাং দেওয়ান-তালুকদার বংশধরেরাই চাক্‌মাজাতিতে বিদ্যেবুদ্ধিতে সমধিক উন্নত বলিয়া অধিকাংশ স্থলে পূর্বগৌরব অক্ষুন্ন রহিয়াছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুর রাজা এবং মৌজাবাসীদিগের সহিত বিবেচনা করিয়া হেড্‌ম্যান নিযুক্ত করেন। তিনি অযোগ্যতা কিম্বা অসৎব্যবহারের নিমিত্ত পদচ্যুত করিতেও পারেন। এই পদে উত্তরাধিকারসত্ত্ব নাই;কিন্তু পুত্র যোগ্য হইলে পিতার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। কোনও হেড্‌ম্যান একাধিক মৌজার ভার পাইবার অধিকারী নহেন। পূর্বে রাজার খাস অধিকারে ১০০০ এক সহস্র পরিবার "রাজপাড়ালিয়া" ছিল। তাহাদের বসবাসের জন্য বিশেষ বিবেচনায় রাজাবাহাদুর ১২ বারটি মৌজা পাইয়াছেন। অবশ্য এই সকল মৌজা শাসনে তাঁহাকে গভর্নমেন্টের সহিত হেড্‌ম্যান-প্রায় ব্যবহার চালাইতে হয়। নিম্নে রাজা ও কুমার বাহাদুর ব্যতীত চাক্‌মা হেড্‌ম্যান ও পার্শ্ববর্ত্তী মধ্যে তাঁহাদের অধিকৃত মৌজার তালিকা হইল —

নিয়োগ

মৌজা ও হেড্‌ম্যান

চাক্‌মা সার্কেলে

১নং তালুক কাচালং। শ্রী নীলচন্দ্র দেওয়ান (বড় কাট্টলি) শ্রী জৈলাধন দেওয়ান (চালদ্যাতলী, শ্রী চন্দ্রমানিক দেওয়ান (ডলছ্বরী), শ্রী নবচন্দ্র দেওয়ান (ঘহছ্বরী), শ্রী থৈয়া তালুকদার (মারিচ্যাচর), শ্রী দিবর্বধন দেওয়ান (রাঙাপানিছ্বরা), শ্রী কর্ণচন্দ্র তালুকদার (পটান্যারমারছ্বরা, শ্রমনুয়া তালুকদার (ভাসান্যা আদম), শ্রী কিনারাম তালুকদার (নলুয়া), শ্রী মদনমোহন দেওয়ান (খাগরাছ্বরী), শ্রী শশিমোহন দেওয়ান দেওয়ান (ঘনমোহর, শ্রীযুবলক্ষ তালুকদার (কাকপর্য্যা, শ্রী ভুবনমোহন দেওয়ান (বেগেনাছ্বরী), শ্রী ইন্দ্রজয় দেওয়ান (কর্কুটীছ্বরা), শ্রী গোলক্ক তালুকদার (বগাচতর)।

২নং তালুক চেঙ্গী। শ্রী অবিনাশচন্দ্র দেওয়ান (ছয়কুড়িবিল), শ্রী শশিকুমার দেওয়ান (মাইচছ্বরী), শ্রী যোগেন্দ্রনাথ দেওয়ান (সাবেক - ক্যং), শ্রীবাঙ্গালীচান তালুকদার (কাট্টলতলী) শ্রী মেত্তা তালুকদার (জাদুখাঁছ্বরা); শ্রী বিজয়গিরি তালুকদার (গবছ্বরী), শ্রীমানিকচন্দ্র তালুকদার (এগরাল্যা ছ্বরা), শ্রী সূর্য্যধন তাঁলুকদার (শলছ্বরী)।

৩। তালুক মহাপ্রুম্। শ্রী নীলমনি দেওয়ান (চৌধুরীছরা), শ্রীকবিরাজ দেওয়ান (ঘিলাছরী, শ্রী অক্ষয়মণি তালুকদার (হাজাছরী), শ্রী রাজমণি দেওয়ান (ছোট মহাপ্রুম্), শ্রী যুবরাজ দেওয়ান (বুড়ীঘাট), শ্রী ব্যাসমানি দেওয়ান (বড়াদম), শ্রী সূর্য্যচন্দ্র তালুকদার (বেতছরী), শ্রী রাজচন্দ্র দেওয়ান (বাঁকছরী), শ্রী নবীনচন্দ্র তালুকদার (তৈ - চাক্‌মা), শ্রী রাজচন্দ্র দেওয়ান (বগাছরী), শ্রী কুমার তালুকদার (কেঙাইলছরী)।

৪ নং তালুক সর্ত্তা। শ্রীঅভয়াচরণ তালুকদার (দুরছরী), শ্রী কৃলচন্দ্র দেওয়ান (বানরকাটা) শ্রী অঙ্গনমোহন দেওয়ান (মুক্তাছরী), শ্রী হরিকান্ত তালুকদার (ডানের বানর কাটা), শ্রী গোপীনাথ তালুকদার (লক্ষীছরী), শ্রী শ্রীশচন্দ্র দেওয়ান (শুক্‌নাছরী), শ্রী রমনীমোহন দেওয়ান (কেরেক্কাবা), শ্রী মন্দিচরণ তালুকদার (না-ভাঙা)।

৫ নং তালুক ইচ্ছামতী। — শ্রী ভত্তারাম তালুকদার (মুবাছরী), শ্রী ভাগ্যধন তালুকদার (ঘাগরা) শ্রী রাজচন্দ্র তালুকদার (ঘিলাছরী)।

৬ নং তালুক রাঙামাটি। — শ্রী জয়কুমার দেওয়ান (রাঙাপানি), শ্রী চন্দ্রধর দেওয়ান (বাকছরী), শ্রী ত্রিজগৎ দেওয়ান (ঝগড়াবিল), শ্রীচন্ডীচরণ দেওয়ান (জীবতলী), শ্রী নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান (কামিলাছরী), শ্রী ত্রিলোচন দেওয়ান (বড়াদম), শ্রী রতনমানিক দেওয়ান (সাপছরী, শ্রী গঙ্গামানিক দেওয়ান (শূকরছরী), শ্রী মুক্তাকিশোর দেওয়ান (কদুগছরী), শ্রীকান্তমাথ চাক্‌মা (ডলছরী), শ্রী কৃষ্ণচরণ দেওয়ান (তৈমিদুং)।

৭নং তালুক রাজভবন। — শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান (বালুখালি), শ্রী কামিনী মোহন দেওয়ান (মঘবান), শ্রী ঘনেশ্বররাম তালুকদার (কৌশল্যাখোনা), শ্রী জয়চন্দ্র তালুকদার (ধনপাতা), শ্রীকর্ম্মধন দেওয়ান (কতুবাদিয়া), শ্রীতিলক চন্দ্র দেওয়ান (নারেইছরী), শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেওয়ান (ফুলগাজি বাপের ছরা), শ্রী মানিকচাঁদ তালুকদার (বিলাইছরী), শ্রী সিক্কাধন তালুকদার (কেরণছরী), শ্রীনবীনচন্দ্র দেওয়ান (কাইন্দা)।

৮নং তালুক শুভলং। — শ্রী কৃষ্ণ কিশোর দেওয়ান (মিতিঙাছরী), শ্রী শরচ্চন্দ্র দেওয়ান (জারুলছরী), শ্রীমদন মোহন দেওযান (এরেইছরী), শ্রীলালমোহন দেওয়ান (পানছরী), শ্রী বিরাজমোহন দেওয়ান (মৈদং), শ্রী নীলচন্দ্র কারবারী (তিন্-দোছরী), শ্রী পঞ্চারাম তালুকদার (বাঘা ছোলা), শ্রী কিঙ্কর দেওয়ান (চোখপতিঘাট), শ্রী জালৈয়া তালুকদার (ডুবাজারুল), শ্রী বীণাধন দেওয়ান (কুসুমছরী), শ্রী চন্দ্রধন তালুকদার (বনজুগীছরা), শ্রী মেঘনাথ দেওয়ান (ফকির ছরা), শ্রী কৈলাসধন দেওয়ান (লুলাংছরী)।

৯নং তালুক বড়কল। শ্রী কৃলচন্দ্র তালুকদার (গর্জ্জনতলী), শ্রী চন্দন খাঁ দেওয়ান (গোরস্থান), শ্রী রতন খাঁ দেওয়ান (আইবাছরা), শ্রী ইন্দ্রধন দেওয়ান (হেইৎভরাইয়া),

শ্রী ভৈরবচন্ড দেওয়ান (মাওদং), শ্রী পবনরাজ দেওয়ান (ধুমবাৎলাং), শ্রী মাণিক্যা তালুকদার (তৈবুং), শ্রীবিদ্যাধর তালুকদার (বামের হালস্বা), শ্রীজয়ন্ত তালুকদার (চিবা বড়হরিণা) প্রভৃতি ৮৮ জন।

মঙ্‌সার্কেলে

শ্রী রসিকচন্দ্র দেওয়ান (আমতলী), শ্রী ভৈরবচন্দ্র দেওয়ান (বড়নল), শ্রী কৈলাসচন্দ্র তালুকদার (তুবুলছড়ী), শ্রী শশিকুমার দেওয়ান (তৈলাভাঙ্), শ্রী মাণিকধন তালুকদার (আশালং)শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেওয়ান (বড়বিলি), শ্রী গগনচন্দ্র দেওয়ান (আলুটিলা), শ্রীনিত্যানন্দ খিসা (মুবাছড়ী) , শ্রী রাজকুমার তালুকদার (কাইয়ং ঘাট), শ্রী নবীনচন্দ্র তালুকদার (লেমুছড়ী), শ্রী রামমোহন খিসা (দুপুর্গ্যা নল), শ্রী কিস্তা খিসা (কেরেঙানালা), শ্রী উমাচরণ দেওয়ান (গোমারী ঢালা), শ্রী হরিধন তালুকদার (উল্টাছড়ী), কিনাধন্ তালুকদার[১৭৯] (দাদ্‌কুপ্যা), শ্রী হরিধন দেওয়ান (ইদ্‌ছড়ী), শ্রী পূর্ণজয় (দুরছড়ী), শ্রী ঈশানচন্দ্র দেওয়ান (কমলছড়ী), শ্রী মোগলধন কারবারী (ভূয়াছড়ী) প্রভৃতি ১৯ জন।

৪

আমরা এস্থলে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির জীবনী রক্ষা করিতেছি। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনচরিত নহে, জীবনের স্থূল পরিচয় মাত্র। বলা বাহুল্য, পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়েই আমাদিগকে

জীবনী

এজন্য সঙ্কুচিত হইতে হইল। ভবিষ্যৎ সতন্ত্র সতন্ত্র জীবন-ইতিবৃত্ত লিখিয়া ধন্য হউন, আমরা তাঁহাদের সৌকার্য্যার্থে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী কার্য্যকালের সংবাদও রাখিয়া গেলাম। চাক্‌মাসমাজের প্রধান ব্যাক্তির কথা চিন্তা করিতেই সর্বপ্রথমে —

ঈশানচন্দ্র দেওয়ান - এর নাম মনে আসে। যদিও তিনি অধুনা আর এ পৃথিবীতে নাই, তথাপি তাঁহাকে বর্ত্তমান সমাজের পথ-প্রদর্শয়িতা বলা যায়। তাঁহার পিতার নাম লবন খাঁ দেওয়ান, মাতার নাম ভেলুয়া বিবি। এই লবণ খাঁ ওয়াংঝাগোছার অক্ষয়-গৌরব মহাবীর রণুখাঁর দ্বিতীয় পুত্র রতন খাঁ ও রাজকন্যা পত্যমণির শুভ সম্মিলনের ফল। কিন্তু ঈশানচন্দ্র অধিককাল পিতৃসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই; তবে তদীয় মহীয়সী জননীর পালনগুনে পিতার অভাবজনিত কোন কষ্টই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিয়াছিল না। ভেলুয়া বিবির ন্যায় ধম্মপরায়ণা দয়াবতী - সাহস ও বুদ্ধি শলিনী রমণীর সংবাদ অতি অল্পই শুনা যায়। তিনি নাবালক পুত্রগণকে লইয়া অতি সুবন্দোবস্তে পরিবার চালাইয়াছিলেন। অসভ্য কুকিগণও তাঁহাকে বিশেষ ভয় সম্ভ্রম করিত, অদ্যাপি কুকিমহলে তাঁহার যশঃকীর্ত্তন শুনা গিয়া থাকে। ১৮৬০

(১৭৯) কিনাধনের মৃত্যু, হওয়ার তৎপুত্রের সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত মংঘই নামক জনৈক মখের সরবরাহকারিতায় উক্ত মৌজার ভার আছে।

খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ খন্ডন-হত্যাকান্ডে কুকিগণ তথা হইতে যে সকল লোককে ধরিয়া লইয়া যায়, ভেলুয়া বিবি তাহাদের মধ্য হইতে নানা কৌশলে তিনটী ত্রিপুরারমণীকে উদ্ধার করিয়া গভর্নমেন্টের হস্তে সর্ম্পাণ করেন। বঙ্গের তদানীন্তন লেপ্টেনান্ট গভর্ণর এই নিমিত্ত তাঁহাকে আন্তরিক গভীর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লেখাপড়া বিশেষ শিখিতে না পারিলেও ঈশানচন্দ্র মাতার অসামান্য বুদ্ধি ও চরিত্র লাভ করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই অবস্থা উন্নত করিয়া লইয়া ছিলেন। কৃষি, শিল্প ও বানিজ্যের প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রবল অনুরাগ ছিল, দেশ ও জাতির উন্নতি বিধায়ক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক আলোচনার প্রতিও তেমন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। গভর্নমেন্টের নিকটও তাঁহার খুব সম্মান ছিল, একসময়ে তিনি ছোটলাট বাহাদুরের "গার্ডেন পার্টিতে"ও নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালীন স্থানীয় প্রায় সমুদয় ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষই তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত প্রশংসাপত্রগুলি এখনও দেখিতে পাই। ধর্ম্মকার্য্যেও তিনি সাতিশয় মুক্তহস্ত ছিলেন, একবার জাতীয় প্রথানুরূপ পিন্ডোৎসর্গ কার্য্যের জন্য বহুসহস্র টাকা ব্যায় করেন। এ জগতে কেহই চিরস্থায়ী নহে, ১২৯০ বাঙ্গালার ২৫শে আশ্বিন মহালয়া পূর্ব্বদিনে ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ জন্মেজন্ম বাল্যকাল হইতেই বলিষ্ঠ, সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতি কিন্তু অতিশয় ক্রোধী, ও দুষ্টবুদ্ধি ছিলেন। ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ইন্দ্রজয় ঢাকা হইতে আসিলে ক্রমে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ ঘটে, অবিলম্বে তাঁহারা পৃথক হইয়া পড়েন। অনন্তর জন্মেজয় কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শনহেতু হেড্‌ম্যান পদচ্যুত হওয়ার গভর্নমেন্টের উপর বিরক্ত হইয়া ৭০ জন রায়ত সংগ্রহ করত— পাবর্বত্য ত্রিপুরায় চলিয়া যাইতে ছিলেন; পথিমধ্যে কাচালং রিজার্ভের তিনটিলা ফরেষ্ট ষ্টেসনের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার সঙ্গীগণকে উক্ত ষ্টেসন আক্রমণ ও লুন্ঠন করিতে প্ররোচিত করেন। ফরেষ্ট গার্ডেরা সমূলে নিহত হয়, এবং তাহারা গভর্নমেন্টের প্রায় ২০০০ টাকা লইয়া যায়। পরে তাহাদের ৩৮ জন ধরা পড়ে, তম্মধ্য হইতে ৩জন রাজার সাক্ষ্যে মুক্তি পায়। আর সকলেরই ২-১০ পর্য্যন্ত মেয়াদ হইয়াছে। দলপতি জন্মেজয় ১৯০০ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছিলেন না, পরে ধৃত হইয়া জাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরে বাস করিতেছেন। ইন্দ্রজয় বাবুই বর্ত্তমানে পিতৃভদ্রাসনে আছেন। পরন্তু ভ্রাতৃ-বিরোধ এক্ষণে তাঁহার অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে। ঈশানবাবুর পরেই

নীলচন্দ্র দেওয়ান - এর কথা বলিতে হয়। তিনি মুনিমাগোছার ধাবানা বংশজ কান্দর খাঁর ঔরসে এবং জাহ্নবীর গর্ভে ১২৪২ বাঙালার ৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার (চঙ্গী) বড়াদম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখনও এদেশে শিক্ষাদানের সুব্যাবস্থা না হওয়ায় বাল্যকালে তাঁহার ভগ্যে উপযুক্ত বিদ্যালাভ ঘটে নাই। ১২৬০ সনের কার্ত্তিক মাসে তিনি কালিন্দী রানীর সেরেস্তায়

তহশিল দারিতে নিযুক্ত হন। রানী তাঁহার কাজকর্ম্মে অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ শিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি রানীর পক্ষ হইতে পাঁচশত লোক লইয়া গভর্নমেন্টের সাহায্য করেন;তজ্জন্য তিনি একখানি ধন্যবাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি ঘটনাবশে রানীর কার্য্যে পরিত্যাগ করিয়া গভর্নমেন্ট পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যে প্রবেশ করেন। সেই পদে থাকিয়া ১৮৭২ সালের লুসাই অভিযানে তিনি কুকি-দমন এবং রসদ-সংগ্রহ কার্য্যে গভর্নমেন্টকে বিশেষ সাহায্যে করিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কাপ্তেন লুইন তাঁহাকে চেঙ্গী উপনদীর পূবর্বকুলবর্ত্তী পাহাড়ের শৃঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত বন্দোবস্তি দিতে চাহিয়াছিলেন;কিন্তু তিনি তাহা লয়েন নাই। অবশেষে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি ১৬ বৎসর সরকারী কার্য্যের পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মাসিক ২৬।।৯৮ পাই হিসাবে পেনসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হরিশচন্দ্রের সাহায্যকারী কৌন্সিলের সভ্য ও পরে কার্য্যনিবর্বাহক কৌন্সিলের সভাপতি নিবর্বাচিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন পাইতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সবর্বপ্রধান কার্য্য — তিনি এই পাবর্বত্য প্রদেশে সবর্বপ্রথম লাঙ্গলেয় চাষ প্রবর্ত্তন করিতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ১২৬২ সনে নীলচন্দ্রবাবু লার্ম্মাগোছাসম্ভূত গঙ্গাধরের পিতৃস্বসা চিত্রবতীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার গর্ভে কোন সন্তানাদি না হওয়াতে ১২৬৯ সনে রাঙিগোছার তুবুদির ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদীয় গর্ভে পুত্র শশিকুমার, চিত্রকুমারের জন্ম হয়। সহৃদয় গভর্নমেন্ট তাঁহার কার্য্যফল স্মরণে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত শশিকুমার দেওয়ানকে পুলিশের সাব-ইন্‌স্পক্টরের পদে, নিযুক্ত করিয়াছেন;নীলচন্দ্র বাবু জীবদ্দশাতেই ইহা দেখিতে যাইতে পারিয়াছিলেন। গত ১৩১৩ বাঙ্গলার ৫ই পৌষ ইংরাজী ২০ শে ডিসেম্বর (১৯০৬), তদীয় ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। ইহার পরে

গিরিশচন্দ্র দেওয়ান - এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি নীলচন্দ্র দেওয়ানের পিতৃব্য মৃত গুন্দার খাঁ দেওয়ানের পুত্র। খল্লতাত গুমান খাঁ কতিপয় দুষ্টলোকের পরামর্শ তাঁহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাহাতে বাধ্য হইয়া তাঁহারা বাঙ্গলা ১২৬১ সনে হাদাছরা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সঙ্গে প্রায় চারিসহস্র ত্রিপুরা এবং ৫/৬ শত চাক্‌মা আসিয়া তাঁহাদের প্রজা হয় সেখানে তাঁহাদের অব্যাহত ক্ষমতাছিল, এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচারাদি করিতেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরা মহারাজের বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর[১৮০], উদয়চন্দ্র ঠাকুর, মধুচন্দ্র এবং সেনাপতি পরীক্ষিত প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়া বিখ্যাত কুকি সরদার রতন পুঁইয়ার[১৮১] সঙ্গে মিলিত হইয়া দেমাগিরিতে বাস করিতেছিলেন। একদা তাঁহারা কতকগুলি কুকি সমভিব্যাহারে ত্রিপুরার

(১৮০) ত্রিপুরার "রাজমালাতে" ইহার আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, পৃঃ (৩৩৬)।

(১৮১) কাপ্তেন লুইনের "ফ্লাই অন্ দি হুইল" নামধেয় গ্রন্থে রতনপুঁইয়া সম্বন্ধীয় নানা কথা আছে।

কৃষ্ণবলী পোমাং নামক কনৈক প্রতাপান্বিত ব্যক্তির পাড়া লুট করিতে যাওয়ার সময় গিরিশচন্দ্রের পাড়ায় আসিয়া তাঁহাদের ঘর জ্বালাইয়া দেয় এবং অনেককে হত্যা করে। এ সময়ে বাড়ীতে জ্যেষ্ঠদের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র ৭/৮ শত লোককে তিন স্থানে ব্যূহাকারে স্থাপন করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের এক ভৃত্য ধৃত হয়; বিদ্রোহীদল চলিয়া যায়। পরে ইহারা প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাদিগকে পুনরায় আক্রমন করে। এবারও ইহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু পলায়নকালে ইহাদের লূণ্ঠিত ছয়জন যুবতীকে তাঁহারা উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে আবার ৫০/৬০ জন কুকি আসিয়া তাঁহাদের একটি পরিত্যক্ত বাড়ীর যত ঘর জ্বালাইয়া দেয় এবং নানা উপদ্রব করিতে থাকে। তখন গিরিশচন্দ্র দোনালী বন্দুকে গুলি বর্ষণ আরম্ব করিলে সকলেই পলায়ন করে। পরে আবার পৌষ মাসে প্রায় চারি হাজার কুকি আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে, গিরিশচন্দ্র নয়জন মাত্র লোক লইয়া সম্মুখীন হন। বন্দুকের গুলিতে ১৬ জন কুকি হত হয়; অপরেরা পলায়ন করে। এইরূপে কুকিদের অত্যাচার অসহ্যবোধে তাঁহারা চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছ্বরী থানার অন্তপাতী বারমাসিয়া গ্রামে আবাসস্থান অন্তরিত করেন[১৮২]। সেখানে দুই বৎসর কাল মাত্র বাসের পর রামগড় আসিয়া বসতি আরম্ভ করেন, পরে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান বাসস্থান আমতলী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও পূবের্ব তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। ডেপুটী কমিশনার মি. এ. ডব্‌লিউ, পাউয়ার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুনের পত্রে[+] লিখিয়াছিলেন ঃ ফেণীকূলে গিরিশচন্দ্র দেওয়ান বিশেষ প্রতিপত্তি - সমপন্ন।" তিনিই আবার পরবর্ত্তী বৎসরের ২১শে এপ্রিলের পত্রে[++] লিখিয়াছিলেন ছ "গিরিশচন্দ্র দেওয়ান যদিও হরিশ্চন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করেন; কিন্তু স্বীয় প্রজাগণের উপর রাজার মত শাসন চালাইয়া থাকেন।"

Letter no. 472
Letter no. 319

তন্যাগোছার শ্রীমতী লক্ষ্মীপতির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; তৎগর্ভে দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ রসিকবাবুর হাতেই জমিদারী চলিতেছে। গত ১৩১৩ সনে গিরিশচন্দ্র তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। বুদ্ধ গয়া হইতে ফিরিয়া আসিতে বর্দ্ধমানে ১৮ই কার্ত্তিক ১৩১৩, ইংরাজী ৪ঠা নভেম্বর (১৯০৬) পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপরে যে তিন ব্যক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইল, তাঁহারা সকলেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত। অনন্তর অধুনা বর্ত্তমান আর তিনজন প্রধান ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ইহাদের জীবনী অসম্পূর্ণ। ভগবান করুন, ইহারা আরও সুদীর্ঘকাল ইহসংসারে থাকিয়া দেশের ও দশের কার্য্যে গৌরবান্বিত হউন।

(১৮২) যেরূপ শুনিতে পাই, নীলচন্দ্র দেওয়ান এবং গিরিশচন্দ্র দেওয়ানের পারিবারিক বিবাদেই কুকির উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ধামাইগোছার পিড়াভাঙা গোষ্ঠিতে বাঙ্গলা ১২৫৮ সনেব ২২শে জৈষ্ঠ বুধবার ৮ দন্ড রাত্রিকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম — "কুঁউগ্যারিবাঁক" তীরবর্ত্তী কামিলাছরী গ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। এই গ্রাম রাঙামাটি হইতে চট্টগ্রামের ৭ মাইল নিকটতর। বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণচন্ডের অটল অধ্যবসায় এবং বিপুল কার্য্যদক্ষতা— সৌভাগ্যসঞ্চারের প্রধান কারণ ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের নিকট প্রাচীন প্রণালীমতে শিক্ষা লাভ করেন। পরে পরে অনুমান ৭/৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজা নগর রাজবাটীতে থাকিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তদনন্তের ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রঘোনায় ইংরাজী-বাঙ্গালা মিশ্রিত বিদ্যালয় খোলা হইলে তাহাতে গিয়া ভর্ত্তি হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মোতাবেক ১২৭৪ সনের ১০ই চৈত্র পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহকে বাধ্য হইয়া ৪র্থ শ্রেণী হইতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন প্রায় চারিমাস চন্দ্রঘোনার ডেপুটি কমিশনার আফিসে শিক্ষানবিশের কার্য করেন। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই কমিশনার লর্ড ইউলিক ব্রাউন তাঁহাকে ৪০ টাকা বেতনে উক্ত আফিসের দ্বিতীয় কেরানী পদে নিযুক্ত করেন। এসময়ে তাঁহাব উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান প্রধান নগরী রাঙামাটির তদানীন্তন জঙ্গল পরিষ্কার করাইবার ভার অর্পিত হয়। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী ডেপুটী কমিশনার অফিস রাঙামাটিতে উঠিয়া আসে। তদবধি তিনি এখানেই স্থায়ীরূপে আছেন। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত নীলচন্দ্র দারোগার ভ্রাতুস্পুত্রী ত্রিলোকচন্দ্র দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী ক্ষেমশ্বরীর সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হয়। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ২৭শে আগষ্ট ৫০ টাকা বেতনে 'ইংরাজী কেরানী' পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বর গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে রাজা হরিশচন্দ্রের সাহায্যার্থে কাউন্সিলের সভ্য এবং হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পব ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে তদীর পার্বত্যরাজ্যের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। রাজসরকার হইতে তিনি তজ্জন্য প্রথমে ৫০ পঞ্চাশ টাকা পরে একশত টাকা করিয়া বেতন পাইতে ছিলেন। ১৮৯০ ইংরাজীর চীন-লুসাই অভিযান[১৮৩] কালে তদীয় সাহায্যলাভে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া সহৃদয় গভর্নমেন্ট তাঁহাকে একটি সুবর্ণঘড়ি প্রদান করিয়াছেন। তাহার পৃষ্ঠে খোদিত আছে;—

"Presented
by
Government
to
Babu Kristo Chandra Dewan

(১৮৩) এই অভিযানের বিস্তৃত বিবরণী "রাজমালা"য়ও পাওয়া যাইবে। ৩৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Manager of the Chakma Raja's Estate
For Good Services rendered
During the Chin-Lushai Expedition
1890 A.D."

অর্থাৎ "১৮৯০ খৃষ্টাব্দের চীন-লুসাই অভিযানকালে বিশেষ সাহায্য করায় চাক্‌মারাজ-সম্পত্তির ম্যানেজার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানকে গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত।" অনন্তর তিনি ১৮৯৫ ইংরাজীর ২৭শে সেপ্টেম্বর ১০০ টাকা বেতনে ৪র্থ শ্রেণীর সবৃডিপুটি কালেক্টরের পদ লাভ করেন; ক্রমে বেতন বর্তমানে ২৫০ টাকা হইয়াছে। তাঁহার এই অপূর্ব উন্নতির মূলে দুইটি মহৎ গুণ সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। একটি—অসাধারণ সরল ব্যবহার, দ্বিতীয় সু-উচ্চ সদাশয়তা।

তাঁহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়া সবডেপুটি কলেক্টরের পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে চট্টগ্রামে আছেন। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, কৃষ্ণবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর—

শ্রীযুক্ত ত্রিজগত দেওয়ান

মহোদয় স্থানীয় গভর্নমেন্ট কোষাগারের (Treasury) খাজাঞ্চির কাজে আছেন;তিনিও অতিশয় সরল। পঞ্চমতঃ—

শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ান

ইনিও "দামাই গোছা'র" "পিড়াভাঙা" গোষ্ঠী সম্ভূত। পিতার নাম জয়চন্দ্র দেওয়ান, মাতা—রম্ভাবতী। ১৮৫৪ ইংরাজী মোতাবেক ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২২শে আষাঢ় প্রাগুক্ত "কুঁউর্গ্যার বাঁকেই" বড়াদম নামধেয় গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। বহুকাল ধরিয়া তাঁহারা এই গ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। পিতার অবস্থাও মন্দ ছিল না, পরন্তু তিনি দেশে এবং সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তিনি অনেকদিন স্বর্গগতা কালিন্দী রানীর মন্ত্রিত্ব কার্যত্ত করেন। দুঃখের কথা এহেন পিতৃসুখভোগ ত্রিলোচনবাবুর ভাগ্যে অধিক দিন ঘটে নাই! তাঁহার পঞ্চমবর্ষ বয়সে ১২৬৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তদীয় বুদ্ধিমতী জননী পুত্রের স্বাভাবিকী প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অচিরে তাঁহাকে চন্দ্রঘোনার সেই মিশ্রবিদ্যালয়ে ভর্তি করাইয়া দেন। তবে পাঠে তাঁহার অশেষ অনুরাগ ও জননীর প্রবল চেষ্টা থাকিলেও, তিনি বিদ্যালয়ে অধিককাল কাটাইবার অবসর পান নাই। সংসার চালাইবার অপর কেহ না থাকায় ৫/৬ বৎসর পরেই

তাঁহাকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; পরন্তু এক্ষেত্রে তিনি এত পারদর্শিতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন যে, ক্রমে তদীয় ভান্ডার ধনধান্যে পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বিবরণ দিব—ধনসম্পত্তিতে এতদ্দেশে চাক্‌মা বাহাদুরের অব্যবহিত নিম্নেই তাঁহার স্থান নির্দেশ করা যায়। পূর্বে যে "ধামাইর হাটের" নাম উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, তাহাও ইহার অধিকারে; তা ছাড়াও চট্টগ্রামে অপর জমিদারী মহাল আছে।

কালিন্দী রানীর সরকারেও তিনি কাজ করিয়াছিলেন। পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাঙামাটিতে গভর্নমেন্টের অধস্তন কোষাগার (Sub Treasury) সংস্থাপিত হইলে, তিনি প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া তাহাতে খাদাঞ্চীর পদে ছিলেন। অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্রের কৌন্সিলে পঞ্চাশ টাকা বেতনে সভ্যপদে কাজ করেন। পরিশেষে ভুবনবাবু যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তৎপর কিছুকাল তদীয় পরামর্শ-দাতা স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু যে কারণে তিনি বিদ্যালয় ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন, পুনঃ তেমনি কারণে এই পরকীয় দায়িত্বভার পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সম্পত্তি সুরক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত চলিয়া যান। ইত্যবসরে গভর্নমেন্ট সমীপেও তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ লুসাই অভিযানে সাহায্য করায় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদসূচক লিপি প্রদান করেন। ত্রিলোচন বাবুর গুণগ্রাম কেবল এ সকলে নহে, দান-ধর্ম-তীর্থ পর্যটন প্রভৃতিতে তাঁহার অশেষ গৌরব, যাচক মাত্রকেই তাঁহার নিকট রিক্ত হস্তে ফিরিতে হয় না, জাতিধর্ম নির্বিশেষে এমন কি মতের বৈষম্য থাকিলেও তিনি প্রার্থী বিমুখ করেন না।

১৮৭১ ইংরাজিতে সুপ্রসিদ্ধ ঈশানচন্দ্র দেওয়ানের কন্যার সহিত পরিণয় হয়। তাঁহাদের পবিত্র সম্মিলনে চারিপুত্র ও দুই কন্যা জন্মিয়াছে। বিশেষ পরিতাপের বিষয়, জ্যেষ্ঠপুত্র মনোমোহনের মস্তিক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিকার ও মনোরঞ্জনার্থে ত্রিলোচনবাবু যথাসাধ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। অপর শ্রীমান্ কামিনীমোহন প্রভৃতি অধ্যয়নে নিরত। পিতৃসুখ ভাগ্যে অধিককাল না থাকিলেও প্রায় ৪৮ বৎসর ধরিয়া ত্রিলোচনবাবু মাতার অনাবিল স্নেহ লাভ করেন; গত ১৩০৯ সালের কার্তিক মাসে সেই মহীয়সী মাতাকেও হারাইয়াছেন!

শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ান

পরলোকগত নীলচন্দ্র দেওয়ানের অন্যতম পিতৃব্য গুমান খাঁ দেওয়ানের ঔরসে পুণ্যগর্ভা সন্ধ্যার গর্ভে ১২৫৭ বাঙ্গালার (শুক্রবার) তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু পরবর্তী বৎসরেই পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। অনন্তর ১২৬৫ বঙ্গাব্দে অগ্রজ মোহনচন্দ্র দেওয়ান তাঁহাকে লইয়া বাঁকছরী গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; বর্তমানেও তাঁহারা তথায় বাস করিতেছেন।

রাজচন্দ্র বাবুও রাজানগর রাজবাড়ী থাকিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে চন্দ্রঘোনা গভর্নমেন্ট স্কুলে ছয়বৎসর পাঠের পর বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্বক পুলিসের হেড্ কনষ্টেবল পদে নিযুক্ত হন। ছয়মাস তাহাতে কাজ করিয়া ছাড়িয়া দেন। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে চাক্‌মারাজ-সরকারে দেওয়ানি কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের লুসাই অভিযানে কালিন্দী রানী তাঁহাকে গভর্নমেন্টের সাহায্যার্থ পাঠান। গভর্নমেন্ট তাঁহার কার্যে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন। পরে তিনি মাসিক ৫০ টাকা বেতনে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কার্য পরিচালন সভার সদস্যপদেও নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় বলে স্বীয় অবস্থাকে বহুপরিমাণে উন্নত করিয়াছেন, অধুনা বিষয়-কর্ম লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। শ্রীমান যোগেন্দ্র ও নির্মলচন্দ্র নামে তাঁহার দুইটি পুত্র, কিন্তু পক্ষান্তরে সপ্ত দুহিতারত্ন লাভ করিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
(শ্রমবিভাগ ও কুলমর্যাদা)
খিসা—কারবারী—ওঝা—এবং রায়তগণ

১

রিজলী মহোদয় বলিয়াছেন (*– "Among the Chakmas, as perhaps among the Greeks and Romans in the beginning of their history, the sect is the unit of the tribal organization for certain public purposes."— "সম্ভবতঃ গ্রীক ও রোমানদিগেরই মত চাক্‌মাদের বংশ কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্যে জাতীয় শৃঙ্খলাবিধানের (পক্ষে) একক হয়।" কিন্তু বলিতে কি, সম্প্রদায় বিশেষে শ্রমবিভাগের কঠোর ব্যবস্থা হিন্দু-সমাজ ভিন্ন আর কোথায়ও নাই। ইহাতে সমাজের ইষ্টানিষ্ট উভয়ই আছে। একদিকে শ্রমবিভাগে যেমন এক একটি কার্যের ভার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীর উপর ন্যস্ত থাকায়, তাহাদের বংশধরগণ অতি অল্প আয়াসেই তত্তৎ ব্যবসায়ে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইতে পারে, পক্ষান্তরে আবার উপযুক্ত প্রতিযোগিতার অভাবে উন্নতির পথে তেমন অগ্রসর হইবার শক্তি পায় না; এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতে সমাজে কোনও নূতন তেজ প্রবেশেরও সুবিধা নাই। বোধহয়, ভারতের প্রাচীন রত্নগুলি হারাইবার ইহাও একটি বিশেষ কারণ। শক্তি না পাইলে কি দিয়া তাহা রক্ষা করিবে? পাশ্চাত্য নীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ এতাদৃশী ব্যবস্থার প্রতি তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। যে দেশে একই জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এ হেন বিপ্রকর্ষণ রহিয়াছে, সেখানে আর জাতীয় একতার সম্ভাবনা কোথয়? বস্তুতঃ হিন্দুদের ভিতর কতকগুলি নিয়ম এমনি কঠোর যে, তাহার বিষময় ফলে সাধারণকে সততই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। কোন রকমে তৎপ্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে সমাজে "পতিত" থাকিতে হয়। ব্যবসায় লইয়া এরূপে জাতীয় উচ্চতা পরিমিত হয় বলিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থও বজায় থাকে। সেই সুযোগে তাহারা একমত হইয়া অবাধ-অত্যাচার করিবারও প্রয়াস পায়। আর তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা পাইলে অমনি বাত-ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত ভীষণাকার ধারণ করিয়া "ধর্মঘট" করিয়া বসে। সুতরাং সমস্ত নির্যাতন সাধারণকে নীরবে সহ্য করিয়া লইতে হয়। "স্বদেশী-আন্দোলনের"র ফলে অনেকেই সাম্প্রদায়িক তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্বপ্রতিভানুরূপ কর্মে নিয়োজিত হইতেছে তাহাতে যে সমাজের একটি মহৎলাভ ঘটিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রমবিভাগ

*Tribes and Castes of Bengal, Page-170

চাক্‌মাদিগের মধ্যেও শ্রমবিভাগে কতকটা শ্রেণীবিভাগ আছে, কিন্তু তাহা বংশগত নহে—কার্যগত মাত্র। 'খিসা' 'কারবারী' 'ওঝা' 'রায়ত' প্রভৃতি আখ্যাগুলি তাহাদের কার্য লইয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'খিসা' 'কারবারী' গ্রামের সকলেরই নির্বাচন-মতে নিযুক্ত হয়। আবার সকলের সমবেত মত হইলে তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতেও পারা যায়। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে,

অভিজ্ঞ হইলেই "ওঝা'র ব্যবসায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যোগ্যতা না থাকিলে উত্তরাধিকার সূত্রে এই সকল কাজ চালাইবার অধিকার পাওয়া যায় না। পরন্তু ইহারা কখনও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অনাদৃত বা অস্পৃশ্য নহে! এমন কি, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ পর্যন্ত চলিতে কোন বাধা নাই। 'দেওয়ান' ইচ্ছা করিলেই 'খিসা', 'কারবারী' বা 'রায়ত' কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন; এরূপ আদান-প্রদান সমাজে যথেষ্ট চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন নিমন্ত্রণাদিতে সকলে একত্রেই বসিয়া খায়। কিন্তু বসিবার বিশেষ শৃঙ্খলা থাকে। রাজ-পরিবারের আসন সর্বাগ্রে নির্দিষ্ট হয়, অনন্তর 'দেওয়ান', 'তালুকদার' 'খিসা', 'কারবারী' 'ওঝা' ও 'রায়ত' ক্রমে বসিয়া যায়। আবার ইহাতেও কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে। তালুকদার "কুটুম্বে বড় হইলে" অর্থাৎ যদি কোনও তালুকদার সম্পর্কে দেওয়ানের পূজনীয় হয়, তবে সেই তালুকদারের স্থান পূর্বে হইবে।

কুলমর্যাদা

খিসা — খিসাগণ দেওয়ান-তালুকদার অর্থাৎ হেড্‌ম্যানদিগের প্রধান সহকারী; সমাজ শাসনে বা খাজানা উশুল-তহশীলে ইহারা বিশেষ সাহায্য করে। এই নিমিত্ত তাহারা হেড্‌ম্যানগণের আহ্বান মতে উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের কি রাজাবাহাদুরের বাড়ীতে কর্মধ্যক্ষতা করিতেও ইহারা সুযোগ পায়। বড় বড় ব্যাপারে ইহাদিগের হাতে প্রধানতঃ ভান্ডার ঘরের ভার পড়ে; তদ্ভিন্ন লোক খাওয়ান, অভ্যর্থনা করা প্রভৃতি নানাদিকেই তাহাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বলা বাহুল্য, সমাজে অপর সাধারণের ক্রিয়াকর্মে ইহাদের উপর প্রধান প্রধান কার্যের অধ্যক্ষতা থাকে, ইহারাও তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। খিসাগণকে জুমকর দিতে হয় না, চাষের জন্য গভর্নমেন্ট হইতে বিনা করে জায়গীর পায়। তবে কিনা ইহাদিগকে রাজ পুণ্যাহ এবং রাজার বা হেড্‌ম্যানগণের শুভানুষ্ঠানে এক 'চুঙা'[(১৮৪)] মদ, একটি হৃষ্টপুষ্ট মোরগ ও একটি "আক্‌চলী"[(১৮৫)] দিতে হয়। এই "খিসা" আখ্যাটী মঘদিগের হইতেই অনুকৃত হইয়াছে।

কারবারী— কারবারী "আদমের" শান্তিরক্ষক। দেশের চৌকীদারদিগের ন্যায় ইহারা গ্রামে কোন গোলযোগ ঘটিলে হেড্‌ম্যানের গোচরীভূত করে, সামান্য অভিযোগে হেড্‌ম্যানেরা কারবারীর উপরই মীমাংসার ভার দিয়া থাকেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনাস্থলে ইহাদিগকে নিশ্চয় উপস্থিত থাকিতে হয়। প্রয়োজন হইলে খিসাগণও ইহাদের সাহায্য পায়। অধিকন্তু হেড্‌ম্যানের বাড়ীতে কারবারীর প্রভুত্ব ও কম নহে; অনেকে কারবারীর উপরই সংসারের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তাহারা কায়মনে মনিবের হিত সাধনে তৎপর রহে। কারবারী-গণও জুমকর হইতে মুক্ত এবং জায়গীর ভোগ করিতে পায়। এতদ্ভিন্ন আর কোন পারিশ্রমিক নাই! তাই গ্রামবাসিগণকেও চৌকিদারী কর দিতে হয় না।

(১৮৪) চুঙা - বাঁশের এক পর্বপরিমিত অংশ মাত্র। ইহার এক প্রান্তে গাঁট এবং অপর প্রান্ত খোলা থাকে।

(১৮৫) অক্‌চলী কাঁচা এক আড়ি অর্থাৎ ষোলসের বা পাকা চৌদ্দ সের চাউল পরিপূর্ণ বাঁশের চ্যাচাড়ী নির্ম্মিত চুপড়ী বিশেষ।

ওঝা — এই আখ্যাটি প্রাচীন বাঙ্গালাতেও পাওয়া যায়। অমর কবি কৃত্তিবাসও আপনাকে "মুরারি ওঝার নাতি" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রাদি অবধৌতিক চিকিৎসা দ্বারা ভূতপ্রেতের দৃষ্টি নিবারককেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু চাক্‌মাদের 'ওঝা' ঠিক তাহা নহে। ইহাদিগের 'ওঝা' দুই জাতীয়—স্ত্রী-ওঝা ও পুরুষ-ওঝা। যে সকল স্ত্রীলোক ধাত্রীর কাজ করে, তাহাদিগকেও 'ওঝা' বলে। সামাজিক অনেক কার্য পুরুষ-ওঝাগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়;বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলে ওঝার কাজ করিতে পারে না, ভূত-প্রেতাদির উৎপাত নিবারণ, রোগপ্রতিকার, গ্রামদেবতা পূজা প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়াকর্মে ইহাদের প্রয়োজন। এক কথায় —ওঝাগণ সমাজের যাজক।[১৮৬] অনুষ্ঠানের পূর্বদিন একচুঙা মদ, পাঁচগন্ডা পান ও পাঁচটি সুপারি লইয়া গৃহস্থ ওঝাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। অনন্তর ওঝা রাত্রিতে খাওয়ার পর অতি পবিত্রভাবে ভগবানকে স্মরণ করিয়া গৃহস্থের মঙ্গলা-মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করে; এবং স্বপ্নে ভাবী অনুষ্ঠানের ফলাফল জানিতে পারে। পরদিন গিয়া যথা বিধানে কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ওঝারা এই যজন-পূজনের নিমিত্ত যথোচিত দক্ষিণা পায়। মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্টব্রতে তাহারা কিছু গ্রহণ করে না। স্ত্রী-ওঝাগণেরও পারিতোষিকের বিধান আছে; আর্থিক পুরস্কারের সহিত মদ এবং কাপড়ও দেওয়া হয়। বিদেশিনী হইলে একটি মোরগও প্রদান করে; আর যদি স্বদেশীয়া হয়, সেই মোরগ কাটিয়া পরিপাটিরূপে ভোজন করায়। কিন্তু ওঝাদিগের খাজানা বাদ নাই। কোন কোন স্থলে হেড্‌ম্যান ইহাদিগকে কর হইতে মুক্তি দিয়া নিজে তাহা বহন করিয়া থাকেন। এস্থলে একটু উল্লেখ থাকা উচিত, চাক্‌মাসমাজে 'বৈদ্য' আখ্যাও আছে। ইহারা মুষ্টিযোগ মাত্র সম্বল লইয়া এবং স্থলবিশেষ কবচ-মন্ত্রাদি দৈবানুষ্ঠান বিধানে চিকিৎসা চালাইয়া থাকে।

রায়ত — সাধারণ প্রজামাত্রকেই রায়ত বলা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাদের পরিবারপ্রতি জমুকর বার্ষিক চারি টাকা, ও একজনের চারিদিন 'বেগার' — নতুবা আরও এক্‌টাকা খাজানা অধিক দিতে হয়। পূর্বকালে রায়তেরা দেওয়ানের বাড়ীতে পনরদিন 'বেগার' দিতে বাধ্য ছিল। এখন তাহা চারিদিনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারও কোন নিয়ম নাই। কোনও কার্যে একবার যাওয়া-আসা করিলেই চলে। সম্প্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কেবল চাষী রায়তগণকে বেগার দিতে হইবে না।

এতদ্ভিন্ন চাক্‌মাসমাজে কুম্ভকার, স্বর্ণকার, কর্মকার, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি কোন ব্যবসায়ী বিশেষ নাই; এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গালী

শিল্পীশ্রম

ব্যবসায়িগণের আগমনের পূর্বে ইহারা বাঁশে করিয়া পাক এবং লাউয়ের খোলে জল বহন করিত। অদ্যাপি কুকি প্রভৃতি আদিম অধিবাসিবর্গ অনেকেই এইরূপে সংসার চালাইয়া থাকে। চাক্‌মাদিগের মধ্যে মৃত্তিকা পাত্রের বহুল প্রচলন হইয়াছে বটে, কিন্তু

(১৮৬) ত্রিপুরাদিগের জাতীয় পুরোহিতগণ 'ওঝাই' নামে পরিচিত।

ইহারা তজ্জন্য বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের মুখের দিকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। মূল্যও চট্টগ্রাম হইতে রাঙামাটি আসিয়াই চারিগুণ হয় — দূরবর্তী স্থানেতে আরও বেশী। সেইরূপ গহনা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় লৌহাস্ত্রাদির জন্যও তাহাদিগকে সর্বদা বিজাতীয় শিল্পীদিগের, সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়। নিজেদের মধ্যে ইহা যোগাইবার ব্যবস্থা না থাকাতেই এত দুর্গতি। কিন্তু এখনও তাহারা ইহা শিখিতে মনোযোগ দিতেছে না। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে অত্রত্য রাঙামাটি গভর্নমেন্ট বিদ্যালয়ের তদানীন্তন হেড্‌মাষ্টার বর্তমানে পেন্সন প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রামকমল দাস মহোদয় এই স্কুলের শাখাস্বরূপে গভর্নমেন্ট-ব্যয়ে কুম্ভকার, কর্মকার ও সূত্রধর নিযুক্ত করিয়া একটি শিল্পবিদ্যালয় (Artian School) খুলিয়াছিলেন;কিন্তু স্থানীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকের ঔদাসিন্যে অচিরে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। হায়! তাহা এতদিন জীবিত থাকিলে কত শুভফল প্রদান করিত। জাতীয় নেতৃবর্গের এই ত্রুটীর নিমিত্ত আরও বহুকাল যাবৎ সমাজকে কষ্ট পাইতে হইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি, ইহাদের শ্মশ্রু নাই বলিলেই হয়; যে দু'একখানি উঠে তাহাও চিম্‌টার সাহায্যে উৎপাটিত করিয়া ফেলে। সুতরাং আর প্রায়ই ফেলিতে হয় — কেবল চুল।

নাপিতের কার্য

ইতিপূর্বে ইহারা একে অপরের চুল কাটিত। এখনও যে সকল স্থানে বাঙ্গালী নাপিতের যাতায়াত নাই, তথায় পরস্পরের সহায়তায় কার্য নির্বাহ করে। ইহাতে কিছুই নিন্দার বিষয় নাই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া আসিতেছে, কেন্নই বা দূষণীয় হইবে ?

সাধারণ চাক্‌মাগণ কাপড়গুলিও নিজে নিজে ধুইয়া লয়;গৃহিণীদের উপর এই কার্যের ভাব থাকে। নদীপথে গমনকালে প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ঘাটে ঘাটে চাক্‌মারমণীগণ কাপড় পরিষ্কার করিতেছে। ইহারা প্রথমে বৃক্ষলতাদির ক্ষার কাপড় উত্তমরূপে মাখিয়া সিদ্ধ

ধোপার কার্য

করিয়া লয়। অনন্তর ঠান্ডা হইলে তাহা ঘাটের কাষ্ঠের উপর রাখিয়া তদুপরি লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে থাকে;এবং মধ্যে মধ্যে জলের ছিটা দেয়। কাপড়গুলি বিশেষ ভারী বলিয়া দাঁড়াইয়া আছড়াইতে পারা যায় না। ছোট ও পাতলা বস্ত্র পরিষ্কার করিতে অবশ্য দাঁড়াইয়া আছড়ায়।

ইহাছাড়া সাধারণ পরিবারে অপরাপর গৃহকর্মেও স্ত্রীলোকগণ অনন্যসহায়। পুরুষেরা দ্বিপ্রহরে নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে প্রশান্ত সুখ উপভোগ করিতেছে, আর তাহাদের সহধর্মিনীগণ

কাষ্ঠাহরণ

দা-হস্তে মার্ত্তণ্ডের প্রবল প্রতাপ তুচ্ছ করিয়া অশেষ কষ্টসাধ্য কাষ্ঠ আহরণে নিরত! বহনোপযোগী কাষ্ঠ সংগৃহীত হইলে, লতাদ্বারা বোঝা করিয়া আর একখানি লতায় তাহা কপালের সাহায্যে পৃষ্ঠের উপর ঝুলাইয়া সেই কাষ্ঠের বোঝা বহন করিয়া থাকে। কেহ কেহবা কাষ্ঠ সংগ্রহের নিমিত্ত বাড়ী হইতে 'থুরুং'[(১৮৭)] লইয়া আসে,

(১৮৭) 'থুরুং' - বাঁশের চ্যাঁচাড়া নির্মিত ঝুড়ি বিশেষ।



তাহা আহৃত কাষ্ঠে পূর্ণ করতঃ উপরি-উক্ত প্রকারে বহন করে। তরি-তরকারী সংগ্রহেও এই একই বিধি। কপালে 'থুরুং' ঝুলাইয়া দা-হস্তে 'রাণ্যায়' অর্থাৎ পুরাতন জুমে শাক, গুল্ম প্রভৃতি আহরণ করে। এইরূপ কপালের সাহায্যে পৃষ্ঠের উপর ঝুলাইয়া বোঝাবহন-প্রথা কেবল চাক্‌মাদিগের মধ্যে নহে, পার্বত্য জাতি মাত্রেই ইহা দেখা যায়।(১৮৮) চাক্‌মাগণ কথায় বলে, — 'কপালের দুখ, কপালেই ভুগুক' অর্থাৎ কপালের দুঃখ কপালেই ভোগ করুক। কথাটি বেশ সদর্থযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী বটে। বস্তুতঃ পাহাড়ে রাস্তায় বোঝা বহন করিবার পক্ষে ঈদৃশী ব্যবস্থা সুবিধা জনক, সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন স্থানের মুটেগণ যে কোন মোট — এমন কি লম্বা ও মোটা বাঁশের বোঝা, জলের ভার ইত্যাদি পর্যন্ত কাঁধে না লইয়া মাথায় বহিয়া থাকে, ইহাতে যে তাহারা কি সুবিধা পায় বুঝিতে পারি না!

তরকারী অন্বেষণ

ইহাদের ধান ভানিবার ব্যবস্থাতেও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। ঢেঁকি আছে সত্য এবং গঠন প্রণালীও একই রূপ; কিন্তু তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রায় পরিবারেই 'ঢঁকিশাল' নাই। ঢেঁকি মহাশয় বাড়ীর একপাশে অযত্ন-সংরক্ষিত হইয়া পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে! যে সকল পরিবারে গৃহিনীর 'যা'-আদি কোন দোসর নাই, সেখানে তাহাকে একাই 'পাদ-দেওয়া' ও 'এলে-দেওয়া' উভয় কার্য্যই করিতে হয়। কতক্ষণ একটানা 'পাদ' দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, বাম হাতে ঢেঁকিটা তুলে' ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে ধানগুলি উল্‌টাইয়া দেয়। এই নিমিত্ত ঢেঁকিটাও প্রায়শঃ হাল্‌কা করা হয়। ঢেঁকি এক হাতে তুলিয়া রাখিতে অসমর্থ হইলে, দুই হাতে উঠাইয়া কোন কাঠ ঠেস্ দিয়া রাখে। ইহাদের মধ্যে 'কুলা'র প্রচলন নহে। একমাত্র 'চালুনি'তেই উভয়বিধ কার্য নির্বাহিত হয়।

ধানভানা

এইত গেল কয়েকটি আনুষঙ্গিক গৃহ-কর্মের কথা। সর্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয়, চাক্‌মামহিলারা লজ্জা-নিবারণের জন্য পরমুখাপেক্ষিণী হন না। তাহাদের অপূর্ব বয়নশিল্পের কথা যথাস্থানে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইবে। এতদতিরিক্ত জুমের কার্যেও তাহারা পুরুষের

(১৮৮) ত্রিপুরা রমণীগণকে উক্তরূপে জল আনয়ন করিতেও সর্বদা দৃষ্ট হয়।

অধিকাংশ সাহায্য করে। বিবাহকালে এইরূপ সাংসারিক কার্যদক্ষতা লইয়াই স্ত্রীলোকদিগের যোগ্যতা বিচার হয়। সাধারণতঃ বলে,

"নেই মোগত্তুন কাণা মোগ ভালা,
সবাই ন-পেতে রাজার ঝি ভালা"

অর্থাৎ স্ত্রী না থাকা অপেক্ষা কাণা স্ত্রী ভাল, একেবারে ন' পাইতে রাজকন্যা ভাল।(১৮৯) ক্ষীরসর পালিতা অকর্মণ্যা রাজ-দুহিতা বিবাহের লোভ এতই সংযত। সাধারণ পরিবারে পুরুষদের খাটুনি অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের খাটুনি অনেক পরিমাণে অধিক। জুমের কার্যে পুরুষেরা কেবল জঙ্গল কাটিতে যাহা কিছু কষ্ট পায়, অপরাপর কার্য প্রায় প্রধানত স্ত্রীলোকদিগের উপর নির্ভর করে। তদুপরি আবার সন্তান পালন, স্বামীর হুকুম সরবরাহ ইত্যাদি কত আছে! রাত্রিতেও নিয়মিত ঘুমাইতে পারে না;অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া কাপড়ের জন্যে সূতা কাটিতে হয়। বস্তুত তাহারা এত খাটে যে, চিন্তা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য না হইয়া থাকা যায় না! ভগবান যেন তাহাদিগকে শুদ্ধ 'গতর খাটিতেই' পাঠাইয়াছেন, কাপ্তেন লুইনের বর্ণনায়ও আছে*, "পাহাড়ীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যক্ষম ও পরিশ্রমী। স্বভাবত সকল ঋতুতে অবিরত ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম হেতু তাহাদের সমাজে স্ত্রীলোকসংখ্যা হ্রাস পায় এবং অবিশিষ্ট জটিল রোগাক্রান্তা হয়।" পুনরায় তিনি পরিশিষ্ট ভাগে যেন অধিকতর বেদনার সুরে লিখিয়াছেন, "ইহাই নিয়ম যে বলবানের প্রতি সকলে সম্মান করে। স্ত্রীলোকেরা শক্তিপ্রকাশে বিমুখ, তাই যাবতীয় বর্বর জাতির মধ্যেই তাহাদের প্রতি ঘৃণা পরিলক্ষিত হয়। হাতের কাছে স্ত্রী, মা কি ভগ্নী থাকিলে অনেকে সামান্য বোঝাটিও লইতে চাহে না।" অহো, তাহাদিগের এই আশ্চর্য শ্রমসহিষ্ণুতা চিন্তা করিলে, অন্তরে স্বতই দয়া ও ভক্তির উদয় হয়। একমাত্র দাম্পত্য প্রেমই তাহাদের এতাদৃশ কর্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার। ধন্য প্রণয়! তোমার আকর্ষণে লোক প্রাণের মমতা তুচ্ছ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিতে পারে। আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ এই ঘোর বিলাসিতার যুগে চাক্‌মা রমণীদের শ্রম-তৎপরতার কথা অনুধাবন করিবেন কি?

মহিলাগণের শ্রমশীলতা

*The H.T. of Ctg. and the dwellers therein, P. 36

(১৮৯) কথাটি 'নাই মামার থেকে কাণা মামা ভাল' - এর অনুরূপ হইলেও তদপেক্ষা গুরুতর চিন্তা যোগ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
(১) জাতীয় চরিত্র, (২) স্ত্রী-স্বাধীনতা
এবং
(৩) দাম্পত্য প্রেম

যে জ্ঞানের আলোকে মানব-হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম বিকাশ পায়, তাহাই প্রকৃত মহান্ ও ভক্তির যোগ্য! নতুবা বিজ্ঞতাভিমানী যে আমরা — নিয়ত স্বার্থের আন্দোলনে মজিয়া থাকি, অজ্ঞতা তদপেক্ষা শত সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। একতা স্বর্গীয় সামগ্রী; ত্যাগ-স্বীকারে অভ্যস্ত না হইলে, এমন দুর্লভ অধিকারে আশা করা যায় না। উচ্চতম রাজশক্তি হইতে নিরন্নের ভিক্ষাপাত্র পর্যন্ত একতার শাসনে নিয়ন্ত্রিত। ক্ষুদ্র হইতেই যদি মহতের পরিচয় লইতে হয়, তৃণগুচ্ছ হইতেই যদি একতার শক্তি উপলব্ধি করিতে হয়, তবে চাক্‌মা সমাজ হইতেও আমাদের শিখিবার অনেক আছে! ইহাদের একতা-বন্ধন আশাতীত সুদৃঢ়। যে কোন "মেলা" অর্থাৎ অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প মনে হইলে 'আদমের' দশ জন মিলিয়া পূর্বে "তেইংমাং" (পরামর্শ) করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া লয়। তাহা ছাড়া কাহারও কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া তাহার সাহায্য করে। দুর্ভিক্ষের সময় কাহারও অতিরিক্ত ধান বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই, তাহা দীনহীন স্বজনগণের মধ্যে বিতরণ করিতে হয়। বিগত দুর্ভিক্ষের সময় ইহাদিগের যে অসাধারণ ত্যাগস্বীকার দেখিয়াছি, তাহাতে ইহাদিগকে জগতের সর্বোন্নত জীব বলিতে ইচ্ছা করে! প্রতিবেশী ক্ষুধায় মরিতেছে দেখিয়া নিজের যাহা কিছু সঞ্চিত আছে বাহির করিয়া দিয়াছে, অথচ জানিত যে — তাহাকেও অনতিবিলম্বে সেই অভাব ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। ইহাদিগের সেই অলৌকিক উদারতাতেই উক্ত ভীষণ অন্নকষ্ট হইতে নিঃসম্বল অনেকে রক্ষা পাইয়াছিল। হায়, আর্যনীতিবেত্তাদিগের বংশধর হইয়াও এই ব্যবহার আজ আমাদের চক্ষে নূতন বোধ হইতেছে! আর একটি কথা পূর্বেই বলা উচিত ছিল, ইহাদের ভিতর পারস্পরিক প্রীতি এত অধিক যে, শিকারলব্ধ পশুর মাংস অকুণ্ঠিত চিত্তে 'লুটে' অর্থাৎ আদমবাসী প্রত্যেক বিভাগে করিয়া দেয়। কিন্তু স্বগৃহেই তাহাদের একতা কম, একান্নবর্তী পরিবার সংখ্যা সমগ্র সমাজে বড় অধিক নহে। বিবাহ হইয়া গেলে, ভাই ভাই দূরের কথা, পিতা-পুত্রও ঠাঁই ঠাঁই হইয়া যায়; তবে কোন বিরোধ থাকে না।

একতা

সরলতা একতা বন্ধনের শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। সরল না হইলে মন উদার হয় না, সুতরাং অপর প্রাণের সহিত মিলিবার শক্তিই বা কোথা হইতে আসিবে। ফলতঃ বলিতে কি, যাঁহাদের হৃদয়-কপাট সরলতার বাতাসে উন্মুক্ত নহে, সংসারে তাহাদের ভাগ্যে সুখভোগ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। সরলের 'দুঃখিত যে মন, দুঃখের কথা কহে সে অপরে,' কিন্তু কপটাচারী ব্যক্তি তাহা হৃদয়াভ্যন্তরে সুগুপ্ত রাখিতে গিয়া জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলে! তাহারা কি নিজ কি অপর — কাহারও কাছে শান্তিসুখ অন্বেষণ

সরলতা

করিয়া পায় না! শিক্ষার অভাব বলিয়া কিনা জানি না, কেবল চাক্‌মাগণ নহে, পার্বত্যজাতি মাত্রেই সরলতা অসাধারণ! কাপ্তেন লুইনও বলিয়াছেন*, 'তাহারা সরল, সৎ এবং প্রফুল্লচিত্ত।' পরন্তু স্থানীয় প্রাচীন অফিসারদিগেরও মুখে শুনিতে পাই, — পূর্বে ইহারা গুরুতর অপরাধ করিয়া আসিয়াও তাঁহাদের নিকট সমুদয় খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ চাহিত; হয়ত তাঁহারাই সেই ঘটানা প্রমাণের নিমিত্ত তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। কোন মহাত্মা তৎগোপনের মন্ত্র শিক্ষা দিলেও বেচারী জেরার কুটিল চক্রে পড়িয়া খাঁটি কথা আর চাপা দিতে পারিত না। অধুনা শিক্ষা ও বিজাতীয় সংসর্গের ফলে প্রকৃতির এই সরল শিশুদিগের হৃদয়েও কিঞ্চিৎ কলুষভাব প্রবেশ করিয়াছে। তাই বলিতে ইচ্ছা করে হে শিক্ষা ও সভ্যতা—তোমাদের অনুগ্রহ যদি ইহাই হয়, তবে দূর হইতে প্রণিপাত করি।

*The H.T. of Ctg. and the dwellers therein, P. 115

বিশ্বাস

অনিল যেমন অনলের অনুগামী, বিশ্বাস তেমনি সততার অনুসরণ করিয়া থাকে। লোকে এসংসারে যাহাতে বিমুগ্ধ, সেই মায়া বিশ্বাসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অতএব সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়, জগতের বক্ষ হইতে বিশ্বাস বিলুপ্ত হইলে কি ভয়ানক বিপ্লব ঘটিত! সংসারে বিশ্বাসঘাতকতার পাপ-কোলাহল অবিরত শুনিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সুখ-দুঃখের তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চৎকর। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অদ্যাপি বিদেশীয় ব্যবসায়িগণ চাক্‌মাদিগকে প্রায়ই বিনা দলিলে নানা জিনিসের জন্য টাকা দাদন দিয়া থাকেন; তাহা ছাড়া ইহাদের অভাব পূরণেও তাঁহারা সাহায্য করেন, কিন্তু বিশ্বস্ততার হানি অতি অল্পই ঘটে!

সত্যপরায়ণতা

যাহা সৎ তাহাই সত্য। এই মূল সূত্রে আস্থা না থাকিলে কর্তব্যজ্ঞান আসিবার ভরসা নাই—সুতরাং সংসারকার্য পরিচালনের আর উপায় কোথায়? আমরা স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, অজ্ঞতা সত্যের মর্যাদা যেরূপ রক্ষা করিতে জানে, সভ্যতা-দৃপ্ত বিজ্ঞতা সেইদিকে তত মনোযোগী নহে। এ কারণে মনে হয়, 'বুঝিবা অজ্ঞতা ছিল ভাল!' সরলতারূপ ভিত্তির উপর সত্যের আসন অবস্থিত। ভিত্তি শূন্যগর্ভ হইলে আসন কখনই স্থির থাকিতে পারে না। পূর্বেই বলিয়াছি, চাক্‌মাদিগের জাতীয় জীবনে বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইতেছে। যতদিন তাহারা ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে ছিল, পাপ মিথ্যা তখন স্পর্শ করিতেও পারে নাই; কিন্তু ক্রমে আধুনিক সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত যখন দেখিল যে, বিদেশীয়গণ নানা ছলচাতুরীতে তাহাদিগের সর্বস্ব আত্মসাৎ করিতেছে, তখন সত্য বলিতে কি, তাহারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সুশানিত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল। এক্ষণে অনেকেই তাহাতে শীঘ্রহস্ত — সুযোগ পাইলেই প্রয়োগ ইতস্ততঃ করে না। হায়, "অভাবেই স্বভাব নষ্ট করে!"

দয়া ও দানে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। প্রথমে দয়া পরে দান — প্রথমে কর্তব্যজ্ঞান, পরে কার্য। দয়ালু হইয়াও দাতা না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের একটা কৈফিয়ৎ থাকে। তবে যাঁহারা কেবল "বিজ্ঞতা"র মধ্যেই কর্তব্যজ্ঞান নিহিত মনে করেন, তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট বিচারক বলিতে

পারি না। এই পার্বত্যদিগের ভিতরে কর্তব্যজ্ঞানের যে উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উন্নত জাতিবিশেষেও তাহার অত্যল্প মাত্র প্রতিপালিত হয়। ইহারা আবশ্যক বুঝিলে আর্য-সংহিতাকার 'মনু'র উপদেশকেও অতিক্রম করে! এমনও দেখা গিয়াছে, প্রার্থীর অভাব হইতে দাতার অনটন অনেক অধিক, তথাচ তিনি প্রার্থনা পূরণে যত্নবান। এতদ্ভিন্ন ভিক্ষু ও শ্রমণদিগের সেবা, আত্মীয় বা সম্মানাস্পদ ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দান, উৎসর্গাদি প্রায়ই আছে, এবং রোগ প্রতিকার এবং তাদৃশ বিপদ-নিবারণ প্রভৃতির নিমিত্ত দানধর্ম অবশ্য করণীয়। চট্টগ্রামের অনেক আচার্য, বৈরাগী এবং নীচ শ্রেণীজ ব্রাহ্মণ আসিয়া ইহাদিগ হইতে নোনা বুজরুকি (খলাইয়া) কত দান-দক্ষিণা আদায় করে; কিন্তু ইহারা তথাপি তাহাদের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাবান।

দান

অতিথিসৎকার ভারতের একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। কপর্দক মাত্র না লইয়াও দেশ-পর্যটনের আকাঙ্খা একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব ছিল। বর্তমানে আমরা সেই "সর্বদেবময়োহতিথি"র সেবা তেমন গুরুতর কর্তব্য বলিয়া মনে করি না, অথবা সভ্যতার ভাষায় বলিতে গেলে — আতিথেয়তা মুষ্টিভিক্ষার ন্যায় বর্জনীয়। সমাজকে উন্নত করিতে সর্বাগ্রে এ দুইকে নির্বাসিত করা প্রয়োজন, ইহাই আমাদের বর্তমান ধারণা! বস্তুতঃ অধুনা অতিথির প্রতি সমাজের ঘৃণা-দৃষ্টি আসিয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত নিতান্ত কষ্ট ও অসুবিধায় না পড়িলে, কেহই আতিথ্য-গ্রাহী হয় না। পৌরাণিক যুগের শিখিধবজ, দাতাকর্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের অতিথিসৎকারের বিস্ময়োদ্দীপক চিত্র সভ্যতার আলোকে মূল্যশূন্য জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু এই পার্বত্য জাতির অতিথেয়তার সহিত তুলনা করিলে, সেই সন্দেহ দূরীভূত হয়। এখন্য এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, হয়ত কোন গৃহস্থ ২/৪ দিন ধরিয়া অন্নাভাবে প্রায় সপরিবারে অনশনে বা অর্ধাশনে কাটাইতেছে, এহেন সময়ে অতিথি উপস্থিত। কিন্তু অতিথিকে তখন তাহাদের এই ভীষণ দুরবস্থার সংবাদ কিছুমাত্র বুঝিতে না দিয়া গৃহপতি গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে যে কোনরূপে অতিথি-সৎকারের উপকরণসমূহ যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছে! আর যাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল, তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, অতিথিকে আতিথ্যজনিত কোন মনোবেদনা অনুভব করিতে হয় না। কেবল পুরুষেরা নহে, তাহাদের সহধর্মিনীরাও এজন্য সবিশেষ তৎপর থাকে। তাই কবি বলিয়াছেন,—

আতিথেয়তা

"অতিথি সেবায় রত, সতীলক্ষ্মী শ্রমশীলা,
বনাশ্রম আলো করে — যেন শত শকুন্তলা।"

দুঃখ এবং লজ্জার বিষয়, কোন কোন বাঙ্গালী আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়া জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় করিয়াছে। তজ্জন্য অনেকে সাধারণ বাঙ্গালী অতিথিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি সেবায় পরাঙ্মুখ হয় না। পক্ষান্তরে খাওয়ার সময় যে কেহ, এমন কি সন্নিহিত প্রতিবেশীও গৃহে উপস্থিত হইলে না খাইয়া ফিরিতে দেয় না।

আতিথেয়তা

স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতা দ্বারা জাতি-বিশেষের তেজ ও শক্তি গঠিত হয়। যে জাতি যত অধিক পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে, তাহাদের ক্ষমতাকে তত অধিক। আবহাওয়া—তেজ ও শক্তি গঠনে অতি অল্পমাত্র সহায়তা করে। চাক্‌মাগণ স্বাধীনতা হারাইয়াছে অধিক দিনের কথা নহে;আর তাহাদের আত্মনির্ভরতার পরিচয়, পূর্বপরিচ্ছেদেও কিয়ৎপরিমাণে দেখাইয়া আসিয়াছি। ইতিপূর্বে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও তাহারা পরমুখের দিকে তাকাইত না। কিন্তু অধুনা ক্রমে বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রলোভনে আত্মশক্তি হারাইতেছে। এখন যাহা কিছু তেজ অবশিষ্ট, তাহার প্রকৃত নাম আত্মাভিমান, তেজের একটি ক্ষীণ প্রকৃতি-বিশেষ। তেজ মৃদু হইলে তাহা উজ্জ্বল দেখাইবার যে চেষ্টা—তাহাই আত্মাভিমান, ইহাই তাহাদের বর্তমানে অবশেষ! কিন্তু তেজ কমিলেও তাহাদিগের শারীরিক যে শক্তি, তাহা কমে নাই। সভ্যতার 'অগ্নিমান্দ্য' না জন্মিলে মানবের দৈহিক বলের কদাচিৎ ব্যত্যয় ঘটে। বিশেষতঃ সংসার-সংগ্রামের চালনায় তাহাদের শক্তি পরিপুষ্ট হইতে পারে। চাক্‌মাদের অনেককে দেখিলে মনে হয়, বল যেন শরীরে আর ধরিতেছে না। মাংসপেশীগুলি স্থূল ও সুদৃঢ়, তন্মধ্যে শোণিত সঞ্চালন যেন বাহির হইতেই সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইতেছে। পরন্তু চেহারা দেখিয়া ইহাদের বয়স নির্ণয় করা সহজ নহে, তাহাতে বিশেষ বহুদর্শিতা আবশ্যক হয়। কোন কোন ৪০/৪৫ বৎসর বয়সের প্রৌঢ়কেও পূর্ণ যুবকের মত দেখায়। এমন কি, কাহারও ৬০/৬৫ বৎসরেও যুবার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আশ্চর্যের বিষয়, এদেশে বাঙ্গালীদের চুল শীঘ্রই পাকিয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ীদের মধ্যে পলিতকেশ বিরল।

তেজ ও শক্তি

তেজ সংযম প্রায় বিপরীত ধর্মাক্রান্ত হইলেও তেজ সংযমকে সুদৃঢ় করে। কিন্তু কেন জানি না, চাক্‌মাদিগের চরিত্রে সংযমের একান্ত অভাব! অতি সহজে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তাহা ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চন এবং মুখে (ওষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিয়া জোরে বায়ুনির্গমনে) এক অব্যক্ত শব্দদ্বারা সহজে প্রকটিত হয়। স্কুল ছাত্রদের মধ্যেও দেখিয়াছি, চাক্‌মাবালকের অনেকে হয়ত অঙ্ক কষিতেছে, কিন্তু প্রথমচেষ্টা বিফল হইতেই 'ন পারিম্' বলিয়া ফেলিয়া রাখিল। শুনিয়াছি, শিক্ষার প্রথম বিস্তার কালে শিক্ষক একটু চোক্ রাঙাইলেই তাহারা স্কুল ছাড়িয়া পলায়ন করিত। পল্লিগ্রামে এরূপ ঘটনা অদ্যাপি প্রায়শ ঘটিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সাধারণ লোকে আসিয়া কাজের সময় ইতস্ততঃ উকিঝুঁকি দেয়। যদি জিজ্ঞাসা করি,—"কি চাও?" অমনি বিরক্তি সহকারে উত্তর করে "কি চাইত?" অথচ প্রকারান্তরে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়; তাহার কিছু জানিবার বা বলিবার আছে। এইরূপে আরও নানাস্থলে তাহাদিগের ধৈর্য্যবিচ্যুতির উদাহরণ পাওয়া যায়। নূতন আগন্তুকের পক্ষে এই দৃশ্য প্রথম প্রথম অশেষ বিরক্তির কারণ হয়, কিন্তু ক্রমে তাহাদের জাতীয়ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে তখন বিরক্তি যাইয়া অনুগ্রহ আসে। আর যে বৌদ্ধ ধর্ম তাহাদিগের বর্তমান অবলম্বন, তাহার শাসন মানিয়া চলে — এরূপ লোক সমাজে অতি বিরল। পঞ্চশীলাচারী লোকও একান্ত দুর্লভ। বলিতে কি, তাহারা ইন্দ্রিয় দমনে সাতিশয় দুর্বল।

সংযম

বোধহয় সংযমেরই অভাবে চাক্‌মাদিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা একেবারেই নাই। নতুবা ইহারা যেরূপ পরিশ্রমী এবং উপার্জনক্ষম, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা ইহাদিগকে অতি সামান্যই আঘাত করে,— তাহারা উপস্থিত সুখসম্ভোগে নিতান্ত ব্যগ্র হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাস হইতে জুমের ফসল পাকিতে আরম্ভ করে; তখনকার সামান্য আয়ে কোন রকমে দিন কাটায়। পরে কার্তিক-অগ্রহায়ণে ধান কার্পাস পাওয়া গেলে, তাহাদের স্ফুর্তিই বা দেখে কে? নবান্ন-উৎসবে টাকা যেন কড়ির সমানও মূল্যবান নয়।

মিতব্যয়িতা

ইহাছাড়া দিবারাত্রি মদের ভাটি, এবং প্রায়শ পিষ্টকাদি চলিয়া থাকে। এইরূপে আমোদ প্রমোদে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত যায়। তখন 'মহামুনি' মেলার খরচ দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সেখানে যে সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, বেহালা, কন্সার্ট প্রভৃতি সখের সামগ্রী ক্রয় করে, সে সমুদয় আর বাড়ী পর্যন্ত আসিতে পারে না। নাচের হুজুগে সমস্ত সেখানেই বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর ক্রমে রিক্তহস্ত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। প্রথম প্রথম প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন হইতে ধার, সাহায্য এবং ব্যবসায়িগণের দাদন প্রভৃতি দ্বারা অতিকষ্টে চালাইয়া থাকে। পরে যখন চারিদিকে সাহায্যের দ্বার রুদ্ধ হয়, তখন ফলমূল শাকাদি ভক্ষণে বা অর্দ্ধাশনে-অনশনে দিনপাত করিতে বাধ্য হয়। এতাদৃশ কষ্টে পড়িতে হইবে জানিয়াও সৌভাগ্যের সময় তাহাদের ইহা স্মরণ থাকে না।(১৯০) না জানি ভগবান কবে তাহাদিগের এই মোহ দূর করিবেন।

বিলাসিতা বর্তমান সভ্যতার এক প্রধান নিদর্শন। তাই আমরা সুসভ্য নামে পরিচিত হইবার আশায় তুচ্ছ ফুকাদানার সহিত মুখের অন্নগ্রাস বিনিময় করি। সঙ্গে সঙ্গে এই সরলপ্রাণ

বিলাসিতা

চাক্‌মাগণও অনললব্ধ পতঙ্গপ্রায় এই বাহ্য চাক্‌চিক্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কাপ্তেন লুইন 'এ ফ্লাই অন্ দি হুইল' নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন*— 'ইউরোপীয় সভ্যতার কলুষিত ভাব প্রবিষ্ট হইতে না দিয়া ইহাদিগকে উন্নত করা আমার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইহা বড়ই কঠিন সমস্যা।' অন্যতঃ তিনি "পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ' নামক পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে এসম্বন্ধে

*Page-379

(১৯০) 'আষাঢ়ে গল্পে'র ন্যায় এমনও দু'একজনের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায় যে, সৌভাগ্যক্রমে কোনবারে আশাতীত ফসল লাভ করা গেলে—তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। কারণ প্রতি বৎসরই তাহারা অনটনে পড়িয়া মহাজন হইতে ধার করিয়া আসিয়াছে; এবারে তাহার প্রয়োজন হইতেছে না--এ কেমন কথা? তখন তাহারা সেই প্রাপ্ত ধনরাশি বৎসরের প্রথমভাগেই যথেচ্ছ আমোদ-প্রমোদে নিঃশেষিত করে। অনন্তর অতীত প্রথার অনুসরণ করিয়া মহাজনদিগের শরণাপন্ন হয়। পরন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ঘরে চাউল থাকিলে, চৈত্র পর্যন্তও চলিবে না জানিয়াও--- তিন চারিজন বিশিষ্ট পরিবারে ৩/৪ সের চাউল পাক করিতেছে। তাহা হইতে কিছু তাহারা খায়, অবশিষ্ট মোরগ, শূকরকে ঢালিয়া দিতেছে; ইহা ছাড়া মদের ভাটিতে লাগাই আছে। এবং ইহাও শুনিয়াছি যে, বিগত ভীষণ দুর্ভিক্ষকালে যখন সহৃদয় গভর্নমেন্ট চাউল ধার দিতেছিলেন, অবিমৃষ্যকারী অনেকে তাহা দু'দশদিন উপবাসের পর পাইয়াও স্থানীয় দোকানে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করতঃ মদ কিনিয়া খাইয়াছে।

অধিকতর প্রাণ খুলিয়া লিখিয়াছেন,* "শারীরিক আবশ্যকীয় অভাবের উপরে কিছুরই প্রতি তাহাদের সহানুভূতি নাই। আমরা দেখি পৃথিবীর অপর সবর্বাংশেই Page-115-16 ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবর্তনা দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ অপকার সমূহ আসিয়াছে,তথাপি জগতের সর্বত্র যাবতীয় অনুন্নত জাতির উপরে আমরা প্রথমে (যাতায়াত বা বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা) সম্বন্ধ স্থাপিত করি, এবং পরিশেষে সভ্যতারূপ বিরাট উদ্দেশ্য বিশিষ্ট ব্যবহারাদি চালাই। কিন্তু এই সভ্যতা কি বা দিয়া থাকে? মিঃ লেইং বলেন, ... সত্য বটে, বর্তমানে পূর্বের ন্যায় অধিকাংশ লোক উপবাসের পার্শ্বে রহিয়াছে, তবুও ইহা উন্নত স্বাচ্ছন্দ্যের অযোগ্য নহে। আমি কল্পনা করিতে পারি, পাহাড়ীরা বলিবে — "হে প্রভু, তাদৃশী উন্নতি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।" সভ্যতার প্রাধান উদ্দেশ্য ধনবৃদ্ধির ইচ্ছা, যাহা কেবল আবশ্যকানুরূপ নহে—জীবনের সুখাদ্য এবং বিলাসিতাও যেন চলে। আমাদের পাহাড়ীদের ন্যায় সরলতাচারীদিগের মধ্যে তেমন কোন অভিপ্রায় নাই;তাহাদের স্থিতিহীন জীবন অত্যধিক সম্পত্তি সঞ্চয় ইহতে বারণ করে এবং তাহারা সম্পূর্ণ জাতীয় সমতা ভোগ করে। এই সকল সরল জাতির মধ্যে উক্ত সভ্যতা প্রবেশ করিলে তাহাদিগের কোন উন্নতি হইবে না, বরং ধবংস করিবে।" বস্তুত পাশ্চাত্য প্রভাব এবং বাঙ্গালী-সংসর্গই ইহাদিগের 'মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের' ভিতর বিলাসিতা আনিয়াছে। অবিবাহিতা বালিকাগণ একমাত্র 'পুতি'র লহরী ভিন্ন বিশেষ কোন বিলাসোপকরণ সামগ্রী পায় না। কিন্তু বিবাহের পর স্বামীর সোহাগের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্‌-বেরঙের শাড়ী, বডি, নানাবিধ গহনা, সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি নানা সখের সামগ্রীও লাভ করে। শিক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ সাক্ষাত বিলাত ফেরত বাবু — চলা-ফিরাও অনেকটা ইঙ্গবঙ্গদল সম্মত। ইহা ছাড়া, সাধারণ চাক্‌মাদিগের মধ্যেও এতদূর বিলাস-ইচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে যে, কেহ কেহ দোকানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে 'রাজা যে কাপড় পরেন', তাহা অনুসন্ধান করে। দোকানদারেরাও এই সুযোগে কল্পনাতীত মূল্য আদায় করিয়া লয়।(১৯১)

অনেকে বিলাসিতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে না। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে অপকার ঘটিতে পারে, কিন্তু বিলাসিতা না হইলে কোন ক্ষতি নাই। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা রাখিতে বিশেষ ব্যয়েরও আবশ্যক হয় না, অথচ সুখ স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। ইহারা এই দিকে কিঞ্চিৎ উদাসীন বটে, কিন্তু আহার্য এবং পানীয়ের প্রতি দৃষ্টি এত তীক্ষ্ম যে, বোধ হয় এইরূপ পৃথিবীর অতি অল্প জাতিরই আছে। প্রতি সপ্তাহে এক বা ততোধিক বার নেকড়া-জলে মঞ্চের উপরিতল পরিষ্কার করিয়া থাকে। কিন্তু তিনটি বিষয়ে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

(১৯১) এস্থলে আর একটি কথা বলিলে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার হয়। বস্ত্রাদি কোন জিনিষ দোকানে অবিক্রীত হইয়া পড়িয়া রহিলে, ব্যবসায়ীরা তাহা নিজ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। অনন্তর যখন সৌখিন চাক্‌মা যুবকগণ জিনিষ ক্রয় করিতে আসে, তাহারা "মহাজনের" ব্যবহৃত দ্রব্যই উৎকৃষ্টতর মনে করিয়া তাহা লইতে অভিলাষী হয়। "মহাজনেরা" প্রথমে তাদৃশ অনুরোধ অস্বীকৃত হইয়া তাহাদের ব্যগ্রতা বর্দ্ধিত করে, অবশেষে অসম্ভব মূল্য আদায় করিয়া তাহা ছাড়িয়া থাকে।

ইহাদের অনেকে এখনও সভ্যজাতি হইতে দূরে রহিয়াছে। প্রথমতঃ স্নানের প্রয়োজনীয়তা যে কি, বুঝিতে পারে না; শরীর ঠাণ্ডা থাকিলে আর স্নানের আবশ্যকতা অনুভব করে না। এই নিমিত্ত শীতকালে স্নান কদাচিৎ ঘটে। গ্রীষ্মকালে শরীরের গ্লানি দূর করিতে কখন কখন স্নান দুইবারও হয়, কিন্তু ডুব দিয়া নহে। বিশেষতঃ স্ত্রী কি পুরুষ যাহাদের মাথায় চুল আছে, ডুব দিয়া স্নান তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সপ্তাহ বা ততোধিক অন্তর ক্ষার বা লতা-বিশেষের নির্যাস দ্বারা চুল ধোওয়াই প্রশস্ত বিধি। স্নানান্তে বস্ত্রপরিবর্তন প্রায়ই ঘটে না। স্বেদসিক্ত পরিধেয় যখন দুর্গন্ধে ব্যবহারের অযোগ্য হয়, তখন একবার কাচিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের মঞ্চোপরিভাগ সুপরিষ্কৃতও মনোহর। বাহির হইতে কেহ আসিলে প্রথমে 'ইজরে' উঠিয়াই পা ধুইবার ব্যবস্থা আছে, এই নিমিত্ত 'সাঁকো'র ধারে এক কলসী জল এবং একটি জলপাত্র রাখা হয়। পরন্তু মঞ্চের নিম্নতল নরক বিশেষ। উপরিতল হইতে নানা ময়লা পরিত্যক্ত হইয়া আস্তাকুঁড় হইতেও জঘন্য করিয়া তুলে। রাত্রিতে বালক এবং অসমর্থেরা মঞ্চোপরি হইতেই মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করে। অবশ্য বাড়ীতে শূকর থাকতে তাহা অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। কিন্তু শূকর ও মোরগেরা নিজে যাহা করে, তাহা নিতান্ত অমার্জনীয়। তৃতীয়ত ইহাদের বাহ্যের পর শৌচব্যবস্থা অন্যবিধ। মল ত্যাগের পর 'চ্যাঁচাড়ী' কিম্বা 'বাখারী' দ্বারা মুছিয়া ফেলে;চলিত কথায় ইহার নাম — 'খক্ করন।' উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে জলাভাব বশতঃই ঈদৃশ বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে। অবশ্য চাক্মাদিগের উচ্চশ্রেণীতে এই সকল কদর্য ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই। মধ্যম শ্রেণীও প্রায় সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অধম শ্রেণীরই খাঁটি চিত্র। যাহা হউক, ইহাদের পরিচ্ছন্নতার আর একটি সুন্দর বর্ণনা এস্থলে দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বর্ষাকালে পথ ঘাট কর্দময় হইলে, কেহ কেহ বংশপাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা সাধারণত বাজীকরদিগের নিকট দেখা যায়। ৬/৮ হাত পরিমিত দুইটি বাঁশে সমান উচ্চতায় পদস্থাপনের উপযোগী সুবিধা করিয়া লয়। তদুপরি চড়িয়া ইচ্ছামত যাতায়াত করিয়া থাকে।

২

স্ত্রী-স্বাধীনতা

বর্তমানে স্ত্রীস্বাধীনতা অনেকেরই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে তাহার উপযোগিতা স্বীকার করিতেছেন। এই সংস্কারকেরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শে—দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সময়ে সময়ে উভয় দলে ভীষণ বাদপ্রতিবাদ লাগিয়া যায়, কিন্তু এযাবৎ তাহার 'ছাইভস্ম' কিছুই মীমাংসা হয় নাই। তবে এইমাত্র বুঝা যায়, ইহারা যে স্বাধীনতা লইয়া চিন্তিত, তাহা পর্দাতঙ্ক মাত্র। পুরুষেরা স্বচ্ছন্দমনে সর্বত্র বেড়ায়, অর্ধাঙ্গের অধিকারিণী হইয়া স্ত্রীলোকেরা কেন পারিবে না,—ইহাই সর্বোচ্চ ভাবনার বিষয়। ইউরোপ এই নিমিত্ত বড়ই উদার; আর রক্ষণশীল মুসলমানদিগের সংসর্গে পড়িয়া হিন্দুগণ

সেই মহত্ত্ব হারাইয়াছে।[১৯২] যাহা হউক, চাক্‌মাগণ যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাহাতে কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব আছে। তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। কবির ভাষায় — 'স্বাধীন সর্বত্র গতি, অথচ, সংযত"। মাথায় 'হেটের' বদলে পাগড়ি (খবং) প্রচলিত হইয়াছে, তা'ছাড়া কোথাও যাইতে হইলে, সেই 'খবং' এরই উপর আর একখানি কাপড়ে মস্তক মাত্র ঢাকিয়া অবগুণ্ঠনের মর্যাদা রক্ষা করে। পরন্তু ইহাদের গৃহকর্ত্রীরা অভ্যর্থনা-শালার গৌরব বৃদ্ধি করিবার সুবিধা পায় না বটে, কিন্তু স্বজাতির নিকট বাহির হইতে আপত্তি নাই। নিতান্ত আবশ্যক না ঘটিলে পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত ঘটে না সত্য, অথচ অনূঢ় ও অনূঢ়ায় আলাপ, মিলনে বা ভ্রমণে কোন বাধা নাই। এক কথায়—স্বজাতীয় সকলেই যেন এক পরিবারের ন্যায়, বিজাতির সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক সম্বন্ধ। পাহাড়ীদের কোন কোন জাতীয় স্ত্রীলোকেরা বাজারেও যায়, কিন্তু ইহাদের সচরাচর তাহা নাই। তবে 'মহামুনি' প্রভৃতি মেলাতে স্ত্রীলোকেরাও যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ পরিবারে আরও অনেক সময়ে মহিলাগণকে গৃহের বাহিরে কাজ করিতে হয়। রাজপথে যাতায়াতও বিরল নহে। এমন কি, একাকিনী নৌকা চালাইয়া যাইতেও দেখা যায়।

অধুনা বঙ্গীয় পরিবারের অনুকরণে সম্ভ্রান্ত মহলে অবরোধ প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ্যে রাজ-অনুমোদন ব্যতিরেকে আব্রুরক্ষার সাধ পূর্ণ করিতে পারে না। আশা করি সরলা অবলাগণকে অন্তঃপুর-কারাগারে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ দিতে রাজা বাহাদুর বিশেষরূপ বিবেচনা করিবেন।



৩

দাম্পত্য প্রেম

স্ত্রী, চাক্‌মাদিগের সর্বপ্রধান সহকারিণী। তাহাদের সম্বন্ধ কেবল শয্যা লইয়া নহে, স্বামীর সংসার পালনে তাহারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া অহর্নিশ খাটিয়া থাকে।[১৯৩] এক মাত্র বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমই এই কর্ম-ক্লান্ত জীবনের অনাবিল শান্তি নির্ঝর! পবিত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যুবক-যুবতীর অতি সহজেই হৃদয় বিনিময় হইয়া

(১৯২) কাপ্তেন লুইন এজন্য আমাদিগকে ঠাট্টা করিয়া ইহাদের কথায় লিখিয়াছেন, – "The position of the women among them is preferable, in my opinion, to that occupied by the females of Hindoostan. Here is no mock modesty, but nature, pure and simple, the custom of concealing their women and hiting their faces, conveying as it does how much mistrust of man to man exists only among the more effeminate races of Asia. Here, if a women is condemned for her physical weakness, and forced, moreover, to bear the heaviest share of the tail for bread, she is still honoured as a wife and mother, trusted in her incomings and out-goings, and her words of advice listened to with respect". (The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein – P. 117.

(১৯৩) পরন্তু তাহাদিগের এই শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী লুইন, (The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, P-116) লিখিয়াছেন, "In marnage with us a perfect world springs up at the word of tendemess, of fellowship, trust, and self devotion. With them it is a mere animal and convenient connection for procrating their species and getting their dinner cooked." ইহা পড়িয়া মনে হয়, তিনি এই পার্বত্য জীবন সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

যায়। বিবাহের বৎসর পরস্পরের পাশছাড়া হওয়াও সামাজিক বিধি-নিষিদ্ধ। পক্ষী-দম্পতির ন্যায় তাহারা যথাসম্ভব সতত একত্র থাকিতে প্রয়াস পায়। কবিবর নবীনচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন ঃ—

"পতি পত্নী একচিত্ত একই জীবন;উভয় জীবন-স্রোত বিবাহ অবধি,
গঙ্গা যমুনার মত, এক অঙ্গে পরিণত,
একই বিমল স্রোতে বহে নিরবধি।" (জুমিয়া জীবন-১৭শ শ্লোক)

পরন্তু কবি স্বীয় বর্ণনায় স্বয়ং সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, উপসংহারে সেই স্বর্গীয় সম্পদে আত্মহারাভাবে গাইয়াছেন, —

"ইচ্ছা হয়, হায়! ওই জুমিয়ার সনে,
বিনিময় করি এই বাঙ্গালী-জীবন;
শুয়ে ওই ধরাতলে, লয়ে প্রিয়া বক্ষস্থলে,
লভি স্বর্গ সুখ, — ওই জুমিয়া জীবন।"

জুমিয়া-জীবনের প্রেম-রাজ্যকল্পনায় আজ কবির ভৌতিক দেহ ধরার অঙ্গে বিলুপ্ত বটে, কিন্তু তদীয় অমর আত্মা স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১) ধর্ম ও (২) পর্বনিয়মাদি

১

চাক্‌মাদিগের ধর্মজীবন এ যাবৎ নিরঙ্কুশ, সুতরাং বিশৃঙ্খল! সংজ্ঞা ধরিয়া বস্তুর পরিচয় নির্দেশ করিতে হইলে, ইহাদের ধর্মবিচারে নানা সমস্যা আসিয়া পড়ে। বারইয়ারী পূজয় গ্রামবাসীর অনেককেই অল্পবস্তির কর্তত্ব করিতে দেখা যায়, দূর হইতে কাহাকেই বা অধ্যক্ষ মনে করিব? তাই অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহারা মিশ্র-ধর্মাবলম্বী। বস্তুতঃ ধর্মবিপ্লবে ভারতের ইতিহাস কলঙ্কিত! তাহারই আনুষঙ্গিক ফলে নানা শাখাধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং মূলধর্মনিচয়েও ন্যূনাধিক পরিমাণে পরস্পরের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। তাই কার্যতঃ চাক্‌মাগণ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান ধর্মত্রয়ের অধিকারপীড়িত হইলেও, ইহারা একতম প্রধান ধর্মের অধীন।

ধর্মসমস্যা

রাজা ধর্মের সংরক্ষক। কোন কোন সমাজে তৎপরিচালনভারও রাজহস্তে থাকে। রাজপ্রদর্শিত পথে সমাজের সকলকেই অনুসরণ করিতে হয়। বস্তুত! রাজা — চাক্‌মা জাতির সর্বোচ্চ নায়ক। তিনি যখন যেই ধর্ম নীতি অবলম্বন করেন, সাধারণ বিচার-বিতর্ক ব্যতিরেকে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। 'চাটিগাঁ ছাড়া' তেই দেখিয়াছেন, 'যুবরাজ বিজয়গিরি পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সিংহাসনাধিরোহণ সংবাদ পাইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিরত হন এবং সৈন্যগণ সহ বিজিত ব্রহ্মদেশ হইতে পত্নী গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। ক্রমে তাহাদের ধর্ম ও আচার পদ্ধতিগুলিও পরিগৃহীত হইয়া যায়।' সুতরা ব্রহ্মদেশে বাস হইতেই ইহাদিগের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মিঃ বুচানন (Mr. Buchanan) ও বার্মিজদিগের ধর্ম এবং ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাদিগেব কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[১১৪] কিন্তু ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে ইহারা কোন্ ধর্ম্মের আশ্রয়ে ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ! মাননীয় শ্রীযুক্ত রিজলী মহোদয় ইহাদিগের 'সংবাসা' (অর্থাৎ বৃক্ষ স্রোতাদির) পূজা দেখিয়া অনুমান করেন যে[১১৫], বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পূর্বে ইহারা জড়োপাসক ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার এবাম্বিধ সিদ্ধান্তের উপর আমরা তত আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি মা। কেননা প্রায় সমুদয় প্রাচীন ধর্মেরই আদিম বিবরণে তাদৃশী জড়োপাসনার গন্ধ পাওয়া যায়।

রাজার নেতৃত্ব

সে যাহা হউক, 'চাটিগাঁ ছাড়া'য় ইহাদিগের আদিম ধর্ম সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সেনাপতি রাধামোহন চম্পকনগরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা সমরগিরি সমীপে

(১১৪) Asiatic Researches, Vol. vi P. 229.

(১১৫) Tribes and castes of Bengal, P. 172.

বিজিত রাজ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"(ছাজের গাভুরে বকাদি)
ছিদুগা মানুষ্যুন অজাদি।"

সেখানকার লোকগুলি বিজাতি বা নীচজাতি।

"(চুঙা কাদিন্যাই পানিখ্যেই)
ছিদুগা মান্‌জ্যত্তুন পৈদা নেই।"

সেখানকার লোকের নিকট পৈতা অর্থাৎ উপবীত নাই।

"(দুধে খাদি ছিজেদং)
পৈদা বারাৎ গরিন্যাই আমি ছিদু বেরেদং।"

আমরা সেখানে পৈতা কাঁধে লইয়া বেড়াইতাম।

এতদ্বারা আমরা চাক্‌মাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ব্রহ্মবাসীদের হইতে বর্ণোৎকৃষ্ট এবং উপবীতধারী বলিয়া জানিতে পারি। বর্তমানে প্রবল বৌদ্ধাধিকারেও ইহারা ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান কালে যজ্ঞসূত্রের অনুকরণে উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আরও একটি কথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, "জাদি পূজায় ঘি দিবি।" অর্থ — "ধর্মকামে" ঘৃত দিবে অর্থাৎ যজ্ঞ করিবে। সুতরাং তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি কথাঞ্চৎ পরিমাণে স্বীকৃতব্যক্ত বটে। আবার কতিপয় স্বার্থান্ধ বর্ণনাকারের অনুগ্রহে ভারতের নানাস্থানে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের কল্পনায় পশ্চিম ভারতে যেইরূপ সূর্যরূপ সূর্যবংশের বাহুল্য, পূর্বভারতে — বঙ্গদেশ ও তৎপার্শ্ববর্তী প্রদেশ সমূহে সেইরূপ চন্দ্রবংশের ছড়াছড়ি হইয়াছে। বাঙ্গালার সেন বংশ, উড়িষ্যার কেশরী বংশ, শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং ত্রিপুরার রাজবংশ ও চট্টগ্রামাধিপতি দামোদর প্রভৃতি সকলেই চন্দ্রবংশজ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছেন। বর্তমান আলোচ্য প্রসঙ্গে ত্রিপুরার 'রাজমালা' লেখক স্পষ্টতই লিখিয়াছেন*, "মিতাই অর্থাৎ মণিপুর রাজবংশ সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর পূর্বে হিন্দু-সমাজে প্রবেশ লাভ করতঃ শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণদিগের কৃপায় অর্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা মঘ নরপতিগণ অল্পকাল মধ্যে চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের কৃপায় চন্দ্রবংশজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।"

ক্ষত্রিয়ত্ব

*১৩শ পৃষ্ঠা

বস্তুতঃ ত্রিপুরা এবং চাক্‌মাদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী তুল্যরূপ বিবেচিত হয়। তাহাদের বাসস্থান-নামতঃ চম্পকনগর এবং ত্রিপুরারাজ্য পরস্পর সন্নিকটবর্তী। উভয় সম্প্রদায়েরই চতুর্দশ দেবতা সম্পুজিত হয়, এবং বিবাহাদি কতিপয় সামাজিক কার্যেও বিশেষ সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। শতশত বৎসরের বিচ্ছেদও তাহাদিগের এতাদৃশ সামঞ্জস্য প্রায় অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। আবার কেহ যেন চাক্‌মাদিগকে ত্রিপুরাজাতির শাখা বিশেষ বলিয়া সন্দেহ না করেন। পূর্বোক্ত "চাটিগা ছাড়া" তে "ত্রিপুরাপাড়া"'র স্বতন্ত্র বর্ণনা রহিয়াছে। ফলকথা, চাক্‌মাগণও এফ্‌, মূলার প্রমুখ

নরজাতি-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ নির্নীত "লোহিততিক" বা তিবতী ব্রহ্মা" শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে। অদ্যাপি হিমালয়ের সানুদেশবাসী ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বিরল নহে। এমন কি, সুদূর তিববত, চীনবাসীরাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশপ্রসূত বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। বক্ষ্যমাণ চাক্‌মাদিগের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে প্রাণোভিল সাহেবের মতানুবর্ত্তনে ইহাদিগকে "লোহিতিক ক্ষত্রিয়" অর্থাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়বিশেষ ধরিয়া লওয়া যায়; তিববতের 'মহাযানধর্ম'ই তাহাদের আদি ধর্ম হইবে।

ইহা একরূপ সর্ববাদীসম্মত যে, ব্রহ্ম দেশে বাসনিবন্ধন ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশলাভ এবং পরিপুষ্ট হইতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপনের পরেও প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ -প্রভাব অব্যাহতরূপে চলিতেছিল। অনন্তর সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের হিন্দুসাধারণের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। তাহার বহু বৎসর পরবর্তী রাজা শুকদেব রায়ের নামেও হিন্দু-গন্ধ আসে। কিন্তু তখনও

হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়

বোধ হয় হিন্দু দেবদেবীগণ চাক্‌মাসমাজে আধিপত্য ক্রমে হিন্দুভাব পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠে। "পাগলা রাজা"র কৃচ্ছ্র সাধনার সংবাদে হিন্দুধর্মেরই ছায়া স্থাপন করিতে পারেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রাজা জববর খাঁ "শ্রী শ্রীজয়কালী জয় নারায়ণ" নাম মস্তকে ধারণ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহারাজা ধরমবক্স খাঁর সময়ে হিন্দুধর্ম ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি হিন্দুধর্মের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। রাঙামাটি রাজভবনে জয়কালী সংস্থাপিত করেন। এবং পিতার অনুকরণে মোহর মধ্যে নামের উপরিভাগে "জয়কালী স্বহায়" খোঁদাইয়া ছিলেন। দৈনিক কালীপূজার নিমিত্ত নিয়মিত ব্রাহ্মণ নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীগণেরও যথাবিধি পূজা এবং নিয়মিতরূপে যাবতীয় হিন্দুপর্ব প্রতিপালিত হইত। ইত্যাদি বিস্তারিত রূপে তৃতীয় পরিচ্ছেদাংশে বর্ণিত হইয়াছে। তদীয় মহীয়সী মহিষী-কালিন্দী রানীর শাসনের প্রথম ভাগে হিন্দুধর্ম আরও পরিস্ফুট হয়। তিনি বারমাসেই হিন্দুপর্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন। নিয়মিত শিব ও বিষ্ণুপূজা এবং দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিষহরী ও নবগ্রহাদির যথাবিধি অর্চনা হইত। বিশেষতঃ ফাল্গুনের অমাবস্যায় রানী মহোদয়া স্বয়ং কালীপুর কালীমন্দিরে গিয়া পূজা প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতিরেকে হিন্দুমতে তাঁহাব নিত্য পূজাও ছিল, পূর্বে ইহাও বিবৃত করা হইয়াছে।

কিছুকাল পরে আরাকানের প্রসিদ্ধ ভিক্ষু সংঘরাজ হারবাংত্রর গুন্নামেজু ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া রাজালয়ে উপস্থিত হন। তাঁহারা রানী মহোদয়াকে বৌদ্ধধর্মে প্ররোচিত করেন।[১৯৬]

(১৯৬) কেহ কেহ বলেন, ইঁহাদের পূর্বে সিংহলে অধীতবিদ্য হরিঠাকুর নামধেয় জনৈক চট্টগ্রামবাসী ভিক্ষু রানীকে বৌদ্ধ ধর্মে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। মিঃ রিজ্‌লীও এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, — "কিছুদিন পরে আরাকান হইতে একজন প্রসিদ্ধ ফুঙ্গি আসিয়া রানীকে বৌদ্ধ ধর্মের সমর্থন এবং পৌত্তলিকতায় বাধা দিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।" লুইন, (Tnbes and Castes of Bengal, P. 171) তবে ইঁহার কথাতে কেমন কেমন বোধ হইতেছে। "পৌত্তলিকতায় বাধা দিতে" "ফুঙ্গির" কোন অনুরোধ ছিল কিনা, সন্দেহ আছে। কেননা বৌদ্ধ ধর্মও পৌত্তলিকতা বর্জিত নহে।

ক্রমে তাঁহার মত পরিবর্তিত হইয়া যায়; তিনি শুভদিনে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর রানী বৌদ্ধধর্মের উন্নতিকল্পে সদনুষ্ঠান সমূহ সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার এই প্রথম ও প্রধান কার্য রাজানগরেব রাজভবন পার্শ্বে পবিত্র "মহামুনি" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা। মন্দির

বৌদ্ধধর্মের পুনপ্রবর্তন

বক্ষস্থিত প্রস্তর ফলকের অক্ষরে অক্ষরে রানীর প্রগাঢ় বুদ্ধ বিশ্বাস এবং অলৌকিক উদারতা প্রতিভাত হইতেছে। বিধবা হইবার প্রায় ৩৮ বৎসর পরে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মৃত্যুর তিন বৎসর মাত্র পূর্বে রানী বৌদ্ধধর্ম সম্মত প্রথম অনুষ্ঠান— এই মহামুনি মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তিনি একটি মহাদান করিয়াছিলেন। অনন্তর স্বীয় প্রজাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিতে তৎপর হইলেন। এই কারণে পালি হইতে অমিয় বুদ্ধ চরিত অনূদিত করাইয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণের ইচ্ছা কিন্তু করালকাল তাঁহার এই পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেয় নাই। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়া রানীর বৌদ্ধধর্মে অনুরাগ জন্মে। জরা পীড়িত দুর্বল জীবতে কত আর "কর্ম" আশা করা যাইতে পারে?

বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মেরই অবতার বিশেষ। সুতরাং তৎপ্রচারিত ধর্ম কখনই হিন্দুত্ব বর্জিত হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'গীতায়' যে কর্মের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,(১৯৭) বুদ্ধ অবতারে তাহাই পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে। কেবল গীতোক্ত ধর্মে ভগবান কর্ম হইতে পৃথক, বৌদ্ধ ধর্মে তিনি কর্মে বিলীন হইয়াছেন! হিন্দুর 'তত্ত্বমসি' ভাব 'সোহম্' জ্ঞানে উন্নীত হইলে 'ভগবান

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম

অর্থাৎ সম্যক' — 'সম্বুদ্ধোপাদস্ট নির্বাণ' লাভ হয়! অতএব বৌদ্ধ গণকে অহিন্দু বলা বা বিবেচনা করা কদাপি যুক্তিসঙ্গত নহে। সম্প্রতি জাপানের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পন্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ওকাকুরা নামা প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে এতদ্‌সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহার কথায় বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দুধর্মের এক বিশেষ অঙ্গ। তবে ধর্ম মাত্রেরই অধিকারীভেদ আছে। 'কর্মে' বদ্ধপরিকর, হইবার পূর্বে লক্ষ্য ধরিয়া উপযুক্ত হওয়া চাই। তাই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মনীষিগণ বৌদ্ধ ধর্মের কবল হইতে হিন্দুধর্মে ন্যায়তঃ স্বার্থ-সংরক্ষণে উত্থিত হইয়াছিলেন।

(১৯৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "কর্ম্মযোগ" নামধেয় তৃতীয় অধ্যায়ে আছে;

"ন কর্ম্মনামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমাধি গচ্ছতি।। ৪।"

কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেহই নৈষ্কর্ম্য লাভ করিতে পারে না, এবং কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।। ৪।'

"নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মনঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মনঃ।।৮।"

'তুমি সর্বদা কর্ম কর। যেহেতু কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা ভাল। কর্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইবে না।।৮।'

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষ।।৯।"

'অতএব তুমি সর্বদা ফলাসক্তি বিরহিত হইয়া অবশ্য কর্তব্য কর্মানুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।৯।'

মহীয়সী কালিন্দী রানী শেষ জীবনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমরণ হিন্দু ধর্মানুদিষ্ট পূজাদিও আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম চাক্‌মা সমাজ হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। পরবর্তী রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়েরও কিছুকাল ধরিয়া ধরমবক্স খাঁর প্রতিষ্ঠিত জয়কালীর পূজার্চনা যথারীতি চলিয়াছিল। পরে একবার রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক শিশু কন্যা রোগাক্রান্ত হইলে;তিনি কালী-সমীপে বহু আরাধনাতেও স্নেহ প্রতিম কন্যারত্নকে রক্ষা করিতে না পারিয়া, কালীমূর্তিকে পার্শ্ব প্রবাহিতা কর্ণফুলী জলে বিসর্জন দিয়াছিলেন। সেই হইতে চাক্‌মা সমাজ হইতে কালী পূজা উঠিয়া গিয়াছে। তবে এখনও কেহ কেহ হিন্দুদের সংস্থাপিত কালীর নিকট 'মানস' পূজা প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ্যে এই কালীপূজা রূপান্তরিত হইয়া "হোইয়া পূজা" আখ্যায় প্রচলিত হইয়াছে। অদ্যাপি রাজবাড়ীতে এবং স্কুলের ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানে সরস্বতী পূজাও হইয়া থাকে, এবং শিবপূজা ও লক্ষ্মীপূজা বিকলাঙ্গ হইয়া কোনরূপে মানরক্ষা করিতেছে।

হিন্দুধর্মের শেষাবস্থা

বিগত সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৫ জন পুরুষ ও ১৭ জন স্ত্রীলোক, এবং পার্বত্য ত্রিপুরায় ২ জন পুরুষ হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বৈষ্ণবেরাই এই হিন্দু ধর্ম পুনঃ প্রবর্তনের মূল। তজ্জন্য তাঁহারা অবশ্য হিন্দুসমাজের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। চট্টগ্রামের "জ্যোতিঃ" সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী মহোদয় বহুদিন ধরিয়া হিন্দুসমাজের গৌরব আর্য্যমিশন ও রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়কে এই বিশৃঙ্খলধর্মী চাক্‌মাসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মশিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত বারংবার আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এযাবৎ তাঁহাদিগের কাহারও কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তথাপি নিতান্ত স্বল্পশক্তি মাত্র সম্বল বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধু চেষ্টা সবিশেষ প্রশংসাই। চাক্‌মা বৈরাগী তুলসীমালা ও ডোরকপীনধারী। তাহাদের মুখে প্রায়ই হরিনাম শুনিতে পাওয়া যায়। মদ্, মাংস বর্জনাদি কঠোরতাতেও তাহাদিগের আসক্তি দেখিয়া অশেষ আশার সঞ্চার হয়। কালিন্দী রানীর জীবনী আলোচনায় মুসলমান ধর্মের প্রতিও তদীয় অনুরাগ দেখিয়াছি। ইহা তাঁহার অসীম উদারতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তাহার ফলে পীরের সিন্নী প্রভৃতি মুসলমানী আচারও সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন যীশুসেবক মিশনারিগণও এই সরল প্রাণ পার্বতীয়দিগের মধ্যে ধর্মালোক বিস্তারের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের বিপুল অধ্যবসায়, বস্তুতঃ হৃদয়ে অনুভব করিবার যোগ্য! কিন্তু এত চেষ্টা চাক্‌মাসমাজে অতি অল্পই ফলপ্রসূ হইয়াছে। আজ প্রায় শতাব্দী কালের সস্নেহ আহ্বানে সাধারণ সম্প্রদায় হইতে অতি মুষ্টিমেয় — ৩/৪ জন মাত্র ভক্তিভাজন যীশুর মন্দিরযাত্রী হইয়াছে। ভদ্র পরিবারসম্ভূত কেবল বাবু দুর্গাকিঙ্কর দেওয়ান এই পথের পথিক হইয়াছিলেন;কিছুদিন পরে তদ্ধর্মালোকে মনের অন্ধকার দূরীভূত হওয়ায়, তিনি পুনরায় বুদ্ধদেবের "নির্বাণ" পথ ধরিয়াছেন।

নানাধর্ম্ম

চাক্‌মাদিগের ধর্মকার্য মাত্রেই প্রথমে 'স্থাপত্য পূজা' হয়। ইহাতে বসুমতী, চুঙুলা (পুরুষ) এবং পরমেশ্বরী (প্রকৃতি) পূজা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যেই তিন প্রধান শক্তিতে এজগৎ সৃষ্ট, সেই আদিম শক্তি ত্রয়ের সাধনা যাবতীয় মানবেরই সর্বাদৌ কর্তব্য। যে জাতি যত অধিক পরিমাণে এই শক্তিত্রয়ের তত্ত্ব রাখেন, ধর্মজগতে তাঁহারাই তত অধিক উন্নত।

দেবতা

এতদ্ভিন্ন ইহারা আরও নানা দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুধর্মের অধিকার কালে চাক্‌মাসমাজে তেত্রিশ কোটী দেবতার অনেকেই প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের আক্রমণে প্রায় সকলেই প্রভুত্বচ্যুত হইয়াছেন। বর্তমানে শিব, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং নবগ্রহ ভিন্ন আর কাহারও পূজা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ত্রিপুরাদিগের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও যে চতুর্দশ সংখ্যক জাতীয় প্রধান দেবতা আছেন, তাঁহাদের বর্ণনা হইতেও হিন্দু দেব-দেবীর গন্ধ আসে। তৎ যথা ঃ—

১। বৃহত্তারা — সৃষ্টির পরে ইনি লক্ষ্মীকে আনিয়া পৃথিবী ধনধান্যে পরিপূর্ণ করেন।[(১৯৮)]

২। মা-লক্ষ্মী — ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী।

৩। ধলধবরী— কার্পাসাধিকারিনী।[(১৯৯)]

৪। পরমেশ্বরী — আদ্যাশক্তি (প্রকৃতি)।

৫। গঙ্গা— জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী।[(২০০)] ইহার নিকট পূণ্য, অভয়, নিরাময় প্রার্থনা করা হইয়া থাকে।

৬। স্থান দেবতা — বাস্তুদেব।

৭। মত্যা — ব্যাঘ্রবাহন;ইহাকে পূজার ফলে লোকে নিঃশঙ্কচিত্তে জঙ্গলে ভ্রমণ করে।[(২০১)]

৮। হত্যা — তদীয় উপদ্রব হইতে জুম রক্ষার নিমিত্ত পূজা করা হয়।

৯। ফুলকমরী — ফোঁড়া পাঁচড়াদির দেবতা।

১০। মেলকমরী — বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি মারীভয়োৎপাদিকা দেবতা।

১১। মোহিনী — অনেক স্থলে ইঁহার আশ্রয় আছে। তথায় নিষ্ঠীবন ত্যাগে কি প্রসবাদি করিলে 'মোহিনী দেবতা' আক্রমণ করেন; তাহাতে দদ্রু প্রভৃতি নানা সংক্রামক রোগ জন্মে।

১২। কালাখেদর — ইনি নানাস্থানে থাকিয়া আক্রমণ করেন। ইঁহার দেহতাড়িত বাতাসও অনিষ্টকারী।

১৩। ভূত — ইনি যেখানে সেখানে মনুষ্যের উপর উপদ্রব করেন।

১৪। রাখ্যোয়াল — রক্ষাকর্তা। তিনি নানা আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

চাক্‌মাদিগের মতে এই চতুর্দশ দেবতা পৃথিবীর পাহারাওয়ালা। স্বচ্ছন্দ বিচরণের নিমিত্ত ইঁহাদিগকে পূজাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে হয়।

---

(১৯৮) বোধহয় ইনি বৃহৎ- -তারা অর্থাৎ স্বয়ং সূর্য্যদেব।

(১৯৯) ত্রিপুরাগণ ইঁহাকে "খুলুমা" আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে।

(২০০) ত্রিপুরাদের মতে ইঁহার নাম – তুই মা।

(২০১) হাওড়া খুরুট পঞ্চাননতলার 'দক্ষিণরায়' এবং চাক্‌মাদিগের দেবতা "মত্যার" মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। "দক্ষিণরায়ও ব্যাঘ্রবাহন" তবে কিনা তিনি কেবল ব্যাঘ্রের দেবতা মাত্র! ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯৬ ৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের যে কোন দিন ইঁহাদের পূজা হইতে পারে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই এই চতুর্দশ দেবতার পূজা হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেবদেবীই নাকি স্ব স্ব চক্রে বাস করেন। এই নিমিত্ত পূজাকালে ক্রিয়াস্থল ও সমবেত সকলকে ঘেরিয়া সূত্রবেষ্টন করে। যাহারা এই সীমা মধ্যে থাকে, তাহারাও নাকি আংশিক ফল পায়। বলা বাহুল্য, এ সমুদয় হিন্দুত্ব বিজড়িত তান্ত্রিক বৌদ্ধমত! তবে ইহারা বলে, এসকল ইহকালের পূজা; পরকালের নিমিত্ত কড়া-তারা-চাক্কার সেবাই কুলধর্ম যাঁহারা পরমবুদ্ধের সাধনা শিখিয়াছেন; তাহারা উপরোক্ত পূজাগুলিকে "মিথ্যা দৃষ্টি পূজা" বলিয়া থাকেন। এস্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, চাক্‌মাগণ বিশেষতঃ ক্রিয়াকর্তা পূজাকালে সস্ত্রীক উপস্থিত থাকে। "সস্ত্রীকম্ ধম্মমাচরেৎ" — হিন্দুধর্মের এই সনাতন বিধি ইহাদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রে অধিকাংশ বিকৃত বাঙ্গালা শব্দ, মধ্যে মধ্যে নানা যাবনিক শব্দও মিশ্রিত হইয়াছে, এস্থলে একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল। শুদ্ধীকরণের নিমিত্ত নদী হইতে জল গ্রহণ কালে এই মন্ত্রে প্রার্থনা হইয়া থাকে,—

পূজা ও মন্ত্র

" দেরে মা গঙ্গা, দেরে পানি
অবোধ মানাই[২০২] শুদ্ধ করি,
শিল ভাঙি পাত্থর করং[২০৩]
পাত্থর ভাঙি দৈর্য্যা[২০৪] করং
দৈর্য্যার পানি কোবে[২০৫] তলং[২০৬]
অবোধ মানাই শুস্বুদ্ধ করং।"

চাক্‌মাদিগের ধর্মশাস্ত্রের নাম — "আগরতারা" অর্থাৎ পৌরাণিক শাস্ত্র[২০৭]। মোটসপ্তদশ খানি 'তারা' বা শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। যথা — (১) মালেম তারা (মালেমস্থবিরের উপাখ্যান), (২) ছাদিংগিরি তারা, (৩) আনিজা তারা (অনিত্য কর্মকথা), (৪) আরেন্ তামা তারা, (৫) সিগল - মোগল তারা (জয় মঙ্গল সূত্র), (৬) সরকদান তারা, (৭) দাসা পারামি (দশ পারামিতা) তারা, (৮) বড়কুরুক তারা, (৯) ছোটকুরুক তারা, (১০) স্ত্রীপূদরাতারা

শাস্ত্র

(২০২) মানাই — মনুষ্য; (২০৩) করং -- করি; (২০৪) দৈর্য্যা দরিয়া, সমুদ্র; (২০৫) কোবে - গন্ডুষে; (২০৬) তলং -- তুলি।

(২০৭) 'আগর'- পূর্ব্বের 'তারা' শাস্ত্র; সুতরাং 'আগরতারা' শব্দের অর্থ 'পৌরাণিক শাস্ত্র।' কিন্তু দেখিতেছি, 'বৌদ্ধ পত্রিকা' সম্পাদিত ইহার অর্থ করিয়াছেন "অগ্রত্রাণ" (১ম ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা)। তিনি এই অর্থ কিরূপে নির্দ্দেশ করিলেন বুঝিলাম না। আমাদের এতাদৃশ মন্তব্য "বৌদ্ধ বন্ধু" তে প্রকাশ হইলে "পত্রিকার" সম্পাদক সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া এক ককলমি প্রতিবাদপত্র ছাপাইয়া লেখকের উপর নানা কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করেন। লেখক তাহাদের ভ্রমপ্রদর্শন এবং উক্ত অন্যায় ব্যবহারের জন্য নোটিশ প্রদান করিলে, তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেহ কেহ 'আগর' - অক্ষর 'তারা' আঁটি, অক্ষরের আঁটি অর্থাৎ গ্রন্থ অর্থও করেন। সে যাহা হউক বাবু ত্রিলোচন দেওয়ানের ঐকান্তিক অনুরোধে চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মবংশ ভিক্ষু মহোদয় কিছুকাল একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি হইতে ইহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মুখপত্র "বৌদ্ধ বন্ধু" ও "বৌদ্ধ পত্রিকা'য় প্রকাশ করিতেছিলেন, পত্রদ্বয়ের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বোধহয় ইতি করিয়াছেন।

(ত্রিকুড্ড সূত্র), (১১) সুরাদিজা তারা, (১২) পুদুম্ফুলু তারা, (১৩) ফুদুম্ফুলু তারা, (১৪) সাহসফুলু তারা, (১৫) চেরাগফুলু তারা, (১৬) স্বামীফুলু তারা এবং (১৭) রাখেম্ফুলু তারা। এই সমুদয়ের ভাষা পালি, — তবে কিনা অধুনা প্রায় সমস্ত তারারই, পাঠ দূষিত এবং বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি কোন কোন স্থলে চাক্মা ভাষা মিশ্রিত হইয়া সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোনরূপে পাঠবিপর্যয় ঘটিয়াছে। অস্মদ্দেশীর অন্যান্য প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির ন্যায় "আগর তারা"ও অনেকের ঘরে তালপত্রে — চাক্মা অক্ষরে লিখিত আছে। এবং অনুষ্ঠান বিশেষে "তারা" বিশেষ ভিক্ষু বা শ্রমণ কর্তৃক পাঠিত হয় তন্মধ্যে 'মাথা ধুইতে'[(২০৮)] "বড়কুরুক তারা" ও "'বড় বিবাহে'[(২০৯)] "সিগল-মোগল তারা," "জাদি পূজা" অর্থাৎ ধর্ম পূজায় - "সালেম তারা" "দাসাপারামি তারা" ও "সাহসকুলু তারা" মৃত্যুর পর মুখে পিণ্ড দিতে "আনিজা তারা" রাজা বা বড়লোক মরিলে "আরেন্তামা তারা" পিণ্ডোৎসর্গ কালে — "মালেম তারা" " পুদুম্ফুল তারা" 'ফুদুম্ফুল তারা" "স্ত্রীপুদরা তারা" "সুরাদিজা তারা" "সাহসফুল তারা" ও "দাসাপারামি তারা" শ্মশানে দাহন সময়ে "ছাদিংগিরি তারা" এবং বার্ষিক শ্রাদ্ধে 'রাখেমফুলু তারা' পঠিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট "চেরাগফুলু" "স্বামীফুলু" এবং "সরকদান তারা" ত্রয় কেবল ধর্মকথা শ্রবণ মানসেই পাঠ করা হয়। এসমুদয় "আগরতারা" অর্থাৎ পৌরাণিক শাস্ত্র হইলেও বৌদ্ধানুশাসনেই যে ইহাদের হাতে আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্বকার "যুগভদ্র", "যুগকালাম", "জ্ঞানপ্রদীপ", "মানবজনম", "ফাকিরী কালাম" নামধেয় হস্তলিখিত পাঁচখানি আধ্যাত্মিক গ্রন্থও ইহাদিগের কোন কোন প্রাচীন উন্নত পরিবারে পরিদৃষ্ট হয়। এগুলি হিন্দুধর্মেরই অমৃতময় ফল। জলটঙ্গীর উপর শিব ও পার্বতী বসিয়া যে সমুদয় দুরূহ আধ্যাত্মিক সমস্যা মীমাংসা করিয়াছেন, গ্রন্থনিচয় তৎসমুদয় কথাতেই পরিপূর্ণ।

কালিন্দী রানী কর্তৃক রাজানগরে "মহামুনি" মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু তাঁহার সঙ্কলিত ইষ্টকময় ক্যং গৃহ প্রস্তুত হয় নাই বটে, তবে সেই বংশ বেত্রবিনির্মিত তৃণাচ্ছাদিত প্রাচীন ক্যং অদ্যাপি স্বর্গীয়া রানীর অপূর্ব ধর্মপ্রাণতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

ক্যং বা বিহার

রাঙামাটি রাজবাড়ীতেও একখানি ক্যং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা রাজভবনের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত দীননাথ ভিক্ষু মহোদয়ের উপর এই মঠের অধ্যক্ষতা রহিয়াছে। এই 'ক্যং' এ (বিহারে) একটি মনোহর বুদ্ধ মূর্তি স্থাপিত আছেন। এতদ্ভিন্ন চাক্মাদিগের অধিকাংশ স্থায়ী গ্রামেই অধুনা ক্যং এবং বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা অন্ততঃ একজন ভিক্ষু বা শ্রমণের তত্ত্বাবধানে থাকে। গ্রামবাসীরা বুদ্ধদেবের সেবার নিমিত্ত যে সমস্ত ভক্তি উপাচার অর্পণ করে; তদ্বারা মঠাধ্যক্ষগণের ভরণপোষণ চলিয়া যায়। সম্প্রতি বর্তমান সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ হাচিন্সন মহোদয়ের উৎসাহে — রাজাবাহাদুরের তৎপরতায়

(২০৮) বৎসরান্তে পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত এবং জ্ঞাতিদের কাহাকেও বাঘে খাইলে "ঘিলা কুচোইর পানি" দিয়া মাথা ধুইতে হয়, পরে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

(২০৯) রাজা বা সম্ভ্রান্ত উন্নতপ্রথার বিবাহ।

রাঙামাটিতে এক বিরাট ইষ্টকময় বিহার ও তন্মধ্যে পবিত্র মহামুনি মূর্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তদীয় সার্কেলের প্রজাগণ হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। তাঁহাদের আশা আছে, প্রতি 'মাঘী পূর্ণিমা'তেই এখানে মেলার বন্দোবস্ত করিবেন।

বৌদ্ধমতে চাক্‌মাদিগের মধ্য হইতেও কেহ কেহ সংসার ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক "রড়ি" (শ্রমণ) ব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু বিরাট সমাজের পক্ষে কৃচ্ছ ব্রতচারী চীবরধারী শ্রমণ সংখ্যা অতিশয় সামান্য। গড়ে প্রায় চারিশত পুরুষ খুঁজিলে তবে একজন 'রড়ী' পাওয়া যাইতে পারে।

রড়ী লোথকও ঠাকুর

ফলতঃ চাক্‌মা "রড়ীদিগের" আচার ব্যবহারেও তাদৃশী কঠোরতা নাই। তাঁহারা যেন স্ত্রীসঙ্গবর্জিত গৃহী বিশেষ। অনেকে পরিধেয় চীবর বস্ত্রে সাধারণতঃ কাছাও দিয়া থাকে। কিন্তু এতাদৃশ প্রশয় পাইয়াও অনেকে শ্রমণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া সংসারধর্মে প্রবেশ করেন। তাঁহাদিগকে লোথক বলা হয়। চাক্‌মাসমাজে "লোথক" নিতান্ত বিরল নহে। আবার এই কৃচ্ছ্রব্রত প্রতিপালন করিয়া এ যাবৎ তিনজন মাত্র[২১০] "ঠাকুর" অর্থাৎ 'ভিক্ষু' উপাধি লাভ করিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাদিগের সামাজিক প্রায় যাবতীয় যজন পূজনাদি ওঝাদের দ্বারা চলিয়া থাকে। সমাজে "রড়ী" ও "ঠাকুরের" অভাবই ইহার প্রধান কারণ হইবে। তবে কিনা ইহাও সত্য যে, বৌদ্ধ ধর্মবিরুদ্ধে ক্রিয়ার প্রতি "রড়ী" ও "ঠাকুরগণ" ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং সমাজে "ওঝা" শ্রেণীর অবশ্য প্রযোজন। সমাজের বহুদর্শী ও ক্রিয়া প্রণালীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই "ওঝা" নির্বাচিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত হইলে তাহাদের উত্তরাধিকারিগণও এই ব্যবসায় চালাইতে পারে। অন্যথা সমাজ তজ্জন্য বাধ্য নহে। "চুঙুলাং" প্রভৃতি কতিপয় অনুষ্ঠানে "ওঝাকে" পূর্বদিন নিমন্ত্রণ করিতে হয়। সে রাত্রি "ওঝা" অতি পবিত্রভাবে দেব-দেবী স্মরণ করিয়া ভাবী অনুষ্ঠানের ফলাফল চিন্তা করিতে শয়ন করে। বলা বাহুল্য স্ত্রীসহবাসাদি দুষ্কর্ম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে। ইহাতে "ওঝা" স্বপ্নে ক্রিয়াকর্তার ইষ্টানিষ্টি পরিজ্ঞাত হয়।

বলিতে কি, ইহারা বৌদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াও ভগবান বুদ্ধোপদিষ্ট পঞ্চশীল[২১১] বা দশশীল[২১২] আচরণে সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ দীক্ষা গ্রহণকালে তাহারা এই পঞ্চশীল ব্রত প্রতিপালন করিবে বলিয়াই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া থাকে। এবং ফলে সাতদিন মাত্র অতিবাহিত হইলেই ইতি শেষ করিয়া রাখে। "ওয়াছু" অর্থাৎ আষাঢ়ের পূর্ণিমা হইতে যে "ছাদাং" আরম্ভ

(২১০) শ্রীযুক্ত দীননাথ ভিক্ষু রাজাবাহাদুরের রাঙামাটি (ক্যাং) মঠাধ্যক্ষ। শ্রীযুক্ত পুনংচান্দ ভিক্ষু 'কাচলং' তীরে অন্য একটিক্যাং এ করিয়া থাকেন। কাচালঙেই অপর যুবক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরত্ন ভিক্ষুনামে পরিচিত, তিনি মহাপ্রুং ক্যাং-এ বাস করেন।

(২১১) পঞ্চশীল -(১) প্রাণী হত্যা (২) চুরি (৩) পরস্ত্রী হরণ (৪) মিথ্যা কথন এবং (৫) মাদক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ।

(২১২) দশশীল - পঞ্চশীল ও (৬) বৈকালিক ভোজন (৭) নৃত্য বাদ্য গন্ধাদি সেবা। (৮) ও (৯) উচ্চাসন ও মহাসনে উপবেশন এবং (১০) অর্থস্পর্শ নিষিদ্ধ।

হয় তাহা "ওয়াগ্যা" অর্থাৎ আশ্বিনের পূর্ণমাসী পর্যন্ত তিনমাস ধরিয়া চলিয়া থাকে। বস্তুতঃ "ছাদাং" বৌদ্ধ মাত্রেরই অতি পবিত্র অনুষ্ঠান। এ সময়ে তাহাদিগকে সুস্বাদু খাদ্য, মনোরম পরিচ্ছদ এবং স্ত্রী-সঙ্গম প্রভৃতি পরিবর্জন করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরাট চাক্‌মাসমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে মাত্র এই পবিত্র ব্রত পালনে তৎপর দেখা যায়। পক্ষান্তরে এই পবিত্রাচার্ ভিক্ষুকগণের নৈমত্তিক ব্রত। তাঁহারা ইহা ছাড়া এ কয়মাস স্ব স্ব 'ক্যং'এ রাত্রি বাস করিতে বাধ্য। অধুনা ইহাও সম্যক প্রতিপালিত হয় না।

২

পর্ব ও নিয়ম

যাহা হউক ইহাদিগের ধর্মানুষ্ঠান সংখ্যায় নিতান্ত কম নহে; তবে বিভিন্ন ধর্মের সংঘাতে অধুনা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। তন্মধ্যে হিন্দুধর্মের অধিকার যদিও বিস্তর, কিন্তু সেই সমুদায় তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত প্রভাবে এতই দূষিত যে, হিন্দুসমাজ কোনরূপেই তাহা গ্রহণে সম্মত হইতে পারে না। মোটের উপর বৌদ্ধ ধর্মেরই সর্বাধিপত্য স্বীকার করা যায়। বিষু, 'ওযাছু', 'ওয়াগ্যা' 'মাঘীপূর্ণিমা' প্রভৃতি সমস্তই বৌদ্ধ পর্ব। তবে কিনা ইহাদের 'নবান্ন' নামক আর এক পর্ব্ব আছে; তাহা অবশ্য হিন্দুসামাজ হইতেই পরিগৃহীত। এতদ্ভিন্ন অপর সমুদয় ধর্মানুষ্ঠানকেই ব্রত বা নিয়ম আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। তৎসমুদয়ের মধ্যে 'চুঙুলাং', 'চক্রবূহ্য', 'থামিং টং', টাঙ্গোনোৎসর্গ' প্রভৃতি সচরাচর প্রচলিত দেখা যায়। "ধর্মকাম" এবং "হাজারবাতি"ও বৌদ্ধানুষ্ঠান বটে, কিন্তু ব্যয়সাধ্য বলিয়া সাধারণে করিবার সাধ্য নাই। তাহা ছাড়া, শিবপূজা, লক্ষ্মীপূজা, হোইয়া (কালী) পূজা, নবগ্রহ পূজা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর অর্চনাও প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, গাভীদান, পারঘাটার শুল্কমুক্তি ইত্যাদি ব্যবস্থাও এই সমাজে বিরল নহে। অপর পক্ষে "কেরপূজা", "সত্যপীরের সিন্নি" প্রভৃতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। নিম্নে এই সকল পর্বনিয়মাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে।

বিষু — মহাবিষুর সংক্রান্তি বৌদ্ধদিগের প্রধান ও পবিত্র পর্বাহ। বসন্তের অবারিত অনুগ্রহে চৈত্রমাস প্রকৃতিকে মনোরম করিয়া তোলে; আর তাহারই সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টিতে বৌদ্ধ সমাজের অতি নিম্নস্তরে পর্যন্ত বিশ্বজনীন প্রেমপ্রবাহ বহিতে থাকে। এইদিন বৌদ্ধ জননী বিপুল মঙ্গলায়োজন সহকারে পরিবারের শুভকামনা করেন। কেবল ইহা নহে, ধর্মের যাহা প্রধান অঙ্গ, এবং যাহা কর্তব্যের শাসনে নিয়ামিত, এ হেন শুভ অবসরে সে সমুদায় মহৎ প্রতিষ্ঠাসমূহও অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ প্রধান এশিয়াখন্ডে প্রায় সর্বত্রই এই একই উন্মাদনা — ভক্তগণ অতি সাবধানে শুচি বিধান করিয়া ভক্তিপূত উপচার-থালা মাথায় পবিত্র বুদ্ধ মূর্তির সন্নিধানে প্রাণের বিনীত নিবেদন জ্ঞাপন করিতে উপস্থিত হয়। কিছুদিন হইল, চিৎমরং নামক স্থানে এক বুদ্ধমূর্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, বিষু প্রভৃতি পর্বাহে তথায় অনেকের সমাগম হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে আরাকান ও চট্টগ্রামে বুদ্ধদেব "মহামুনি" মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই চাক্‌মা আবাল-বৃদ্ধ -বণিতা প্রায় সকলেই সেই সূদূর মহামুনিদর্শনে গমন করে।[(২১৩)]

তীর্থ-কার্য

"ফুলবিযু" অর্থাৎ সংক্রান্তির পূর্ব দিন হইতে ইহাদের তীর্থ কার্য আরম্ভ হয়। প্রথমে স্নানাদিতে শুচি হইয়া মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত বারান্দায় বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী ঘুরিয়া আকুল প্রাণে বুদ্ধ নাম কীর্তন করিতে থাকে। এরূপে কিছুকাল প্রদক্ষিণের পর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক মহামুনির শ্রীচরণপ্রান্তে উপচার-থালা এবং প্রজ্বলিত বর্তিকা স্থাপন করতঃ ভূমিগত প্রণিপাত করে। তদন্তর মন্দির মধ্যেই পুনরায় বারংবার মহামুনিমূর্তি প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিতে থাকে। অবশেষে যখন শ্রান্তিক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন বাসায় গিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লয়।

প্রদক্ষিণকালে ইহাদের সুশৃঙ্খলার ভাবে — সৌন্দর্যের খেলায় — এবং সর্বোপরি পবিত্র ধর্মোন্মাদনায় দর্শকের পাষাণ হৃদয়ও বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়! সমবয়স্ক স্ত্রী পুরুষ দলে দলে গলাগলি করিয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতে থাকে। মুখে পবিত্র বুদ্ধ নাম, এবং মধ্যে মধ্যে অপূর্ব উৎসাহোদ্দীপক খল খল হাস্যঘটাজড়িত "রেইঙ্‌ খারিয়া"[(২১৪)] মন্দির বিকম্পিত—মেলাস্থল মুখরিত করিয়া তোলে। অহো, সেই বিহ্বলবিভ্রান্ত নৃত্য এবং উদাস-বিভোর সঙ্গীত পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের অভিনয় দেখায়! কেবল মন্দিরসন্নিধানে নহে, নৃত্য-গীতের এতাদৃশ আনন্দপ্রবাহ পথে-ঘাটে-মন্দিরে-প্রাঙ্গণে সর্বত্রই তরঙ্গায়িত হইয়া থাকে।

এ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদিগের কোন বিশেষ সাজসজ্জা থাকে না। অবগুণ্ঠন ব্যপদেশে কেবল একখানি লোহিত কি শুভ্র 'ওড়না' মস্তকোপরি হইতে পশ্চাদ্দিকে ঝুলাইয়া দেয়। পুরুষেরা বিশেষতঃ অনূঢ় যুবকগণ কর্ণে পুষ্পগুচ্ছ, মস্তকে রঙ্গিন টুপি, গলদেশে আপাদ-বিলম্বিত রুমাল ও ফুকাদানা, গিল্‌টির শিকল প্রভৃতি নানাবিধ গহনা ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়। শুধু ইহা নহে, কেহ কেহ বা আবার চুন, হলুদ বা কালী মাখিয়া অদ্ভুত সং সাজে। এতদ্ভিন্ন কেহ বেহালা, কেহ কন্সার্ট, কেহ বা বাঁশী, অপর কেহ বা দুই তিনটি যন্ত্র যুগপৎ ধ্বনিত করিতে থাকে। ফলে তাহাদের সেই উদ্দাম ব্যবহারে — আমোদের উপসংহার না হইতেই তৎসমুদয় যন্ত্র ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। অন্যতঃ প্রায় সকল স্ত্রী পুরুষেরই হাতে অন্ততঃ একখানি করিয়া পাখা[(২১৫)] থাকে। যুবকেরা তাহা হয়ত বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য করিবার সময়ও

(২১৩) রাজানগরের "মহামুনি"র কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে তদ্ভিন্ন 'পাহাড়তলী' নামধেয় বৌদ্ধ প্লাবিত গ্রামে মঙ্‌রাজা বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত আর একটি মহামুনিমূর্তি আছেন, ইহাই অধিকতর প্রাচীন। উভয় স্থানেই এই সংক্রান্তি উপলক্ষে বিরাট মেলা হয় বটে, কিন্তু পাহাড়তলীর জনতা সংখ্যা গড়ে রাজনগর মেলার প্রায় দ্বিগুণাধিক হইয়া থাকে। তবে রাজানগর মেলার প্রায় তিন চতুর্থাংশেরও অধিক যাত্রী চাক্‌মা। স্বকীয় ও স্বজাতীয় রাজার প্রতি ভক্তিমত্তাই যে উহার প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২১৪) "রেইঙ্‌খারা" কুইধ্বনি।

(২১৫) স্ত্রীলোকদিগের এই - মাথায় 'ওড়না' এবং হাতে পাখা দেখিলে স্পেনীয় মহিলার কথা স্বতই স্মরণ হয়!

ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আনন্দে অধীর হয়। এবং অধিকাংশ স্থলে ক্লান্তি দূরীকরণমানসেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোথাও বা দেখা যায়, কোন প্রণয়িনী শ্রান্ত-ক্লান্ত তাহার হৃদয়েশ্বরকে শীতল করিতেছে আর বিমুগ্ধ প্রণয়ী সেই কোমলকর-সঞ্চালনের প্রতি সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! আবার কোথায় বা শ্রমালসপীড়িতা কুমারী যুবতীকে কোন অনূঢ় যুবক ব্যজনে তৎপর। হঠাৎ কোন শুভ নিমিষে চারি চক্ষুতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলিয়া যায়, নীরবে — নিশ্বাসে উভয়ে উভয়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অধোমুখী রহে! এই রূপে তথায় প্রেমের প্রথম অভিনয়-পূর্বরাগ সূচিত হয়। অবশেষে যুবক যুবতীর হস্তধারণে সাহসী হয়, তখন আর হৃদয়ের উদ্‌ভ্রান্তভাব মুখের কপাটে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। অনেকেই এইরূপে জনসংঘ হইতে জীবনসঙ্গিনী নির্বাচিত করিয়া লইয়া থাকে। পরস্পরের মত জানিতে পারিলে, পরিশেষে তাহারা স্ব স্ব অভিভাবকের গোচরীভূত করে;এবং তাহাতেই বিবাহ হইয়া যায়।

অবশ্য এতাদৃশী ঘটনা তীর্থক্ষেত্রের কলঙ্ক বিশেষ। হায়, বর্তমানে অনেক হিন্দু তীর্থস্থান হইতেও এইরূপ নানা ব্যভিচার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ পাপ দৃশ্যের বর্ণনা বক্ষ্যমান পবিত্র বিষয়ের সঙ্গে দেওয়া উচিত ছিল না। তবে যখন আমরা জাতীয় ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়াছি, তখন ভাল মন্দ বিচার করিয়া ফল কি? আমাদিগকে উভয়ই নিরপেক্ষভাবে লিখিয়া যাইতে হইবে। তবে সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিয়া রাখি, এ সকল স্বৈরাচার ভদ্রসম্প্রদায়ে কদাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

কথায় কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি; পাঠক, ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে পুনরায় মূল কথার অবতারণা করা যাউক। পূর্বে যে ভক্তিপূত নৃত্য-গীতের বর্ণনা কথিত হইয়াছে, সেই ভাবে চাক্‌মাদিগের আবাল বৃদ্ধ-বণিতা পান ভোজন ও বিরল বিশ্রামাবসর ভিন্ন অহর্নিশই কাটাইয়া থাকে। অনন্তর পর (বিষু) দিন প্রত্যুষে স্নানাদিতে শুচি হইয়া যথাসাধ্য দান-ধর্মানুষ্ঠানে ব্রতী হয়। অবস্থায় কুলাইলে এ সময়ে অনেকে "থামিংটং বা অন্নমেরু, টাঙ্গোনোৎসর্গ প্রভৃতিও করিয়া থাকে। এবং অনেকেই বিক্রয়ার্থে আনীত জীবিত মৎস্য ক্রয় করিয়া সমীপবর্তী পুষ্করিনীতে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে বেলা আট নয় ঘটিকা যাবত কাটাইয়া, অবশেষে পূর্বোক্তরূপ নৃত্য গীতের সহিত মহামুনি প্রদক্ষিণ এবং প্রণিপাতপূর্বক প্রায় সকলে বিদায় হয়। সেই দিন দ্বিপ্রহরের পর মেলাস্থলে চাক্‌মা বা অপরাপর পাহাড়ীকেও কদাচিৎ লক্ষিত হয়। কিন্তু মেলা আরও প্রায় ৭/৮ দিন থাকে। কোন কোন বৎসর ইহার পরেও কর্তৃপক্ষ হইতে ভাঙিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

বিষু সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া যাহা লিখিত হইল, তৎসমস্তই মহামুনি-সংপৃক্ত। তাহা ছাড়া বিষুপলক্ষে ইহাদের আরও কর্তব্য রহিয়াছে। এ দিন জীব হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অন্নগ্রহণেরও বিধি নাই। কেবলমাত্র—রাজার বেতসাগ্র ও বন্যশাক-গুল্মাদি সহযোগে 'পাচন' (শুক্তানি) খাইয়া দিনপাত করে। এতদ্ভিন্ন ভক্তিভরে 'ছাদং-ফারেক' (শাস্ত্রকথা) শ্রবণ এবং পরিপাটিরূপে 'বড়ী' 'ঠাকুর' প্রভৃতিকে খাওয়ান হয়।

বিশেষত যাহারা মেলায় যাইতে পারে না, তাহারা এই দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নদীতে গিয়া স্নান করে;এবং যাহারা নদীতে যাইতে পারে না, অন্যেরা নদীর জল আনিয়া তাহাদিগকে অবগাহন করায়! এই নিমিত্ত 'আদমে' হৈ চৈ পড়িয়া যায় — ছেলের দল এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বয়োবৃদ্ধগণকে স্নান করাইয়া থাকে। অনন্তর সকলে সর্বাঙ্গে চন্দন মাখে। বলা বাহুল্য, এইদিন অনেকে বাড়ীতে বসিয়াও অন্নমেরু, টাঙ্গোনোৎসর্গ প্রভৃতি দান ধর্ম্ম করে।

পূর্ণিমা ব্রত — বৌদ্ধভাষায় আষাঢ়ের পূর্ণিমাকে 'ওয়াছু' বলা হয়। এইদিন হইতে 'ওয়া' অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ব্রত আরম্ভ হইয়া থাকে। তাই 'ওয়াছু' বৌদ্ধ -সম্প্রদায়ের অতি পবিত্র দিন। শ্রবণের পূর্ণিমার নাম 'ওয়াখংলাব্রে'। কথিত আছে, এই তিথিতে ইন্দ্র পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া 'ছাদং' করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভাদ্রের পূর্ণিমাকে - 'তচুলং লাব্রে' ও আশ্বিনের পূর্ণিমাকে 'ওয়াগ্যালাব্রে" বলা হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত দিনে 'ওয়া' উঠিয়া যায়। এই কয় পূর্ণিমায় বিশেষতঃ 'ওয়াছু' এবং 'ওয়াগ্যাতে' ইহারা যথাসাধ্য ধর্মচর্যা অর্থাৎ রড়ী-ভোজন, দান দক্ষিণাদি উৎসর্গ এবং শাস্ত্রকথা শ্রবণ প্রভৃতি করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন 'মাঘী পূর্ণিমা' (তাবুং লাব্রে) কেও ইহারা পর্বাহ স্বরূপে গণনা করে। শাস্ত্রমতে এই দিন বুদ্ধদেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষেও উপরোক্ত ব্রতচর্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত অপরাপর সকলে বৈশাখ এবং কার্তিকের পূর্ণিমাতেও পবিত্রভাবে ব্রতাচরণ করে; কিন্তু চাক্‌মাদিগের মধ্যে তাৎকালিক অনুষ্ঠান ক্বচিৎ দেখা যায় মাত্র।

নবান্ন — ইহা মূলতঃ হিন্দু সমাজেরই পর্ব। নূতন ধান বাহির হইলে — সচরাচর কার্তিক মাসেই. ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক নবান্ন একটি পবিত্র এবং সমীচীন ব্যবস্থা। বৎসরের প্রথম লব্ধ — জীবন যাত্রা নির্বাহের সর্বপ্রধান উপকরণ সর্বাগ্রে দেবতাদির উদ্দেশে দিয়া গ্রহণ করা বস্তুতই মনোহর দেখায়। আমরা সচরাচর কোন প্রিয়দ্রব্য লাভ করিলে, প্রথমে তাহা আমরা যাহাকে অধিকতম ভালবাসি -- তাহাকেই দিতে অভিলষিত হই। নবান্নও তাদৃশ অনুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে চাক্‌মাগণ নূতন চাউল দ্বারা (ছাগল বলিসহ) 'চুঙুলং' অথবা (শূকর বলিতে) 'মা-লক্ষ্মীমা'র পূজা করিয়া থাকে। এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মদ্য মাংসাদিসহকারে নবান্ন সজ্জিত থালা অতি পবিত্র ভাবে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে এক ভিন্ন ঘরে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত স্থাপন করে। তাহাতে কোন কীট বা পতঙ্গ আকৃষ্ট হইলে তাহারা প্রেতাত্মার গ্রহণ সিদ্ধ মনে করিয়া লয়। অনন্তর সেই প্রসাদ নদীজলে বিসর্জন দিয়া আসে। এস্থলে ইহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, নবান্ন উপলক্ষে ভোজাড়ম্বর যথাসম্ভব অধিক হয়; এবং অপরিমিত সুরাপ্লাবনে অতিথি - অভ্যাগত ও প্রতিবেশিবর্গ পর্যন্ত ডুবিয়া রহে।

চুঙুলাং — এই সঙ্গে দেবী পরমেশ্বরীরও পূজা হইয়া থাকে। চাক্‌মাসমাজে ইহা একটি অতি পবিত্র ও অবশ্য অনুষ্ঠান। বিশেষতঃ চুঙুলাং না হইলে বিবাহ সিদ্ধই হয় না, স্ত্রী পুরুষের যে কেহ ইচ্ছা করিলে সেই বিবাহ ভঙ্গ করিতে পাবে। মঘেরা বিবাহ, সন্তানজন্ম, গৃহনির্মাণ

প্রভৃতিতে 'চুমুংলে' নামধেয় গৃহদেবতার পূজা করে; তাহা হইতেই চাক্‌মাদিগের 'চুঙুলাং' পূজার উদ্ভব সম্ভব। পরন্তু চাক্‌মাদিগের বিপদকালেও ইহা অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন সঙ্গতিপন্ন অনেকে প্রতি বৎসরেই ইহা করিয়া থাকে। ক্রিয়া পদ্ধতি যথা ঃ- পূর্বদিন বিধিমতে ওঝাকে নিমন্ত্রণ করা হইলে, সে স্বপ্নে ভাবী চুঙুলাঙের ফলাফল জানিতে পারে। পরদিন প্রাতে আসিয়া ওঝা দৈর্ঘ্যে সাতজোড়া ও প্রস্থে সাতজোড়া বাঁশের 'চ্যাচাড়ী' দ্বারা ছোট একখানি 'চাঙরী' প্রস্তুত করে। তাহার এক পার্শ্বে একটি পাতায় একখানি ক্ষুদ্র 'ছই' দেওয়া হয়। অন্য পার্শ্বে বাঁশের তিনখানি 'বাখারী' তেপায়া আকারে বসাইয়া তাহার মাথায় একটি পাতা জড়াইয়া দিয়া থাকে। ইহাদের সংস্কারমতে — এই ঘরখানি স্ত্রীলোকের এবং অপর 'ছই' খানি পুরুষের উদ্দেশে বিনির্মিত হয়। পুরুষকে প্রায়শঃ বিদেশাদিতে যাইতে হয়। সুতরাং স্ত্রী-পুত্রাদির নিমিত্ত তাৎকালিক খাদ্য সংস্থান মানসে 'ছই'য়ের নিম্নে একটি ডিম্ব রক্ষা করে। ইহা ছাড়া, দুইটি ক্ষুদ্র ঝুড়ির একটিতে চাউল ও অপরটিতে ধান্য পরিপূর্ণ করতঃ যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষের দিকে রাখে, এবং ঝুড়ি দুইটির পার্শ্বে দুইটি মদ্যপূর্ণ পাত্রও স্থাপিত হয়। অতঃপর ওঝার 'আগ্‌চাওয়া'[২১৬] হইয়া গেলে সচরাচর তিনটি কুক্কুট এবং বিবাহাদি কোন বিশেষ উপলক্ষ থাকিলে তৎসঙ্গে একটি শূকরও বলিদান করে। পরে মোরগের পদ, মস্তক ও হৃদ্‌পিন্ড, এবং শূকরের মস্তক, শোণিত এবং সম্মুখ ও পশ্চাতের বিপরীত ক্রমে দুই খানি পদ সিদ্ধ করিয়া অগ্রভাগে কদলী-পত্রোপরি রাখিয়া দেয়। তদনন্তর ক্রিয়াকর্তা সস্ত্রীক আসিয়া প্রণিপাত করে; এবং প্রাগুক্ত মদ্যপাত্রদ্বয় বিনিময় করিয়া থাকে। তখন দম্পতি পুনরায় 'দন্ডবৎ' করে ও ওঝা কৃতকর্মের ভাবী শুভাশুভ পরীক্ষা করিয়া দেখে। যেমন, মোরগের অঙ্গুলীগুলিতে অত্যধিক ফাঁক থাকিলে ক্রিয়াকর্ত্রী অমিতব্যয়িনী হয়। নখে হৃৎপিন্ড জড়াইয়া ধরিলে গৃহস্থের অমঙ্গল সূচনা করে। এইরূপে নানা পরীক্ষা আছে, অবশেষে চাউলগুলি ঢালিয়া আবার মাপিয়া দেখে। কথিত আছে, এই মাপে চাউল কম পড়িলে গৃহস্থি নিপাত এবং বেশী হইলে আয়ত্ত বৃদ্ধি হইবে। ন্যূনাধিক্য না ঘটিলেও বিশেষ অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে। তন্নিমিত্ত যথাবিধ লক্ষ্মীপূজা করিয়া কুক্কুট বলি প্রদান করে। চুঙ্গলাং অনুষ্ঠানকালে চতুর্দিকেসূত্র বেষ্টিত করা হয়। ব্রতসমাপনান্তে উক্ত সূত্র খন্ড খন্ড করিয়া ফারাক্ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক অনুষ্ঠানকারিগণের (পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীলোকেব বাম) হস্তপ্রকোষ্ঠে জড়াইয়া দেওয়া হয়। পরিশেষে ইহাও উল্লেখ প্রয়োজন, সাধারণ 'চঙুলাঙে' 'চাঙরী' প্রভৃতির আবশ্যক হয় না, কেবল একটা ডিম্ব, তিনটি মোরগ এবং চাউল, মদ্য ইত্যাদি ইত্যাদি হইলেই চলে।

(২১৬) 'আগ' পরীক্ষা, 'চাওয়া' দেখা। ওঝা দুইটি কাঁঠাল পাতা তদভাবে বাঁশপাতা দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীর মধ্যস্থলে রাখিয়া আচম্বিতে ভূতলে নিক্ষেপ করে। যদি পাতা দুইটিই চিৎ হইয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে 'হাসিতেছে।' অন্যথা দুইটিই উল্‌টিয়া পড়িলে বিরাগ ভাব সূচনা করে। কিন্তু ইহার কোনটিই সফলতাজ্ঞাপক নহে। দ্বিতীয় তৃতীয়বারেব পরীক্ষাতেও যদি পাত একটি চিৎ এবং আর একটি উপুড় করিয়া ফেলিতে না পারে, তাহা হইলে সেই পাতা দুইটি পরিবর্তন করিয়া লয়।

'মা-লক্ষ্মী-মা'।[২১৭] পূজা — এই পূজার ওঝা প্রথমে দুইটি পাতা পূজাস্থানে রাখিয়া তদুপরি একটি 'মারাই'[২১৮] প্রোথিত করে। পরে ক্রিয়া-কর্তা সস্ত্রীক সতন্তুলোদক — অর্ঘ্যদান পূর্বক প্রণিপাত করিলে 'আগ্‌চাওয়া' হয়। অনন্তর একটি মোরগ বলি দিয়া, তাহাকে পরিষ্কার করিয়া লয়, এবং একটি ঝুড়িতে পাতা পাতিয়া তদুপরি একখানি থালায় মাংসগুলি কিয়ৎকাল রাখিয়া দেয়। অবশেষে পুনরায় সতন্ডুলোদক অর্ঘ্যদানে 'সালাম' করিয়া মাংসে পরীক্ষা দেখে— যদি মোরগের অঙ্গুলিগুলি উপযুপরি থাকে, তবে বিপদ নিশ্চয়। আর যদি একপার্শ্বস্থ অঙ্গুলী তিনটির মধ্যে অপর পার্শ্বস্থ অঙ্গুলীটি আশ্রয় লয়, তাহা সৌভাগ্যের লক্ষণ।

'হোইয়া' বা 'কালাইয়া' পূজা — ইহা কালী পূজার প্রকার বিশেষ মাত্র। 'হোইয়া' দ্বিবিধ- 'পাঁচ পাতার' এবং 'সাত পাতার হোইয়া'। 'সাত পাতার হোইয়া'য় অতিরিক্ত কার্য কেবল 'হোইয়া সংস্থাপনের পূর্বে নিকটবর্তী খালে অন্তত একটি ছাগ বলিদান একান্ত প্রয়োজন। একটি সুদীর্ঘ বাঁশে কাপড় জড়াইয়া, তাহাতে 'পাঁচ পাতার হোইয়া'য় পাঁচখানি এবং 'সাত পাতার হোইয়া'য় সাতখানি (বাঁশের) মোটা 'বাখারী' আড়ভাবে থাক্ থাক্ করিয়া বাঁধিয়া দেয়;এবং প্রত্যেক 'বাতার' দুইপার্শ্বে দুইখানি করিয়া নূতন 'খাদী' ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। পরে গৃহসম্মুখীন প্রাঙ্গণে একখন্ড মোটা বাঁশ প্রোথিত করিয়া তন্মধ্যে একটি ডিম রাখে এবং তাহার উপর উক্ত সুসজ্জিত বাঁশ অর্থাৎ 'হোইয়া' সংস্থাপন করে। ইহার পাদমূলে একটি বেদী প্রস্তুত করা হয়; এই সঙ্গে আনুষঙ্গিক যত দেবতার পূজা করিতে হইবে, বেদীতে তত খানি 'মারাই' পুতিয়া যথানিয়মে পূজার্চনার পর শূকর, মোরগ ইত্যাদি বলি প্রদান করিয়া থাকে। এই মাংসে নিমন্ত্রিতগণকে খাওয়ান হইয়া গেলে, অপরাহ্নে ওঝা পূজাস্থানে দন্ডায়মান হইয়া গৃহাভিমুখে তন্ডুল বর্ষণ করিতে করিতে গৃহস্থকে 'রাজার বাটায় পান খাও' 'এক দানায় লক্ষ দানা (শস্য) পাও' 'লোকে তোমাকে নমস্কার করিয়া সম্মান করুক' প্রভৃতিরূপে আশীর্বাদ করিতে থাকে। অনন্তর সমাগত সকলে 'হোইয়া' কাঁধে লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী বাড়ী ফিরে, এবং প্রত্যাবর্তনের পর ওঝা 'ঘিলা কুঁচোর' জলে সংস্কার করিয়া পুনরায় পূর্বস্থানে স্থাপন করে। ইতি পূজা পদ্ধতি শেষ। পরদিন প্রাতে কাপড়গুলি খসাইয়া বাঁশটি নদীজলে ভাসাইয়া দেয়।

শিবপূজা—ইহাতে সাতটি মোরগ, একটি বড় শূকর, একটি শূকর শাবক এবং এক টাকার নানাবিধ ফলোপচার ও তৈল, ঘৃত ও মসল্লা ইত্যাদি প্রয়োজন। বাসগৃহের নিকটে ছোট একখানি 'দান ঘর' উঠাইয়া, তন্মধ্যে আবার ক্ষুদ্রতর একখানি গৃহ রচনা করে। ইহার নাম 'গোঁয়াই (গোঁসাই) ঘর"। তাহাতে একটি জলাধার অর্থাৎ ঘট স্থাপন করা হয়। রড়ী বৃহত্তর

(২১৭) লক্ষ্মী টংচঙ্গ্যাদিগেরও ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাহারা এই পূজায় একখানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করে। শিলাখন্ড বিশেষকে লক্ষ্মী কল্পনা করিয়া গৃহমধ্যে স্থাপন পূর্বক সপ্তগ্রন্থি বিশিষ্ট সাত গাছি সূতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া লয়। অনন্তর যথাবিধি পূজা করিয়া শূকর, মোরগ প্রভৃতি বলি দেয়। পরিশেষে সেই প্রসাদী মাংস সকলে আমোদের সহিত ভোজন করিয়া থাকে।

(২১৮) 'মাবাই'। — বাঁশের বাখারী চাঁছিয়া একপ্রান্তে ঝুঁটি করা হইলে 'মারাই' নামে অভিহিত হয়।

গৃহে বসিয়া পূজা সম্পাদন এবং পিষ্টক আহার করেন। পরদিন প্রাতে নিকটবর্তী মাঠে অন্নবেদী সংগঠিত করিয়া পুনর্বার পূজা ও 'আগর তারা' পাঠ হয়। পূজাকালে অন্নোপরি কীট পতঙ্গাদি পতিত হইলে, সাফল্য সূচিত হইয়া থাকে। অতঃপর প্রতিবেশিগণকে লইয়া বিরাট ভোজ চলে। খাওয়ার সময় বৃদ্ধগণ ব্যঞ্জনাদির আস্বাদ তুলনায় পূজার শুভাশুভ ফল বিচার করে।

নবগ্রহ পূজা — ইহা কথঞ্চিৎ হিন্দু-অনুকরণেই অনুষ্ঠিত হয়, তবে পূজাকার্য 'ঠাকুরগণ' দ্বারা নির্বাহিত হইয়া থাকে। পূজার ঘট এবং উপচারাদিও যথানিয়মে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, হিন্দুদৈবজ্ঞগনোপদিষ্ট গ্রহ-শান্তিই এই পূজার উদ্দেশ্য।

কেরপূজা[২১৯] 'জুম' কাটার পর অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুন মাসে এবং 'জুম' ক্ষেত্র শ্যামলাভায়, ভূষিত হইয়া উঠিলে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে — বৎসরে দুইবার এই পূজা করিবার নিয়ম। প্রতিবেশী সকলে মিলিয়া নদীকূলে পূজা করে। ইহাতে কুকুর পর্যন্ত বলি দেওয়া হয়। সৌভাগ্য সম্পদ লাভাশাতেও অনেকে 'কেরপূজা' করিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, এই পূজায় পূর্বতন রাজগণ নরবলি প্রদান করিতেন। অধুনা 'কেরপূজা' বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

সত্যপীরের সিন্নি — মুসলমান সমাজের অবতার বিশেষ[২২০] হইলেও সত্যপীর বহুদিন হইতে 'সত্যনারায়ণ' আখ্যায় হিন্দু সম্প্রদায়েরও পূজা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুগণ নারায়ণ ঠাকুরের এত রকমবেরকমের সাজসজ্জায়ও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া ফকিরী আলখাল্লা এবং 'নম্রমান দাড়ী-গোঁপ, গায় কাঁথা শিরে টোপ, হাতে আশা কাঁধে ঝোলা ঝুলি'[২২১] ইত্যাদিতে সাজাইয়াছেন। বস্তুতঃ হিন্দু ও মুসলমানগণ বহুকাল যাবত একত্র বাস নিবন্ধন এই শ্রেণীর মিশ্র দেবতার পূজা উভয় সমাজেই প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীন কবি ফকিররাম দাস উদার প্রাণে লিখিয়াছেন, —

"দেখ থাকে পুরাণ, কোরাণ থাকে দেখো।
জোই রাম রহিম দোনহি হোয়ে একো।"

(২১৯) 'ত্রিপুরা' দিগের মধ্যেও এই পূজা প্রচলিত আছে। পূজার সমসাময়িক কালে 'এক দিবা দুই রাত্রি (পার্বত্র) ত্রিপুরাবাসিগণকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এমন কি নৃপতিও গৃহের বাহির হইলে চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্তাই তাঁহার অর্থদন্ড করিয়া থাকেন।' (রাজমালা-উপঃ ২৮ পৃষ্ঠা)

(২২০) সত্যপীরের জীবনীবিষয়ক নানা জনশ্রুতি আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশের মতে — মনসুর হালক নামধেয় জনৈক বোগদাদ্ নগরবাসী সর্বদা 'আমি সত্য' 'আমি সত্য' বলিতেন। তাঁহার এই ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্যে, কতিপয় গোঁড়া ঈশ্বর-নিবাসী কর্তৃক অবশেষে তিনি নিহত হন। কিন্তু তখন তাঁহার রক্ত হইতেও সেই বাক্য উচ্চারিত হইতেছিল। এই কারণে তদীয় দেহ সম্পূর্ণরূপে ধংস করিবার মানসে সম্পূর্ণ জ্বালাইয়া ফেলা হয়। কিন্তু সেই চিতাভস্ম হইতেও ধবনি উত্থিত হইতেছিল, 'আমি সত্য' 'আমি সত্য' ইত্যাদি। কবি রামেশ্বর সত্যপীরের উর্দু বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহার দুই পংক্তি যথা ঃ-

"জওত সত্যপীর মেরা জওত সত্যপীর।
তেরা দুঃখ দূর করত ও হাম ফকীর।।"

(২২১) কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'সত্যপীরের কথা।'

ক্রমে ইহা চাক্‌মাসমাজেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শনি মঙ্গলবার কোন কোন স্থলে বা বারনির্বিশেষে পাঁচপোয়া চাউলের আটা, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, কলা প্রভৃতি উপচারের সহিত পূজা স্থাপন করা হয়। অনন্তর প্রতিবেশীগণ উপস্থিত হইলে সকলে সভক্তি প্রণিপাত করে এবং উপচার রাশি একত্রে মাখিয়া সিন্নি প্রস্তুত করিয়া থাকে ইহাই সত্যপীরের প্রসাদ — গ্রহণে যাবতীয় আপদ বিপদ দূরীভূত হয়। কোন বিশেষ কারণে প্রসাদ ভক্ষণে কাহারও নিষেধ থাকিলে, মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাখে।

ধর্মকাম — ইহার অন্য নাম 'জাদিপূজা'। বিজন অরণ্য-মধ্যে পূজার স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। নিদিষ্ট দিনে ভিন্ন ঘরে মুখবদ্ধ পূর্বক ভাত পাক করিয়া তথায় লইয়া যায়। বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্বে 'ঠাকুর' তদভাবে 'রড়ী' বা 'লোথক' 'আগর তারা' পাঠ করেন। অনন্তর পূজা স্থানে পাত্রোপরি একটি অন্নপিন্ডকে মোচাগ্র আকারে বসাইয়া সূচাগ্র ভাগে অপর একটি ক্ষুদ্রতম পিন্ড স্থাপন করা হয় এবং চারিপার্শ্বে কলা, ইক্ষু, বাতাসা, মিষ্টান্ন, ব্যঞ্জন এবং পিষ্টক প্রভৃতি নানা উপচাররাশি সাজাইয়া দিয়া থাকে। সংস্কার আছে, যদি কোনরূপে ক্ষুদ্রতর পিন্ডটিস্খলিত হয়, তাহা হইলে ক্রিয়াকর্তা নিশ্চয়ই অচিরে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে। সে যাহা হউক, পিন্ড সংস্থাপনের পর, বংশদন্ড যোগে ৩/৪ খানি বস্ত্র(২২২) তাহার চতুস্পার্শ্বে ধবজা দেওযা হয়। তখন সস্ত্রীক ক্রিয়া কর্তা ও নবাগত সকলে সভক্তি প্রণিপাত করিয়া উঠিলে, পুরোহিত (ভিক্ষু, রড়ী বা লোথক) 'দাসাপারামি তারা' পাঠ আরম্ভ করেন এবং ক্রিয়াকর্তা ও তৎপরিবাবস্থ সকলে চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই শাস্ত্র পাঠ প্রভাবে নাকি সেই অন্নপিন্ড হইতে বাষ্প নির্গমন আরম্ভ হয়। অতঃপর ১৪টিকুক্কুট, একটি শূকর এবং একটি শূকরী বলিপ্রদান করে। তাহার কিয়ৎ পরে দৈব প্রেরিত একটি ঊর্ণনাভ আসিয়া অন্নপিন্ডের চতুপার্শ্বে জাল বিস্তার করিয়া থাকে। এই মাকড়সা না আসিলে পূজাও সিদ্ধ হয় না। অপরতঃ যদি ঊর্ণনাভ পুরোহিতের পদাঙ্গুষ্ঠে সূতা জড়ায়, তবে তাঁহার আয়ুশেষ জানিবে। এইরূপে পূজা সমাপ্ত। পরে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া ঠাকুর, রড়ী ও লোথকদিগের ভোজন হইয়া গেলে প্রধান পুরোহিত 'সাহসফুলু তারা' পাঠ করতঃ ক্রিয়া সাঙ্গ করেন।

হাজার বাত্তি — ভাল কথায় সহস্র প্রদীপ। হিন্দুদিগের দীপান্বিতা ও এই 'হাজার বাতি'তে বহুল সাদৃশ্য আছে, দূর হইতে দেখিলে এক বলিয়াই মনে আসে বস্তুতঃ ক্রিয়াস্থলের গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণই বিচিত্র! বাঁশ ও বাখারী দ্বারা এমন কারুকার্য প্রকাশ করা হয় যে, দেখিলে বিস্ময় লাগে। এরূপে সরল অথচ সুন্দর বাস্তবিকই প্রশংসাব যোগ্য। চারিদিকে চারখানি সুগঠিত দ্বার। ভিতরে চারিকোণায় এবং মধ্যস্থলে মঞ্চসংবলিত পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুম্বুজ তথাযও প্রদীপ স্থাপনের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে। এতদ্ভিন্ন চতুস্পাশ্বতী বেষ্টনে কদলীবৃক্ষ এবং সারি সারি

---

(২২২) এই বস্ত্র প্রস্তুত প্রক্রিয়াও বিধিবদ্ধ আছে। একবার মাত্র বিবাহিতা স্ত্রীলোককে মুখবদ্ধ করিয়া ইহা নির্মাণ করিতে হয়।

বাতি সুসজ্জিত হয়। ধজাদন্ডেও বাতি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যাসমাগম মাত্রই ক্রিয়াস্থল উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। বাতি সংখ্যা কেবল হাজার নহে, সহজে গুণিয়া লইবার সাধ্য থাকে না।

সর্বপ্রথমে একখানি "টাঙ্গেন" উৎকৃষ্ট হয়। তদনন্তর অনুষ্ঠাতা সহধর্মিণী এবং নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনাদির সহিত সাতবার ক্রিয়াস্থল প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম দ্বার সমীপে পূর্বমুখী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের মাথায় 'খবং', আর পুরুষেরা গলবস্ত্র; পরন্তু সকলেই ভূমিতলে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। উৎসর্গকালে ক্রিয়াস্থল ও সমবেত সকলকে বেষ্টন করিয়া সাতগুণ সূতা দেওয়া হয়। ইহাদের বিশ্বাসমতে যাহারা এই সূত্রলহরীর বাহিরে থাকে, ক্রিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেও তাহারা কোন ফলভোগী হইবে না। পশ্চিমদ্বারের পার্শ্বে একটি গর্ত করিয়া জলপূর্ণ করতঃ ক্ষুদ্রতম সংস্করণে সরোবর গঠিত করে। "ঠাকুর" বা "রড়ী" তন্ত্রীরে দন্ডায়মান হইয়া সম্মুখে তালবৃন্ত ধারণ পূর্বক[২২৩] মন্ত্র ও "তারা" পাঠ আরম্ভ করেন। উৎসর্গ সম্পাদিত হইলে কর্তা এবং তদীয় গৃহিনী উক্ত সরোবরে যথাসাধ্য দক্ষিণা প্রক্ষেপ করে। তখন উপস্থিত অপরাপর সকলেও স্ব স্ব ভক্তি ও সামর্থানুরূপ দক্ষিণা তাহাতে দিয়া থাকে।

থামিং টং — বার্মিজ ভাষায় — "থামিং" অর্থ অন্ন, "টং" অর্থ পর্বত অর্থাৎ অন্নপর্বত কেহ কেহ ইহাকে বিশুদ্ধ বাংলাতে 'অন্নমেরু' ও বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ 'থামিং টং" নাম দেখিয়াই বুঝা যায় যে, ইহা ব্রহ্মবাসীদের হইতে অনুকৃত। হরিদ্রা মিশ্রিত অন্নদ্বারা চতুষ্কোণোকারে কেহ সপ্তস্তর কেহ বা পঞ্চস্তরে পর্বত সাজাইয়া সর্বোপরি একটি অন্নশৃঙ্গে স্থাপন করে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক কোণায়ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্নশৈল স্থাপিত হয়। এবং তৎসঙ্গে ঘৃত, চিনি, সিন্দুর, চন্দন, পান, সুপারি, পেপে, নারিকেল, প্রভৃতি নানা উপচার দিয়া থাকে। এই অন্নমেরু "ঠাকুর" এবং "রড়ীদিগকে" উৎসর্গ করা হয়, এবং সঙ্গে বিশিষ্ট ভোজও চলিয়া থাকে। কোন কোন পরিবারে এককালে দুইটি "থামিং টং" উৎসৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এক "থামিং টং" এর ভাতগুলিতে হলুদ মিশাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। পরন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দশ পনর দিনেও "থামিং টং" এর উৎসৃষ্ট অন্ন শৃগাল-কুকুরে পর্যন্ত স্পর্শ করে না। আশ্বিনের পূর্ণিমা অর্থাৎ 'ওয়াগ্যা'ই 'থামিং টং" উৎসর্গের প্রকৃষ্ট সময়। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু এবং বৈশাখ ও মাঘী পূর্ণিমায়ও ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

চক্রব্যূহ — ইহাও বৌদ্ধব্রত। বেড়াদ্বারা বিরাট ব্যূহ গঠিত হয়, তাহাতে দুইটি মাত্র দ্বার রাখা হয়। দর্শক প্রবেশ করিলে সহজে পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না; দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শুভদিনে বিশেষতঃ বৈশাখ, আষাঢ় বা আশ্বিনের পূর্ণিমায়

(২২৩) বৌদ্ধমতানুসারে যাহাতে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন না ঘটে, তজ্জন্য ভিক্ষু বা শ্রমণগণ সম্মুখে তালবৃন্ত ধরিবার রীতি প্রচলিত আছে।

"রড়ী" "ঠাকুর" প্রভৃতিকে দান-দক্ষিণাদি দিয়া এই ব্যূহ উৎসৃষ্ট হয়। এই সঙ্গে ছাদং—ফারেক শ্রবণ এবং ভোজাদিও চলিয়া থাকে। মধ্যস্থলে একখানি মঞ্চ করে, তাহাতে রড়ী প্রভৃতি উপবেশন করেন;আর সকলে ব্যূহভ্রবণ ছলে তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুণ্যোপার্জন করে। পরন্তু তাহাদের এই প্রদক্ষিণও অনেকটা "মহামুনি মন্দির" পদক্ষিণের ন্যায়। অপূর্ব কুইধবনি সহকারে বিভ্রমবিহ্বল নৃত্য আগন্তুকের পক্ষে অতিশয় আমোদপ্রদ। বিগত ২৪শে জানুয়ারী যখন "পূর্ববঙ্গ ও আসামে"র লেপ্টেনান্ট গভর্ণর বাহাদুর রাঙামাটিতে শুভাগমন করেন, তখন তিনিও এই দৃশ্য দেখিয়া অতীব বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

টাঙ্গোনোৎসর্গ — "টাঙ্গোন" অর্থ ধজা। টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় বলিয়াই ধজা নামান্তরে "টাঙ্গোন" আখ্যা পাইয়াছে। সোয়া কি দেড়হাত পরিমিত পরিসর বিশিষ্ট ১০/১২ হাত দীর্ঘ নূতন ধবলবস্ত্রে নানা ফুল 'লতা' কাটিয়া এক প্রান্তে বাঁশের 'চ্যাচাড়ী' নির্মিত ত্রিভুজাকৃতি একখানি "চ্যাঁজ" বদ্ধ করত অপর প্রান্ত একটি সুদীর্ঘ বাঁশে ঝুলাইয়া দেয়। কথিত আছে, এই ধজার বাতাসে যত ধূলিকণা স্থানান্তরিত হয়, প্রতিষ্ঠাতার তত বৎসর স্বর্গবাস ঘটে। পূজাস্পদগণের সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধে, বিষ্ণু, ওয়াছু প্রভৃতি পর্বে এবং পিন্ডোৎসর্গ, হাজার বাতি, থামিং টং, চক্রব্যূহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উক্ত 'টাঙ্গোন' উৎসর্গীকৃত হয়। উৎসর্গকালে 'রড়ী', 'ঠাকুর' প্রভৃতিকে পরিপাটি ভোজন এবং দক্ষিণা দান আবশ্যক। আবার একপ্রকারের "ফুল টাঙ্গোন" প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা যুবকদের ক্রীড়া বিশেষ মাত্র, ধর্মের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাতে কাপড়ের পরিবর্তে কেবলই পুষ্প মাল্য গ্রথিত হয়; দূর হইতে দেখিতে বড়ই মনোরম দেখায়।

এতদ্ভিন্ন গাভীদান ও 'পারঘাটার' শুল্কমুক্তি ইত্যাদিও ধর্মার্জন-মানসে অনুষ্ঠিত হয়। 'গাভীদান' শব্দেই অনুষ্ঠেয় কর্ম বিশ্লেষিত হইতেছে। শুভদিনে বা কোন ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে

গাভীদান ও ঘাটছাড়া

"ঠাকুর" কি "রড়ীকে" দক্ষিণাদির সহিত পয়স্বতী গাভী সম্প্রদান করা হয়। আর পাপমুক্তির কামনাতেই "ঘাটছাড়া" অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'পারঘাটা'র শুল্ক বিমুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অবশ্য তন্নিমিত্ত 'পাটনী'কে পূর্বে দাবী অনুরূপ প্রাপ্য দিয়া বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

এই সমুদয় ব্যতিরেকে চাক্‌মাসম্প্রদায়ে আরও অনেক ক্রিয়ানুষ্ঠান আছে, তৎসমুদয় পারিবারিক কার্যে বা রোগ কি বিপদমুক্তি কারণে করা হইয়া থাকে। ধর্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তৎসমস্ত এখানে উল্লিখিত হইল না, যথাস্থানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমাজ-বিধি এবং স্ত্রী-আচার

ধর্মের শাসন ছাড়াও সমাজের এমন কতকগুলি বাঁধাবাধি নিয়ম থাকে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সমাজরক্ষার নিমিত্ত যাহা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। তৎসমুদয়কে দশকর্মাদির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না বটে, তথাপি অবশ্য প্রতিপাল্য জ্ঞানে সকলকেই তত্তৎসমাজের বিধিব্যবস্থাগুলি অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া চলিতে হয়। যে সমাজে তাদৃশ বন্ধন নাই, তাহা কখনই সমাজ-পদবাচ্য হইতে পারে না। সেই সমুদয় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলে, সমাজ নিশ্চয় ধংসাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং সমাজের বিধিব্যবস্থাগুলির মস্তকে যাহারা পদাঘাত করিতে চাহে, তাহারা যে কেবল সমাজদ্রোহী তাহা নহে, সমস্ত জাতির অধঃপতনের মূলেও তাহারা ন্যায়তঃ দায়ী। আবার যে সকল ব্যক্তি সমাজ বিশেষের ব্যবস্থিত রীতিনীতির প্রতি সমালোচনার কশাঘাত প্রয়োগ করেন, পৃথিবীতে তাহাদের তুল্য অপর কোন নীচমনা জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ। স্বয়ং যাহা করিতেছি তাহাই সত্য, তদ্ভিন্ন সমুদয় মিথ্যা, ইত্যকার ধারণা মনে কখনই আসিতে দেওয়া উচিত নহে।

সাধারণ চাক্‌মাদিগের মধ্যেও যোড়হস্তে অভিবাদনের রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু তৎসঙ্গে তাহারা "সালাম" কথাটিও উচ্চারণ করিয়া থাকে। যতদূর বুঝা যায়, ইহা মুসলমান সংসর্গেরই অপ্রতিবিধেয় পরিণতি। এস্থলে চাক্‌মাসমাজের হুকা আদানপ্রদানে নমস্কারের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তজ্জন্যও মুসলমান সমাজের নিকট ঋণী বলিয়া বোধহয়। পরন্তু ইহাদের সম্বোধন মাধুর্যে হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ হইয়া থাকে। অপর বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত স্থলে ঠাকুর দাদা সম্বন্ধ বুঝাইতে আযু (আর্য্য), পিতৃব্য সম্পর্কে "খুরা" (খুড়া) বড় ভাই সম্পর্কে "ডাঙ্গু" (দাদা) বয়ঃকনিষ্ঠ যুবক 'গাভুর'[(২২৪)] এবং শিশুকে 'চিকর্ণ' (খোকা) বলিয়া আহ্বান করা হয়। বিশেষতঃ 'ডাঙ্গু' কথাটি এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত যে, বাঙ্গালীগণও ইহাদিগকে সাধারণ সম্বোধনে 'ডাঙ্গু' বলিয়া থাকে। এই সকল ছাড়া ইহাদের সমাজে অতিথি অভ্যাগত সেবা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘরে অভ্যাগত উপস্থিত হইবামাত্র প্রথমে পাদপ্রক্ষালনের উদ্যোগ হয়। তজ্জন্য 'সাঁকো' সন্নিধানে ইজরোপরি কলসী পূর্ণ জল এবং একটি ঘটী কি মেটে "কোত্তি" রক্ষিত থাকে। অতঃপর পান তামাকাদি এবং যদি বিশেষরূপে জানা থাকে যে আগন্তুক পানেও অভ্যস্ত, তাহা হইলে এই সঙ্গে নানাবিধ মদ্যও প্রদত্ত হয়। বিবাহাদি শুভকর্মের নিমন্ত্রণকালে — পান, সুপারি, লবঙ্গ প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়া থাকে। অধুনা কোন কোন স্থলে এ সকলের পরিবর্তে পরিবার প্রতি এক একটি পয়সা দ্বারা 'মানাইয়া' নিমন্ত্রণ করিতে দেখা যায়। নিমন্ত্রণে বংশ ও মর্যাদা বিশেষেই বসিবার স্থল নির্বাচিত

শিষ্টাচার

(২২৪) পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থলে অদ্যাপি "গাভুর" শব্দটি যুবক বা বলশালী, কোথায় বা মজুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হইয়া থাকে। অন্যপক্ষে সম্পর্কের সম্মানও গণনা করা হয়। সমশ্রেণীর দুই তিন জন মিলিয়া একত্রে আহার করিতেও ইহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। বিশেষতঃ 'চিকণ' গুলি বয়োজ্যেষ্ঠের সহিত খাইতে কোন আপত্তিই হইতে পারে না। অধিক কি, দম্পতির একত্র ভোজনও সাধারণ পরিবারে বিরল নহে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা প্রায় স্বামীর পূর্বে খায় না। তবে কিনা যখন তাহাদিগকে কার্যে বাহির হইতে হয়, অথচ স্বামী ঘরে থাকে না, তখন তাহারা বাধ্য হইয়া অভুক্ত স্বামীকে ফেলিয়া খায় বটে, কিন্তু পূর্বে স্বামীর নিমিত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া 'মোচা' (পুটুলী) বাঁধিয়া রাখে। ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রতি ইহাদের একটি বিশেষ সাবধানতা দেখা যায় যে, বিড়ালের মুখস্পর্শ ঘটিলে তাহা বিষবৎ পরিবর্জন করে।

ভোজন প্রথা

কেশ ভূষণে ইহারা নিতান্ত অসৌভাগ্য হইলেও চুলের প্রতি ইহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায়। অনেক পুরুষ বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবকেরা চুল রক্ষা করে[২২৫]; অবশ্য শিক্ষিতাগণ এই ব্যবস্থাধীন নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর সন্তান মাত্রেরই চুল ফেলিয়া দিবার বিধি আছে বটে, কিন্তু মৃতবৎসা নারীর স্বস্ত্যয়নাদি করিবার পর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার চুল একগুচ্ছ কোন দেবতার উদ্দেশে রাখিয়া দেওয়া হয়। পরে পুত্র বয়স্ক হইলে উদ্দিষ্ট দেবতার মানৎ দান করিয়া সেই চুল ফেলিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন পিতা মাতার মৃত্যুতে 'হাড় ভাসাইবার' পরে মস্তক মুন্ডনের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের মহিলাগণ চুল পেছন দিকেই আঁচড়ায়। সিঁতি কাটে না সত্য, কিন্তু পশ্চাদ্দিকে খোঁপা বাঁধিয়া থাকে এবং বালিকারা তাহা মনোহর বনফুলে সুভূষিত করে। বস্তুতঃ জানিনা কেন, সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েই কেশের প্রতি কামিনীদিগের আদর রহিয়াছে। চাক্‌মা সম্প্রদায়ে সুদীর্ঘ কেশ রাশি মন্ডিত কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই, চুল ভিজিবার ভয়ে ডুব দিয়া স্নান করে না; ছয় সাত দিন অন্তর সুবিধা মত সময়ে ক্ষারক ভস্ম বা লতা বিশেষের নির্যাস দ্বারা চুল পরিস্কার করিয়া লয়।

চুলে যত্ন

ইহাদের চুম্বন-প্রথায়ও অভিনবত্ব আছে। অধরে অধর মিশাইয়া শীৎকৃতির পরিবর্তে গন্ডস্থলে মুখ স্পর্শ করিয়া জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। ইহা কতক পরিমাণে আমাদের শিরোঘ্রানের অনুকৃতি হইবে।

চুম্বন বিধি

পার্বতীয় জাতির অনূঢ় যুবকগণ রাত্রিকালে প্রায়ই বাড়ীতে থাকে না; গ্রামের সকলে মিলিয়া "ক্যং" বা অপর কোন গৃহে রজনী যাপন করে। তাহাতে সেখানে তাহাদের যথেচ্ছ আমোদ-প্রমোদ করিবার সুবিধা ঘটে। তাহাদিগের মধ্যে একজন দলপতি থাকে; দলের সকলেই তদীয় আদেশ পালনে বাধ্য। পরন্তু দলভুক্ত দিগের চরিত্র রক্ষার নিমিত্তও তাহার দায়িত্ব থাকে, তজ্জন্য সে সকলেরই চরিত্রের উপর সুতীক্ষ্ন নজর রাখে। মিঃ হান্টারের লেখায় দেখা যায়,

(২২৫) পুরুষদিগের চুল রক্ষা পুরাকালেও বিরল ছিল না —
"পলায় রামের সৈন্য নাহি বাঁধে কেশ" -- কৃত্তিবাস।
"পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল" বিজয় গুপ্ত।

সাঁওতাল দিগের মধ্যেও এতাদৃশী ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ছোটনাগপুরের কোলদিগের বর্ণনাতেও কর্ণেল ডেল্টন লিখিয়া গিয়াছেন, "প্রতি গ্রামেই অবিবাহিত যুবকদিগের রাত্রিবাসের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র গৃহ থাকে। তাহার সম্মুখে বিস্তীর্ণ খোলা জায়গা রাখা হয়; সেখানে তাহারা নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকে। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ যুবকগণ কনিষ্ঠদিগের উপর আধিপত্য করে।" অত্রত্য টংচঙ্গ্যা অর্থাৎ দৈংনাক সম্প্রদায়েও ঈদৃশী প্রথা সাধারণ, কিন্তু চাক্‌মাদিগের মধ্য হইতে ইহা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। রাত্রিতে "আদমের" অবিবাহিত যুবকদল "ক্যং" বা কোন নির্দিষ্ট গৃহে থাকে বটে, কিন্তু কোন দলপতির ব্যবস্থা এক্ষণে আর নাই।

অনূঢ় সমিতি

Annals of Rural Bengal, P-217

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে স্বজাতীয় অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের অবাধ-মিলনে প্রায় কেহই হস্তক্ষেপ করে না। পিতা মাতা বা অপরাপর অভিভাবকগণ তাহাদের আমোদ-প্রমোদে বাধা দান অসঙ্গ ত মনে করে এবং তাহা 'গাভুর মিলার বিযুতি" অর্থাৎ যুবক যুবতীর আমোদ জ্ঞানে নিজেরা সরিয়া যায়। কোন কোন অভিভাবককে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি "বয়সের সময় আমোদ আহ্লাদ করিবে তাহাতে আপত্তি কি? কোন কোন কন্যার পিতা এবংবিধ সংমিলনে প্রশ্রয় দিয়া দুহিতার পাণিপ্রর্থী যুবকগণকে খাটাইয়া লয়। একবার জনৈক শিক্ষক কোন বালককে এরূপ অবৈধ সঙ্গমের নিমিত্ত শাস্তি দিয়াছিলেন। তাহাতে বালিকার অন্যতম অভিভাবক অতিশয় দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন "মাষ্টারবাবু, শুনিলাম আপনি নাকি— কে শাস্তি দিয়াছেন, কিন্তু দেখুন — সে এমন অন্যায় কাজ তো কিছুই করে নাই।" তখন শিক্ষক মহাশয় গতিক বুঝিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "কাজ অবশ্য অন্যায় না হইলেও তাহাদের বয়সোচিত হয় নাই।" সত্য বলিতে কি, এই শ্রেণীতে বিবাহের পূর্বে অনেক যুবতীরই এক বা ততোধিক প্রণয়ী থাকে এবং অধিকাংশ স্থলে এই ঘনিষ্ঠতা হইতেই বিবাহ ঘটিয়া যায়। কিন্তু বিবাহের পর আর কাহারও চরিত্র দোষ শুনা যায় না; এবং ইহাও বিশেষ প্রশংসার কথা, বিজাতীয়ের সহিত উপগতা চাক্‌মা রমণী এত বিরল যে নাই ধরিয়া লওয়া যায়। সহস্র প্রলোভনেও নাকি তাহারা বিজাতীয়ের প্রার্থনা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে, ইহাও কম প্রশংসনীয় নহে!

অবাধ মিলন

স্বজাতীয় হইয়াও যুবতীর অনিচ্ছা সত্বে যদি কেহ তাহাকে লইয়া পলায়ন করে, তবে সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের ৬০ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড হইতে পারে। এতদতিরিক্ত যুবতীর পিতৃগ্রামবাসী ছেলেদের হইতে 'উত্তম-মধ্যম' 'অর্দ্ধচন্দ্র' প্রভৃতি 'উপরি' লাভও আছে। আর কোন ব্যক্তি সম্মতি সহকারেও অন্যের বিবাহিতা পত্নী লইয়া পলায়ন করিলে, তাহাকে ৪০ টাকা হইতে ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং প্রণয়িনীর মূল্য স্বরূপ তৎ-স্বামীকে তাহার বিবাহকালীন যাবতীয় ব্যয় দিতে হয়; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়িনীর উপর খাস দখলের অধিকারও লাভ করে। জেঠী, খুড়ী প্রভৃতি কতিপয় নিকটতম সম্পর্কের মধ্যে, অবৈধ

ব্যভিচারে দন্ড

প্রণয় সংঘটিত এবং প্রকাশিত হইলে উভয়েরই ৫০ টাকা অর্থদন্ড ও শারীরিক শাস্তি বিহিত হয়। যদি চাক্‌মা রমণীর সহিত কোনও বিজাতীয় পুরুষের প্রণয়ের প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অপরাধী গ্রামের সকলকে একটি শূকর দিয়া পরিপাটিরূপে নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে বাধ্য হইয়া থাকে। নিমন্ত্রণের লোভে অনেকেই তাদৃশ ঘটনা আবিষ্কার করিতে সতর্ক দৃষ্টি রাখে; পক্ষান্তরে বিজাতীয় দুশ্চরিত্রগণও "শূকর দেওয়া" রূপ লজ্জাজনক শাস্তির ভয়ে তেমন পাপ কামনা মন হইতে দূর করে।

যে কোন অভিযোগ প্রথমে "হেডম্যান" সমীপে উপস্থিত হয়। তিনি স্বীয় ক্ষমতাতীত বিচারভার রাজাবাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজাও আবার আপন ক্ষমতা বহির্ভূত বুঝিলে তাহা সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুরের কাছে পাঠাইয়া থাকেন। সালিসী বিচারে যদি কোনও অভিযোগের প্রকৃত দোষী নির্ণয় দুরূহ হয়, তখন এক অভিনব প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। একসের পরিমিত চাউল পরিপূর্ণ একটি পাত্র "ক্যং" মধ্যে পবিত্র বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে একরাত্রি রাখিয়া দেয়। পরদিন অতি প্রত্যুষে সকলে সমবেত হইয়া সন্দেহযুক্ত অপরাধীকে সেই পাত্র হইতে একমুষ্টি চাউল চিবাইতে দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি নির্দ্দোষ হইলে ইহাতে তাহার কোন কষ্ট হয় না; কিন্তু যদি দোষী হয় — তবে যে সে কেবল চিবাইতে অসমর্থ হইবে এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে নাকি তাহার রক্তবমন আরম্ভ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রমাণিত অপরাধীর প্রতি শাস্তি-পরিমাণ গুরুতর হয়। দোষী অর্থদন্ড দিতে অসমর্থ হইলে প্রাচীন নিয়মানুযায়ী নিজের মজুরী হিসাবে নির্দ্ধারিত কালের নিমিত্ত বিচারকের দাসত্ব গ্রহণ করে।

বিচার

অবশ্য বিরল হইলেও বিবাহবন্ধনচ্ছেদ এই সমাজে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে। সাধারণতঃ ইহাদের পুরুষেরা কিঞ্চিৎ অধিকতর কামাতুর, সুতরাং তাহারাই সর্বংসহব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সহিষ্ণুতার মাত্রা অতিক্রম করিলে, ইহারা প্রণয়িনীর প্রতি শাস্তিবিধান করিতেও ছাড়ে না বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার গলিয়া যায়! ফল কথা, ভাষায় যাহাকে স্ত্রৈণত্ব বলে, ইহাদের সমীপে তাহা নিন্দনীয় নহে। তথাপি প্রায়শঃ মহিলাগণ কোন কারণে স্বামীর সহিত মনোমালিন্য ঘটিলে, অমনি তাহার সংসর্গ-বিমুক্তির নিমিত্ত হেড্‌ম্যান সমীপে প্রার্থনা উপস্থিত করে। এমন কি, স্বামী যদি মনোমত রসজ্ঞ না হয়, তন্নিমিত্ত কোন কোন ভামিনী স্বামীর উপর পুরুষত্বহীনতা আরোপ করিয়া বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ প্রার্থনা করে। হেড্‌ম্যান ঈদৃশ বিচারে গ্রামের দশ বয়োবৃদ্ধের সহিত পরামর্শ করিয়া নিষ্পত্তি করেন। বিচারকালে কোন কোন স্থলে তাহাদের দাম্পত্যপ্রণয়ের গভীরতাও পরীক্ষিত হয়। কাপ্তেন লুইন এবংবিধ রহস্যময় একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা — "একদা সন্ধ্যার সময় কয়েকজন পল্লীবাসিনীর সহিত কোন রমণী জল আনিতে নদীতে গিয়াছিল। এমন সময় তাহার স্বামী অপর যুবতীগণকে পরিচিত জনৈক যুবকের সহিত হাসি - তামাসা

দাম্পত্য বিচ্ছেদ (Divorce)

করিতে করিতে তৎপ্রতি জল ছিটিতে দেখিতে পায়। সে ইহাতে নিজ প্রণয়িনীরও চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়া তখনই সেই যুবককে নানা ভর্ৎসনা এবং সকলেরই সম্মুখে স্ত্রীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে। তাহাতে যুবতী অতিশয় মর্মাহতা, হইয়া এই স্বামী পরিত্যাগের নিমিত্ত হেড়ম্যানের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে। হেড়ম্যান ও গ্রামের অপর বৃদ্ধগণ প্রথমে নানারূপে তাহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। অবশেষে তাহারা পরামর্শ করিয়া সেই শীতকালে বিনা শয্যায় দম্পতিকে এক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রাতে আসিয়া দেখিলেন, যুবতী তথাপি বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের প্রার্থনা করিতেছে। তজ্জন্য তাঁহারা যুবতীকেই দোষী সাবস্ত করিয়া তাহার ৩০ টাকা অর্থদন্ড করতঃ বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ অনুমোদন করেন।"(২২৬) এইরূপে যাহার দোষে দাম্পত্য প্রণয় ছিন্ন হয়, তাহাকেই দন্ডভোগ করিতে হইয়া থাকে। পুরুষেরাও এ কার্যে প্রার্থী হয় না, এমন নহে;তবে সচরাচর খুব কম এবং তাহা সহজেই মীমাংসিত হইয়া যায়। হেড়ম্যান যে সমুদয় বিচার গুরুতর উপলব্ধি করেন;তৎসমস্ত রাজ-সরকারে পাঠাইয়া থাকেন। এখানে এই বিচারের নিমিত্ত একখানি ঘর আছে, তাহাতে দম্পতিকে নির্দিষ্ট কয়েক মাসের নিমিত্ত থাকিবার আদেশ হয়। হয়তঃ ইহাতেই পরস্পরে মিলিয়া যায়, অন্যথা যথাবিধি বিচার মীমাংসা হইয়া থাকে।

চাক্মাসমাজে অবরোধপ্রথা অনেক পরিমাণে শিথিল হইলেও ভাগিনেয় বধূ এবং ভাদ্রবধূ সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপে বিধি নিষিদ্ধ। বোধ হয় এই সমুদয় হিন্দু-সমাজেরই সংসর্গজাত ফল। কিন্তু আবার সন্দেহ হয় যে, ভাদ্রবধূকে স্পর্শ করা যখন প্রায় যাবতীয় পার্বত্য জাতির মধ্যেই বারিত রহিয়াছে, এমন কি — সর্ববাদিসম্মত আদিম বর্বর সাঁওতালদিগের ভিতরেও এই বিধি অতি সাবধানে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তখন ইহাতে হিন্দুসমাজের কতদূর দাবী আছে? আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহাদের মধ্যে মেয়েদের "পিঁধন"কাপড় পুরুষেরা পরত্পক্ষে ছোঁয় না।

স্পর্শনবিধি

বিবাহের পূর্বে ঋতুদর্শন ইহাদিগের মধ্যে নিন্দা বা লজ্জাকর নহে। তবে কিনা এই রজস্বলাকালে যতদিন "গায়ের পানি ভাঙে" অর্থাৎ রক্তস্রাব থাকে—সচরাচর তিনদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে অশুচি ধরা হয়। সাধারণ স্পর্শদোষ ধরা না হইলেও অপরের ঘরে কি ধর্মকর্মে যোগদান করিতে পারা যায় না এবং এই সময়ে প্রায় পরিবারে তাহাদিগকে পাক করিতেও দেওয়া হয় না।

'গায়ের পানিভাঙা'

(২২৬) এসম্বন্ধে খাসিয়াদিগের এক কৌতূহলোদ্দীপক ব্যবস্থা আছে। তাহাদের দাম্পত্য বিচ্ছেদের সময় উভয় পক্ষের আত্মীয় বান্ধবের উপস্থিত থাকা আবশ্যক। স্ত্রী স্বামীকে একটি পয়সা দেয়, স্বামী তাহা নিজ হইতে আর এক পয়সা সহ স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুনঃ দুই পয়সাই স্বামীকে প্রত্যর্পণ করে, সে উহা ফেলিয়া দেয়। তখন এক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে সমগ্র পল্লিতে তাহাদের দাম্পত্য বিচ্ছেদ সংবাদ— ঘোষণা করিয়া থাকে।

গর্ভিণী ইচ্ছামত খাইতে পায়, তাহার ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে সর্তক দৃষ্টি রাখা হয়। সন্তান ভূমিষ্ট হইলে পিতা এক ঝুড়ি শুষ্ক মৃত্তিকা আনিয়া প্রসূতির শয্যা-পার্শ্বে রাখে, এবং তদুপরি অগ্নি প্রজ্বলিত করে। পাঁচ দিনের মধ্যে এই অগ্নি নির্বাপিত হইতে দেয় না। অতঃপর মাটিও ফেলিয়া দেওয়া হয়। যদি প্রসবের সময় সবিশেষ কষ্ট হয়, একটি ছাগল প্রসূতির মাথা "নিছিয়া" নদীতে বলি প্রদত্ত হয়, ইহারই নাম গঙ্গাপূজা।

গঙ্গাপূজা

প্রসবের দিন হইতে ১৫ দিন যাবৎ প্রসূতি অশুচি থাকে। রজস্বলা কালের ন্যায় তাহারা এই কয়দিন সংসারের সমুদায় কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। পরন্তু কেবল প্রসূতি নহে, সন্তানের পিতাও এই পনর দিন এবং "ওঝা" (ধাত্রী) নবজাত সন্তানের নাভী স্খলিত হওয়া পর্যন্ত অশৌচ ভোগ করে। এই সময়ে তাহারা ক্যং ঘরে বা কাহারও পূজাগৃহে উঠিতে পারে না। অশৌচান্তে সকলে "ঘিলা-কুচোই-সোনারূপা'র জল দিয়া পবিত্র হয়। বলিতে ভুলিয়াছি, রজস্বলা কি প্রসবের অনধিক পরেই স্নানের ব্যবস্থা আছে[(২২৭)]। সচরাচর প্রসবের পরদিন প্রসূতি 'কানি বেনা'[(২২৮)] লইয়া নিকটবর্তী খালে স্নান করিতে যায়। সংস্কার আছে, খালে গিয়া স্নান না করিলে প্রসূতির স্তন্য হয় না। তদ্ভিন্ন প্রসূতির খাদ্য পানীয়ের প্রতি কোন বাধা ব্যতিক্রম থাকে না। কানীন সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা ঘটিলে, তৎপ্রসবের নিমিত্ত পৃথক "ছেলেফুটানী ঘর" আবশ্যক। কারণ সেই গৃহ আর কোনও কার্যে ব্যবহৃত হয় না। অবশ্য ব্যভিচারী ব্যক্তির স্কন্ধেই সেই ব্যয়ভার পড়িয়া থাকে।

জাতশৌচ ও প্রসবে ব্যবস্থা

সাপ্তাধিক শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত ইহাদিগের অশৌচ গ্রহণ বিধি। গোষ্ঠীর ভিতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মাত্রেই অশৌচ পালন করে। এই সময়ে ইহারা নিরামিষ ভোজন এবং বিলাস বাসনাদি ছাড়িয়া কাল কাটায়; পতি বিয়োগ-বিধুরাগণ কোন অলঙ্কারই ধারণ করে না। যুবতী বিধবাগণ স্বামীর অশৌচান্তে পুনরায় অলঙ্কার সজ্জা করে বটে; কিন্তু অনেকেই 'হাঁচুলী' (গলভূষণ) আয়তি চিহ্ন জ্ঞান করিয়া ধারণে বিমুখ হয়। বৃদ্ধা বিধবাদিগের কোন গহনাই থাকে না এবং পরিধানেও কেহ কেহ হিন্দু বিধবার ন্যায় থানের কাপড় ব্যবহার করে।

অশৌচ বিধি

ইতিপূর্বে আমরা 'ঘিলা কুচোইর পানি'র কথা নানা অনুষ্ঠান বর্ণনা প্রসঙ্গে বারম্বার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। অশুচিত্ব দূর করিবার ইহাই একমাত্র উপকরণ। ঘিলা ও কুঁচবাটা, জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সোনারূপা ধৌত জল এবং কিঞ্চিৎ মদ্যও প্রদান করা হয়। ইহাই 'ঘিলা কুচোইর পানি' আখ্যায় কথিত হইয়া থাকে। এই জলে দক্ষিণ জুলপি বা মস্তক বিধৌত করিলেই পবিত্রতা সাধিত হইয়া যায়। এইরূপে বিশুদ্ধ হওয়াকে 'বুরপার্‌ন' বলে। নদী তীরেই

---

(২২৭) চট্টগ্রামবাসীদিগের মধ্যেও ঈদৃশী প্রথা রহিয়াছে। তাহার ফলে প্রায় প্রতি গৃহেই সূতিকা-রাক্ষসী করাল জিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রসূতির রক্ত শোষণ করিতেছে। এইরূপে কত অবলা যে নিয়ত মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইতেছে, ভাবিলেও প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। কিন্তু হায়, দেশবাসীর দৃষ্টি তথাপি এই দিকে পড়িতেছে কই?

(২২৮) "কানি বেনা" - নেকড়ার দড়া। ইহার একপ্রান্ত অগ্নিসংযুক্ত করিয়া প্রসূতি সঙ্গে নেয়, নতুবা ভূতাদি হইতে ভয় পাইবার সম্ভাবনা আছে।

এইকার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অনুষ্ঠানানন্তর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পশ্চাদ্দিকে অবলোকন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বৎসরে অন্ততঃ একবার হইলেও প্রত্যেকের "বুর পারন" অর্থাৎ "মাথা ধোওয়া" অবশ্য কর্তব্য। তাহা হইলে আর কোন আপদ-বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। সচরাচর ইহা বৎসরের প্রথমেই করিয়া লওয়া হয়। পূর্বে এই উপলক্ষে চাক্‌মারাজ ১লা বৈশাখ ওঝা ও অপরাপর লোকজন সমভিব্যাহারে সপরিবারে নদী তীরে গমন করিতেন। ওঝা পূজান্তে ছাগ-মোরগাদি বলিদান করিলে উপরোক্তরূপে সকলেরই বিশুদ্ধি সম্পাদিত হইত। অনন্তর ওঝা কতিপয় প্রর্থনা বাক্য উচ্চারণ করিলে রাজা বাহাদুরও তৎসমুদয় সঙ্গে সঙ্গে পুনরুচ্চারিত করিতেন। পরিশেষে রাজা অতীত কার্যের জন্য এবং নবাগত বৎসরের নিমিত্ত সুবিধান প্রর্থনা করিতেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ আর সকলে দ্বিতীয় এবং অপর সমুদায় পরবর্তী যে কোনদিন নির্বাচনে স্ব স্ব পরিবারের 'বুর পারন' কার্য সম্পাদন করিত। আজ কয়েক বৎসর হইতে রাজা বাহাদুর প্রাগুক্ত বলির সহিত পূজা করেন না, ঐ দিনমাত্র ভগবানের নামাদি গ্রহণে অতি পবিত্র ভাবে কাটাইয়া থাকেন।

'বুর পারন!'

কাহাকেও ব্যাঘ্রে হত্যা করিলে জ্ঞাতির সকলেই তজ্জন্য অশুচি থাকে। তজ্জন্য যথানিয়মে বিশোধন ব্যবস্থা না করিলে এক বৎসরের মধ্যে সেই ব্যাঘ্র পুনরায় সগোত্রজ এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিহত করে। এই কারণে গোষ্ঠীর সকলে পরামর্শ করিয়া যথাসম্ভব সত্বরে এক দিন নির্দিষ্ট করে, এবং সেই দিন সকলে এক স্থানে বা নিতান্ত অসুবিধা জনক হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমবেত হইয়া নদী তটে এক খানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত পূর্বক ওঝা দ্বারা তাহাতে পূজা করায়। এই পূজা গৃহে অপর কাহারও অবস্থানাধিকার থাকে না। পূজায় সমাগত প্রত্যেক পরিবার এক একটি কুক্কুট এবং যে পরিবারের লোক নিহত হইয়াছে, তাহাদের হইতে একটি ছাগল বলিদান করা হয়। এ সময়ে 'বড় কৃরুক' এবং 'ছোট কৃরুক' 'তারা'ও পঠিত হইয়া থাকে। অনন্তর পূর্বোক্ত 'ঘিলাকুচোইর পানি'তে বলিজাত কিঞ্চিৎ রক্ত মিশ্রিত করিয়া আবালবৃদ্ধবণিতা সকলে তাহাতে দক্ষিণ জুল্‌পী ধৌত করে এবং পরিশেষে সেই কেশ ধৌত জলপূর্ণ পাত্র নদীতে ভাসাইয়া দেয়।

'মাথা ধোওয়া'

কাহারও গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইলে নদীতীরে 'বুরপরা পূজা' করিয়া সাতটি কুক্কুট এবং একটি ছাগল বলিদান করা হয়। পরে উক্তমরূপে সেই বলিজাত শোণিত 'ঘিলাকুচোইর পাণিতে' মিশাইয়া তদ্দ্বারা পরিবারের সকলে মানবিবেচনায় পর্যায়ক্রমে দক্ষিণ জুল্‌পী বিধৌত করে। অনন্তর ক্রিয়াকর্তা 'ওঝাকে' একটি টাকা, একখানি গামছা, একটি কুক্কুট, একবোতল মদ এবং একটি অঙ্গুরীয়ক দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়া সপরিবারে আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

বুরপরা পূজা

অর্ঘপ্রদানের নিমিত্ত ইহাদের সমাজে তণ্ডুলোদক ব্যবহৃত হয়। অতি সামান্য পরিমিত তণ্ডুলের সহিত সেই জল শান্তি প্রদানের জন্যও বর্ষিত হইয়া থাকে। আশীর্বাদ প্রদান করিবার সময়ে তণ্ডুল এবং বীজহীন কার্পাস তূলা নিষ্ঠীবন-সংপৃক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

অর্ঘ ও আশীর্বাদ

নবম পরিচ্ছেদ

(১) দশকর্ম—প্রাথমিক কর্তব্য ও বিবাহ ইত্যাদি

এবং

(২) অন্ত্যেষ্টি, হাড়ভাসান, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান

১

যদিও চাক্‌মাগণ এক সময়ে হিন্দুধর্মের অধিকারে ছিল, কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল সংঘর্ষণে দশাচারের অনেকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছে আবার বিভিন্ন ধর্মের সাহচর্যে দু' একটি অভিনব অনুষ্ঠানও এই সমাজে সংক্রামিত হইয়াছে। কর্ম সংখ্যা নিতান্ত বহুল না হইলেও অতিশয় বিশৃঙ্খল। এমন কি, সাধারণ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পার্থক্যের প্রকৃতি নির্দেশ করিলে স্থূলতঃ বলা যায়, সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ উন্নত সম্প্রদায় আপনাদের ক্রিয়াকর্মে যথাসাধ্যরূপে হিন্দুদিগের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন; সাধারণ দল এ যাবৎ ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ফলে তাহাদিগের মধ্যে নানা উচ্ছৃঙ্খলাচার প্রচলিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ সামাজিক ক্রিয়া-কর্মাদি যে প্রধান ভিত্তির উপর অনুষ্ঠিত হয়, যতদিন পর্যন্ত সেই ধর্ম সম্বন্ধে কোন এক মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা না যায়, ততদিন ইহাদের মধ্যে এক অভিন্ন-আচার চলিবার আশা নাই। বর্তমানে উন্নত সম্প্রদায়েরা সমাজের মধ্যে একটা 'সংস্কার' আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন, আর সাধারণ সকলের তাহা গ্রহণ করিয়া উঠিতে দিন চলিয়া যায়, ইহাই পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য-ভাবের একমাত্র কারণ। যাহা হউক এ স্থলে সাধারণ ভাবে উভয় সম্প্রদায়েরই কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা করা হইল।

দশকর্ম

প্রাথমিক কর্তব্য — পুত্র ভূমিষ্ট হইলে আত্মীয়-স্বজনকে ভোজপ্রদান এবং অবস্থাবিশেষে বাজী পোড়ান প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উৎসবও চলিয়া থাকে। কিন্তু দুহিতা লাভে এবম্বিধ অনুষ্ঠান বলিয়া ইহাদের কোনও ক্রিয়াবিশেষ নাই। অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন দৈবশক্তির উপর ভারার্পণ করিবার ব্যবস্থাও দেখা যায় না। পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধগণ স্নেহগর্ভ সংক্ষিপ্ত নাম নির্বাচিত করে; তাহাই শেষে 'ডাক নাম' হইয়া দাঁড়ায়। নিতান্ত বিকৃত শুনাইলেও তাদৃশ নামে সন্তানের প্রকৃতি উপলব্ধি হয়। যথা, 'কুর্য্যা' (কুঁড়ে) নামে বুঝা যায়—ছেলেটি বড়ই অলস এবং 'পিড়াভাঙা' নামধেয় ব্যক্তির ভারে যে কোনদিন 'পিড়া' (পিড়ি) ভাঙ্গিয়াছিল অর্থাৎ সে যে স্থূলকায়, সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। জন্মস্থান বিশেষেও নামকরণ হইয়া থাকে। যেমন 'বড়কলে' জন্ম হইলে পুত্র 'বড়কল্যা' এবং কন্যা 'বড়কলী' নামে আখ্যাত হয়। কালের কবলে অনেক পুত্র কন্যা হারাইয়া যদি পরিশেষে কোন সন্তান লাভ হয়, তাহা হইলে সেই সন্তানের জন্য অতি জঘন্য নাম নির্দেশ করা গিয়া থাকে। বিশ্বাস—তাদৃশ নামে যমেরও ঘৃণা হইবে! শেষে সন্তান বয়স্ক হইলে স্বীয় পছন্দানুরূপ বা

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন

গুরুগণ কর্তৃক একটা সভ্যভব্য নামে আখ্যাত হয়। অনেক স্থলে স্কুলে ভর্তি হইবার সময়ে শিক্ষকগণই শিশুদিগের বিকৃত নাম পরিবর্তন করিয়া লইয়া থাকেন। আবার পিতা মাতা কর্তৃক এমন নামসকলও নির্বাচিত হইতে দেখা যায়, যেন তাহাতে সন্তানের জীবন দীর্ঘ ও গৌরব সূচক হয়। এই আশায় প্রায় রামায়ণ এবং মহাভারতোক্ত নামই রাখা গিয়া থাকে। কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর নামেও অনেকে সন্তানের নামকরণ করে। তাহা অজামিলের ন্যায় ফাঁকতালে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কামনায় নহে; ইহারা আশা রাখে সন্তানকে তন্নামধেয় দেবতা অনুগ্রহ করিবেন। এইরূপে চাক্‌মা সমাজের প্রায় সমস্ত নামই হিন্দুসমাজানুমোদিত। অন্নপ্রাশনেরও কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই; সুতরাং তজ্জন্য অনুষ্ঠানবিশেরও প্রয়োজন হয় না। সন্তানেরা অনেক দিন ধরিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে থাকে। তিন বৎসরের শিশু তাহার কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীর সহিত স্তন্যপান করিতেছে এ হেন দৃশ্য বিরল নহে। পরন্তু ইহাদিগের এক প্রধান বিশেষত্ব যে, কোন রমণী অপর রমণীর গর্ভজাত শিশুকে স্বীয় দুগ্ধ প্রদান করে না; এমন কি শিশুর মাতা পীড়িত হইলেও নহে।

কর্ণবেধ — কর্ণবেধের প্রথা থাকিলেও ইহাদের সমাজে 'কর্ণবেধ' বলিয়া কোনও ক্রিয়া বিশেষ নাই। উচ্চ পরিবারে এই উপলক্ষে মাত্র আমোদ আহ্লাদাদি করা হয় তা'ছাড়া ধর্মার্থে কিছুই অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ সন্তান ছয় সাত বৎসরের হইলে সিজ বা অন্যধিক বন্যবৃক্ষের কন্টক দ্বারাই কান দুখানি ছিদ্র করিয়া লয়। পুরুষেরা দুই কানে দুইটি মাত্র ছিদ্র করে; কেহ কেহ তাহাতে রূপার আঙ্টি ধারণ করে। নতুবা ছিদ্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করেই না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের দুই কানে অন্যূন বার এবং বাম নাসিকায় একটি ছিদ্র করাই সাধারণ নিয়ম। বাস্তবিক অবলাগণ গহনা পরিধানের নিমিত্ত কিদৃশ নিষ্ঠুর রূপে ক্ষতবেদনা সহ্য করে! ইহা যে কেমন সখ, সহজ বুদ্ধিতে আসে না।

দীক্ষা — আট নয় বৎসরের সময় শুভদিনে সচরাচর বিষু ও বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন এবং মাঘের পূর্ণিমার বালকগণের 'চা-মণি' অর্থাৎ দীক্ষা হয়। 'ঠাকুর' (ভিক্ষু) তদভাবে 'রড়িগণ' (শ্রমণেরা) এই দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষা প্রার্থীগণ পূর্বাহ্নে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া যথাবিধি পবিত্রতা সাধন এবং কাষায়বস্ত্র পরিধান পূর্বক সপল্লব ঘট-দীপ-তন্ডুল ইত্যাদি সম্মুখে পশ্চিমাস্য হইয়া উপবেশন করে। অনন্তর সপ্তগুণ সূত্র দ্বারা এ সমুদায় বেষ্টন করতঃ তৎপ্রান্তদ্বয় হস্তে লইয়া 'দশশীল' আচরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অবশেষে ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত ও গুরুদক্ষিণা দান করিয়া শ্রমণ ব্রত গ্রহণ করে। কিন্তু ইহার কৃচ্ছ্রসাধ্যব্রত অধিকদিন পালনে অনেকেই পরাঙ্মুখ হয়; অধিকাংশ সকলে সাত দিন মাত্র আচরণেই যথেষ্ট মনে করে। আর যাহারা যাবজ্জীবন এই ব্রহ্মচর্য ব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, তাহারা প্রথমে 'রড়ী' এবং সিদ্ধ হইলে 'ঠাকুর' আখ্যা পায়। চাক্‌মা সমাজের প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, স্ত্রীলোকদিগের দীক্ষা ব্যবস্থা নাই।

যৌবনোন্মেষ — বালিকাগণ ত্রয়োদশ বৎসরে এবং বালকেরা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে যৌবনের অধিকারভুক্ত হয়। কেহ কেহ রোগ-জীর্ণতায় সবলের সহিত অগ্রসর হইতে পারে না। আবার অনেকে 'ইঁচড়েই পাকিয়া' যায়। সাধারণ শ্রেণীতে — কোন বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠে, তখন সে অনন্য নির্ভরতায় 'জুম' কর্তন করে। ইহাই সেই যৌবন প্রাপ্তির প্রধান নিদর্শন।[২২৯] পুত্রের যৌবনপ্রাপ্তিতে পিতামাতা প্রতিবেশী এবং অপরাপর আত্মীয় স্বজনাদি লইয়াই আমোদ-উৎসব করিতে বাধ্য।

বিবাহ — ইহাদের মধ্যে এমন কি যাবতীয় পার্বত্য জাতির মধ্যেই বাল্যবিবাহ বিরল প্রচলিত। পরন্তু কত বয়সে যে বিবাহ হইবে তাহাও নির্দিষ্ট নাই। কোন কোন ব্যক্তি আবার চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া যায়। বিবাহ হইলে ইহাদের 'বুড়া-বুড়ী' আখ্যা হয়। নতুবা বয়স যত অধিক হউক না কেন, 'গাভুর' (কুমার) ও 'মিলা' (কুমারী) — অভিধা থাকে। বিগত আদমসুমারীর বিবরণীতে দেখা যায়, চাক্‌মাদিগের মধ্যে —

শ্রেণী	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১০ বৎসরের	১০ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে ঊর্দ্ধ বৎসরের	মোট
পুরুষ	৪২৩৯	৫৫৭১	১৬১১	১৮৪৬	১২২৬	৬০	১৪৫৫৩
স্ত্রী	৪০৩৩	৪৯২৪	১৩১৫	৭৬৬	১২৯	৩৫	১১২০২

অবিবাহিত। চল্লিশোর্দ্ধ বয়সের এই ৬০ জন পুরুষ এবং ৩৫ জন স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হইবার আশা কোথায়? অপর ২০-৪০ বৎসরের যে সকল স্ত্রীলোক অদ্যাপি অবিবাহিতা, তাহাদের অনেকে চিরকুমারী থাকিবে। তবে অধিকাংশ পুরুষদের দার-পরিগ্রহ করিবার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে বিবাহিতের তালিকায় দেখা যায়, চাক্‌মাদিগের —

শ্রেণী,	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১০ বৎসরের	১০ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে ঊর্দ্ধ বৎসরের	মোট
পুরুষ	০	১১	১১	২৭৪	৬০১০	৪১১২	১০৪২৮
স্ত্রী	৫	১২	১৫২	১৪৪৩	৬৪৬৩	২২৩১	১০৩০৭

(২২৯) মঘ ও ত্রিপুরাগণের এই যৌবনত্ব প্রাপ্ত সন্তান 'গোয়ালীচেলা' আখ্যায় অভিহিত হয়। তখন হইতে তাহারা স্বগ্রামের কুমারীগণের সহিত মিলনে কোন বাধাবন্ধক নাই। পরন্তু অন্য গ্রামের কুমারীসহ মিলনে দুই টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

পত্নী-পতি লইয়া আছে। সুতরাং এই উভয় তালিকা তুলনা করিলে সহজেই পরিলক্ষিত হইবে যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সে পুরুষের এবং ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের অধিক পরিমাণে বিবাহ ঘটিয়া থাকে। পরন্তু পরবর্তী তালিকায় বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১০৪২৮ হইলে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিরূপে ১০৩০৭ জন মাত্র হইল, দেখিয়া সন্দেহ হয়। এই ১২১ জনকে মৃত-দারও বলিতে পারা যায় না; কেননা তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর মহাভারতীয় দ্রৌপদী বা আধুনিক তিবতীয় সম্প্রদায়ের মত ইহাদের সমাজে একত্রে বহু-স্বামী-গ্রহণ প্রথা (Polyandry) ও প্রচলিত নাই, অধিকন্তু বহু-স্ত্রী-গ্রহণ প্রথা (Polygamy) রহিয়াছে।[২৩০] তবে এইমাত্র অনুমান করা যায়, বর্জিত পত্নীক পুরুষগণকেও বিবাহিত সংখ্যায় গণনা করা হইয়াছে। অপর তালিকায় আছে, চাক্‌মাদিগের মধ্যে—

শ্রেণী	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১০ বৎসরের	১০ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে তদূর্দ্ধ বৎসরের	মোট
বিপত্নীক	০	২	০	৭	২১৫	৭২৫	৯৪৯
বিধবা	৩	১	১	১৩	১৬৫	১১৭২	১৩৫৫

অতএব মোট ২২৮৬৪ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৩৫৫ জন মাত্র অর্থাৎ এক ষোড়শাংশেরও ন্যূনসংখ্যক স্ত্রীলোককে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। তাহাতে আবার প্রৌঢ়া অর্থাৎ যাহাদের পুনর্বিবাহের সময় সম্পূর্ণরূপে অতীত হইয়া গিয়াছে, তেমন বিধবার সংখ্যা ১১৭২ জন। আর ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক মৃতদার অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অনেক কম। ইহাতে সহজে অনুভূত হয় যে, যুবতী বিধবাগণের প্রায়ই পুনর্বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু সেই বয়সের বিপত্নীকগণের কথা দূরে থাকুক চল্লিশোর্দ্ধ যে ৭২৫ জন মৃতদার পুরুষের সংবাদ পাওয়া গেল, জরাপীড়া বা সাংসারিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি বিশেষ অসুবিধায় না পড়িলে, তাহাদিগেরও অনেকে পত্নীবিরহিত হইয়া অধিক দিন থাকিবে না।

(২৩০) কিন্তু একসময়ে দুই পত্নীর অধিক কাহারও পরিদৃষ্ট হয় না, এমন কি তৎপ্রতি সাধারণের ঘৃণার আভাস পাওয়া যায়। তাহারা কথাতেই বলে—

"হিলে বিলে তিন জোগ,
মুসলমানের তিন মোগ।"

অর্থাৎ বিলাদিতে যেমন জোক যথেষ্ট, তেমনি মুসলমানের স্ত্রী অনেক। (মুসলমান বন্ধুগণ সঙ্কলয়িতাকে ক্ষমা করিবেন)।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পিতৃকুল লইয়া "গোষ্ঠী" এবং বাসস্থান ভেদে "গোছা" আখ্যাত হয়। সেই হেতু একই "গোছা"য় বিবাহের কোন বাধা নাই। অথচ "সগোষ্ঠীতে" বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলিয়াই সমাজের ব্যবস্থায় এত দিন এই বিধি নির্বিবাদে চলিয়া আসিয়াছে।

বিবাহে সম্বন্ধ বিচার

একমাত্র সেই দিন কুমার রমনীমোহনের বিবাহে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল; তিনি সগোষ্ঠী হইতেই পত্নীগ্রহণ করিয়াছেন। সমাজবন্ধন এই যে শিথিল হইল, এখন হইতে বোধ হয় ইহা অবাধে চলিবে। মামাত ভগ্নী, পিসতুত ভগ্নী প্রভৃতির পাণিগ্রহণও যথেষ্ট প্রচলিত বরং সেইগুলি যেন প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু ভাগিনেয়ী, বড়শালী প্রভৃতির সহিত বিবাহ কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। পরিত্যক্তা ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে দেবরেরাও বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য তাহারা বাধ্য নহে।

সচরাচর বিবাহ পঞ্চবিধ, যথা—অভিভাবকগণের প্রস্তাবানুসারে — (১) পাত্রী তুলিয়া আনিয়া ও (২) পাত্র তুলিয়া নিয়া বিবাহ, (৩) বড় বিবাহ, (৪) গৃহজামাতা আনয়ন এবং (৫) মনোমিলনে পরিণয়। এতন্মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণীর বিবাহই সমধিক প্রচলিত। বিশেষতঃ ধনবান্ সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভিন্ন "বড় বিবাহ" হয় না।

বিবাহের শ্রেণী বিভাগ

দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রকারের বিবাহকেও সমাজ ঘৃণার চক্ষে দেখে; এজন্য অবস্থা ভাল থাকিলে কেহই ইহাতে স্বীকৃত হয় না। এতদ্ভিন্ন বিধবা এবং পরিত্যক্তা মহিলাদিগের বিবাহতো আছেই। বিবাহের শ্রেণীবর্ণনায় বঙ্গের লেখকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর "প্রমোদ লহরী" নামক পুস্তকে নানা কৌতুকগর্ভ বিবাহের পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে তিনি, কোন্ পুস্তক অবলম্বনে জানি না, চাক্‌মাগণকে "খ্যয়ংথা" হইতে পৃথক করিয়া বিবাহের দুই বিভিন্ন পদ্ধতি চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার জানিতে ভুল হইয়াছে যে, চাক্‌মাগণ "খ্যয়ংথা" শ্রেণীর এক বিশেষ শাখা মাত্র। তদীয় "খিয়ংথ" বিবাহের বর্ণনা পাঠে বোধ হয় "খ্যয়ংথা" শ্রেণীর অন্যতম শাখা মঘবিবাহেরই চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহা সর্বাংশে যথাযথ না হইলেও, তিন যদুদ্দেশ্যে তুলিপাত করিয়াছেন, তাহার সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। তবে তিনি চাক্‌মাদিগের সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার আলোচনা না করিয়া পারি না। তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন, — "চাক্‌মাদিগের বিবাহ আরম্ভে আসুরিক এবং উপসংহারে পৈষ্টিক হইলেও মূলে সৌত্রিক বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।" কিন্তু ইহা খাঁটি আসুরিক নহে। প্রাগুক্ত প্রথম প্রকারের বিবাহে যদিও অসুরভাবের লক্ষণ আছে, তাহা ঠিক অসুরত্ব পরিজ্ঞাপক নহে। কারণ স্থল বিশেষে কন্যাকর্তা যে পণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহা বিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থ অভাবে পড়িয়া মাত্র, কোন লাভের উদ্দেশ্যে নহে। নতুবা অধিকাংশ বিবাহের মূলেই মনুবিহিত গান্ধর্ব-রাক্ষস প্রথা রহিয়াছে। এইরূপে তাঁহার বর্ণনার সহিত আরও দু'এক স্থলে অনৈক্য দেখা যায়, তাহা ছাড়িয়াই গেলাম।

(অভিভাবকগণের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ) ।পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে দেখিলে পিতামাতা অপরাপর নিকট আত্মীয়দিগের সহিত "তাইন্‌মাং" (পরামর্শ) করিয়া পাত্রী অনুসন্ধান করিতে থাকে। তাহাদের মনোমত কন্যার সমাচার পাইলে কোন কোন সময় পুত্রকেও প্রকারান্তরে তাহার মত জিজ্ঞাসা করা হয়। অনন্তর প্রস্তাবনার নিমিত্ত অভিপ্রেত কন্যার পিত্রালয়ে বরের

পিতার যাওয়া একান্ত অপরিহার্য। তদভাবে মূল অভিভাবককেই যাইতে হয়। প্রথম বারে — মদ, পান-সুপারি এবং কয়েকবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাওয়াই বিধি। পরন্তু কখনই কলা নিবে না; তাহাতে বিফল মনোরথ সর্ববাদী সম্মত। বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উঠাইতে অতিশয় সতর্কতা গ্রহণ করা গিয়া থাকে। পাত্রের পিতা বলে — 'তোমার ঘরের নিকট একটি মনোহর বৃক্ষ জন্মিয়াছে, আমি তাহার ছায়াতে একটি চারা রোপণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে চাহি'। ইহা হইতেই কন্যার পিতা মূল কথা বুঝিয়া লয়। যাতায়াতের সময় উভয় পক্ষই অতি সাবধানে শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখে। কেননা, সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত এমন অনেক বিবাহ কুলক্ষণ দ্বারা ভাঙিয়া গিয়াছে। যদি কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষকে মোরগ, জল বা দুগ্ধ লইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে যাইতে দেখা যায়, তবে লক্ষণ—শুভ। কিন্তু চিল কি শকুনি দেখা গেলে, অথবা কোন কাক যদি বাম পার্শ্বে বসিয়া ডাকিতে থাকে, তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যদি তাহারা পথে আসিতে কোনও জীব জন্তুর মৃতদেহ দেখিতে পায়, তবে আর পদৈকমাত্র অগ্রসর হয় না, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় আয়োজনও বন্ধ করিয়া দেয়। বৃদ্ধদিগের মুখে এমন বহু উদাহরণ শুনা যায় যে, এই সমস্ত শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি অবহেলা—পক্ষান্তরে প্রভূত অসুখের কারণ হইয়াছে। পথিমধ্যে এইরূপ শুভাশুভ দর্শন লইয়া ছোটনাগপুরের ওরাওন জাতির মধ্যেও বড় বেশী কঠোর বিধান আছে, তবে তাহারা কেবল কন্যাকর্তার বরদর্শনে গন্তব্য পথে মাত্র এই শুভাশুভ ফলের শাসন মানে। এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত, 'ছাদং' এর সময় অর্থাৎ আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমার মধ্যে বিবাহের কোনরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রস্তাবনা

দ্বিতীয়বারেও প্রথমবারের ন্যায় অধিকন্তু পিষ্টক, মোরগ প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া বরের পিতা পুনরায় উপস্থিত হয়। এ যাত্রায় উভয় পক্ষের সুবিধা অসুবিধা বিবেচিত হইয়া থাকে। এবং উপস্থিত পাত্রের সহিত সম্বন্ধ করিতে পাত্রীর পিতামাতার অভিমতও অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বারেও সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় না। অনন্তর তৃতীয় বারেও দ্বিতীয়বারানুরূপ 'তত্ত্ব' সামগ্রী লইয়া যায়, সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও থাকে। এবার পণ ধার্য করা হয়। সাধারণতঃ ৫০/৬০ তোলা রূপার গহনা এবং ১০০/১২০ টাকা পর্যন্ত কন্যার পণ নির্ধারিত হইয়া থাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারে কন্যাপণের(২৩১) প্রচলন নাই। এই সময়ে কন্যা তুলিয়া আনা হইবে; কি বরকে তুলিয়া নিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে, প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বর তুলিয়া নিয়া বিবাহে বরপক্ষীয়ের খরচ অবশ্য অল্প, কিন্তু ইহা খুব বিরল প্রচলিত। হিন্দু সমাজের কলঙ্ক কুলীন সম্প্রদায়ের মত যৌতুকের সামগ্রীতে গৃহপূর্ণ করিবার আকাঙ্খা ইহাদের সমাজে এযাবৎ হয় নাই। বর পাত্রীর পিত্রালয়ে গিয়া বিবাহ করিতে নিতান্ত লজ্জা ও অপমান মনে করে। পরন্তু ভাবী বৈবাহিকের রুধিরলোলুপ এমন কোন বরের পিতা

বন্দোবস্ত

(২৩১) আরও সুখের সংবাদ কুকিদিগের মধ্যে কন্যাপণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শুনা যায়, পূর্বে কোনও বালিকার বিবাহে পণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাতে বিবাহের অব্যবহিত পরেই দম্পতির মৃত্যু ঘটে। তদবধি এই সর্বনাশিনী প্রথা রহিত হইয়াছে।

চাক্‌মাজাতিতে দেখা যায় না এবং তাদৃশ বরবিক্রয়ের প্রথাও ইহাদের সমাজে প্রচলিত নাই। সে যাহা হউক, উপরোক্ত প্রস্তাবে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পাদিত হইলে, শুভদিন ধার্য করে। ফসলের কার্য হইতে অবসর কালই বিবাহের প্রশস্ত সময়; এই নিমিত্ত সচরাচর মাঘ ফাল্গুন মাসেই দিন নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ এই সময়ে হাতে টাকা পয়সারও অভাব হয় না। এবং সকলে কাজকর্ম হইতেও কিঞ্চিৎ অবসর পায়। এই রূপে কথাবার্তা সাব্যস্ত হইয়া গেলে কোন কোন বরের পিতা ভাবী পুত্রবধূকে উদ্বাহস্থিরতা জ্ঞাপক একটি অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়া আইসে। অবশেষে বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইলে বরপক্ষ কন্যার পিতার নিকট হইতে অচিরে উপস্থিত বিবাহের নিমিত্ত মদ্য প্রস্তুত করিবে কি না অনুমতি লইয়া যায়।

বিবাহের পূর্বদিন যে সকল বাদ্যকরেরা আসে, তাহাদের প্রথম বাদ্য হইতে বয়োবৃদ্ধগণ ভাবী পরিবারের শুভাশুভ গণনা করে। এই প্রথম বাদ্যকে 'খোলামাননি'[(২৩২)] বলা হয়। এতদ্ভিন্ন বরপক্ষীয় কোন স্ত্রীলোক কলাপাতায় পান এবং সুপারীর দুইটি 'পুটুলী' করিয়া একত্রে নদীতে ভাসাইয়া দিয়াও ইষ্টানিষ্ট পরীক্ষা দেখে। যদি 'পুটুলী' দুইটি মিলিত হইয়া ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে ভাবী দম্পতির প্রগাঢ় সদ্ভাব সূচিত হয়, অন্যথা 'পুটুলী' দুইটি বিপ্রকৃষ্ট হইয়া ভাসিলে পরস্পরের মধ্যে চিরজীবনই, মতভেদ ঘটিয়া থাকে। বিবাহ বরের বাড়ীতে হইবার কথা হইলে, তদনন্তর সেই মহিলা নদী হইতে এক কলসী জল লইয়া আইসে; পক্ষান্তরে কন্যাপক্ষ হইতে জল তোলান হয়। তদ্দ্বারা বিবাহের দিন বরকন্যাকে স্নান করাইয়া থাকে। অধিবাস দিবসে বরকন্যা উভয়পক্ষেরই গৃহসম্মুখীন দুইধারে সপল্লব মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়া থাকে।

অধিবাস দিনের কার্য

(১) পাত্রী তুলিয়া — আনিতে হইলে বিবাহের পূর্ব দিন, পথ যদি দূরবর্তী হয় তবে তাহারও পূর্বে অর্থাৎ যাহাতে বিবাহদিন প্রাতে পাত্রীকে লইয়া বরের বাড়ীতে উপনীত হইতে পারা যায় সেই হিসাবে, বরের পিতামাতা এবং অপরাপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা নানাবিধ বাদ্যাদি সমভিব্যাহারে কন্যা আনয়নের জন্য যাত্রা করে। তাহাদের সঙ্গে সগোত্রজা এক অনূঢ়া কিশোরী সুরঞ্জিত 'ফুলবারেং'[(২৩৩)] এর মধ্যে করিয়া পূর্বনির্দিষ্ট সমস্ত গহনা, দুই দুইখানি 'পিঁধন'[(২৩৪)] 'খাদী' চাদর, 'খবং' ও কুর্তা (তন্মধ্যে একটি ফুলবিহীন ও অন্যটি 'ফুলদার'; এই 'ফুলদার' কুর্তা বিশেষতঃ বিবাহেই ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা এ সময়ে গহনাগুলি বাঁধিয়া নিয়া থাকে) একখানি চিরুণী, এক বোতল নারিকেল তৈল লয়; এবং তৎসঙ্গে একটি মোরগ, ৭০০ সুপারী ও ৭০০ পানের বাড়া[(২৩৫)] উপঢৌকন যায়।

(২৩২) ইহাতে প্রাঙ্গণে একটি জায়গা করিয়া তাহাতে পান, সুপারি, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়া ঘট স্থাপিত করে; এই নিমিত্ত টাকাও একটি দিতে হয়।

(২৩৩) 'ফুলবারেং' চ্যাচাড়ী নির্মিত ঝুড়ি বিশেষ।

(২৩৪) 'পিঁধন' - স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র। বিস্তৃত পরিচয় পরে দেওয়া হইতেছে।

(২৩৫) পানের বাড়া -- এক এক খণ্ড পাতায় কিঞ্চিৎ পান এবং কিয়দংশ সুপারি মুড়িয়া মাত্র।

এদিকে কন্যাকর্তা বিবিধ ভোজ্যপকরণ আহরণ করিয়া থাকে এবং বরযাত্রিগণের নিমিত্ত প্রাঙ্গণে স্ত্রী ও পুরুষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৈঠক স্থান গঠিত হয়। তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়গণ স্বাগতসম্ভাষণাদি দ্বারা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া যথা নির্দিষ্ট স্থানে বসায়;

অভ্যর্থনা

তখন মদ, তামাক ইত্যাদি শিষ্টাচারোপহার অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে পাত্রীপক্ষীয় সকলে নানা মঙ্গলায়োজনের সহিত প্রথমে উপরোক্ত কিশোরীকে গৃহে তুলিয়া, পরে অন্যান্য বরযাত্রীগণকেও ঘরে লইয়া যায়। এই সঙ্গে দ্বারদেশে স্থাপিত মঙ্গল ঘট এবং প্রদীপাদিও উঠাইয়া আনা হয়। পরে গহনাদি যাবতীয় দ্রব্য কন্যার পিতামাতা বুঝিয়া লয়, এবং সকলে আহার করিয়া উঠিলে বরপক্ষীয়া মহিলাগণ সেই গহনা এবং পরিচ্ছদের এক প্রস্ত (Set) পাত্রীকে পরাইয়া দেয়।

অনন্তর সকলে নিদ্রা যায়, এবং পরদিন প্রত্যূষে ঘট প্রদীপাদি যথাস্থানে স্থাপন পূর্বক অপরাপর শুভানুষ্ঠানের সহিত পিতামাতা দুহিতারত্নকে বিদায় দান করে। এই সময়ে 'সাঁকো'র

কন্যাযাত্রী

পথ বন্ধ করিয়া সপ্তগুণ সূত্র টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। বরপক্ষীয়েরা পাত্রী বাহির করিয়া আনিতে কন্যার মাতা সূতাখানি ছিঁড়িয়া দেয়, ইহাতেই তাহাদের সহিত কন্যার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়[(২৩৬)]! যাহা হউক; কন্যার সমভিব্যাহারে তাহার পিতা কি পিতামাতা উভয়েই গিয়া থাকে। বরের বাড়ীতেও নানা মঙ্গলায়োজনের সহিত পাত্রী তুলিয়া লইবার প্রথা আছে। এই বিবাহদিন প্রাতেই 'চুভুলাং' পূজা হইয়া থাকে।

রাত্রে (কোন কোন পরিবারে গণৎকার নির্ধারিত লগ্নে) বর-কন্যাকে উপযুক্ত বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া শয়নকক্ষে বিবাহবেদী-উপরি উপবেশন করায়। স্ত্রী স্বামীর বামপার্শ্বে স্থান

উদ্বাহ ক্রিয়া

পাইয়া থাকে। অতঃপর বরের কোনও আত্মীয় এবং আত্মীয়া বরকন্যার প্রতিনিধিত্ব ভার গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে তাহাদের পশ্চাতে বসে। ইহাদিগকে 'ছাঁয়লা' এবং 'ছাঁয়লী' বলা হয়। ইহারা একখানি শুভ্র নববস্ত্র লইয়া উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করে, 'জোড়গাঁট বাঁধিবার হুকুম আছে ত?' সকলে বলিয়া উঠে — 'আছে' 'আছে' 'আছে'। সম্মতি পাইবা মাত্রই 'ছাঁয়লা-ছাঁয়লী' উক্ত বস্ত্রের দ্বারা দম্পতিকে বদ্ধ করে। তখন তাহারা পরস্পরকে 'বদাগুল্যা ভাত' অর্থাৎ সিদ্ধ ডিম মিশ্রিত অন্ন এবং কলা, গুড় ও পান ইত্যাদি খাওয়ায়, ফলে মুখস্পর্শ করাইয়া থাকে। স্ত্রী দক্ষিণ হস্তে স্বামী মুখে এবং স্বামী বাম হস্ত দ্বারা প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করতঃ মুখমধ্যে উল্লিখিত ভক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্য এই কার্যেও 'ছাঁয়লা-ছাঁয়লীর বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেননা, উপস্থিত সাধারণের[(২৩৭)] সম্মুখে নবদম্পতির

---

(২৩৬) ত্রিপুরাদিগের মধ্যেও ঈদৃশী প্রথা আছে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ। পাত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার সময় তাহার ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূ (বাহই) দ্বারে একটি মূলী বাঁশ আড করিয়া ধরে; বরপক্ষীয়েরা তাহা ভাঙ্গিয়া কন্যা লইয়া আসে।

(২৩৭) এস্থলে 'সাধারণ' বলিতে স্বজাতীয় বুঝিতে হইবে। প্রত্যুত ইহাদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথার কঠোরতা না থাকিলেও স্বজাতি ভিন্ন অপর কাহাকেও বিবাহ দেখিতে দেয় না; এমন কি বিজাতীয় বন্ধু ও বন্ধুর বিবাহ দেখিতে ভাগ্যবান নহে।

ব্রীড়া নিপীড়িত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড়ই থাকে। তখন তাহারা স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে সমর্থ নহে; প্রতি কার্যেই অন্যদীয় সহায়তা অপেক্ষা করে। ইহা আর খুলিয়া প্রকাশের চেষ্টা বৃথা, বিবাহিত পাঠকপাঠিকাগণ সহজেই বক্তব্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। খাওয়ানের বিনিময়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সমাগত বয়োবৃদ্ধগণ, নবীন দম্পতির মস্তকে শুভাশীষবাক্যের সহিত নদীজল বর্ষণ করে। ইহাই স্বস্তি বাচন—পক্ষান্তরে কর্মের সাফল্য ঘোষণা। অনন্তর দম্পতি আচম্বিতে উঠিয়া পড়ে। এতন্মধ্যে যদি নবোঢ়া পূর্বে উঠে, তবে সে সর্বদা স্বামীর অপরিমেয় ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া সংস্কারের আশ্বাস আছে। পরে স্বামী স্ত্রী দুই পৃথক স্থানে নিদ্রায় রাত্রি কাটায়।

পরদিন অতি প্রত্যূষে দম্পতি গাত্রোত্থান করিয়া জনৈক 'ওঝার' সহিত নদীকূলে যায়;এবং তথায় দুইটি মোরগের রুধির 'ঘিলা' ও 'কুঁচ' বাঁটা, কিঞ্চিৎ মদ্য ও সোনারূপার জলে 'মাথা ধুইয়া শুদ্ধ' হয়। ইহাকে বিবাহের 'বুরপারণ' বলে। অতঃপর চারিদিকের লোক ঘুম হইতে না উঠিতেই তাহারা বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে। পরিশেষে আহারাদির পর আত্মীয় স্বজাতি সমাগত স্ত্রী পুরুষ সকলে (অবশ্য দুই ভিন্ন দলে) সভা করিয়া বসে। তখন নবদম্পতি তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিতে উপনীত হয়; এবং যথোচিত অভিবাদন পুরঃসর পূজনীয়বর্গের নিকট হইতে নিষ্ঠীবনপৃক্ত-সতন্তুল-তুলা শুভনির্মাল্য স্বরূপ লাভ করে। এই সঙ্গে দম্পতির কিছু আর্থিক লাভও ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ এ সময়ে কন্যার পিতা নবজামাতাকে সম্বোধন পূর্বক বলিয়া দেন, — (স্বীয় কন্যাকে জামাতার হস্তার্পিত করিয়া) ইহাকে গ্রহণ কর। আমি বড় সাধ করিয়া ইহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। এ নিতান্ত বালিকা, গৃহকর্ম কিছুই জানে না। যদি কোন সময়ে তুমি কর্মস্থল হইতে আসিয়া দেখ যে, ভাত পুড়িয়া ফেলিয়াছে, অথবা তদ্রূপ অপর কোন দোষ করিয়াছে, তবে তাহাকে শিক্ষা দিও, প্রহার করিও না। এরূপে তিন বৎসর চলিয়া গেলেও যদি অনিষ্ট করিতে থাকে, তাহা হইলে প্রহার করিতে পার, তজ্জন্য আমি অসন্তুষ্ট হইব না। কিন্তু একবারে প্রাণে মারিয়া ফেলিলে, আমি তোমা হইতে প্রাণের মূল্য দাবী করিব। অনন্তর কন্যাপক্ষীয় সকলে এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনদিগেরও প্রায় অনেকে বিবাহ বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

শুদ্ধিবিধি

বিদায় সভা

জামাতার প্রতি উপদেশ

বিবাহের দুই তিন দিন পরে বর নানাবিধ মদ্য এবং পিষ্টকাদির সহিত নবোঢ়াসমাভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন করে এবং তথায় দুই চারি দিন অবস্থানের পর সস্ত্রীক চলিয়া আইসে। ইহারই নাম বিবাহের 'ছুইঁদ ভাঙ্গান' অর্থাৎ ইহাতেই বিবাহজনিত অপবিত্রতা (?) নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, ইহা না হইলে নবদম্পতির একত্র বাসও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে, এবং তাহারা অপর কাহারও মঞ্চেও উঠিতে পারে না। চাক্‌মাসমাজের ইহা অতিশয় উল্লেখযোগ্য সংস্কার। পরন্তু সেই বৎসরেরই বিষুব সংক্রান্তিতেও নববিবাহিত যুবককে সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ী বেড়াইয়া যাইতে হয়। বাস্তবিক বিবাহের পর ইহারা যেন পক্ষিদম্পতি, অথবা অনেকটা পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ের মত। সতত উভয়ে একত্রে থাকিতে

বিবাহের ছুইঁদ ভাঙান

চেষ্টা পায়। বিশেষতঃ প্রথম বৎসর পরস্পরের পাশ ছাড়া হওয়া কোন রূপেই বিধিসঙ্গত নহে।

২। বর তুলিয়া — নিয়া বিবাহ এবং উপরি বর্ণিত বিবাহ-পদ্ধতিতে বিশেষ কোন তারতম্য নাই; কেবল বরগৃহের কার্যগুলিও কন্যার পিত্রালয়ে হইয়া থাকে মাত্র। ইহাতে বরযাত্রীদিগের সহিত বরও গিয়া থাকে। তাহারা যাহাতে বিবাহ দিন প্রাতে পাত্রীর পিত্রালয়ে উপস্থিত হইতে পারে, সেই হিসাবে যাত্রা করে। বলা বাহুল্য, 'বর তুলিয়া বিবাহে' "বিবাহের ছুইঁদ ভাঙ্গাইবার" প্রয়োজন হয় না।

বড় বিবাহ—রাজপরিবার এবং সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরিবার ভিন্ন অপর সাধারণে এ বিবাহের অধিকারী নহে। ইহা একপক্ষে যেমন ব্যয়সাধ্য পক্ষান্তরে তেমনি বংশমর্যাদাসাপেক্ষ। বিবাহের আনুষঙ্গিক অপরাপর কার্য—পাত্রী তুলিয়া আনিয়া বিবাহেরই অনুরূপ। তবে সেই সঙ্গে আড়ম্বাদির ত কথাই নাই। অধিকন্তু তিন খানি অতিরিক্ত গৃহ নির্মিত হয়। তাহার এক ঘরে বরপক্ষ, আর এক ঘরে কন্যাপক্ষ থাকেন। অপর গৃহখানি 'ফুল-ঘর' নামেই আখ্যাত;তাহাতে নবদম্পতিকে যথাবিধি বসাইয়া 'ঠাকুর' (ভিক্ষু) 'জয়মঙ্গলসূত্র' রূপান্তরে 'সিগলমোগলতারা' শুনাইয়া থাকেন। পূর্বকালে সাধারণ বিবাহেও এই 'তারা' (শাস্ত্রগ্রন্থ) পঠিত হইত;এক্ষণে প্রায় অন্তর্হিত। এই 'বড় বিবাহে'ও নবদম্পতিকে 'ছুঁইদ ভাঙাইয়া' আসিতে হয়।

গৃহ জামাতা — যাহারা নিতান্ত সম্বলহীন এবং যাহাদের পরিবারে অপর কেহ নাই, তাহারা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া শ্বশুরেরই ব্যয়ে বিবাহ করিয়া থাকে। পাত্র তুলিয়া নিয়া বিবাহের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। গৃহ জামাতা হইলেও আজীবন শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান অধুনা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। অনেকেই আপনাকে স্বশক্তিতে পরিবারচালনক্ষম বুঝিলে স্ত্রীকে লইয়া সরিয়া পড়ে। যাহা হউক, বর্তমানে এই শ্রেণীর বিবাহ কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুসমাজ হইতেও ইহা বহুপরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নতুবা কুলীন পরিবার যেরূপ ভারগ্রস্থ হইয়া উঠিতেছিল, এতদিন উহা সেইভাবে প্রবল থাকিলে সম্ভবত এতদিনে হিন্দুসমাজ বিধবস্ত হইয়া যাইত!

মনোমিলনে বিবাহ — ত্রিপুরাসমাজে এই বিবাহ 'হিক্নানানী' আখ্যায় প্রথিত। প্রাচীনকালে হিন্দু সম্প্রদায়ে যে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশের 'কোর্টসিপ' (Courtship) এবং ব্রাহ্ম সমাজের মনোমিলন পদ্ধতিতে তাহার কিঞ্চিৎ গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে দম্পতি পরস্পরকে 'ত্বং' মে পতি — 'ত্বং মে ভার্যা' ইত্যাকার জ্ঞানে গ্রহণ করিলে 'গান্ধর্ব বিবাহ' সম্পাদিত হইয়া যায়। ফলতঃ এইরূপ পবিণয় অতি আদিম প্রথা অনেক দিন হইতে ইহা লইয়া নীতি শাস্ত্রবিদসমাজে গভীর গবেষণা চলিতেছে এযাবৎ তাহার কোন প্রকৃষ্ট মীমাংসা স্থিরীকৃত হয় নাই। সত্য বটে স্ত্রী পুরুষের অদ্বিতীয়া সঙ্গিনী। সুখে-দুঃখে-সম্পদে-বিপদে এ হেন সমভাগী আর কেহই নহে। গৃহসুখ, এমন কি সাংসারিক যাবতীয় সুখ-শান্তি তাহারই উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে পতিই অবলার অনন্যগতি! প্রাণের সামান্য বেদনাটি জানাইতেও

এ জগতে স্বামী ভিন্ন তেমন আর কেহ নাই। তবে ভাবী জীবনের সুখশান্তির অনন্যপন্থা স্বয়ং নির্বাচন করিয়া লওয়া কি সমীচীন ব্যবস্থা নহে? কিন্তু তাহারা বিচারকের কিরূপ উপযুক্ত, ইহাই আগে চিন্তা করিবার বিষয়। নীতিজ্ঞ পন্ডিতেরা বলিয়াছেন, যৌবনরূপ বনে প্রবেশ করিলে মনুষ্যের প্রকৃতি বন্য জন্তুর প্রায় হয়। বিশেষতঃ অপরিপক্ক বুদ্ধির সহিত রূপজ মোহ মিলিত হইলে কি যে ভীষণ হলাহল উদগীরণ করে, তাহা স্মরণ করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সুতরাং মদনায়ুধ-বিভ্রান্ত যুবক যুবতীতে যে সম্মিলন সংগঠিত হয়, তাহা সকল

যৌবন ও যুবক-যুবতী

সময়ে সুফলপ্রসূ হইবার ভরসা কোথায়? আবেগ ফুরাইলে, উত্তেজনা দমিত হইলে, পরস্পরের চিত্তপার্থক্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর আরম্ভ হয় এবং তাহারই ফলে — 'কোর্টসিপের' পরিণামে 'ডাইভোর্স' (Divorce) এবং মনোমালিণ্যের বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি ঘটিতে থাকে। তাদৃশী দুরবস্থার তাড়নাতেই বোধহয় হিন্দুসমাজ হইতে স্বয়ম্বর প্রথা রহিত হইয়াছে। অধুনা চাক্‌মাগণও ইহা ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে ইহা একরূপ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু সাধারণ সমাজে মনোমিলনে সম্বন্ধ যত অধিক, অভিভাবকদিগের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ তাহার অর্ধেকও নহে। এই বিবাহকে মনুর ভাষায় 'গান্ধর্ব-রাক্ষস' শ্রেণীভুক্ত করা যায়; ইহার সহিত পাশ্চাত্য সমাজের স্পেনীয় ও ফরাসীয় বিবাহ ব্যবস্থার গাঢ়তর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইহাদের সমাজে অনূঢ় এবং অনূঢ়াদলের সম্মিলন প্রায় অব্যাহত। যুবক-যুবতীর মধ্যে সেই সুযোগে প্রণয়াশক্তি জন্মিলে, কিম্বা 'মহামুনি' মেলায়

প্রণয়ে পলায়ন

সূচিত পূর্বরাগে মনোমিলন হইয়া গেলে, তাহারা উভয়ে একযোগে পলাইয়া যায়। এদিকে পিতামাতা যখন জানিতে পায় যে, তাহাদের পুত্র বা কন্যা অমুকের কন্যা বা পুত্রের সঙ্গে পলাইয়াছে, তখন কন্যার পিতা আসিয়া হেড্‌ম্যান সমীপে যুবকের নামে অভিযোগ জানায়। উপায়াভাবে যুবকের পিতামাতাও যুবতীর পিতামাতার নিকট তাহাদিগের পরিণয়ে সম্মতি প্রার্থনা করে। অবশেষে যুবক-যুবতী স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে

সম্মতিতে বিবাহ

হেড্‌ম্যানের কাছে বিচার উপস্থিত হয়। যদি যুবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বেই বলপ্রয়োগ দ্বারা লইয়া গিয়াছে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেই দুর্মতি যুবকের ৬০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। অন্যথা পরস্পরের স্বীকৃতি পাইলে বিচারে কিছু অর্থের দ্বারা কন্যার পিতামাতাকে সম্মত করিয়া তাহাদের যথাবিধি বিবাহ হইয়া যায়। কোন কারণে অভিভাবকদিগের সম্মতি পাওয়া না গেলে, তথাচ যদি যুবক যুবতীর সঙ্কল্প প্রবল থাকে, তাহারা পুনরায় পলায়ন করে। এইরূপে চারিবার পর্যন্ত পলাইতে পারিলে কন্যার পিতা আর কুলমর্যাদাহানির দাবি করিতে পারে না। এবং সেই অচ্ছেদ্যপ্রণয়ী পণ হইতে মুক্তি পায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দ্বিতীয়বার পলায়নের পর আর কেহই তাহাদের বিবাহে বাধা দেয় না। এই বিবাহে 'চুঙুলাং' পূজা এবং নূতন কুটুম্বগণকে লইয়া এক পরিপাটি ভোজ ভিন্ন অপরাপর আনুষঙ্গিক কার্য না করিলেও চলে হয়ও না।

কোন কোন সময় এবংবিধ সম্মিলনে ভগ্নমনোরথ হইয়া ভীষণ করুণান্তক অভিনয় ঘটে; তখন ইহা চিরজীবনের তরে অসুখের কারণ হইয়া থাকে!

হতাশ প্রণয়

কাপ্তেন লুইন স্বীয় পুস্তকে* এরূপ একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে তাহারই মর্মানুবাদ তুলিয়া দেওয়া সঙ্গতবোধ করিতেছি ঃ—

*The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, P. 72-73

"ভূপিয়া নামে জনৈক যুবক সন্যামূলা নাম্নী বালিকার সহিত প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। ইতি পূর্বেই সন্যামূলা মাতৃহারা হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুরাধন সস্ত্রীক ভিন্ন গ্রামে বসতি করিত। সন্যামূলার অপর ভ্রাতা হীরাধনও বৃদ্ধপিতার সহিত জুমের সময় 'মইনঘরে' বাস করিতেছিল।

একটি চিত্র

ভূপিয়া তাহাকে বিশেষ ভালবাসিত; কোনরূপেই তাহার পাশ ছাড়া হইতে চাহিত না। জুমকার্যের সহায়তা প্রভৃতি ব্যপদেশে সে সর্বদাই তাহাদের পরিবারের ভিতর থাকিতে প্রয়াস পাইত এবং প্রায় প্রতিদিনই তাহাদের বাড়ীতে আহার ও 'গুদীতে' শয়ন করিত। কিন্তু সে এত দরিদ্র ছিল যে, সন্যামূলার অভিভাবকদের সহিত প্রস্তাবক্রমে বিবাহ করিবার সাহস পায় নাই। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া তাহাদিগের প্রণয়ের আদান প্রাদান চলিতে থাকে। অবশেষে উভয়ে একযোগে পলায়ন করিল। ঘটনার অবশিষ্ট কথাগুলি হীরধনের মুখেই প্রকাশ করা যাইতেছে। — 'গত শুক্রবার আমি যখন কার্যস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হই, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, — 'তোর ভগ্নী কোথায়? অনেকক্ষণ হইল সে জল আনিতে গেল, কিন্তু অদ্যাপি ফিরে নাই। অকর্মণ্য ভূপিয়া আমাদের এখানে নিরন্তর ঘুরিত। আমার সন্দেহ হইতেছে, বুঝিবা সন্যামূলা তাহারই সঙ্গে পলাইয়া গেল!' এই কথায় আমি আরও দুই তিন জন যুবককে সঙ্গে লইয়া ভগিনীর উদ্দেশে বাহির হইলাম। এক ক্ষুদ্র সরিত্তীরে তাহাদের সহিত দেখা হইল। ভূপিয়া অগ্রে;সন্যামূলা তাহার হস্তধারণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। এই দৃশ্যে আমি ক্রোধান্ধ হইয়া হস্তস্থিত দা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতেই সে একপার্শ্বে লাফাইয়া পড়িল এবং সেই আঘাত আমার ভগ্নীর উপর পড়িয়া তাহার পার্শ্বদেশ কাটিয়া ফেলিল। হায়! তৎক্ষণাৎ সেও 'ভাই' বলিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল! আমি ভয়ে পলাইয়া গেলাম। যদিও আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানিতাম না যে, তাহাদের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছে। কেননা, প্রেম-সমস্যা অনুসন্ধান আমাদের জাতীয় প্রথা নহে। যদি ভূপিয়া আমাদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত করিত এবং নিয়মিত পণ দিতে পারিত, তাহা হইলে আমরা বন্ধুবান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকেই বিবাহ দিতাম। কিন্তু সে 'বিবাহের উপযোগী ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে না বলিয়া তাহা করে নাই। অগত্যা সন্যামূলাকে লইয়া পলাইয়াছিল।" ইত্যাদি।

হায়রে, উদ্দাম প্রণয়ের পরিণাম! ইহাছাড়া এইরূপই প্রায়শঃ ঘটে যে, কোন রমণী একজনকে পূর্বে বিশেষরূপ আশ্বাস দিয়াছিল, শেষে ঘটনাচক্রে অপরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যায়। ইহাতে সেই হতাশপ্রণয়ী জীবনের মমতা তুচ্ছ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইহলোক হইতে সরাইতে সচেষ্ট হয়। বৎসরে এদেশের দুই চারিটি হত্যা এই নিমিত্তই ঘটিয়া থাকে।

বিধবা এবং পরিত্যক্তা রমণীদের বিবাহে — বিশেষ কোনও আমোদ-উৎসবাদি হয় না, কেবল স্বগ্রামবাসী সকলকে একটি ভোজ দেওয়া গিয়া থাকে মাত্র। পূর্বপতির ঔরসজাত সন্তানাদি অধিকাংশস্থলে তাহাদের পিত্রালয়েই থাকে, আর নিতান্ত অপোগণ্ড হইলে যদি মাকে ছাড়া থাকিতে না চাহে, তাহা হইলে পরবর্তী স্বামীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে দান করিয়া না গেলে কেহই বৈপিত্রিক সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না।

গর্ভাধানাদি ইহাদের সমাজে নাই। পুংসবন্ সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ প্রভৃতি গর্ভিনীসংস্কার-গুলিও এই সমাজে কোন কালে ছিল কি না, কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু এই সকল পরিবর্তে প্রসূতিদিগের মঙ্গলার্থ প্রসবের পূর্বে ও পরে 'গাংশালা'[(২৩৮)] ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। গর্ভের সপ্তম মাসে অথবা প্রসবের পর শুভদিন নির্দেশ করিয়া, পূর্বদিন যথা নিয়মে 'ওঝা' নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিকটবর্তী নদীজলে — জলপৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিদুপরিভাগে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করে। অনন্তর বাড়ীতে আসিয়া একটি হাঁড়িতে একটা আস্ত সুপারী স্থাপন পূর্বক উহার মুখ 'খাদী' দ্বারা আবৃত করিয়া লয়। পরে সুদীর্ঘ সূতার একপ্রান্ত সেই 'হাঁড়ির' গলায় সাতপাক জড়ায় এবং হাঁড়িটি সাতবার গর্ভিনীর বা প্রসূতির মস্তক 'নিছিয়া' যথাসম্ভব সোজাসুজি পথে সেই 'গাংশালা'য় লইয়া আসে। কিন্তু সূতাখানি এত লম্বা থাকে যে, তাহার এক প্রান্ত সেই 'হাঁড়ি'তে আবদ্ধ রহিলেও অপর প্রান্ত 'পোয়াতি'র আবাস গৃহে থাকে। ব্রতকার্যে প্রথমে 'আগ্ চাওয়া' হইয়া গেলে পূজা ও বলিদান প্রভৃতি ক্রমে সম্পাদিত হয়। অনন্তর 'ওঝা' সূতা ধরিয়া অগ্রসর হয়; এবং প্রসূতির ও স্বামী সেই 'হাঁড়ি' ও বলিদ মোরগ লইয়া অনুসরণ করিতে থাকে। 'হাঁড়ি' টিগৃহে আনিয়া তুলিয়া রাখিবার পর, প্রাঙ্গণে একটি শূকর বলি দেওয়া হয়। ইহার নাম 'আগিদা'। পরিশেষে সাধ্যমতে আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশিগণকে ভোজদানের ব্যবস্থা আছে।

গাংশালা ব্রত

২

অন্ত্যেষ্টি — মৃত্যুর পরে স্নানাদি করাইয়া শবকে নববস্ত্র পরিধান করায়; এবং 'সিঙ্গাপা'য় তিনটি বংশবোঝা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি শয্যা রচনা পূর্বক উহাকে তাহাতে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া রাখে। অনন্তর শবের শিরোদেশে ও পদপ্রান্তে দুইটি অন্নপিণ্ড এবং বক্ষোপরি কতক খই ও একটি টাকা রাখার পর রড়ী 'মালেম তারা' পাঠ আরম্ভ করেন। রাজা বা গণ্যমান্য লোকের মৃত্যুতে 'আরেন্তামা তারা'ও পঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে 'ঢুল' (ঢাল) বাদ্য চলে, এবং শবরক্ষক যুবকগণ এই 'ঢুল' বাজাইয়া রাত্রি যাপন করে। অন্ত্যেষ্টির আয়োজন এবং আত্মীয় স্বজনের আগমন পর্যন্ত শব এইরূপে থাকে। পরে সুবিধানুরূপ দিনে চরম সংস্কারের নিমিত্ত সকলে প্রস্তুত হয়। "বুধবার — লক্ষ্মীবার"; সুতরাং

শবসংস্কার

(২৩৮) "গাং" - নদী, "শালা" - গৃহ নদীতে গৃহ প্রস্তুত করিয়া যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে "গাংশালা ব্রত" বলে।

সেইদিন মৃতসৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাহা ছাড়া অনেক পরিবারে শুক্রবারেও অন্ত্যেষ্টি স্থগিত থাকে। কিন্তু শব যতদিন গৃহে থাকে, ততদিন বাড়ীতে উনুন জ্বলে না। তাহারা সকলে নিকটবর্তী আত্মীয় বা 'আদমের' অপর কাহারও গৃহে একে একে আহার করিয়া আসে।

নির্দিষ্ট দিনে সৎকারের যথাবিধি আয়োজন হইলে পূর্ব স্থাপিত অন্নপিণ্ডদ্বয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবার শবের মুখস্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দেয়;এবং তৎস্থলে পুনরায় দুইটি সদ্যপক্ব অন্নপিণ্ড স্থাপন করে। অনন্তর শবের পাদকনিষ্ঠাঙ্গুলিতে সপ্তলহর সূত্রের এক প্রান্ত বদ্ধ করিয়া অপর প্রান্তে একটি মোরগশাবকের অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া দেয়;মৃতব্যক্তির পরিবারস্থ সকলে সেই মোরগশাবক ধরিয়া থাকে। তখন 'আদমের' জনৈক বয়োবৃদ্ধ সূত্রের নিম্নে একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া 'তাগল' (দা) হস্তে সমাগত আর সকলকে জিজ্ঞাসা করে, — 'মরা হইতে জীবিতদের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হুকুম আছে কি না? তাহারা যুগপৎ 'আছে' 'আছে' বলিয়া উঠিলে, মধ্যস্থলে একই ঘা'য়ে মৃত-জীবিতের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপর 'আনিজা তারা' পাঠ আরম্ভ হয়, এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতেই সকলে শবকে শ্মশানভূমিতে লইয়া চলে। সচরাচর স্রোতস্বতী-তীরেই শ্মশান নির্বাচিত হইয়া থাকে। তথায় আনয়নের পর শেষোক্ত অন্নপিণ্ড দুইটি হইতে সাতবার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শবের মুখস্পর্শ করাইয়া পরিত্যাগ করে।

সম্বন্ধচ্ছেদ

পূর্ণবয়স্কের মৃত্যুতেও সমর্থ হইলে শ্মশানে রথ টানিবার আয়োজন করা হয়। এই রথ নির্মাণেও আবার ইতরবিশেষ ব্যবস্থা আছে। রাজপরিবারে বা তদ্ঘনিষ্ঠ কেহ মরিলে 'পঞ্চরত্ন' রথ প্রস্তুত হয়, অপর সাধারণের মৃত্যুতে একটিমাত্র শৃঙ্গ থাকে। একটি কাষ্ঠমঞ্জুষায় নানা সুগন্ধ দ্রব্যাদির সহিত শব রাখিয়া, সেই শবাধার রথোপরি স্থাপন করে। অতঃপর উপস্থিত সকলে সমান দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিপরীতাভিমুখে টানিতে থাকে। তাহাদের একপক্ষকে 'স্বর্গের দূত', অপর পক্ষকে 'নরকের দূত' কল্পনা করা

রথটানা



হয়। বলা বাহুল্য, তাহাদিগের হার জিতের দ্বারা মৃতব্যক্তির পরলোকের স্থান পরীক্ষিত হইয়া থাকে। পরন্তু এই আখ্যা নির্বাচনে এমনি চতুরী থাকে, প্রায়শই 'স্বর্গীয় দূতের' জয় হয়। পূর্বে এই রথ টানিবার নিমিত্ত বিবাহিত এবং অবিবাহিতদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। বর্তমানে বিবাহিতের সংখ্যা অধিক হইয়া যাওয়াতে 'গোছা' ভেদে অথবা নদীর বিপরীত তীরবাসীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে। বলিয়া রাখা ভাল, এই সময়ে বাদ্য, বাজীপোড়ান প্রভৃতিও একান্ত প্রয়োজন।

শবদাহ

শব সচরাচর দাহ করিয়া বিনষ্ট করা হয়। কিন্তু অনুদগতদন্ত শিশুশব ভূপ্রোথিত করাই সাধারণ বিধি। যদি কেহ তাদৃশ শবকেও পোড়াইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে মুখে কড়ি স্পর্শ করাইয়া জ্বালাইতে পারে। অপর বসন্ত বিসূচিকাদি সংক্রামক রোগে মৃতদেহ প্রথমে ভূগর্ভে পুতিয়া রাখে অনন্তর দুই তিন মাস পর সেই শব তুলিয়া যথানিয়মে জ্বালাইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এ সকল ছোঁয়াচে রোগের শব সদ্য জ্বালাইলে, তথাবিধ রোগে হুতাশন প্রায় গ্রাম উৎসন্ন করিবে। ইহাদের শবদগ্ধ করিবার নিমিত্ত চুল্লীর প্রয়োজন হয় না। দুই পার্শ্বে দুইটি মোটা গুঁড়ি স্থাপন করিয়া তদুপরি পুরুষের নিমিত্ত পাঁচ তবক এবং স্ত্রীলোকের সাত তবক সরু কাষ্ঠ সাজাইয়া লয়।[২৩৯] মধ্যে মধ্যে আম্রপ্রশাখাও দেওয়ার নিয়ম আছে, ধনশালী মহাশয়েরা তৎপরিবর্তে চন্দনকাষ্ঠ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া এই চিতার উপরিভাগে একখানি চন্দ্রাতপ টাঙাইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর পুরুষের শব পূর্বাভিমুখ এবং স্ত্রীলোকের শব পশ্চিমাভিমুখে মস্তকে চিতার উপর সংস্থাপিত করা হয়। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র তদভাবে অপর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ পূর্বক মুখাগ্নি দান করিলে আরও অনেকে চতুর্দিক হইতে অগ্নিসংযোগ করিয়া থাকে। এই সঙ্গে মৃত ব্যক্তির গৃহের একটি থাম, কি একটি বাঁশ বা যে কোন একটি অংশ পরজন্মের আশ্রয়ার্থ দগ্ধ করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্কের মৃত্যুতে প্রজ্জ্বলনকালেও বাদ্যোৎসবের প্রচলন আছে, অবস্থাপন্ন হইলে, বাজী পোড়াইবারও ব্যবস্থা করা হয়। পরিশেষে দাহকার্য সমাধা হইয়া আসিলে 'বড়িগণ' 'ছাদিংগিরি তারা' পাঠ করেন। গর্ভাবস্থায় মরিলে আগে পেট চিরিয়া ভ্রূণ বাহির করতঃ তৎপর জ্বালায়;এবং সেই ভ্রূণ সমাধিস্থ করে।[২৪০] আর যদি কেহ ভূতগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারায়, তাহা হইলে সেই শব অর্ধদগ্ধ হইবার পর বক্ষের নিম্নে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলা হয়। সংস্কার আছে, নতুবা সেই ব্যক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া নানা অহিত সংঘটন করে। পুরাকালে আত্মহত্যাকারীদিগের প্রতিও ঈদৃশী ব্যবস্থা প্রদত্ত হইত। যাহা

(২৩৯) মঘদিগের মধ্যেও স্ত্রীলোকের নিমিত্ত অধিকতর কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। চাক্‌মাগণ তাহাদিগের হইতে ইহা অনুকরণ করিতে পারে। কিন্তু জানি না, ঈদৃশী ব্যবস্থায় কোন্ বিশেষ রহস্য নিহিত রহিয়াছে! কাপ্তেন লুইনও এতৎপ্রসঙ্গালোচনায় লিখিয়াছেন - স্ত্রীলোকদিগের অধিকতর বৃদ্ধি এবং তৈলাক্ত পদার্থের আধিক্যনিবন্ধন দাহোপকরণের কম প্রয়োজন হইবার কথা, কিন্তু ইহারা তৎস্থলে আরও অধিকই ব্যবহার করে।

(২৪০) এই প্রথা পার্শ্ববর্তী মঘ ও ত্রিপুরাদের মধ্যেও আছে হিন্দুদের হইতে অনুকৃত অনুমান হয়। পরন্তু এই পেট চিরিবার ভার স্বামী তদভাবে দেবরের স্কন্ধেই পড়ে।

হউক, শব ভস্মাবশিষ্ট হইলে সমাগত সকলে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। বলিয়া রাখা ভাল, এই ফিরিবার কালে তাহারা অতি সাবধান রহে।

হাড়ভাসান — অন্ত্যেষ্টির পরদিন প্রত্যুষে চিতা হইতে কতকগুলি অস্থিমাত্র সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট ভস্মরাশি স্রোতোজলে নিক্ষেপ করে। অনন্তর সংগৃহীত হাড়গুলি[২৪১] একটি হাঁড়িতে রাখিয়া মৃতব্যক্তির জনৈক সগোত্র তাহার মুখ বন্ধ পূর্বক লইয়া সেই স্রোতস্বতীর জলে নামে। তাহার হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একখানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত বাধিয়া দেওযা হয়; অপর প্রান্ত তাহার সম্পর্কে সম্মানিত সেই গোত্রেরই কেহ তীরভূমি হইতে টানিয়া ধরে। এদিকে চাপদ্বারা 'হাঁড়ি'টা জলপূর্ণ হইলে ডুব দিয়া তাহা ঠেলিয়া দিতেই, তীরস্থিত ব্যক্তি জলগত ব্যক্তিকে সূতার আকর্ষণ তুলিয়া আনে। অতঃপর 'রড়ী' ও 'ঠাকুর' দিগকে দান-দক্ষিণা উৎসর্গ করা এবং পরিপাটিরূপে খাওয়ান হয়। এই সময়ে শ্মশানভূমিতে ঘেরা দিবারও ব্যবস্থা আছে।

শ্রাদ্ধ — কোন কোন গোষ্ঠীতে অন্ত্যেষ্টির দিন হইতে সাতদিন পরে, আবার কেহ বা মৃত্যুদিবসের সাতদিন পরে সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করে।[২৪২] এই আদ্যশ্রাদ্ধকার্য শ্মশানভূমিতেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সাধ্যয়ত্তরূপে ভিক্ষু ও শ্রমণগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। ক্রিয়াস্থলে প্রেতাত্মার প্রীত্যর্থে ধজা, খট্টা, শয্যা, নানাবিধ বাসন ও মদ্য, অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্যাপকরণ দক্ষিণাসহ উৎসর্গ করে। অনন্তর সপরিবারে কলসী ধরিয়া জল

সাপ্তাহিক

ঢালে; পরিবারের কাহারও অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে সে একখানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত ধরিয়া রহে, অপরপ্রান্ত দানভূমিতে আনিয়া উক্ত কলসী গলে জড়ায়। এই সময়ে সমাগত আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা প্রেতাত্মার উদ্দেশে ধজাপ্রতিষ্ঠা এবং 'দান খয়রাত' ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কথিত আছে, ধজাদানের এতই ফল যে তৎসঞ্চালনে শ্মশানের যতগুলি রেণু পরিচালিত হয়, মৃতব্যক্তি তত বৎসর নির্বিঘ্নে স্বর্গবাসের অধিকার লাভ করে। সুতরাং ধজা সংখ্যায় বেশী হইলে স্বর্গবাসের সুবিধাও অধিক ঘটে। এতদুপলক্ষে ভোজাদিও যথাসাধ্য পরিপাট হইয়া থাকে।

ইহাদের সমাজে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিবারও রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহা অতি অল্পলোকেই

বার্ষিক

করে। মৃত্যুদিবসের বাঙ্গালা তারিখ ধরিয়াই বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন গণনা করা হয়। ইহাতেও ভিক্ষু এবং শ্রমণদিগকে, নানাবিধ দান ও দক্ষিণাদি উৎসর্গ ভিন্ন পূর্বোক্তরূপে জল ঢালাও হয়; তা'ছাড়া অপর কোন বিশেষ বিধান নাই।

(২৪১) ধনাঢ্যগণ ইহা হইতে কয়েক খণ্ড অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপনার্থ রাখিয়া দেন।

(২৪২) এই কয়দিন পরিবারস্থ সকলে প্রত্যহ সায়ংকালে 'ফাবক' শ্রবণ করিয়া থাকে; তদুপলক্ষে শ্রোতৃগণের প্রত্যেকে এক যোড়া করিয়া বাতি জ্বালায়।

পিণ্ডদান— ইহাকে সাধারণ কথায় 'ভাত দেওয়া' বলা হয়। বৌদ্ধগণও পুনর্জ্জন্মবাদী। চাক্‌মারা বলে, ইহলোকের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলানুসারে মানবগণ দেবযোনি হইতে কীট-পতঙ্গাদি তির্য্যগ্‌যোনি পর্যন্ত ভ্রমণ করে। সুতরাং কামনা ও কর্ম ফলে অনেকে পুনরায় মানবজন্মও গ্রহণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা আবার পূর্ববংশেও জন্মলাভ করে। কথিত 'পিন্ডদান' দ্বারা একদিকে যেমন পূর্বপুরুষের তৃপ্তি সাধিত হয়, অপর দিকে তাহারা বর্তমানে কে কোথায় আছে — তাহারও অনেকটা সন্ধান লাভ হয়; এবং কেহ কেহ উদ্ধারও লাভ করে। আপনাপন গোষ্ঠিতে মাত্র পিণ্ডদান করিবার নিয়ম, সগোত্রজ যে কেহ 'গোষ্ঠীর' সকলেরই উদ্দেশে পিন্ডদান করিতে পারে। পরন্তু কত পর্যায় পর্যন্ত পিণ্ডদান করা হইল, প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই তাহার একটা হিসাব থাকে। তিন, চারি বা অবস্থাবিশেষে ততোধিক পর্যায়ান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গতি ব্যক্তি এ হেন পবিত্র কর্মানুষ্ঠানে 'অশেষ পুণ্যার্জন করে।'।

এ উপলক্ষে সমুদয় জ্ঞাতিবর্গ, এবং তদ্বংশোদ্ভবা বিবাহিতা ও বিধবাগণ তাহাদের সন্তানসন্ততি সমভিব্যাহারে আহূত হয়। নদীতীরে অপ্রাপ্তপিণ্ডক মৃত স্ত্রী ও পুরুষগণের নিমিত্ত বয়ঃক্রমানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দুই সমান্তরাল শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন কৃত্রিম 'শ্মশান' প্রস্তুত করে। 'শ্মশান' আর কিছুই নহে, বাঁশদ্বারা সীমাবদ্ধ কতিপয় ক্ষেত্র মাত্র। পূর্বদিন সায়ং সময়ে সকলে উক্তস্থানে গিয়া প্রেতাত্মাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে, তখন হইতেই মূর্চ্ছিত হয়। সকলে গিয়া তাহাদিগকে আপনাপন পরলোকগত পূর্বপুরুষ সম্বোধনে আহ্বান করিতে থাকে; যে পরিচয়ে সংজ্ঞালাভ হয়, সে-ই তথাকথিত ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বিশ্বাসে — তৎবংশধরগণ তাহার আকাঙ্খাপূরণে তৎপর হয়; এইরূপে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে পরদিন 'ঠাকুর' তদভাবে 'রড়িগণ' তাঁহাদের নিমিত্ত বিশেষ ভাবে প্রস্তুত মঞ্চোপরি উপবেশন করিয়া, 'মালেম', 'স্ত্রীপুদরা', 'সুরাদিজা', 'পুদুমফুলু', 'ফুদুমফুলু', 'সাহসফুলু' এবং 'দাসপারমি-তারা' পাঠ করেন। অনন্তর গৃহস্থ ও অপরাপর পিণ্ডদাতৃগণ গললগ্নী-কৃতবাসে প্রত্যেক প্রেতাত্মার উদ্দেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'আধার'[(২৪৩)] এবং 'মেজাং'-এর উপরিস্থাপিত নবথালায় এক এক অর্দ্ধ দগ্ধমোরগ, কিছু কিছু শূকর-মহিষাদির মাংস ও ভাত, নারিকেল, কলা, মিশ্রি, গুড়, নানাবিধ মিষ্টান্ন, মদ্য প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন পুরোহিতগণ সমস্বরে উৎসর্গ মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করেন। মন্ত্রপাঠকালে কোন 'আধারের' উপর কীট-পতঙ্গাদি পতিত হইলে, সেই পত্রোদিষ্ট ব্যক্তি তথাপতিত তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। এসময়ে আবার জ্ঞাতি বা সমবেত কুটুম্বদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। তখন পিন্ডদাতা সুমদয় পিণ্ডপাত্রসহ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া এক একজনের সম্মুখে এক একটি 'আধার' আনয়ন করতঃ পাত্রোদিষ্ট নামোল্লেখে বলিতে থাকে, "তুমি আমার অমুক (পিতা বা পিতামহ প্রভৃতি) হইলে, মদ্দত্ত পিণ্ড গ্রহণ কর।" এইরূপে এক একটি পাত্র 'যাচাই'

(২৪৩) 'আধার' - - পিণ্ডপাত্র; ক্ষুদ্র চুপড়ী বিশেষ।

করিতে করিতে সেই মূর্চ্ছিত ব্যক্তি হঠাৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষুরুন্মীলনপূর্বক কাঁদিতে থাকে। যে পাত্রোদ্দিষ্ট নামে চৈতন্য সম্পাদিত হয়, সে মূর্চ্ছিত ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। অনন্তর যথাযোগ্য দান দক্ষিণাদিসহ তাহারই হস্তে তথাকথিত পিণ্ড অর্পিত হয়, পিণ্ডগ্রহীতা তাহা হইতে স্বেচ্ছানুসারে উপাদেয় সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকে। তখন পিণ্ডদাতা তাহাকে (বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও) ভূমিগত প্রণিপাত করিয়া 'তুমি আমার অমুক (পিতা পিতামহ প্রভৃতি), এক্ষণে অমুক (পুত্র বা পৌত্র) রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আহা ! স্নেহের কি অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ ! জন্মেও আমাকে ভুলিতে পারিতেছে না', ইত্যাদি নানা প্রিয়ালাপের সহিত সস্নেহ আলিঙ্গন করিয়া তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লয়। ক্রিয়াস্থলে জ্ঞাতিবর্গের সকলেরই উপস্থিত থাকিবার প্রধান প্রয়োজনীয়তা এই যে, তাহাদের কেহ যদি ভিন্ন স্থানে থাকিয়া এই পিণ্ডদানকালে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তদুদ্দিষ্ট পিণ্ডলাভ ব্যতিরেকে চৈতন্য লাভ ঘটে না, সুতরাং বিপদের নিশ্চিত সম্ভাবনা। ইহারা আরও বলে, পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কীট, পতঙ্গ, কুকুর, শৃগালাদি তির্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এই পিণ্ডদানমাত্র মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগপূর্বক মুক্তিলাভ করে। ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতির করালগ্রাসে বা জলমগ্ন কি উদ্বন্ধনাদিতে গতাসু ব্যক্তিগণও এই পিণ্ডলাভে উদ্ধার পাইয়া যায়। অতঃপর এইরূপে পিণ্ডপাত্রাদি লইয়া প্রাগুক্ত শ্মশানে উপস্থিত হয়;তথায় প্রত্যেক প্রেতাত্মার নির্দিষ্ট স্থানে পিণ্ডপাত্রাদি স্থাপনপূর্বক পার্শ্বে প্রত্যেক প্রেতাত্মার উদ্দেশে নানা কারুকার্য সমন্বিত এক একখানি সূত্র ও বস্ত্র 'টাঙ্গোন' প্রবাহিতা নদীকূলে বিলম্বিত ও দক্ষিণা উৎসর্গ করে। মৃদু মন্দানিলে সেই ধ্বজানিচয় সঞ্চালিত হইয়া অনুষ্ঠাতার অক্ষয় পুণ্য ও যশোঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যত ধূলিকণা স্থানান্তরিত করে, প্রেতাত্মা তত বৎসর স্বর্গসুখভোগ করিতে পায়। বিগত ১৩১৫ সালের ২রা ফাল্গুন ফেমাছরাবাসী শ্রীজয়চরণ ঘিসা নামা কুরাকুট্যা গোছার সুরেশ্বরী গোষ্ঠীজ জনৈক চাক্‌মা যে পিন্ডদানোৎসব করে, তাহাতে ১৮০ জন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড প্রদত্ত হয়। তাহাদের গোষ্ঠীতে ৮০ পরিবার। এই কার্যে তাহার প্রায় সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

(১) প্রাথমিক সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ ধারণা

(২) প্রবাদ বাক্য (Proverbs)

১

সংস্কার

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির ভিতরেই ন্যূনাধিক পরিমাণে কতিপয় সংস্কার এযাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর প্রদীপ্ত সভ্যতালোকেও তৎসমুদয়ের উচ্ছেদ সাধন করা যাইতেছে না। অনেকে বিশেষতঃ নব্য যুবকেরা বলিয়া থাকেন, এই সকল সংস্কার জাতীয় দুর্বলতা হইতে সঞ্জাত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহারাই আবার বয়সাধিক্য এবং শক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল 'কুসংস্কারের' ভক্ত হইয়া পড়েন। এরূপ দৃষ্টান্ত সমাজে প্রায়শঃই ঘটিতে দেখা যায়। এমন কি ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যৌবন-মদ-দৃপ্ত উদ্ধতাচারী কোন কোন যুবক পুরুষ পরম্পরাগত সংস্কারের মস্তকোপরি পদাঘাতে নানা উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটাইয়াও হঠাৎ দৈবশক্তির সামান্য আঘাতেই এত যে কাতর হয়, অতি সত্বরেই বল্গাকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে নতশির হইয়া পড়ে। যাহা হউক, মধ্যযুগে সমাজবিপ্লব যাদৃশ ভীষণ ভাবে গড়াইতেছিল, সুখের বিষয়, এক্ষণে তাহা আর নাই। ঝড় থামিয়াছে,— স্রোত ফিরিয়াছে—দেশের লোকের মতি-গতিও প্রাচীনকে সম্মান করিতে ছুটিয়াছে।

ফল

পক্ষান্তরে ইহা সত্য যে, এ সমুদায় সংস্কারের উপর অত্যাচার করিলে ফল না হইয়া যায় না। হয়তঃ কোনটা স্থূল দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে, অথবা কোনটা পরোক্ষভাবে তেজবিকাশ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করে। তবে সংস্কারগুলি যেরূপ ভাবে ধর্ম ও অমঙ্গল-পাশে বিজড়িত, সেই সমস্ত কি পরিমাণে যে সারগর্ভ— তাহাই সন্দেহের বিষয়। যতদূর সম্ভব, সাধারণকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই তাদৃশী গর্হিত যুক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। তৎপরিবর্তে সরল ভাবে কারণ নির্দেশ করিয়া গেলেই আশা করি এই কঠোর বৈজ্ঞানিক যুগে অধিকতর আদৃত হইত। তবে পরিণাম সমালোচনা না করিয়া পূর্বপুরুষের বহুদর্শিতা-প্রসূত উপদেশজ্ঞান অন্ধ বিশ্বাসেই সংস্কারগুলি প্রতিপালন করিয়া যাওয়া মন্দ নহে।

সংস্কার চেষ্টা

অধুনা চাক্‌মাদিগের মধ্যেও 'সংস্কার' সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে। এখানেও শিক্ষিতাভিমানী নব্য যুবকেরাই তাহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইবেন সন্দেহের বিষয়। কেননা সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই সমস্তের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় ভক্তিমান যে, তাহারা সহজে বিচলিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য সমাজের যে কোনও অনিষ্ট ঘটিবে, সেই আশঙ্কাও নাই। বরং সকলে 'সংস্কারের' তাড়নাতে হইলেও কর্মে ব্রতী হউক, তাহাই আমাদের প্রার্থনা।

কোন সমাজের যাবতীয় সংস্কারগুলি তালিকাবদ্ধ করা কখনই সম্ভবপর নহে। কেবল নমুনা প্রদর্শনের নিমিত্ত চাক্‌মাজাতির কয়েকটি মাত্র সংস্কারের উল্লেখ করা গেল ঃ---

তালিকা

অমঙ্গল সূচনা

শব্দে — রাত্রিকালে কাক বা ঘুঘু এবং অপরাহ্নে মোরগের ডাক অশুভ সূচনা করে। কুক্কুটীর উচ্চশব্দ যে কোন সময়ে অমঙ্গলজ্ঞাপক। শুষ্কবৃক্ষে খঞ্জন ডাকিলেও অশুভ ঘটে।

দৈবযোগে— রাত্রে টিয়াপাখী উড়িলে দেশ ছাড়খারে যায়। মোরগে নরম ডিম পাড়িলে গৃহস্থের অশুভ সূচিত হইয়া থাকে। 'কেয়া কাপড়' অর্থাৎ গামছা ভাসিয়া গেলেও অমঙ্গল।

পশুপক্ষীদ্বারা — আদমে বানর ঢুকিলে কিম্বা বাঘ ঘরে ঢুকিয়া 'ভাতের মোচা (পুটুলী' খাইলে ভাল নহে। গৃহের মধ্যে মৌমাছি প্রবেশ করিলে সবংশে বিনাশ নিশ্চিত। ঘরের মধ্যে অপরের ছাগল উঠিলে, অতিথির আগমন সূচনা করে। যদি 'মইন ঘরে' গিয়া বাঘ উঠে, তাহা হইলে পরিবারের সকলেরই 'মাথা ধোওয়া' আবশ্যক। এতভিন্ন ঘরের চালে চিল, পেচক, শকুনী বা গৃধিনী পড়িলে অথবা কুকুর উঠিলে অশুভ জ্ঞাপক করে। তজ্জন্য যথাসম্ভব সত্বর পূজার আয়োজন করা হইয়া থাকে। কেবল শেষোক্ত স্থলে কুকুরের কান কাটিয়া দেওয়া হয়; এবং সপরিবারে "মাথা ধোয়"।

যাত্রাকালে — খালী কলসী দেখিলে অমঙ্গল ঘটে, পূর্ণ কলসী দেখা গেলে কার্যসিদ্ধি নিশ্চিত। হাঁচি পড়িলে ভাল নহে; কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যাওয়া প্রয়োজন। সর্প বা শৃগাল দক্ষিণ হইতে বামে গেলে কুলক্ষণ সূচনা করে, বিপরীতে শুভ। মস্তকে আঘাত পড়িলে অশুভ; ইহাতেও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক। যদি বন্য কুক্কুট ডাকিতে ডাকিতে কাহারও অভিমুখে আসে, তাহাতেও অমঙ্গল সূচিত হয়। সর্প দক্ষিণ হইতে বামদিকে গেলে অযাত্রা, কিন্তু বাম হইতে দক্ষিণ দিকে গেল শুভ ঘটিবার সম্ভবনা। বিবাহের প্রস্তাবার্থ গমন সময়ে যদি কোন জীবের শব দেখা যায়, তাহা হইলে সেস্থলে বিবাহ প্রস্তাব পরিত্যাজ্য।

নিষেধ ব্যবস্থা

বারবিশেষে — বুধবার কোন প্রকার কাজ করিতে নাই। এমন কি বাড়ী হইতে কোথাও যাত্রা করাও নিষিদ্ধ।

পানভোজনে — বিড়ালের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণ, পুকুরের পানাবশিষ্ট বা যে 'কোত্তির' জলে পা ধোওয়া হয়, অথবা যে কূয়ার জলে লোকে স্নান করে তাহার জলপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বর্ষাধিককালের ছিমগাছের ছিম ভক্ষণে সর্পবিষ অনিবার্য হয়।

ক্রীড়ায — কাঁকড়া লইয়া খেলা নিষেধ। কীট লইয়া খেলা কবিলে বজ্রপাত ঘটে।

স্পর্শে — চলিবার সময় সন্তানের গায়ে বিশেষতঃ মস্তকে 'পিধঁন' লাগিলে, সন্তানের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। সোনা, রূপা, চাউল প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধন সামগ্রী পায়ে লাগা ভাল নয়। যদি কোনরূপ পাদস্পর্শ ঘটে, তবে তখন তখন তাহা মস্তকে স্পর্শ করাইবে।

আচার-ব্যবহারে —জলে প্রস্রাব করা, এবং তামাক সেবনের পর মুখ ধোওয়া নিষেধ। পক্ক বেগুনের ঘ্রাণ লইলে নাক পঁচিয়া যায়। পুরুষে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিলে ব্যাঘ্রমুখে প্রাণ হারাইয়া থাকে। প্রত্যুষে রোদ উঠিবার পূর্বেই উনানের ছাই ফেলিয়া না দিলে পরে সেই ছাই আর মাটিতে ফেলা যায় না;তাহা অপর কোন পাত্রে উঠাইয়া রাখিতে হয়। দ্বিপ্রহরের পর মঞ্চ পরিষ্কার কিম্বা উনান লেপাদি কাজ করিতে নাই। খালে নিয়া মাটির হাঁড়ী, ঘর লেপিবার 'নাতা' প্রভৃতি ধোওয়া ভাল নয়। জ্ঞাতির কেহ যদি নূতন কোনও নিয়ম বা কার্য আরম্ভ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই জ্ঞাতির অপর কাহারও তাদৃশ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য নহে।

বিশেষ বিধি

উপবেশনে — কোন স্থানে বসিবার পূর্বে কিঞ্চিৎ 'থুতু' প্রক্ষেপ না করিলে মার্গদেশ ভারী হইয়া 'পুনঘোড়া' রোগে কষ্ট পাইয়া থাকে।

দোলা প্রস্তুতে — প্রথম জাত সন্তানের জন্য দোলা প্রস্তুত করিতে পারা যায়;কিন্তু অনুজাত আর সমুদয় পুত্র কন্যাকে তাহাতেই দোলাইতে হয়। নতুবা পরবর্তী, কাহারও নিমিত্ত নূতন দোলা প্রস্তুত করিলে, সেই সন্তানের মৃত্যু ঘটে।

বিষম লাগিলে — পানাহার করাইবার সময় যদি হঠাৎ শিশু সন্তানের শ্বাসরোধ ঘটে, তাহা হইলে মাতা এক শব্দ করিতে করিতে আস্তে আস্তে সন্তানের মস্তকে করাঘাত করিয়া থাকে।

গোষ্ঠীবিশেষে — 'পিড়া ভাঙা' গোষ্ঠী মিষ্টকুমুড়ের বীজ বপন করিতে পারে না; তাহার অন্যথা করিলে তাহাদের ক্ষেত্রে বাঘ আসে এবং উপদ্রব করে। "কোমরেং" ও "কাল" গোষ্ঠী লাউ কুমুড়াদির নিমিত্ত 'মা চা' দিতে পারে না। "সিঙ্গিরা পুনা" গোষ্ঠী কিছু উত্তাপে রাখিবার জন্য "মাচা" দিলেও অমঙ্গল ঘটে। "নানুক্‌তুয়া" গোষ্ঠির সেরী, আড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন কচুরোপণেও তাহাদিগের বাধা আছে। এইরূপে কোন কোন গোষ্ঠী মানকচু খাইতে এমন কি ছুঁইতেও পারে না। কাহারও বা পেচক ধরা উচিত নহে।

শূকর কাটিলে — 'আদমে' শূকর কাটিলে বালক-বালিকাদিগের নাকে, বগলে এবং কনুই ও জানু প্রভৃতিতে কাঁচা হলুদ বাটিয়া দেওয়া হয়, নতুবা তাহারা অপদেবতা হইতে ভয় পাইতে পারে।

সর্পহত্যায় — সাপ মারিলে মাথা ও লেজ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখে; তা'না হইলে সেই সর্পের পুনর্জ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা রাখে।

শব সৎকারে — যাহারা বাঘের 'ফু' অর্থাৎ মন্ত্র জানে, মৃত্যুর পর যদি তাহাদিগের শব অবিলম্বে পোড়াইয়া না ফেলে, তবে তাহারা পুনর্জীবিত হইয়া মানুষ ধরিয়া খায়। এমন কি শত শত খণ্ড করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিলে ও রাত্রে আবার সমস্ত একীভূত হইয়া উৎপাত আরম্ভ করে। সেই জন্য এইরূপ শবের তালু এবং উদরে লৌহ প্রেক প্রোথিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা অতি উত্তম প্রতিষেধক। লৌহ সংসৃষ্ট জিনিষের উপর ভুতপ্রেতের অধিকার থাকে না। অতএব এ সকলের হাত হইতে নিরাপদ থাকিতে হইলে লৌহের কোন দ্রব্য সঙ্গে রাখিতে হয়।

স্বপ্নফল

যদি স্বপ্নে শিকাব লব্ধ কোনও প্রাণীভোজন করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে অচিরে মৃত্যু ঘটে। স্বপ্নে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়াছে দেখা গেলে, অপমানিত হইতে হয়। স্বপ্নে মৎস্য প্রাপ্তিতে অর্থলাভ হইয়া থাকে। মৃতলোককে স্বপ্নে দেখিলে পরদিন মাংস খাইতে নাই, নতুবা অনিষ্ট ঘটে। স্বপ্নে "চামনী" (দীক্ষা) হইতেছে দেখা ভাল নহে; চুল ছাটিতে দেখাও ভারী অমঙ্গ লজ্জাপক। যদি কেহ স্বপ্নে স্রোতের অনুকূলে নৌকা যাইতে দেখে, তাহাতে অমঙ্গল হয়; প্রতিকূলে যাইতে দেখিলে শুভ ঘটিয়া থাকে।

বিবিধ

শনি মঙ্গলবারে চিংড়ি মৎসের জ্বর হয়; সুতরাং ঐ সকল দিনে চিংড়িমাছ অধিক সংখ্যায় ধরিতে পারা যায়।

গ্রহণের কারণ নির্দেশে কথিত হয়, 'চন্দ্রসূর্য কোন সময়ে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া রাহু হইতে কিছু ধার নিয়াছিল; কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলেও, তাহারা তাহা পরিশোধ করিতে পারে নাই। তদবধি তাহারা রাহুকে দেখিলেই 'পাশ কাটিয়া' পলায়ন করে। রাহু ইহাতে কোপ-পরতন্ত্র হইয়া বিশ্বাসঘাতকগণকে সুবিধামত পাইলেই উদরসাৎ করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহারা মলদ্বার দিয়া পলাইয়া যায়।' এই কারণে গ্রহণসময়ে ইহারা বন্দুকের আওয়াজ করিতে থাকে। অন্যতঃ উল্কাপাতকেও ইহারা কোন অমঙ্গলের চক্ষে দেখে না। ইহাদের মতে 'এক তারা অপর তারার বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায়' মাত্র। তাই তাহা ইহাদের ভাষায় — "তারা জামাই"।

অনেক সময় এই দেশ ইন্দুরের উপদ্রবে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পালে পালে ইন্দুর আসিয়া, সম্মুখে যাহা পায় — লুটিয়া যায়। তাহারা ক্ষেত্রের শস্যও নষ্ট করে এবং হতভাগ্য পাহাড়ীদেব ধানের গোলাও শূন্য করিয়া ফেলে। পরন্তু ইহাই আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে অন্তর্ধান হয়। কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন[২৪৪], "গত ১৮৬৪ অব্দে যখন ইন্দুরের উৎপাত আরম্ভ হয়, তখন পাহাড়ীয়া আমাকে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল যে, সকল

(২৪৪) The Hill Tracts of Chittagong and the dewellers therein, P.13.

ইন্দুর কালে বন্য কুক্কুট হইয়া থাকে!" প্রমাণ স্বরূপ তাহারা, বন্যকুক্কুটের লম্বা পালককে যাহা মাটি ছেঁচড়াইয়া যায়, ইন্দুর জন্মে লেজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল।"

২

সমাজে আর কতিপয় গাথা থাকে, তৎসমুদয় বহু অভিজ্ঞতা প্রসূত, সুতরাং অমূল্য উপদেশে পরিপূর্ণ! সহস্র ব্যাখ্যা বা বক্তৃতায় যাহা সম্ভব নহে, এই এক একটি মাত্র উপমামূলক সতর্কসত্যে তদপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ততার সহিত মনের উপর প্রবল আঘাত করিয়া থাকে।

প্রবচন

আমরা যদি এই মহা বাক্যগুলি হৃদয়ে চির জাগরূক রাখিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কখনও কর্তব্য ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। মনে কোনরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ দৈববাণী উত্থিত হয়;তাহার সুগম্ভীর নির্ঘোষে ভাবী ফলাফল জানিতে পারিয়া উপযুক্ত সময়ে সাবধান হইতে পারি। অতীব দুঃখের বিষয়, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার বড় একটা সংবাদ রাখেন না। তাঁহারা দুই চারিটি বিজাতীয় 'ইডিয়ম' (Idiom) শিখিলেই জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর হইল, চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কলেক্টর মিঃ এন্ডার্সন কতিপয় 'চট্টগ্রামের প্রবাদ বাক্য" (Chittagong Proverbs) উদ্ধার করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। লিখিতে লজ্জা ও ক্ষোভে লেখনী নত হইয়া যায়, — আধুনিক অনেক স্বদেশবাসী তাহা পাঠেই দেশের প্রবচন শিক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা হউক এক্ষনে তৎপ্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আশা হয়, বুঝি বা দিন ফিরিল। সুতরাং প্রত্যেক দেশের সহযোগী সাহিত্য সেবকগণকে এই জন্য অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন স্ব স্ব দেশের এতাদৃশ কর্তব্যানুশাসক বচন নিচয় অতীতের ঔদাসিন্য হইতে রক্ষা করিতে যত্নশীল হন। চাক্‌মা সম্প্রদায়ে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে। তৎসমুদায়ের কিয়দংশ বিজাতীয় ভাবে গঠিত, কোন কোনটি কেবল ভাষান্তরিত মাত্র। এস্থলে কেবল ইহাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব কয়েকটী প্রবচন প্রদত্ত হইল।

"বড় পণ্ডিত হলে পথর কুরে হাগন।"[২৪৫]

"আপন আন্দাজ পাগলে বুঝে।"[২৪৬]

"উয়রে উয়রে ব-যায়,
কলগ-মান্‌জে থান্‌ নপায়।"[২৪৭]

"একা বুদ্ধি যার, গুণৎ দরি তার;
ছোওরা বুদ্ধি যার, পুনৎ দরি তার।"[২৪৮]

(২৪৫) অত্যধিক পবিত্রাচারী লোকেরা পথের ধারেই বাহ্য করে, অর্থাৎ যাহারা বেশী খাঁটি দেখাইতে চায়, তাহাদের গলদ খুব বেশী।

(২৪৬) নিজের ভাল পাগলেও বুঝিতে পারে।

(২৪৭) বাতাস উপর উপর দিয়াই প্রবাহিত হয়, গিরিগহ্বরবাসীরা তাহা অনুভব করিতে পায় না।

(২৪৮) যাহার একমাত্র বুদ্ধি অর্থাৎ এক বিষয়ে মাত্র জ্ঞান, সে (নৌকার) 'গুণ দড়ি'র ন্যায় কার্য চালাইয়া থাকে। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অত্যধিক, তাহার মার্গে দড়ি পড়ে; অর্থাৎ সে রজ্জুবদ্ধ হয়। c/o 'অতি চালাকের গলায় দড়ি।'

"কুকি দেজৎ নূন যেচেদে হয়?"[২৪৯]

"কে ন্যায় দুষ গরে, মাল্যা কাবা খায়।"[২৫০]

"খেইৎ ন জান্নে মরি পায়,
বইৎ ন জান্নে লরি পায়।"[২৫১]

"গরম ভাতে ক্ষুধা বেজার।"[২৫২]

"গাজর আগাৎ গুই,

খুরা ভাৎ খেয়া তুই।"[২৫৩]

"গিরিগুণে শূকর ফাট্টোয়া হয়।"[২৫৪]

"শব্দ হুনি গোয়ালপারা,

দৈ-দুধ ছেওরা।"[২৫৫]

"চিলর দরে কি কুরা ন পুজিব?"[২৫৬]

"ছাগল দিলে দরি নদিনে।"[২৫৭]

'তুই বাঙাল ছাগল হইযছে?"[২৫৮]

"তুছ্ খলাৎ কুরা-আক্যাং হইয়ে।"[২৫৯]

(২৪৯) কুকিদেশে লবণ (অর্থাৎ যেখানে যাহার বিশেষ অভাব) যাচ্ঞা করিতেছে।

(২৫০) দুশ্চরিত্র পাপ কার্য করে, নপুংসক তাহার শাস্তি ভোগ করে। অর্থাৎ একে দোষ করে নির্দোষ তৎশাস্তি পাইয়া থাকে।

(২৫১) খাইতে না জানিলে মরিতে হয়, এবং বসিতে না জানিলে নড়িতে হয়।

(২৫২) ক্ষুধার সময় গরম ভাত দেওয়া হইলে ক্ষুধা লোপ পায়, অর্থাৎ উচিত ব্যবস্থায় সকলেই বিরক্ত হয়।

(২৫৩) গাছের অগ্রভাগে গোসাপ রহিযাছে (অথচ ভাইপো পিতৃব্যকে বলিতেছে) খুড়া, (উক্ত গোসাপ দিয়া) ভাত খাইয়া যাও।

(২৫৪) গৃহস্থের প্রকৃতি অনুসারে শূকর অমিতাচারী হয়।

(২৫৫) গোয়ালপাড়ার শব্দ শুনিযা, দৈ দুধ পর্যাপ্ত মনে করা।

(২৫৬) চিলের ভয়ে কি মোরগ পুষিব না? c/o 'চোরের ভয়ে বিবাহ না করা।'

(২৫৭ ছাগল দিলে, তার দড়ি দিলে না?

(২৫৮) তুই বাঙ্গালীর ছাগলের ন্যায় (সর্বদা গা ঘেসা) হইয়াছিস।

(২৫৯) তুষ ভাণ্ডার লোভী মোরগের ন্যায়।

"নানু ন চিনি ছালাম্ গরন।"[২৬০]

"নূন খেই গুণ গরন।"[২৬১]

"পেক্কোয়াও পরিবার গং,
ধিলাবোয়াও ভাঙিবার গং।"[২৬২]

"ফকির লগে কাল বাঙাল,
হরিণ লগে চঙরা পাগল,
খঞ্জন সমারে চেগা পাগল।"[২৬৩]

"ফুল-বারি গায় ন সয়;
চাবুক-বারি পরাণে মাগের।"[২৬৪]

"বকা ছেরে কবা।"[২৬৫]

"বর গাংয় চাইয়ম্,
খাদীও ধুইয়ম্।"[২৬৬]

"বিলেলৈ কুগুর।"[২৬৭]

"বুরা বাঁদরে গাছৎ উড়ে।"[২৬৮]

"ভাত নেই গর্ পিদা।
উলু পারা চুল-ঝুদা।"[২৬৯]

"মইলায় গাছ্ কাবদে,
ভাগিনায় নরম পায়।"[২৭০]

(২৬০) ঠাকুরদা অর্থাৎ পূজনীয়কে না চিনিয়া সেলাম করা।
(২৬১) নিমক খাইয়া উপকার করা।
(২৬২) পক্ষিটি পড়িতেছে ডালটি ভাঙিয়া গেল। c/o 'কাকতালিয়।'
(২৬৩) বাঙ্গালীরা সর্বদা ফকিরের পেছনে পেছনে থাকে। সেইরূপ ছোট হরিণীর সহিত বড় হরিণ এবং খঞ্জনের সঙ্গে চেগা নামক পক্ষী পাগলপ্রায় ঘুরে।
(২৬৪) ফুলের আঘাত সহ্য হয় না; চাবুকের আঘাত প্রাণে চায়!
(২৬৫) বকপালের মধ্যে যেমন কাক, অর্থাৎ 'হংসোমধ্যে বকো যথা'।
(২৬৬) বড় নদীও দেখিব, "খাদী" ও ধুইব। c/o 'রথ দেখা ও কলা বেচা।'
(২৬৭) বিড়ালের সহিত (যেন) কুকুর ইহাদের সর্বদাই ঝগড়া বাধে।
(২৬৮) বুড়া বানরও গাছে উঠিয়া থাকে।
(২৬৯) ভাত খাওয়ার চাউল নাই, (হুকুম হইতেছে) 'পিঠা কর'। (অন্যতঃ তৈল অভাবে) চুলের খোপা উলু অর্থাৎ সরু ছনের প্রায় হইয়াছে।
(২৭০) মামা গাছ কাটিতেছে, ভাগিনেয় জানিতেছে যে নরম।

"মাণিক্যা-ব্যাপর ছিন্নিখানা।"[২৭১]

"মানুজ্ বুঝি পুগয়ে কামরায।"[২৭২]

"মুরা - উয়রে তুগুন বাচ্।"[২৭৩]

"যা-নাঙে ন্যেই,
মেজ্‌বান্যা ঘরৎ গেলেও ন্যেই।"[২৭৪]

"যার বাপরে কুমুরে খায,
তার পোয়ায় ধেউ দেলে দরায়।"[২৭৫]

"যে ফুল নিন্দে, সেই ফুল পিঁধে।"[২৭৬]

"যেই কুগুরের লেজ বেঙা,
চুমাৎ ভোরেলেও উজু নহয়।"[২৭৭]

"যেমন তান্যাবি সেমন নাম,
সামুলেজী পিঁধন্নান্।"[২৭৮]

"লূর-শূয়র চাল-উপর উঠিলে,
ঘুগ্‌ঘুগি জঙর হয়।"[২৭৯]

"ধায়দে মাচ্ছোয়া দাঙর,
মরেদে পুয়াবুয়া দোল্।"[২৮০]

"ছুকুরে কুচু-টেঙেরা ছুপ্ পেলে ন এরে।"[২৮১]

(২৭১) 'মাণিক্যর বাপ' নামক এক ব্যক্তি সিন্নির নিমন্ত্রণে যথা সময়ে উপস্থিত না হওয়ায় কিছু পাইয়াছিল না। তদবধি তাহার ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত লোককে উক্ত প্রবচন দ্বারা ঠাট্টা করা হয়।

(২৭২) মানুষের প্রকৃতি বুঝিয়াই পুঁই নামক কীট বিশেষে কামড়ায় অর্থাৎ নিরীহ পাইলে ক্ষুদ্রও জ্বালাতন করে।

(২৭৩) পাহাড়ের শৃঙ্গোপরিস্থিত তুগুণ বাঁশ অর্থাৎ ঝাড়ে একমাত্র বাঁশের ন্যায় বায়ুর অনুসারী বিবেকসম্মানহীন ব্যক্তি।

(২৭৪) যার জন্য নাই, তার নিমন্ত্রণ বাড়ীতেও নাই।

(২৭৫) যার বাপকে কুমীরে খায়, সে ঢেউ দেখিলেও ভয় পায়।

(২৭৬) যেই ফুলকে নিন্দা করা হয়, সেই ফুলই পরিশেষে পরিধান করে।

(২৭৭) যেই কুকুরের লেজ বাঁকা, চুঙায় ভরিলেও তাহা সোজা হয় না।

(২৭৮) তান্যাবিবি যে রকম, তার নামও তেমনি; তার পিঁধনখানিও "সামুলেজী" ফুল বিশিষ্ট ছিল।

(২৭৯) খোঁয়ারের শূকর চালের উপর উঠিলে গর্জন বাড়ে।

(২৮০) যে মাছটি পলাইয়াছে, তাহা খুব বড় ছিল; যে ছেলে মরিয়াছে, সে বড় সুন্দর ছিল।

(২৮১) শূকর যদি কচুর খেরার অর্থাৎ কচুখেতের সন্ধান পায়, আর ছাড়ে না।

"সভামধ্যে কর্গরা ভাত।"[২৮২]

"সময় থাক্‌তে বান;
দিন থাক্‌তে হাঁট।"[২৮৩]

"সাত ওঝায় পোয়া মারে।"[২৮৪]

"ছেদাম্ ন্যেই ভেদাম্
মৈন্‌র উপর তিন আদাম্।"[২৮৫]

"ছেদাম্ ন্যেই ভেদাম্ ন্যেই এত্তুমা হা,
গাং কূলে নি ভিজেই ভিজেই খা।"[২৮৬]

"ছেদাম্ ন্যেই যার তিন মোগ্‌তার।"[২৮৭]

"হেইদ্ এলে গাজ্ তগাতুগি।"[২৮৮]

"হেইদ-পুনৎ কুগুরে ভুগে।"[২৮৯]

"হেরা খেইয়া বাঘ-দরে ধেই যাদে,
চিৎখেইয়া বাঘ-লাগৎ পায়।"[২৯০]

"চিগন মরিচ-ঝাল বেচ্।"[২৯১]

"খের-তলেও সোনা থায়।"[২৯২]

"রাদা ন্যেই দেজৎ,
কুবিড় গব্‌গবি।"[২৯৩]

"গাজ চিনে বাগলে,
মানুছ্ চিনে আগলে।"[২৯৪]

(২৮২) সভার মধ্যস্থলে পান্তাভাত, অর্থাৎ এক বিষয়ের আলোচনার সময় অন্য বিষয়ের উত্থাপন।
(২৮৩) সময় থাকিতে বাঁধ; দিন থাকিতে হাঁটিতে থাক।
(২৮৪) সাত ধাত্রীতে সন্তান নষ্ট করে।
(২৮৫) বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই, অথচ পাহাড়ের শৃঙ্গে তিন পাড়া বসাইতে চায়।
(২৮৬) বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই --- 'হা' টা এত বড়; নদীর কূলে নিয়া ভিজাইয়া ভিজাইয়া খাও। অর্থাৎ নিষ্ঠাহীন আশায় কোন ফল নাই।
(২৮৭) যার বুদ্ধি সুদ্ধি নাই, তার তিন স্ত্রী। অর্থাৎ সে এক স্ত্রীতে ঘর চালাইতে পারে না।
(২৮৮) হাতী আসিয়া পড়িলে, তখন (তাহাকে মারিবার জন্য) গাছের অনুসন্ধান হয়!
(২৮৯) হাতীর পেছনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। অর্থাৎ কেহ কেহ অপ্রাকৃত সাহসও প্রদর্শন করে।
(২৯০) মাংসভুক্ বাঘের ভয়ে পলায়ন করিতে হৃদপিণ্ডভুক্ বাঘের সম্মুখে পড়ে।
(২৯১) ছোট লঙ্কার ঝাল বেশী।
(২৯২) খড়ের তলায়ও সোনা থাকিতে পারে।
(২৯৩) যে দেশে পুং মোরগ নাই, তথায় স্ত্রী মোরগের শব্দই বড়।
(২৯৪) বাকল দেখিয়া গাছ চেনা যায় এবং আচরণ দেখিয়া মানুষ চেনা যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আহার্য ও পানীয়

প্রধানত দেশের প্রকৃতিভেদেই খাদ্য ও পানীয়ের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। শীতপ্রধান এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশ কখনই একই নির্দিষ্ট তালিকাধীনে চলিতে পারে না। একস্থানে মদ্যমাংসাদি উষ্ণতর ভক্ষ্য না হইলে আত্মরক্ষা কঠিন হয়, অন্যস্থানে শাকান্ন ভোজনেই যথেষ্ট হয়।

খাদ্যবিচার

সুতরাং যে স্থানে যাহা অনাবশ্যক-তাহাই অখাদ্য, রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একবারে অস্পৃশ্য; অথচ তাহাই অন্যস্থানে জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন। ইহা হইতেই জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতা আসে এবং ধর্মাচর্যার স্থূল ব্যবস্থাগুলিও নানারূপে পৃথগীকৃত হইয়া পড়ে। পরন্তু যদ্দ্বারা শরীররক্ষার সাহায্য হয়, তাহা সকল দেশের সকল জাতিরই ধর্মানুমোদিত! প্রথমে শরীর পরে ধর্ম, — ইহাই পণ্ডিতবর্গের মত।[২৯৫] অতএব আবশ্যক ও সৌকর্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভিন্নবিধ ভোজ্য প্রচলিত থাকিতে পারে, তাহাতে নিন্দার কোনও কথা নাই।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভেদে খাদ্যবিচার যেমন স্বাভাবিক, পক্ষান্তরে তাহার আহার পদ্ধতি ও বিভিন্নরূপ হইয়া যায়, শীতপ্রধান দেশে 'কাঁটা-চামিচ' না হইলেই নয়; আর আমাদের দেশে

আহার পদ্ধতি

একমাত্র হাতেই কাজ চলে। ইহাতেও আবার কেহ বা ডান হাতে কেহ বা বাম হাতে,[২৯৬] কেহ কেহ বা উভয় হাতে, কি যে কোন হাতে আহার করে। চাক্‌মাগণও এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে সাধারণতঃ ইহারাও দক্ষিণ হস্তেই গ্রাস গ্রহণ করে এবং বাম হস্ত মৎস্যের কাঁটাদি ছাড়াইতে সাহায্য করিয়া থাকে। বলিতে কি, ইহাদেরও উচ্ছিষ্টে অশুচিত্ব সংস্কার নাই।[২৯৭] নিমন্ত্রণাদিতে বা প্রীতিভোজে সতরঞ্চ তদভাবে কেবল 'পাটী' বিছাইয়াই আহারে বসে; নতুবা সচরাচর সকলে 'পিড়ি'তে বসিয়াই আহার করিয়া থাকে। কিন্তু ধনবান মহাশয়েরা আহার কালে ধাতুজ 'ভোজন বেড়ের'[২৯৮] উপর থালা রক্ষা করেন; আর সাধারণ পরিবারে 'ভোজন বেড়' অভাবে বাঁশের চ্যাচাড়ী নির্মিত 'মেজাং'[২৯৯]

(২৯৫) "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং' --- কুমার সম্ভব।

(২৯৬) ডাক্তারগণের মতে যে হাতে জলসৌচ করা হয়, খাদ্যদ্রব্যে তাহা স্পর্শ না করাই কর্তব্য; কেননা তাহাতে কৃমিডিম্ব থাকে। এই ডিম পুনরায় কোনরূপ শরীরাভ্যন্তরে ঢুকিতে পারিলে ফুটিয়া যায়।

(২৯৭) পরন্তু যে হাতে আহার করে, সেই হস্তেই মুখপ্রক্ষালন করিয়া থাকে। অনেকে মুখ প্রক্ষালনজন্য খাইবার যায়গা হইতে আর উঠে না। মঞ্চের দুইটি বাঁখারী ফাঁক করিয়া 'কুলি' করিয়া লয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুখপ্রক্ষালনের নিমিত্ত 'ওলদান' ব্যবহৃত আছে।

(২৯৮) প্রায় বিতস্তি পরিমাণ উচ্চ ত্রিপদ 'বেড়' বিশেষ। ইহার উপর থালা স্থাপন করিয়া ভোজন করা হয় বলিয়া, 'ভোজন বেড়' নামে কথিত হইয়া থাকে।

(২৯৯) মেজাং - সচ্ছিদ্র ঝুড়ি বিশেষ; ইহাতে ভোজন বেড়ের কাজই চলে।

এর উপর থালা, মৃণ্ময় বাসন কিম্বা কদলী পত্রে ('পৈ') ভোজন করিয়া থাকে। 'পৈ' চিৎ করিয়াই পাতা হয়। ভাতের মধ্যে মধ্যেই 'তৈল' অর্থাৎ ব্যঞ্জন লয়; সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাটীর ব্যবহারও আছে। ইহাদিগের সচরাচর প্রচলিত খাদ্য ও পানীয়ের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

চাউল — আতপেরই প্রচলন অধিক; সিদ্ধ একরূপ নাই বলিলেও হয়। পাহাড়ী চাউলে তৈলের ভাগ কিছু বেশী এবং অধিকাংশই মোটা। কিন্তু ইহারা চাউলগুলি এমনি ছাটিয়া খায় যে, সহসা দেখিলে মোটা চিকণে প্রভেদ বুঝা যায় না। তত অধিক পুরাতন চাউল মাত্রই পছন্দ করে না। এমন কি তৈলাক্ত হইলেও নূতন চাউলই খায়; এবং বৎসরন্তে উদ্বৃত্ত ধান বিক্রি করিয়া নূতন খরিদ করে।

দাল — খুব কম প্রচলিত; নিমন্ত্রণাদিতে বা ভদ্রপরিবারে মাত্র সময়ে সময়ে দেখা যায়। কিন্তু শিমের বীজের দাল ইহারা অতিশয় ভালবাসে।

শাক— নানা রকমেরই আছে তন্মধ্যে এই কয়টিই সমধিক প্রচলিত। উচ্ছে শাক, "লেলাং শাক," "উজন শাক," ঢেঁকি শাক, "মাইয়া শাক", কচু শাক, "লোংরা শাক", বাথুয়া শাক, গিমা শাক, পুঁই শাক, "ইয়রেং শাক", "আমিলাপাতা শাক", প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন নবোদগত আম পাতা, পেয়ারা পাতা, কাঁঠাল পাতা প্রভৃতিও শাকের শ্রেণীভুক্ত হয়। শাক পাক করিবার সময় লবণ ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হয় না। খাওয়ার সময় কাঁচা কি পোড়া লঙ্কা তাহাতে 'গুজি-গুজি' আহার করে। কোন কোন শাক আগুনে চড়াইবারও প্রয়োজন হয় না। 'ভুভুজি' কুটিয়া লবণ সহ বাঁশের মধ্যে ভরে। অনন্তর 'গুতাইতে-গুতাইতে' যখন নরম হইয়া আসে, তখন বাটা লঙ্কা মিশাইয়া আনন্দের সহিত আহার করে। বিশেষতঃ লাউপাতা, কুমুড় পাতা প্রভৃতি কেবল কিয়ৎক্ষণ রগড়াইয়া এবং 'লেলম পাতা' মাত্র কিয়ৎক্ষণ বগলতলায় রাখিয়া ঈষদুষ্ণ হইলে লবণ ও মরিচ সহযোগে স্বচ্ছন্দে খাইয়া ফেলে। ইহারা লেবু পাতা, তেঁতুল পাতা, কামরাঙ্গা পাতা ইত্যাদিতে টকেরও সমধিক প্রিয়।

তরকারী — ইহাদের অপর্যাপ্ত। জুমে শশা, কুমুড়, "মারফা" বেগুন, চাক্‌মা কচু প্রভৃতি যথেষ্ট মিলে। কাঁচাকলাদি এখানে এত অধিক ও সুলভ যে, কলিকাতা প্রভৃতি নগরীতে ৫/৬ গুণিত মূল্য দিয়াও এমন পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এ পাহাড়ের মান ও ওল কচু অতিশয় প্রসিদ্ধ; এরূপ আর কোথাও মিলে না। উহা অতি অল্প আয়াসেই এত সিদ্ধ হইয়া যায় যে, নূতন ভোক্তা কচু কি আলু খাইতেছে, উপলব্ধি করিতে পারে না। এখানে নানা রকমের আলু প্রাপ্ত হওয়া যায়। শূকর ও সজারু যে সকল মূল আহার করে, ইহারা তৎসমুদয়ই আপনাদের খাদ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ইহাতে দরিদ্র পরিবারের বহুল অভাব নিবারিত হয়। বিশেষতঃ গত দুর্ভিক্ষে একমাত্র এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়াই অধিকাংশ পরিবার আত্মরক্ষা করিয়াছে। এ দুর্ভিক্ষে যদিও সহৃদয় গভর্নমেন্ট এবং স্থানীয় রাজন্যবর্গ প্রায় লক্ষাবধি টাকার সাহায্য

করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি কথিত মূলাদি সুলভ না হইলে খুব সম্ভব — এই পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী কালের করাল কবলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইত! এক বা দুই মুষ্টি চাউলের সহিত প্রভূত পরিমাণে 'বাঁচ্চরী' অর্থাৎ বংশাঙ্কুর এবং মূলাদি সিদ্ধ করিয়া ৫/৬ জনবিশিষ্ট পরিবার চলিয়াছে। শেষোক্ত উপকরণ বিশেষতঃ বাঁচ্চারী শীঘ্র জীর্ণ হয় না, সুতরাং অনটন কালে ইহাতেই দগ্ধোদর পরিপূরণ করিতে পারিলে কিছু বেশী সময়ের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়। 'বাঁচ্চরী' দুর্ভিক্ষকালেরই প্রধান আহার্য সত্য, কিন্তু সচরাচর তাহাও বেতসাগ্র প্রভৃতি সুখাদ্য স্বরূপেই আহার চলে। কলা, বেগুন, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তরিতরকারী সম্বন্ধে ইহাদের একটা প্রধান বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় যে, কাঁচা অপেক্ষা পাকাতেই তাহাদের আগ্রহ বেশী। সততই শুনিতে পাই, এই সকল পাকা তরিতরকারীর বীজ ছাড়াইয়া পাক করিলে অতিশয় সুস্বাদু হয়। তরকারীর মধ্যে ডালনা, চচ্চরীরই প্রচলন অধিক; তদ্ভিন্ন লাউ, "মারফা" প্রভৃতি কোন কোন তরকারীর 'কোর্বোয়া' অর্থৎ ছেঁচ্‌কীও খাইতে দেখা যায়।

ফল — ও নানাবিধ মিলে। বিশেষতঃ আরণ্যফলের অভাব নাই। যে যে ফল বানরে আহার করে, তৎসমুদয়ই ইহারা খাইয়া থাকে। ইহা অতি সুন্দর নির্বাচন বটে। আদিম মানবসমাজে, বর্তমান ভক্ষ্যসমুদয়ের নির্বাচনে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইহাদিগের চেষ্টা দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমরা তাঁহাদের আবিষ্কৃত পথে পদক্ষেপ করিতেছি মাত্র। অতিশয় বুদ্ধিমানেরা যে সতত 'নগণ্যস্যাগ্রতৌ গচ্ছেৎ' মন্ত্রের আড়ালে থাকিতে চেষ্টা করেন, সকলেই যদি তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে সংসারে উপায় কি হইত জানি না! ফলের সাধারণ নাম 'গুলা'। কুল, কাউ প্রভৃতি 'খট্টাগুলা' (অম্লফল) ইহারা সাতিশয় ভালবাসে এবং আম, চালতা, তেঁতুল প্রভৃতির 'কাজী' অর্থাৎ অম্বল প্রায়শই খায়।

মৎস্য — সদ্য অপেক্ষা পঁচাতেই আগ্রহ বেশী, এমন কি কোন কোন মাছ ইচ্ছা করিয়াই পঁচাইয়া খায়। ভক্ষণীয় মৎস্যের বিস্তারিত তালিকা আর কি দিব? কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'ছুছুং' ছাড়া আর কোনও মাছ খাইতে ইহাদের বাধা নাই।

শুক্‌টী — তাজা মাছ হইতেও অধিকতর উপাদেয় বলিয়া গণ্য; বিশেষতঃ অগ্নি-উত্তাপে শুষ্ক হইলে — আদর আরও বাড়ে। বাজারে দেখিয়াছি, নিম্নশ্রেণীর চাক্‌মাগণ, চিংড়ি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যের শুকটী চিবাইয়া সুস্বাদু কিনা পরীক্ষা করে। ইহাদের সমাজে শুক্‌টী বলিতে কেবল শুষ্ক মৎসকে বুঝায় না, মাংসের শুক্‌টীও আছে। পাঁঠা ব্যতীত অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ জন্তুর মাংস দুইচারিবেলা খাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, শুকাইয়া রাখে। পরে তাহা আবশ্যকক্রমে পাক করিয়া আহার করে। শুক্‌টী 'মিশাল' নামেই পরিচিত, তরকারী মাত্রেই ইহা মিশাইয়া দেওয়া হয়।

মাংস — নানা প্রাণী হইতেই আহৃত হয়। পাখীর মধ্যে শকুনী, ভিংরাজ প্রভৃতি কয়েকশ্রেণী ভিন্ন অপর গুলি খাইতে আপত্তি নাই। সাপের মধ্যে — 'অরল সাপ', 'সূতানালা সাপ',

'দোমুখা সাপ', 'বামন সাদা সাপ', 'কুলাচাক্ সাপ' (ইহা খাইতে গন্ধ করে), 'কালন্দর সাপ' (ইহার শরীর হইতে মোরগের গন্ধ উঠে) মাত্র বাদ। সাপ মারিয়া প্রথমে মাথা ও অন্ত্রাদি ফেলিয়া দেয়, অনন্তর আগুনে সেঁকিয়া চামড়া ছাড়াইয়া ফেলে;অপরাপর প্রক্রিয়া সাধারণ। সর্প সমাজের নিকৃষ্ট সম্প্রদায়েরই খাদ্য বটে, কিন্তু গোসাপ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি শুনা যায় না। অধিকন্তু যাবতীয় মাংসের মধ্যে 'গুই'য়ের মাংসই নাকি সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু; ভেকের মাংস দ্বিতীয়। বেঙ নানা জাতীয় আছে। তন্মধ্যে 'গাছ বেঙ', 'শাক বেঙ', 'ভাট বেঙ', 'ডোবা বেঙ', 'কর্কডি বেঙ', 'কুদুবিচি বেঙ', 'ঘর বেঙ', 'কানা বেঙ', 'চঙা বেঙ', 'ঘিলা বেঙ', 'খচ্ছোয়া বেঙ' ইত্যাদিই সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। শেষোক্ত দুই জাতীয় বেঙকে আঘাত করিলে ফুলিয়া উঠে। সাধারণ চাক্‌মাগণ বর্ষাগমে বৃষ্টির পর রাত্রে মশাল জ্বালাইয়া যষ্টি হস্তে ভেকশিকারে বাহির হয়। পূর্বোক্ত বেঙের মধ্যে কোন কোনটি আবার খাইতে নিষেধ আছে। কারণ যথা, — 'ঘিলা বেঙ' খাইলে মাথা ঘুরায়, 'খচ্ছোয়া' বেঙের গলমধ্যে একখানি কাল পর্দা থাকে, তাহা খাইলে গলা ফুলিয়া যায়, এমন কি প্রাণবিয়োগেরও সম্ভাবনা। 'কর্কডি' ও 'ডোবা বেঙ' তজ্জাতীয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট। শুনিতে পাই, বেঙের অন্যবিধ পাক হইতে ভাজাই অধিকতর সুখাদ্য। পশুর মধ্যে শূকর, মহিষ, হরিণ, ছাগল, বাঘ, বিড়াল প্রভৃতি অনেকেই খাদ্য শ্রেণীতে পরিগণিত; কেবল কুকুর, হাতী, গরু ইত্যাদি কয়েক জাতীয় পশু মাত্র ভক্ষ্য তালিকা হইতে মুক্তি পায়। বিবাহে মহিষকাটা অবশ্য কর্তব্য! শূকর মারিয়া চামড়া ফেলিয়া দিলে একেবারে সাদা হইয়া যায়, পাকপ্রক্রিয়া অপরাপর মাংসের ন্যায়। বরাহ-মাংস অতিশয় তৈলাক্ত, কিন্তু মহিষ-মাংস বড়ই নীরস; মাংসের পরিমাণ সামান্য হইলে সঙ্গে 'থোড়' দিয়া পাক করিয়া থাকে।

ডিম — হংস, কুক্কুট, কচ্ছপ ও গোসাপের ডিম্বই ক্রমোৎকৃষ্ট। কাক, ময়না, খঞ্জন, দয়েল, চিল, পেচক, শকুনী প্রভৃতি ব্যতিরেকে আর সমুদায় পক্ষীর ডিম্বই ইহারা খায়।

শামুক ও কীটপতঙ্গ — নিম্ন সম্প্রদায়ের সচরাচর আহার্য। প্রায় সকল জাতীয় শামুকই তাহারা খাইয়া থাকে। ইহাদের ভাষায় কীটপতঙ্গ উভয়েরই সাধারণ আখ্যা — 'পোগ' অর্থাৎ পোকা 'পোগ' নাকি ভাজিয়া খাইতে অতিশয় সুস্বাদু;বিশেষতঃ "চেরাই পোগ' ভাজা সর্বোৎকৃষ্ট। এই পতঙ্গবিশেষ সংগ্রহের নিমিত্ত ইহারা বর্ষাকালে সন্ধ্যার সময় গৃহসম্মুখে একখানি সাদা কাপড় পাতে, এবং তাহার কিয়দ্দূর উপরে একটি মশাল রাখে। অনন্তর দুইখণ্ড বাঁশের বাখারী লইয়া বাজাইতে বাজাইতে ডাকিতে থাকে, —

"চে-রে — চে-রে—চে-রে ....
চেরাই পোগা চেরাইয়া,
অংচেরে অংইয়া;
ধোপ কাপড়ৎ পড়ি-যা

হাগনি-চালৎ মরি-যা;
তোরে পেলেন খাইয়া;
তোরে মজা'লৈ ভাত মজা,
কদু গেলারে বাঁদরী গোছা ?" ইত্যাদি

তাহাতে রাশি রাশি মদলুব্ধ পতঙ্গ অনল-আলিঙ্গন প্রয়াসে আত্মসমর্পণ করে, ও বস্ত্রখণ্ডে পতিত হয়। কিন্তু 'ওয়া-কালে' 'চেরাইপোগ' ধরা নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত 'ধূল্যাপোগ' বালি হইতে ফুৎকার দ্বারা এবং ঘুংরাপোগ মাটি খুঁড়িয়া বাহির করে।

লবণ — সাধারণতঃ আমাদের হইতে কিঞ্চিৎ বেশী খায়। পাতে নুন খাওয়া ইহাদিগের জাতীয় পদ্ধতি। বৈদেশিক লবণের পশার বৃদ্ধির পূর্বে ইহারা এক রকম পার্বত্য বাঁশের ভস্মে জলের ধারা দিয়া লবণ বাহির করিত। তা'ছাড়া পাহাড়ের স্থলবিশেষে এমন প্রস্তরখণ্ড আছে, তৎসমুদায় হইতে লবণাক্ত জল নিঃসৃত হয়। অদ্যাপি তাহাতে অনেকে উপকৃত হইতেছে।

লঙ্কা মরিচ — অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এমন কি, পোড়া শুক্‌টীর মাথা, রসুন ও লবণ সহযোগে যে 'মরিচ বাটা' প্রস্তুত হয়, তাহাতে লঙ্কার ভাগ এত থাকে যে, — দেখিতেই ভয় হয়;অথচ ইহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত ভ্রুকুঞ্চনমাত্রও না করিয়া তাহা খাইয়া ফেলে! মরিচাদি পেষিবার নিমিত্ত শিলনোড়ার প্রচলন বিরল। 'চারী'র গঠনে মাটির 'কুর্যা' প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া লয়। সেই কুর্যার মধ্যে লঙ্কা দিয়া গুতাইতে গুতাইতে নরম করিয়া থাকে। অনেকে অতদূর অসুবিধাও স্বীকার করিতে চাহে না;আগুনে একাটুকু সেঁকিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া তরকারীতে দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন —

তৈল ও গোলমরিচের — ব্যবহারও সাধারণ সম্প্রদায়ে কচিৎ ঘটে। গরম মশলা নাই বলিলেই হয়;তৎপরিবর্তে তণ্ডুলচূর্ণ শুষ্ক করিয়া রাখে;তাহার কিছু কিছু তরকারীতে ছড়াইয়া দিলে নাকি মসলার গন্ধ পাওয়া যায়। ঘৃত ইহাদিগের পক্ষে সুলভ, কিন্তু অনেকেই খাইতে চাহে না।

পিষ্টক — বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য। আত্মীয় বাড়ী যাইতে, প্রধানতঃ বিবাহের প্রস্তাবনাসূচক 'তত্ত্বে' পিঠা নেওয়া একান্ত আবশ্যক। পিষ্টক নানাবিধই প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কয়জাতীয়ের বিবরণ যথা; (১) "খগাপিদা; —" জলসিক্ত 'বিনি' চাউল পাতায় মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে: অর্থাৎ একটি জলপূর্ণ 'হাঁড়ির' মুখে অপর একটি সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্রতর 'হাঁড়ি' বেশ করিয়া আঁটিয়া লাগায়, পরে তাহা জ্বালের উপর স্থাপন করিয়া উপরের পাত্রে পত্রমণ্ডিত তণ্ডুলগুলি রাখে এবং তাহার মুখেও ঢাকনী দেয়। ইহাতে নীচের পাত্রোত্থিত বাষ্পে উপরিস্থিত পিঠা সিদ্ধ হইয়া যায়। (২) 'বিনি পিদা' — "বিনি চাউলের আটা পাতায় মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে। এই দুই পিঠাতেই নারিকেল 'কোড়া' দিবার রীতি আছে। (৩) "কলা পিদা" — যে কোন চাউলের মিহি আটায় পাকা কলা মাখিয়া লয়। অনন্তর তাহা পাতায় আয়তাকারে

মুড়িয়া বাম্পে সিদ্ধ করে। চট্টগ্রামে ইহা "কলবড়া পিঠা" নামে প্রসিদ্ধ। (৪) "বেঙ্‌পিদা" — যে কোন চাউলের মিহি আটাতে যৎসামান্য জল মাখিয়া পাতায় চতুর্ভুজাকারে মোড়ে; অনন্তর বাম্পে সিদ্ধ করে। এই পিষ্টক সচরাচর রোগীকে পথ্য স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। (৫) "সান্যা পিদা" — খুব মিহি চাউলের আটার ডেলা করা হয়। তাহা বাম্পে সিদ্ধ করার পর চূর্ণ করিয়া তদুপরি নারিকেল কোড়া ছড়াইয়া দেয়। অতঃপর কিঞ্চিৎ জল মাখিয়া পুনর্বার গোলা করে এবং তন্মধ্যে গুড় কি চিনি দিয়া হাতে কি থালায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডিম্বাকৃতি করিয়া লয়। অতঃপর তাহা বাম্পে সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। (৬) "বরাপিদা" — 'বিনি' বা অপর সাধারণ চাউলের মিহি আটায় কিঞ্চিৎ জল মাখিয়া তৈলে ভাজিয়া লয়। (৭) "পাক্কোন (মুসলমানী আখ্যা — পাক্কোয়ান) পিদা" — চাউলের মিহি আটা (তন্মধ্যে 'বিনি' চাউলের আটাও সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া দিলে ভাল ফুলে) ও গুড়ে কিঞ্চিৎ জলদ্বারা একত্রে মাখিয়া তাহা তৈলে ভাজিয়া থাকে। এই শেষোক্ত দুই পিষ্টকের আকৃতি গোলাকার। পিঠা সাধারণতঃ শূকরের চর্বিতেই ভাজা হয়; নিতান্ত অভাব না হইলে সরিষা বা অপর কোন তৈলে ভাজে না। কেননা, শূকরের চর্বিতে না কি অধিকতর মুখরোচক হইয়া থাকে। (৮) "দুঁ-ই পিদা" — চাউলের আটা নারিকেলের মালায় করিয়া বাম্পে সিদ্ধ করে। (৯) "ইন্দুর লাদি পিদা" — চাউলের আটায় জল মাখিয়া ইঁদুরের লাদের আকারে আকারে পাকায়, পরে চিনি যোগে সিদ্ধ করে। বাম্পে সিদ্ধ পিষ্টক পর্যসিত হইলে, ইহারা তাহা আগুনে সেঁকিয়া খাইয়া থাকে।

ভাজাপোড়া — ইহাদিগের মধ্যে খুবই কম প্রচলিত। চিড়ে বা মুড়ির ব্যবহার সকলে অদ্যাপি শিখে নাই। কেবল মাত্র "ধান খোলা" করিতে অর্থাৎ খই ভাজিতে জানে। ইহারা ভুট্টা-সিদ্ধ, পোড়া ও ভাজা ত্রিবিধ রূপেই খাইয়া থাকে।

জল — ও ভাত পাহাড়ীগণ এত পরিষ্কার খায় যে, তাহারা তজ্জন্য আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য। খাওয়ার এবং "ফেলা ঝোলা" করিবার 'পানি' (জল) বিভিন্ন থাকে। যে সময়ে খালের জল ঘোলা হয়, তখন ইহারা ঝরণার জল পান করে। পানীয় জল সংগ্রহের নিমিত্ত চাক্‌মা রমনীরা এই দুর্গম পার্বত্য পথে দূরবর্তী স্থানে যাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। খাবার জলের ঝরণা যথাসাধ্য পরিস্কৃত রাখে; কাপড় কাচা প্রভৃতি হইতে দেয় না। আমি যখন এখানে নূতন আসি, সেই সময়ে রাঙামাটি স্কুল বোর্ডিং-এর একটি ঝরণায় স্নান করিতাম। সেই ঝরণার জলই বোর্ডিং-এর ছাত্রগণ পান করিত। কিন্তু আমি পূর্বাভ্যাস বশতঃ স্নানের পূর্বে 'তয়েল' (towel) খানি ঝরণায় ডুবাইয়া লইতাম। ইহাতে যে কোন আপত্তি হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। এরূপে কয়েকদিন গেলেও ছাত্রেরা লজ্জায় আমাকে কিছু বলে নাই। অনন্তর একদা জনৈক বুদ্ধিমান ছাত্র অতি বিনীত কৌশলে আমাকে তাহাদের আপত্তির কথা জানাইল।

বলিতে কি, আমি তাহাতে যেমন লজ্জিত হইয়াছিলাম, পক্ষান্তরে পানীয় জলের প্রতি তাহাদিগের এরূপ সাবধানতা দেখিয়া ততোধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম।

কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন,[৩০০] — "এই পাহাড়ে এক রকমেব লতা আছে, তাহা কাটিলে স্বচ্ছ ও সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। উচ্চ পর্বত লংঘনার্থীদিগের এই লতার রসই একমাত্র পিপাসা নিবারণের উপায়। আশ্চর্যের বিষয় যে, লতাখানিকে এক ঘায়ে কাটিলে কিছুই পাওয়া যায় না, আবার ৩/৪ ঘায়ে কাটিলেও শুকাইয়া যায়। কিন্তু যদি তাড়াতাড়ি (উপরে ও নীচে দুই স্থানে দুই খায়ে) কাটা যায়, তাহা হইলে এক বড় গ্লাসের প্রায় অর্দ্ধেক পরিষ্কার শীতল জল বাহির হয়। পাহাড়ীরা বলে, লতাখানিকে যখন কাটা যায়, তাহার জল ঊর্দ্ধ মুখে ধাইতে চাহে।"

ইহারা ভাত খাইবার সময় জল পান খুব কমই করে। কিন্তু পরে যখনি তৃষ্ণা পায়, তখনই তাহা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত জুমে যাইবার কালে তথায় খাইবার জলের অভাব বুঝিলে বাড়ী হইতে চুঙা করিয়া জল লয়। "কোত্তি"[৩০১] করিয়াই ইহাদের জল পানের নিয়ম। তাও মুখ না লাগাইয়া খায়; ইহাতে অবশিষ্ট জল দূষিত হইতে পারে না।

দধি-দুগ্ধ — ও ইহাদের যথেষ্ট সত্য, কিন্তু অতি অল্প লোকেই সদ্ব্যবহার করে। বিশেষতঃ পেটের অসুখ হইবার ভয়ে মহিষের দুধ বা দই প্রায়ই খায় না। যাহাদের খাইবার অভ্যাস আছে, তাহারা মাত্র গরুর দুধ-দই-ই খায়। তন্মধ্যেও আবার অনেকে আহারের পর মুখক্ষালনের শেষে এই দুধ বা দধি খাইয়া থাকে। অত্রত্য পাহাড়ীয়া বাঁশের চুঙাতেই দই জমায়; তাহাতে তৈলাক্ত অংশ নষ্ট হয়। সুতরাং চুঙার মহিষের দধিতেও অনিষ্টের সম্ভাবনা কম। ইহারা দুধ হইতেও দইকে অধিক পছন্দ করে।

সুরা — ইহাদিগের মধ্যে অতিশয় সাধারণ।[৩০২] প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ভাটি রহিয়াছে। ইহারা ইচ্ছানুরূপ সুরা প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু বিক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই। স্ত্রী এবং বর্তমান শিক্ষিত সমাজে মাত্র মদ্যের প্রচলন অধুনা কিঞ্চিৎ বিরল, নতুবা ইহারা অভিভাবকের সম্মুখে সুরাপানেও লজ্জাবোধ করে না। বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে পান তামাকের সহিত মদের বোতলটিও যে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। এতদ্ভিন্ন নিমন্ত্রণে ইহা অবাধে চলে। এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর কিছুক্ষণ পবে পরে মদ্য পরিবেশন করিবার ভার থাকে। বিবাহ, উৎসব এবং নানাবিধ ধর্মকার্যে ইহার ব্যবহার এত অধিক যে,

(৩০০) The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, Page-9

(৩০১) জলপাত্রবিশেষ, গঠনপ্রণালী গাড়ুর ন্যায়।

(৩০২) পান পাত্র সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে অবশ্য কাচের বা ধাতুজ গ্লাস ব্যবহৃত হয়। দরিদ্রগণ "নয়ানসুক" বাঁশের পাত্রেই প্রয়োজন সাধন করে। এই বাঁশ আয়তনে ৬/৮ ফাফুট এবং পরিধিও প্রায় ৬ (ছয়) ইঞ্চি পরিমিত হইবে।

শুনিলেও আশ্চর্য হইতে হয়[৩০৩]। কুমার বাহাদুরের বিবাহে দেখিয়াছি, এক সুবৃহৎ ঘর কেবল মদ্যকলসীতে পরিপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত মদ প্রজাসাধারণের 'ভট'-প্রদত্ত। এইরূপে ইহাদিগের জাতীয় উপঢৌকন মাত্রেই অল্পবিস্তর মদ্য থাকে। সামাজিক কোন কোন কার্যে মদ এরূপ প্রয়োজনীয় যে, যাহাদের পানের অভ্যাস নাই, তাহাদিগকেও অন্ততঃ মস্তকে স্পর্শ করাইতে হয়। গ্রামে ওলাওঠা প্রভৃতি মহামারী উপস্থিত হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মদে বিভোর থাকে। ইহাদের ধারণা, এই বিষের মধ্যে অপর কোন বিষ স্থান পাইতে পারে না। এই রূপে ইহাদিগের মদ্যপানের কারণ অপর্যাপ্ত নহে। পরন্তু মদ্য পানে ইহারা যে সর্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। এতৎসম্বন্ধে আমি নিজে আর কিছু না বলিয়া, নিম্নে ১৩১১ সালের ১৮ই শ্রাবণ 'জ্যোতি'তে প্রকাশিত একখানি প্রেরিতপত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি, ইহা হইতেই পাঠক-পাঠিকাগণ গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন ঃ—

"ইহারা দেশীয় কৃষক অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিতে পারে; তাহাদের অপেক্ষা বেশী আয় ও করে। ইহারা এত পরিশ্রম ও আয় করিয়াও সুখী হইতে পারিতেছে না। বৎসরের ধান্য ঘরে জমা থাকে না। দিন দিন ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করে। কারণ, ইহারা সকলেই খুব বেশী পরিমাণে মদ্য পান করে। প্রতি ঘরে ঘরে মদ্য প্রস্তুত হয়। মদ্যপান করার কোন নিয়ম নাই; যত ইচ্ছা তত পান করে। ইহাদের মদের তৃষ্ণা এত বেশী যে, দেখা গিয়াছে ভাত খাওয়ার চিন্তা অপেক্ষা মদ তৈয়ার করার বেশী আগ্রহ। যতদিন ইহাদের ঘরে ধান্য থাকে, ততদিন মদের ভাণ্ড খালি থাকে না। দুই তিন দিনের পরিশ্রমে যাহা আয় হয়, ৪/৫ জন একত্রে তাহা মজলিসে ব্যয় করিয়া দেয়। ছোট বড় মজলিস সর্বদা গঠিত হয়। সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া যাহা আয় করে, তাহার অর্দ্ধেক কেবল সুরারাক্ষসীর সেবায় অপব্যয় করে এমন নহে, মদ্য পানে অজ্ঞান হইয়া অনেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও বাদ-বিসম্বাদ করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই সম্পর্কীয় বহু সংখ্যক সালিশ মোকদ্দমা হইয়া থাকে। পুরুষেরা সময়ে সময়ে মদের প্রসাদে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির উপরও যথেচ্ছ উপদ্রব করিয়া গৃহকে অশান্তিময় করিয়া তোলে। আবার ইহাদের বিবাহ, পর্ব, উৎসব ও নিমন্ত্রণাদিতে অনেক বেশী পরিমাণ মদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। তখন যত ইচ্ছা তত মদ্যপান করিতে পারে। সেই সময় অতিরিক্ত মদ পান করিয়া কত জনের অবস্থা কতরূপ তাহার পরিসীমা থাকে না। এই সকল অপব্যয়ে জুমিয়াদের বৎসরে ধান্য জমা থাকে না; বর্ষাকালে কেহ কেহ অনশনও থাকে।"

(৩০৩) "রাজস্থান" পাঠে যেরূপ জানিতে পারি, সুরাপ্রীতিতে রাজপুতগণও ইহাদের হইতে বড় কম নহে। অতিথিসৎকারের "মান্নার পেয়ালা" রাজপুত গৃহীর আবশ্যকীয় গৃহসরঞ্জাম; দেবার্চনা ও রণোদ্যমেও পানকার্যে তাঁহাদের অত্যধিক আগ্রহ।

এই সমুদয় সুরা সচরাচর দ্বিবিধ উপায়ে প্রস্তুত হয়। প্রথম সাধারণ মদ-প্রস্তুত করিতে আগে পর্য্যুসিতভাতে 'মূলী'(৩০৪) মাখিয়া পাতায় আচ্ছাদিত ঝাঁকাতে রাখিয়া দেয় এবং উপরেও পাতা ঢাকা দিয়া থাকে। ২/৩ দিন পরে তাহাতে রসসঞ্চিত হইতে দেখা গেলে নিয়মিত জলের সহিত কলসীতে পূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করে। সেইরূপে আরও ২/৩ দিন রাখিয়া পরে তাহা চুয়াইয়া লয়। এই সাধারণ মদ্য দ্বিতীয়বার পরিশ্রুত করিয়া লইলে শক্তি অতিশয় তীব্র হয়; তাহার নাম "দোচয়ানীমদ"। ইহা অপেক্ষাকৃত দুর্লভ বলিয়া সাধারণ্যে বিরল ব্যবহৃত। দ্বিতীয় "জোগরা"; — তাহার প্রস্তুত প্রণালীতে পরিশ্রমের ভাগ কম। বিনি চাউলের ভাতে "মূলী" মাখিয়া কলসীপূর্ণ করত মুখ বন্ধ করিয়া রাখে ইহাতেই তাহাতে রস সঞ্চিত হয়। এই রসের নামই "জোগরা"। "জোগরা" খাইতে খুব মিষ্ট, এবং মাদকতাও মধুর! ভদ্রপরিবারে ও স্ত্রীসম্প্রদায়ে ইহারই প্রচলন অধিক। পরন্তু মুখতৃপ্তি এবং মৃদুমাদকতায় আমোদ কেবল ইহাতেই সম্ভবে। পূর্বোক্তরূপে সঞ্চিত রস নিঃশেষ হইলে, তাহাতে জল দিয়া আবার কয়েক দিবস ধরিয়া রাখে। অনন্তর সেই জলেও যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টি ও নেশা লাভ হয়। এইরূপে তিন চারিবার পর্যন্ত জল দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ক্রমশই শক্তি কমিয়া আইসে। মাদকতা নিতান্তই কমিয়া আসিলে, কেহ কেহ এই মিশ্রিত জল চুয়াইয়া লয়; তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

তামাক — ইহাদিগের কথায় ধুঁদা। মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষ সম্প্রদায়ে আর প্রায় সকলেই সেবনে অভ্যস্ত। এমন কি, অনেকে গুরুজনের সাক্ষাতে খাইতেও লজ্জাবোধ করে না। তবে গাঁজা, আফিঙ, এযাবৎ ইহাদিগের মধ্যে তেমন প্রবেশ লাভ করে নাই।

পান — ও ইহাদের সাতিশয় প্রিয়বস্তু। অবিরত পান চিবাইতে পারিলে ইহারা নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে। কোন স্থানে যাইতে হইলেও 'পানের খল্যা' কোমরে লইতে ভুলে না। এই 'খল্যা' অর্থাৎ থলিতে পান, সুপারি, চুনের কোটা ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত হয়। বৃদ্ধগণ পানের সহিত তামাকপাতাও খাইয়া থাকে। খয়েরের প্রচলন পূর্বে ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি প্রায় সকলেই তাহা ধরিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর মসলা সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভিন্ন দেখা যায় না। প্রত্যূত পান, সুপারি, চুন — যাহা নিত্য ব্যবহার্য, ইহাদিগের অনায়াস লভ্য। প্রত্যেক বাড়ীতেই "গোছা পানের" "ক্ষেত" রহিয়াছে; বন্য "রামসুপারি" ইচ্ছা করিলে সহজে পাইতে পারে; এবং শামুক পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করিয়া লয়। শুনিয়াছি, এই পানের আদান প্রদান দ্বারাই যুবক-যুবতীর

(৩০৪) "মূলী" — চাউলের আটার সহিত "বড়পেডাগুলা", 'পমা', "কাট্রোয়াডগর" গাছের ছাল, "দেরলদি" লতা, ইক্ষুপাতা প্রভৃতি সমুদয় কিংবা যে কোন পদের রস মাখিয়া ডেলা ডেলা করতঃ খড়ে পোড়াইয়া লয়; ইহা দেখিতে সাদাটে।

প্রণয়-প্রস্তাব চলিয়া থাকে;সঙ্কেত যথা, — যদি মসলাদি সহযুক্ত পানের মধ্যে করিয়া কোনও ফুল বা ফুলের পাপড়ি কাহাকেও প্রদান করা হয়, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, "আমি তোমাকে ভালবাসি"। প্রত্যর্পণ যদি অধিক মসলা এবং বিশেষ ভাবে সজ্জিত কোণায় পান লাভ হয়; তাহা হইলে "আস" — ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে;অথবা প্রতিদত্ত পানে কিঞ্চিৎ হরিদ্রাসংযোগ থাকিলে "আমি এখন পারিব না," কি ভিতরে অঙ্গার খণ্ড দেওয়া হইলে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

পরিশেষে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, উপরিউক্ত খাদ্য ও পানীয় তালিকা চাক্‌মাসমাজের সাধারণ শ্রেণী অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ যাহাদের দ্বারা পুষ্ট, তাহাদিগকে দেখিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে। ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের খাদ্য-নির্বাচন প্রায় উন্নত সভ্যতানুমোদিত। ইহাদের কেহ কেহ মৎস্য-মাংস কি মদ্য সম্পূর্ণই পরিত্যাগ করিয়া আছেন। পক্ষান্তরে ক্রমে মধ্যশ্রেণী সাধারণ শ্রেণী হইতে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া ভদ্র সম্প্রদায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছেন— ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসা ও শুশ্রূষা

চাক্‌মাদিগের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা শাস্ত্র নাই। তাহারা অনেকে রোগ অবধৌতিক ব্যবস্থা মাত্র অবলম্বনেই সারিবার চেষ্টা করে। বিশেষতঃ সুসভ্য মহাশয়দের ন্যায় ইহারা অহর্নিশ শরীরের সেবায় তৎপর নহে; তদ্দিকে অতি সামান্যই দৃষ্টি রাখে। অনেকের সাংসারিক অবস্থাতেও তাহা পোষাইয়া উঠে না; কাজে কাজেই ইচ্ছা না থাকিলেও অনেকে অনেক সময়ে নীরব থাকিতে বাধ্য হয়। তবে ইহা সত্য যে, ইহারা প্রথমে প্রায়শই প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া রহে।

চিকিৎসা

সমাজে হাতুড়ে বৈদ্যের সংখ্যাই অধিক। তাহারা মুষ্টিযোগ এবং 'ঝারা-ফু" মাত্র সম্বল লইয়া ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে সুরতচন্দ্র ও মীননাথ বৈদ্যের নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সকল বৈদ্যের অনেকে অধুনা "কবিরাজী শিক্ষা" বা তথাবিধ পুস্তক আশ্রয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মন্থনেও মনোযোগ দিয়াছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই এযাবৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তথাপি উন্নত সম্প্রদায়ের আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসার প্রতি ভক্তিমত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে কয়জন বাঙালী কবিরাজও বাস করেন, কঠিন রোগে চট্টগ্রাম হইতে সুবিজ্ঞ কবিরাজ আনান হয়। সম্প্রতি ইংরাজরাজের কৃপায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতিও ইহাদিগের অনুরাগ পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থাই ইহার কারণ।[৩০৫] অন্যতঃ কিছুকাল হইতে খৃষ্টিয়ান মিশনারীগণও এই দরিদ্র পাহাড়ীদিগের চিকিৎসাবিধানের প্রতি সাতিশয় মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন।[৩০৬] তদ্দ্বারাও এলোপ্যাথির প্রতি ইহাদের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। রাজ পরিবারের

চিকিৎসক

(৩০৫) ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাঙামাটি ও বান্দরবনে মাত্র দুইখানি হাসপাতাল ছিল; সেই সনের উভয় হাসপাতালের রোগী সংখ্যা একুনে ১১৪৭৭। অনন্তর লামা, বড়কল, রামগড়, মাহালছড়ী এবং মাণিকছড়ীতেও দাতব্য চিকিৎসা বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই সকল সরকারী চিকিৎসাগারে গত বৎসর (১৯০৮ খৃঃ অঃ) মোট ৩০৫১৯ জন রোগী সাহায্য পাইয়াছে, তন্মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা ৭২৮। এই তালিকার এক রাঙামাটি হসপিটালেরই রোগী সংখ্যা ১২৪৬০ জন; তাহাতে indoor ৯৯, outdoor ১২৩৬১ এবং অস্ত্র চিকিৎসা ১৬৩। এই জিলার চিকিৎসা কার্যে ১৯০৭ ০৮ সনে গভর্নমেন্টের ১৪৬৮৪, ৫ পাই গিয়াছে, পর বৎসরের ব্যয় পরিমাণে ১৬০।।১১ পাই।

(প্রসঙ্গত বলিতে হয়, এখানকার ভেক্সিনিসানের নিমিত্ত ও গভর্নমেন্ট বার্ষিক প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

(৩০৬) প্রথমে ১৯০৫ অব্দে রাঙামাটিতেই তাঁহাদের এই চিকিৎসা বিভাগ খোলা হয়। সেই বৎসর রোগী সংখ্যা প্রায় ২০০০ হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী বৎসরেই তাহা চন্দ্রঘোনায় স্থানান্তরিত করেন; তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে ঘুরিয়াও তাঁহারা ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন। এইরূপে ১৯০৭ সনে তাঁহারা চন্দ্রঘোনায় ১১৯১৪ এবং মফস্বলে ৬৮৫ জন রোগীকে চিকিৎসা সাহায্য প্রদান করেন; তন্মধ্যে ১২৪টি অস্ত্রচিকিৎসা ছিল।

তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত স্থানীয় গভঃ হসপিটাল এসিষ্টান্ট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। জনৈক কবিরাজ রাজসরকার হইতে ঐরূপ বৃত্তি লাভ করেন। কিছুদিন গত হইল, রাজা বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীমান মদনমোহন দেওয়ান কলিকাতা কাম্বেল বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। যদিও তিনি সরকারী কর্মে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদ্বারা স্বজাতি ও স্বদেশের বহুল উপকার ঘটিবে, আশা করা যায়।

শুশ্রূষা

রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রত্যেক জাতিতেই আছে সত্য, তবে সাধারণতঃ ইহাতে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ শুশ্রূষা অপেক্ষা চিকিৎসাকেই আরোগ্য লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা মনে করেন। অপর দলের অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুতঃ ইহা ধ্রুবসত্য যে, শুশ্রূষার প্রতি উদাসীন থাকিলে শত চিকিৎসাতেও ফললাভ অসম্ভব।[৩০৭] বিশেষ কি, কেবল শুশ্রূষার উপর নির্ভর করিয়াই অনেককে রোগকবল হইতে রক্ষা পাইতে দেখা গিয়াছে। চাক্‌মাদিগের প্রায় সকলেই শোষক্ত মতাবলম্বী;ইহারা শুশ্রূষার নিমিত্ত যথাসাধ্য সাবধান থাকে, কাহারও অসুখ হইলে প্রতিবেশী অপরেরা আসিয়া সাহায্য করিতে পরাম্মুখ হয় না।

চিকিৎসা শাখা

পক্ষান্তরে ঔষধ প্রয়োগই চিকিৎসার একমাত্র প্রক্রিয়া নহে, প্রকার বিশেষ মাত্র। সাধারণ অসুখাদিতে — ১। মন্ত্রপূত কবচ ধারণ বা 'ফু' ঝাড়িলেই যথেষ্ট, তদাপেক্ষা কঠিন রোগে — ২। মুষ্টি যোগের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন রোগ নিতান্ত সাংঘাতিক হইলেও, মাত্র এই দ্বিবিধ চিকিৎসায় আশ্চর্যজনক উপকার পাওয়া যায়। কবিরাজী, ডাক্তারী বা হাকিমী প্রভৃতি চিকিৎসা এই শেষোক্ত শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। আর যখন বুঝা যায় রোগ সহজে দূর হইবার নহে, তখন — ৩। দেবতা বিশেষের পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতেই নাকি রোগের চরম শান্তি হইয়া যায়।

কবচ ও মন্ত্রপ্রয়োগে চিকিৎসা

শুনিতে পাই, কবচ ও মন্ত্রশক্তিতে নানা বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়া থাকে। ইহারা প্রাচীনকালে এতৎ প্রভাবে ভূতপ্রেত নাচাইতে পারিত; আরব্যোপন্যাসের দৈত্য-বশীকরণ ক্ষমতাও ইহাদের দুর্লভ ছিল না। অর্থাৎ কবচ বা মন্ত্রবলে সেকালে অসাধ্যসাধন হইত, কিন্তু নানা অত্যাচার অবিচারে এখন সে শক্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। তথাপি অধুনা মন্ত্রশক্তিতে সাপ ধরা বা সাপের বিষ নষ্ট করা চলে। এমন কি, ইহাতে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস রোগগুলিও নিবারিত হয়;এবং আমরণ জ্বর, বাত প্রভৃতির উপদ্রব শূন্য হওয়া যায়। মন্ত্রের এই দৈবশক্তি শিক্ষিত সমাজও অস্বীকাব করেন না।

মন্ত্রের সাধারণ আখ্যা — 'ফু'। ইহা পাঠের পর ফুৎকার দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে, বিশেষতঃ অন্যলোকে কেবল 'ফু' মাত্র শুনিতে পায় বলিয়াই বোধ হয় ইহার এই সংক্ষিপ্ততম অভিধা

(৩০৭) কথিত আছে, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কালীচরণ লাহিড়ী মহোদয় জনৈক রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া গৃহের ছানি অভাব দর্শনে 'প্রেস্কৃপসনে' এক গাড়ী খড়ও ধরিয়া দিয়াছিলেন।

প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ এই মন্ত্রগুলি ইহাদের স্বকীয় সম্পত্তি কিনা, তাহাই সন্দেহের বিষয়। ভাষা ও ভাব দৃষ্টে এই সমুদয়ের কোন কোনটী যে অনতিপূর্বেই (চট্টগ্রামের) হিন্দুসমাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। নমুনাস্বরূপ সাধারণ একটি মন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি;

যথা —

"ওম্ হুঙ্কার
(রোগীর নাম) এর বাঁধম্ দশমীর দশ দুয়ার।।
আঠার মোকাম ভিরম্ নিরঞ্জন,
আজ্ঞা করিবে কালিকা-চন্দ্রিকায়;
হিতে বাঁধম্, পিতে বাঁধম্,
বাঁধম্ চৌচালা।
চোখেতে চোখ বাঁধম্ যম রাজার পোলা।।
আকাশের ইন্দ্র বাঁধম্ , পাতালে উনকোটী নাগ।
(রোগীর নাম) এর পঞ্চ প্রাণী রক্ষাতাক্।।"

প্রত্যূষে খালিপেটে নদীর স্রোতোহভিমুখী জলে একটী কলসী পূর্ণ করিয়া, সেই জল উক্ত মন্ত্রপূত করিয়া লয়;তদ্দ্বারা স্নান করিলেই যে কোন জ্বর বিদূরীত হইয়া থাকে। "খায়ৎ খগুাস লাগিলে"ও অর্থাৎ যদি কোন ঘা কোনপ্রকারে দূষিত হইয়া পড়ে, ঐ মন্ত্রপূত জলে ধুইয়া লইলে, তাহা অচিরে শুকাইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এই মন্ত্র শরীরে পড়িয়া দিলে — "গা-বন" হয়, অর্থাৎ ভূত-প্রেত-সাপ-বাঘ প্রভৃতি হইতে দেহ নিরাপদ থাকে।

মুষ্টিযোগ

মুষ্টিযোগ দ্রব্যগুণের সরল চিকিৎসা। উৎকৃষ্টতর সংস্করণে ইহাই ডাক্তারী, হাকিমী, কবিরাজী প্রভৃতি নানাবিধ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। অপরাপর চিকিৎসায় যুক্তিতর্কের মীমাংসা আছে সত্য, কিন্তু মুষ্টিযোগের কৃতিত্বসংবাদ অত্যন্ত বিস্ময়োদ্দীপক। সুখের বিষয়, এখনও চারিদিক্ হইতে ইহার আবিষ্ক্রিয়া চলিতেছে। আশা করি, এইরূপে ক্রমে ভগবানের সৃষ্টিরাজ্য মানব সম্প্রদায়ের অধিগত হইয়া পড়িবে। এস্থলে চাক্‌মা সমাজে প্রচলিত কয়েকটি মুষ্টিযোগতত্ত্ব উদ্ধৃত করিলাম। বলা বাহুল্য, মদীয় সংগ্রহ অতি সামান্যমাত্র। পাহাড়ীদের বিশেষতঃ চাক্‌মাদিগের প্রত্যেকে কিছু না কিছু পরিমাণে ইহার খবর রাখে।

১। কাটা ঘায় — "রাঙা মোছা মা" গাছের[৩০৮] শিকড় অথবা "বাঁশকাপুর" সহযোগে তেয়রী পাতা বাটিয়া দেয়।

(৩০৮) যে সকল লতা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, 'ডবল কোটেশনের' মধ্যে তাহাদের চাক্‌মা নাম রাখিতে বাধ্য হইলাম।

২। পোড়া ঘায় — সাপের তৈল দিলে শীঘ্রই সারে।

৩। নালী ঘায় — গোরসুনের পাতা ভস্ম করিয়া ঘায়ের মুখে দিলে নালী ভরিয়া আইসে।

৪। দদ্রুতে — "দওলং পাতা" কেরোসিন তৈল, লবণ ও ঝুল মিশাইয়া অতপতপ্তকরতঃ মালিশ করে।

৫। কেশ ফোঁড়া — "বেইশাক" বা "হরিণকান শাক" বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপশমিত হয়।

৬। বিষ-ফোঁড়ায় — "হরিণকান শাক" বিছুটি পাতা এবং "ডুলপান" বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপশমিত হয়।

৭। পাঁচড়া-ফোঁড়া — "ফুলশোঁয়নি" গাছের বাকল, নিমের পাতা এবং ভাটপাতা সিদ্ধজলে ধুইয়া ফেলিলে শীঘ্রই সারিয়া যায়।

৮। বাত ফোঁড়ায় — বিছুটি পাতা ও "ডুলপান" অথবা রাঙা মুছ্যানি পাতা এবং "কাবাখ্যা লুদি" বাটিয়া দিয়া থাকে।

৯। আঙ্গুল হাড়ায় — "হরিণকান শাকের" পাতা এবং ভেরেণ্ডা পাতা বাটিয়া প্রলেপ দেয়।

১০। গতিশীল বা অস্থির বাতে — "মোন্‌চণ্ডা" পাতা, বিছুটি পাতা, "ডাইনের হাত পা", গোমটি পাতা প্রভৃতি বাটিয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করত বাতের ফুলায় লেপিয়া দিলে সারিয়া যায়।

১১। চোখে রক্ত আসিলে — "দের লতির" দুইপ্রান্ত উত্তমরূপে কাটিয়া লয়। পরে তাহার একপ্রান্ত রক্তবেষ্টিত চক্ষুর উপর ধরিয়া অপরপ্রান্তে ফুৎকার দিলে তন্মধ্যস্থিত রস চোখে পড়ে, ইহাতে চোখ পরিষ্কার হইয়া যায়। প্রকারান্তরে একজাতীয় শ্বেতপ্রস্তর জলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘষিয়া সেই জলে চোখ ধুইয়া ফেলিলেও আরোগ্য লাভ হয়।

১২। শিরপীড়ায় — পাতি লেবুর শিকড় তাহার রসে পিসিয়া কপালে প্রলেপ দিলে সারিয়া যায়।

১৩। মাথাধরায় — বাটা সরিষা একখণ্ড নেক্‌ড়াযোগে মাথায় বাঁধিয়া রাখিলেই কমে।

১৪। কেশ উঠা — "ধোপচুয়াঁ ফুল" গাছের শিকড় বাটা জল মাখিলে নিবারিত হয়।

১৫। একশিরা — "হাজগাছ" ও "কোনই গাছের" শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে সারে।

১৬। সান্নিপাতিকে — "বারেঙ্গ্যা লুদি"র রস স্ফীত স্থানে লাগাইলে কমে। অথবা "তলসর

গাছ", "বাঁদরসাঁয় গাছ" ও অশ্বত্থ গাছের বাকল সিদ্ধ জলে মুখ ধুইলে এবং তৎসমুদয় বাটিয়া বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে সান্নিপাতিক দূব হয়।

১৭। হাত পা ভাঙিলে — "হাড়ভাঙা" লতার পাতা বাটিযা ঈষদুষ্ণ করত আহত স্থানে লাগাইলে শীঘ্র সারিয়া যায়।

১৮। কানপাকা — "আদা গুন্‌গুনি" (মণ্ডুরী) ও "জোতানির্বিষ" পাতাব রস অথবা পাটিপাতার রস দিলে আরোগ্য হয়।

১৯। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে -- ক্ষত স্থানে মদের "মূলী" বাটিয়া দিলে ভাল হয়।

২০। কফবৃদ্ধি রোগ — সমান ওজনের তিত পটলের দানা, আপাং ও সাপের পিত্ত পিষিয়া খাওয়াইয়া দিলে কমিয়া যায়।

২১। কাস রোগে — "চেয়দিবা" পাতার রস কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া খাইলে নিরাময় হওয়া যায়।

২২। বুক বেদনায় — "সিগিরাসিক" ও তেজবহল পাতা বা "ডাট্‌বাঙা" গাছ কাটিয়া প্রলেপ দেয়।

২৩। "শূকর পীড়া" অর্থাৎ গলা ও গণ্ডস্থল ফুলিয়া গেলে — শূকরের দাঁত ঘষিয়া বহির্ভাগে প্রলেপ দিয়া থাকে।

২৪। পেট ফাঁপিলে — খুব তীব্র মদ্য পানেই সারিয়া যায়।

২৫। কোষ্ঠকাঠিন্যে — কাচি পেয়ারা পাতা খাইলেই বিশেষ উপকাব লাভ হয়।

২৬। আমাশয়ে — "দের লতি"র কচি পাতা লবণ সহযোগে খাইলে, আরোগ্য লাভ করা যায়।

২৭। পেট কামড়িতে — "আদা গুনগুনি" (মণ্ডুবী)র রস অথবা সাপের পিত্ত খাইলে কমে।

২৮। প্রদর — শ্বেতবর্ণের হইলে সাদা "ভাইট" এবং রক্তবর্ণের হইলে রাঙা "ভাইট" ফুল গাছের শিকড় বাটিয়া সর্বাঙ্গে মালিশ ও তাহার রস পান করাইলে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

২৯। সাধারণ জ্বরে — "বুলপুত্তি শাক" গরম করিয়া তাহার বস কিঞ্চিৎ লবণ সহযোগে পান করিলে অনাময় হওয়া যায়।

৩০। 'নোয়াবিছ' অর্থাৎ অবিরাম জ্বর বিশেষে — "ক্ষংমারেস" কাঁটামাবিস ও "বর্জিয়াল লুদি"র রসে গণ্ডারশৃঙ্গ ঘষিয়া তাহাতে একখণ্ড বহ্নি-প্রতপ্ত লৌহ ডুবাইয়া লয়। ইহা পানে প্রায়শই আরোগ্য লাভ করা যায়।

বস্তুতঃ এ সকলের মধ্যে এমন ভাল ভাল ঔষধও আছে, যাহাদের কৃতকার্যতা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। দ্রব্যগুণের অদ্ভুত শক্তিতে অনেক স্থলে অস্ত্র চিকিৎসারও প্রয়োজন হয় না, এমন কি পাথরী পর্যন্ত এইরূপে সারিয়া যায়। আবার কোন কোন স্থলে একরূপ অবধৌতিক চিকিৎসা দেখা গিয়া থাকে। দু'একটি উদাহরণ যথা — ফোঁড়াদি পাকিলে অরুণরাগলাঞ্ছিত উত্তপ্ত লৌহশলাকা ফুঁড়িয়া দেয়। কাটা ঘা সত্বর না শুকাইবার হইলে, তাহাতে সলবণ কাঁচালঙ্কাবাটা বেশ পুরু করিয়া দিয়া তদুপরি এক প্রতপ্ত লৌহখণ্ড কিয়ৎকালের জন্য চাপিয়া ধরে।

ব্রতপূজাদি দ্বারা চিকিৎসা

এই সমস্ত নিয়মাদি বিশুদ্ধ ধর্মচর্যা নহে, রোগের করাল কবল হইতে বিমুক্ত লাভের প্রয়াস মাত্র। বিপদের প্রবল সংঘর্ষণে হৃদয় বলের পরীক্ষা হয়। মহাপুরুষেরা তাদৃশ "বিপদে ধৈর্য" এবং সৎসাহসকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু বলিতে কি, বিপদের অসহ্য তাড়নায় বাধ্য হইয়া অনেক গোঁড়া নাস্তিককেই দেবতাবিশেষের প্রতি ভক্তিমান হইতে এবং তথাকথিত ধর্মাচরণে তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বারা পীড়ার শান্তি যাহাই হউক মনের শান্তি যে নিশ্চিত লাভ ঘটে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চাক্‌মাগণ যাবতীয় রোগে বিশেষতঃ দুশ্চিকিৎস্য কিংবা বহু চিকিৎসাতেও অনাময় বোগ সমুদয়ে নানা অপদেবতার শক্তি কল্পনা করে, এবং নানা উপচারে সেই সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া নিরাময় হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। নমুনা-স্বরূপ এস্থলে তথাবিধ পূজার একটি মন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা ঃ-

"হঁ-হুঁ বাপ-মা সকল,
(অমুক) কে জ্বর দেয় — জারি দেয়।

এই তুন[৩০৯] ধরি ভাল গরিবার লাগি —
(চাউল পূর্ণ একখানি ডালায় আস্তে আস্তে ঘা দিতে দিতে) —
এক বারি[৩১০] দেগাঁর[৩১১] একদিনের পথখুন[৩১২] এজ[৩১৩]
দুই বারি দেগাঁর দুদিনর পথখুন এজ।
তিন বারি তিন দিনর পথখুন এজ।
চের[৩১৪] বারি দেগাঁর চের দিনর পথখুন এজ। পাঁচ বারি দেগাঁর পাঁচদিনের পথখুন লজ।
ছবারি দেগাঁর ছদিনর পথখুন এজ।
সাত বারি দেগাঁর সাতদিনর পথখুন এজ। উ-উ-উ-উ-উ (কুই)।

(৩০৯) তুন হইতে; (৩১০) বারি ঘা; (৩১১) দেগাঁর দিতেছি; (৩১২) পথখুন পথ হইতে; (৩১৩) এজ আস, (৩১৪) চের চারি;

"হু দেদি[৩১৫] এজ ন[৩১৬] লই;
আগারে[৩১৭] এজ কাক্যা[৩১৮] লই;
কুলৎ[৩১৯] পোয়া কুলৎ করি আন;
কোরৎ[৩২০] পোয়া কোরৎ করি আন্;
হাঁদরা পোয়া হাঁদাই আন্। উ-উ-উ-উ-উ (কুই)
"খেয়াঁ দেইন[৩২১], মরুং দেইন, ওক্‌চা দেইন, উ-উ-উ-উ-উ (কুই)।
বাল দেইন, চাক্‌মা দেইন, গির-ঘরর পুৎ দেইন-ঝি দেইন, উ-উ-উ-উ-উ (কুই)।
মুই দেগঁর মাথাৎ করি,
তুমি লও হাতৎ করি,
এজ, দালি[৩২২] খই — বাপ মা সকল লোক।"

ইহা "মাটীশূকর" দিবার মন্ত্র, পূজাবিধি অনতিপরে বর্ণিত হইবে। এই একমাত্র মন্ত্রেই ইহাদের অপদেবতা সমুদয়ের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বিজাতীয় গন্ধও তেমন নাই, ভাষাও "ঝাড়া-ফু" এর মন্ত্রের ন্যায়, সংস্কৃত শব্দ বিজড়িত নহে। সুতরাং এক কথায় এই মন্ত্রগুলির উপর চাক্‌মাদিগের ন্যায় সঙ্গত দাবি রহিয়াছে।

এদাদাগানা — শিশুসন্তান যদি কোনও অপদেবতা কর্তৃক ভয় পায়, তাহা হইলে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে মাতা "সাঁকোর দুয়ারে" ভয়প্রাপ্ত সন্তানকে কোলে লইয়া বসে; সম্মুখে "মেজাং"-এর উপর একখানি থালায় একটি টাকা, একটি কলা, একটি ডিম এবং ভাত, গুড় প্রভৃতি রাখা হয়। তদুপরি একখানি বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়া পিতা একপ্রান্ত তুলিয়া ধরে। তখন লাউয়ের খোলে চাউল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিতে থাকে, "কে তোমাকে গালি দিয়াছে ? বাপে কি বলিয়াছে ? মা কি বলিয়াছে ? আর কেহ কিছু বলিবে না, — ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। ইত্যবসরে যখন একটা মাছি বা অপর কোন কীট ঐ থালার উপর পতিত হয়, পিতা অমনি আচম্বিতে কাপড় খানি চাপিয়া ধরে; তখন মাতা শিশুকে নিয়া দোলায় তুলিয়া রাখে। ওঝা "মেজাং" এ একখানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত জড়াইয়া অপর প্রান্ত ঐ দোলনায় বাঁধিয়া দেয়। অনন্তর পিতা উক্ত থালাপূর্ণ উপচাররাশি শিশুর নিকটে লইয়া গিয়া সম্মুখে ধরে; তাহাতে শিশু টাকা কি গুড় ধরিলে ভাল নহে — তদ্ভিন্ন যদি ভাত, কলা কি ডিম ধরে তাহা হইলে শুভলক্ষণ।

খ-ফেলা — সাধারণ জ্বরাদিতে কদলী বৃক্ষাংশ, একটি পাতা, এবং চাউল একটি হাঁড়িতে সিদ্ধ করিয়া পত্রাচ্ছাদিত ডালায় চালিয়া লয়। পরে তাহা রোগীর মাথা "নিছিয়া" দূরে নিয়া

(৩১৫) হেংদেদি — স্রোত নিম্ন হইতে; (৩১৬) ন — নৌকা; (৩১৭) আগারে — স্রোত উর্ধ হইতে; (৩১৮) কাক্যা -- ভেলা; (৩১৯) কুলৎ — কোলের বা কোলে; (৩২০) কোরৎ — কাঁকের বা কাঁকে; (৩২১) দেইন্ — ডাইন; (৩২২) দালি — ডালি।

ফেলিয়া দেয়। পাছে তাহা নেওয়ার সময় "ওঝা" স্বীয় ছায়া মাড়ায়, তৎপক্ষে বিশেষ সাবধান থাকে। তাই বোধ হয়, ইহা সচরাচর বেলা তৃতীয় প্রহরে পশ্চিমদিকে নিয়া নিহিত করিবার ব্যবস্থা সাধারণ্যে প্রচলিত। এই "খ" (আপদ) ফেলিয়া প্রত্যাবর্তনান্তে ওঝা জিজ্ঞাসা করে, অমুকের অমুক ব্যারামের নিমিত্ত "খ" ফেলিয়া আসিলাম গিয়াছে ত? বাটিস্থ সকলে এক সঙ্গে উত্তর দেয় — 'গিয়াছে, গিয়াছে, গিয়াছে'।

সংবাসা পূজা — সাংঘাতিক পীড়া বা তাদৃশ বিপদ উপস্থিত হইলে, এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে চারিটি কচু-ডগায় একখানি ক্ষুদ্র ভেলা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি সমচতুষ্কোণাকৃতিকৃত একটি পাতা দ্বারা "ছই" দেওয়া হয় এবং দুই প্রান্তে দুই খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধজাও প্রোথিত করে। অনন্তর ওঝা "ছই'য়ের নিম্নে একটি সিদ্ধ ডিম্ব এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি অন্নপিণ্ড স্থাপন করিয়া রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই সজ্জিত ভেলা নদী স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে সাত বার টানিয়া আচম্বিতে বাম হস্ত দ্বারা ডিমটি গ্রহণপূর্বক ভেলাখানি স্রোতের অনুকূলে ছাড়িয়া দেয়। প্রত্যাবর্তনান্তে অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, অমুকের ব্যারাম বা বিপদের নিমিত্ত যে সংবাসা পূজা করিলাম, তাহা ভাল হইয়াছেতো ? যদি পৃষ্টব্যক্তি উত্তর করে "ভাল হইয়াছে" তবেই ভাল। অনন্তর ডিমটি "ওঝা" স্বয়ং অথবা অপর কোন বালকে খাইয়া ফেলে।

মাটি-শূকর — দুশ্চিকিৎস্য রোগবিশেষ — বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় গৃহসম্মুখস্থ প্রাঙ্গন ভূমিতে চারি খানি 'বাখারি' প্রোথিত করিয়া নানাবিধ সূত্রে বেষ্টিত করে। মধ্য স্থলে একখানি ডালা চাউল পূর্ণ করিয়া রাখা হয। অনন্তর "ওঝা" মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করে, ইহা কিঞ্চিৎ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরে রোগী আসিয়া দণ্ডবৎ করিলে "ওঝা" "আগ-চায়" এবং একটি মোরগ শাবক ও একটি শূকর বলিদান করে। এই প্রাসাদী মাংস সন্ধ্যা না হইতেই প্রতিবেশীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়।

সাঁজ-কুরা — "মাটিশূকরে" প্রতীকার পাওয়া না গেলে সাঁজ (সন্ধ্যা) কুরা মোরগ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ কোনও প্রক্রিয়া নাই। সন্ধ্যার সময় একটি মোরগ কাটিয়া অন্ত্রাদি ফেলিয়া দেয়, অতঃপর তাহা চালের উপর তুলিয়া রাখে। কিছুক্ষণ পরে নামাইয়া দেখে, তাহার কোন অংশ দেবতা ভক্ষণ করিয়াছে কি না। যদি খাইয়া থাকে, তবে ভাল;নতুবা বিপদ নিশ্চিত জানিবে।

চেলা শূকর -- যে রোগ এত কঠিন বোধ হয় যে, উপরিউক্ত প্রতিবিধানে অব্যাহতি লাভের আশা নাই, তন্নিমিত্ত এই 'চেলা শূকর' দানের ব্যবস্থা হয়। এক ঝুড়ি পরিপূর্ণ চাউল ও খই, এবং একটি খড়ের মনুষ্যমূর্তি লইয়া ওঝা রাত্রিকালে দেবতা ডাকিতে ডাকিতে নিম্নপ্রদেশাভিমুখে গমন করে। দূরবর্তী নিবিড় জঙ্গলের বনস্পতি-মূলে তাহা স্থাপন করিয়া তথায় একটি পুংজাতীয় সুপুষ্ট শূকর বলি দিয়া থাকে। ইহার মাংস কোন ব্যক্তি খায় না। পূজা

সিদ্ধ হইলে বন্য শ্বাপদের উদরসাৎ হয়; নতুবা কেহ স্পর্শও করে না, পঞ্চভূত পঞ্চভূতেই লীন হইয়া যায়। এই কার্যে "ওঝা" একটাকা পারিতোষিক পাইয়া থাকে।

কাল পূজা — কোনও অপদেবতার আশ্রয়ে রোগ ধরিয়াছে সিদ্ধান্ত হইলে এই পূজা করা হয়। চট্টগ্রামের হিন্দুদিগের মধ্যেও "কালপূজার" প্রচলন দেখা যায়, কিন্তু পূজাপদ্ধতি ইহাদিগের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা নদীতীরেই পূজাস্থান নির্বাচিত করে। মদ্যই ইহাদিগের "কালপূজার" প্রধান উপচার।

সাত-নিথিক — সপ্তাহের কোন্‌দিন কোন্ দেবতার আক্রমণে ব্যারাম হয়, সেই সেই দেবতার পূজা বিধিই বা কি, — ইত্যাদি সংক্রান্ত এক বিবরণী পুস্তিকা প্রায় প্রত্যেক "ওঝার" নিকটে আছে। তদনুসারেই এই নিথিং পূজা চলিয়া থাকে। ইহা ছাড়া চান্দ্রনিথিকও আছে, তাহাতে কোন তিথিতে কোন দেবতার আক্রমণে পীড়া হয় এবং তাঁহাদের পূজা প্রক্রিয়া-বর্ণিত আছে।

থানমানা — ইহার অন্য নাম "খাং-পূজা।" "খাং" অর্থ চাঁদা; প্রতিবেশী সকলের সম্মিলিত চাঁদায় অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই ইহা "খাং পূজা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নদীতীরে পূজার স্থান এবং শনি বা মঙ্গলবারে পূজার দিন নির্বাচিত হয়। পূজার নিমিত্ত প্রতিবেশী প্রত্যেক পরিবার হইতে কিছু কিছু চাউল, খই এবং এক এক চুঙা মদ্য আসে, এতদতিরিক্ত 'ওঝা' ও দুই চুঙা মদ্য পাইয়া থাকে। যথাবিধি পূজা শেষ হইলে "আগ্‌চাওয়ার" পর সকলে সতণ্ডুলোদক অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক প্রাণিপাত করে। অনন্তর বলিদান করা হয়। ইহা একটি বিরাট ব্যাপার! একত্রে এতগুলি প্রণীবধ ইহাদিগের আর কোন অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। একুনে — পাঁঠা দুইটি, শূকর দুইটি, পারাবত এক জোড়া এবং প্রত্যেক পরিবারের সঙ্কল্পে এক একটি মোরগপ্রাণ সমর্পিত হয়। চাঁদার পরিমাণ বেশী হইলে এই সঙ্গে মহিষ বলিও প্রদান করা হয়। বলির পরে 'ওঝা' নৈবেদ্য হইতে আচম্বিতে কিছু চাউল গ্রহণ করিয়া পুনরায় পরীক্ষা দেখে। অযুগ্ম সংখ্যায় শুভ এবং যুগ্ম সংখ্যায় অশুভ সূচিত হয়। শেষোক্ত স্থলে পুনঃ পুনঃ তিনবার পর্যন্ত পরীক্ষা দেখিয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থই ভাত, অপরাপর ব্যঞ্জন এবং সামান্য লবণ মসলাদি সঙ্গে আনে। এখানে মাংসমাত্র পাক করিয়া আমোদ আহ্লাদে ভোজন করে।

এই পূজা সিদ্ধ হইলে 'আদমের' যাবতীয় অমঙ্গল বিদূরিত হয়। বিশেষতঃ মারীভয়ার্ত গ্রামবাসীর আসন্নবিপদ মুক্তির ইহাই অমোঘ উপায়। ভিন্ন গ্রামে ওলাউঠা বা বসন্তাদি দেখা দিয়াছে—শুনা গেলে, ইহারা যথাসম্ভব সত্বরে 'থানমানা' পূজা অনুষ্ঠানে তৎপর হয়। এতদ্ভিন্ন' যাহাতে তাহাদের গ্রামে সেই দূষিত রোগের বীজ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য কয়েকদিনের নিমিত্ত ইহারা "পাড়াবন" অর্থাৎ পাড়া বন্ধ করে। পূর্বে সচরাচর সাতদিনের জন্য করা হইত, সাধারণের অসুবিধা ঘটে বলিয়া অধুনা ঊর্দ্ধ সংখ্যায় তিন দিন, প্রায়শঃ একদিনের নিমিত্তই করা হয়। কিন্তু এই নির্দিষ্ট দিনে আদমে কাহারও

পাড়া বন্ (বন্ধ)

প্রবেশাধিকার থাকে না এবং সেই পাড়ার লোকেরাও বাহির হইতে পারে না। কাহাকেও বাধ্য হইয়া স্থানান্তরে যাইতে হইলে সেই দিনই পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কিন্তু আদমের বহির্ভাগে থাকিতেই পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রক্ষালিত করিয়া, তবে প্রবেশ করে। আদমের চতুর্দিকে পতাকা এবং "বানর[৩২৩] ঝুলাইয়া" দিয়া 'প্রবেশ নিষেধ' আজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করা হয়। ইহা ছাড়া তাহারা এই কয়দিন পবিত্রভাবে পূজার্চনা সহকারে কাল কাটাইয়া থাকে।

এইরূপে দূষিত ও সংক্রামক পীড়ায় ইহাদের সতর্কতা অসাধারণ। পরিবারে কাহারও কুষ্ঠব্যাধি হইলে বাড়ীর অনতিদূরে পৃথক ঘর করিয়া তাহাকে রাখে এবং নির্দিষ্ট একজন গিয়া যথা আবশ্যক সাহায্য করে। ইহা দ্বারা রোগীকে যে ঘৃণা করা হয় — তাহা নহে; যেন তৎসংসর্গে অপরকেও ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য সাবধান থাকে মাত্র।

চাক্‌মাদিগের মধ্যে চর্মরোগ অতিশয় সাধারণ। বলা বাহুল্য, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবই তাহার কারণ। গ্রীষ্মকালে কর্মসমাপনান্তে "গা-ধুইবার" নিয়ম আছে বটে, কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র প্রায়ই প্রবর্তিত হয় না। শীতকালে স্নানের নাম করিলেও ভয়ে অনেকের শরীর শিহরিয়া উঠে! সম্প্রতি উপদংশেরও বিস্তর প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যেই এই রোগের আক্রমণ অধিক। দুই পুরুষ অর্থাৎ শতেক বৎসর পূর্বে এই পীড়ার অস্তিত্বও চাক্‌মা সম্প্রদায়ে অজ্ঞাত ছিল। অধুনা আরও দুইটি রোগ বিশেষ পশার লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে একটির নাম — "চানাপীড়া"। ইহা প্রথমে সামান্য পালা জ্বররূপে দেখা দেয়, ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবিরাম ভাব ধারণ করে। জিহ্বা ও কণ্ঠনালিতে দূষিত ক্ষত হয় এবং পরিশেষে প্রলাপাদি উপসর্গ আসিয়া মৃত্যুমুখে পাতিত করে। অপরটি — "নোয়াবিছ" অর্থাৎ নূতন বিষ।

বিশেষ রোগ

ইহা প্রবল অবিরাম জ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই রোগদ্বয় উপদংশেরও পরবর্তী কালে ইহাদের ভিতর আমদানী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ম্যালেরিয়া, দূষিত জলবায়ু, উপযুক্ত খাদ্যাভাব, কৃমি, বাতব্যাধি, উদরাময় প্রভৃতিও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পঁচা মাছ মাংস ও অত্যধিক লঙ্কা ভক্ষণ এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ত্রুটিতেই এই সমুদয় রোগ জন্মিয়া থাকে।

১৯০১ ইংরাজীর আদম সুমারিতে দেখা যায়, এই পার্বত্য প্রদেশে,—

উন্মত্ত			কালা-বোবা			খঞ্জ			কুষ্ঠগ্রস্ত		
মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
১৫৮	৮২	৭৬	৮০	৪৩	৩৭	১৩৭	৮২	৫৫	৬২	৫০	১২

(৩২৩) "বানর" বিতস্তোক পরিমিত বংশখণ্ডমাত্র। "হোরাইজেন্টেলবার" আকারে বাঁশ পুতিয়া তাহাতে ইহা ঝুলাইয়া দিলেই, লোকে "বানর ঝুলাইয়াছে" বলিয়া 'প্রবেশ নিষেধ' বুঝিতে পায়।

মোট ২৫৭ জন পুরুষ এবং ১৮০ জন স্ত্রীলোক রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ। বাঙ্গালার অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে উন্মাদের সংখ্যা বেশী; অতিরিক্ত মদ্যসেবনই ইহার প্রধান কারণ হইবে। কেননা যে সকল দেশে মাদক দ্রব্যের প্রচলন অধিক, তৎসর্বত্রই বিকৃত মস্তিষ্কের বাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ দেখান যায় — ইংলন্ডে বঙ্গদেশ অপেক্ষা পাগলের সংখ্যা শতকরা ১৩ অধিক। বোধহয় আর খুলিয়া লিখিতে হইবে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমুদয় অধিবাসীদের অনুপাতে অংশতঃ চাক্‌মাদিগের অবস্থা অনায়াসে অনুমান করিয়া লওয়া সহজসাধ্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

(১) পোষাক পরিচ্ছদ — গহনা

এবং

(২) অন্যান্য আবশ্যকীয় সরঞ্জাম

১

পোষাক-পরিচ্ছদ জাতিবিশেষের প্রধান বহিঃনিদর্শন বাসস্থানের শীতাতপভেদে নির্দ্ধারিত হইলেও এই বহিরাবণ মাত্র দর্শনে জাতীয় পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার প্রবল প্রবাহে সে সুবিধা নষ্ট হইয়া যাইতেছে; উদার-অনুকরণের আঘাতে জাতীয় বিশেষত্ব সমুদয় বিলুপ্ত প্রায়! অন্যে পরে কা' কথা, অধুনা পিতামাতা প্রবাসাগত পুত্রকে চিনিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; প্রণয়িনী-জীবনার্দ্ধভাগিনী বিদেশাগত প্রাণপতিকে হঠাৎ কক্ষদ্বারে উপনীত দেখিয়া সতীত্বের মর্যাদা-রক্ষাভয়ে আকুলপ্রাণে পলায়ন করিতেছেন; প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগণ অগন্তুককে দেখিয়া অপরিচিত জ্ঞানে দূরে দাঁড়াইয়া আছে; বর্তমানে এইরূপে ঘটনা আরব্য কি পারস্য উপন্যাসের অভিনয় বা "গুলিখোরী গল্প" মাত্র নহে। নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, এই 'ইঙ্গবঙ্গের' দলে হিন্দুদিগের সংখ্যাই অধিক; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত চাক্‌মা সম্প্রদায়েরও দু'চারিজন এই সজ্জা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনুকরণ অবশ্য নিন্দনীয় নহে। তবে ভাল ছাড়িয়া মন্দের অনুবর্তী হওয়া কখনই ক্ষমার্হ নয়। এদেশে গরমে প্রাণ আঁইটাঁই করে; গায়ে চাদরখানি রাখাও অসহ্য হইয়া উঠে; তাদৃশী অবস্থায় গঞ্জি, সার্ট, ওয়েষ্টকোট, ওপেন্‌কোট ইত্যাদি ইত্যাদি শীতপ্রধান দেশোপযোগী হিমনির্যাতক হরেকরকমের পোষাক সমূহ আঁটিয়া নিরন্তর 'পাখা' 'পাখা' করিবার আবশ্যকতা কি, বুঝিতে পারি না[(৩২৪)] এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কতিপয় জাতীয় হিতৈষী হুজুগ তুলিয়া ছিলেন, 'চাদর উঠাইয়া দেওয়া হউক'; কিন্তু হায় হতভাগ্য হিন্দুসমাজ! যদি পিতৃ-পিতামহচরিত গাত্রাবরণের সেই একমাত্র নিদর্শন উত্তরীয় বস্ত্রখানিই বিসর্জন করিবে, তবে আর রাখিলে কি? যাউক আর অধিক বকিয়া ফল কি, ইহা হইতেই যদি অনুচিকীর্ষু ভ্রাতৃবৃন্দের পূর্বে একবার ভালমন্দ বিবেচনা করিবার জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এক্ষণে আমরা আলোচ্য বিষয়ের পুনরবতারণা করি।

উদার-অনুকরণ

চাক্‌মা সম্প্রদায়ের পুরুষদিগের পোষাক সাধারণ হিন্দুগণের ন্যায়, দেখিতে 'বড়ুয়া' অর্থাৎ বাঙ্গালী মঘ বলিয়াই মনে হয়। প্রৌঢ়সমাজ মস্তকে 'খবং' বাঁধিয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীনকাল

(৩২৪) এদেশবাসী জনৈক ইউরোপীয় লেখকই বলিয়াছেন, — We, in England, wear many articles of clothing, simply because life could not be preserved in that climate without them; but here any large amount of clothing is absolutely insupportable. True modesty lies in the entire absence of thought upon the subject.

হইতেই, ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত আছে;প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্ববর্তী "কাটুয়া কন্যার আমলেও" "খবং" এর গৌরব-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পাগড়িকে মঘেরা "গম্বং" বলে, তাহা হইতেই "খবং" শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। তদ্বারা মনে হয়, ইহারা মঘদিগের হইতেই পাগড়ির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে কিন্তু পুরাকালে হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়েই পাগড়ির সবিশেষ প্রচলন ছিল।[৩২৫] সুতরাং এতৎসম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নহে। ইহা ছাড়া শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে সার্ট, কোর্টের ব্যবহার প্রচুর। বর্তমানে সেই পুরাকালের "ছিলুম্" (আঙ্‌রাখা) নিঃস্ব গরীব দুঃখীর মাত্র সম্বল হইয়াছে। তাদৃশী হীনাবস্থায় না পড়িলে "গামছাখানিও" কেহ পরিধান করিতে চাহে না। তবে দরিদ্রগণ সচরাচর 'লেংটি' মাত্র পরিয়াই জীবনাতিপাত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত চাক্‌মাগণ শিকারে কিম্বা দূরবর্তী স্থানে যাইতে হইলে "কর্জ্জাল" (থলিবিশেষ) মধ্যে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পূর্ণ করিয়া স্কন্ধোপরি ঝুলাইয়া লয় এবং কোমরে "পানর খল্যা" (থলি) রাখে। তন্মধ্যে আবার পান বাঁধিয়া রাখিবার নিমিত্ত একখানি "পানরপানিও" থাকে। পরন্তু এই "কর্জ্জাল" "পানর খল্যা" এবং "তাগল" (দা) ইহাদের পথ-পর্যটনের বিশেষ সজ্জা। এস্থলে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, কোন কোন চাক্‌মা যুবককে রৌপ্য বলয় ব্যবহার করিতেও দেখা যায়।

(পুরুষদিগের) পোষাক-পরিচ্ছদ

রমণী সমাজে এযাবৎ জাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ যথেষ্ট প্রচলিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদেরও অনেকে অধুনা অণুকরনোৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ রাজা ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরিবারের মহিলাগণ সচরাচর সাড়ীই পরিধান করিয়া থাকেন;এবং 'জ্যাকেট্' 'বডি' প্রভৃতি অবস্থাপন্ন পরিবার মাত্রেই প্রায় সাধারণ। এই সঙ্গে অনেক বাড়ীতে কুন্তলীন, কেশরঞ্জন প্রভৃতি গন্ধতৈল, এসেন্স্ এবং সুবাসিত সাবানও সমধিক পরিমাণে আমদানী হয়। বিলাসিতার খরস্রোতে একে একে সমুদয়কে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে আমরা ইহাদিগের প্রকৃত জাতীয় পরিচ্ছদ খুঁজিয়া লই। পরিধেয় বস্ত্রের আখ্যা "পিঁধন"। ইহার বর্ণ নীল, মধ্যে প্রায় চারি অঙ্গুলী বিস্তৃত লোহিত বর্ণের দুইটি সুদীর্ঘ ডোরা[৩২৬] থাকে। দৈর্ঘ্যে দেড় মোর দিবার মত, তিন হাত পরিমিত হইবে। পরন্তু উহা পড়িবার এমনি বাহাদুরী যে, ইহারা লজ্জাশীলতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াই লোক সাধারণের সমক্ষেও প্রস্রাবাদির নিমিত্ত বসিয়া যাইতে পারে। কাপড়ও এত মোটা, তাহার মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মিও প্রবেশলাভ করিতে সুবিধা পায় না। এক একখানি "পিঁধন" ওজনে বোধ হয় ৭/৮ সের হইবে। এক জোড়ায় একজনের প্রায় দুই বৎসরাধিককাল অবাধে চলিয়া যায়। যৌবনোন্মুখিনী হইতেই রমনীগণ "খাদী" দ্বারা বুক বাঁধিতে আরম্ভ করে।

(স্ত্রীলোকদিগের) পোষাক-পরিচ্ছদ

(৩২৫) মানিক চাঁদের গানেও দেখা যায়, - "কার জন্য পাগড়ি রাখিছ মস্তক উপর।"

(৩২৬) টংচঙ্গীয়া রমণীর পরিধেয় বস্ত্রও প্রায় এই অনুরূপ; কেবল লোহিত ডোরার একটি, প্রায় এক ফুট বিস্তৃত হইয়া পাইরের অধিকার পায়।

বক্ষোবন্ধনকে ইহারা এত আবশ্যকীয় মনে করে যে, জ্যাকেট, বডি পরিয়াও তদুপরী "খাদী" বাঁধিয়া থাকে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ পিঁধনের পরিবর্তে যে শাড়ীর ব্যবহার করেন, তৎপ্রান্তভাগ দিয়াই সচরাচর তাঁহাদের বক্ষোবন্ধন চলে। খাদী দ্বিবিধ, — "রাঙাখাদী" ও "ফুলখাদী"। সাধারণতঃ রাঙাখাদী যুবতীগণ এবং ফুলখাদী প্রাচীনারা ব্যবহার করে। "ছিলুম" অর্থাৎ কোর্তাও ইহাদের মধ্যে কম প্রচলিত নহে। বিশেষতঃ বিবাহকালে "ফুলছিলুম" না হইলেই নয়। এতদ্ব্যতীত মস্তকে "খবং" বন্ধন প্রত্যেক মহিলারই একান্ত কর্তব্য। সচরাচর সকলে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানকালে "খবং" বাঁধিয়া উঠে, এবং স্নানের সময় পর্যন্ত তাহা সযত্নে রক্ষা করে। কিন্তু পূজা, বিবাহ বা অপরাপর উৎসবের সময় ইহারা অহর্নিশ মাথায় "খবং" রাখিতে বাধ্য হয়। অধুনা সম্ভ্রান্তা রমনীগণ শাড়ীর অঞ্চলভাগ মাথায় দিয়াই "খবং"-এর বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। "খবং" মাথায় থাকিলেও ইহারা *জনসমাগম স্থানে গমনকালে, তদুপরি শুভ্র বা লোহিতবর্ণের 'ওড়না' ঢাকা দিয়া যায়, তাহাই ইহাদিগের অবগুণ্ঠন। এই 'ফেসন' যে স্পেনীয় মহিলাগণের মধ্যেও দেখা যায়, তাহা পূর্বেই* বলিয়া আসিয়াছি। বিগত ১৩১১ সনের "মহামুনি মেলায" দেখা গেল, "কুরাকুট্টা" গোছার পুরাঙ্গনাগণ লোহিতবস্ত্র-মস্তকেই আসিয়াছিল। পরন্তু শ্রেণীবিশেষে পরিচ্ছদের তাদৃশ কোন তারতম্য আছে বলিয়া শুনা যায় না।

এই বনবাসিনীগণ বনফুলে সাজিতেই অধিকতর ভালবাসে। রাজকন্যা ও রাজপুত্রবধূ সীতাদেবী স্বীয় বনবাস কালের বর্ণনায় একদা কবির ভাষাতে বলিয়াছিলেন ঃ— "তুলি কুবলয়ে (অতুল রতন সম) পরিতাম কেশে; সাজিতাম ফুলসাজে; হাসিতেন প্রভু, বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!" বস্তুতঃ ফুলসাজে এই ফুলরানীগণকে দেখিলে স্বর্গীয়া অপ্সরা বলিয়াই ভ্রম

গহনা

হয়! রজতকাঞ্চনের বিবিধ ভূষণাবলী প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর সজ্জার তুলনায় কত যে তুচ্ছ, ইহাদিগকে দেখিয়াই তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয়। হায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে বর্তমানে সোনারূপার কৃত্রিম আভরণ ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে! সম্ভবতঃ তাহা নশ্বর প্রাকৃতিক ভূষণ ব্যবহারের অসুবিধা নিবন্ধনই অন্যান্য জাতির অনুকরণে বাধ্য হইয়াছে। নিম্নে অলঙ্কারসমূহের একখানি তালিকা দেওয়া হইতেছে। তন্মধ্যে যে সকল গহনা চট্টগ্রাম ও বঙ্গের অপরাপর স্থানে ব্যবহৃত আছে, তৎসমুদয়ের পার্শ্বে তারা চিহ্ন স্থাপিত হইল; সুতরাং তদ্দ্বারা পাঠক পাঠিকাগণ ইহাদিগের নিজস্ব অলঙ্কার সহজেই বাছিয়া লইতে পারিবেন। খোপায়—চোরি; কানে — (নিম্নভাগে) কজফুল * রাজযোড়, ঝিরমিলি * এবং নাদেং; এই শেষোক্ত শব্দটি খাস মঘী। মঘদিগের মধ্যেও এই গহনাখানি প্রচলিত আছে; তবে আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। উহাদের "নাদেঙের" পরিধি প্রায় তিন ইঞ্চি হইবে। পাহাড়ী মহিলাদিগের কর্ণলতিকারন্ধ্র সাতিশয় বিস্তৃত। পূর্বে যে "ছাক্" জাতির আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাদের রমণীগণের কানের ছিদ্র এত বড় করা হয় যে, বাঁশ ভিন্ন অপর কিছুতেই উহা রক্ষা করিবার সুবিধা নাই; কর্ণপ্রান্ত আসিয়া প্রায় স্কন্ধদেশ চুম্বন করে। চাক্‌মামহিলার কর্ণলতিকারন্ধ্র তাদৃশ

বড় নহে। কেবলমাত্র "রাজযোড়" পরিধানের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বৃহত্তর ছিদ্রের প্রয়োজন;তৎপরিধি কোনরূপে একইঞ্চি মাত্র হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহাদিগের প্রত্যেক কর্ণে চারি পাঁচটি ছিদ্র করা হয়। তৎসমুদয়ে "ঝম্বলি" পরিধান করিয়া থাকে। নাকে—সোনানগ*, গলায়—হাঁচুলি*, চন্দ্রহার*, মটরদানা*, (সাধারণ পরিবারে) "টাকার ছড়া" এবং (নিতান্ত গরীবদুঃখিনীরা) — বিশেষতঃ (কুমারীগণ) পুঁতিব লহরী মাত্র পরিয়া থাকে। বাহুতে—তাড়যোড়*, নীচের হাতে - কুচী*, বাহু*, কঙ্কন*, এবং রসিকবালা* প্রভৃতি নানারকমের বালা আছে। অধুনা নব্যসমাজে নানাবিধ সুরঙ্গিন কাচও পরিগৃহীত হইতেছে। আঙুলে — আঙ্‌টি* খুবই সাধারণ। পায়ে- নিটোল "চরণমল"* ইহার পরিধি তত অধিক থাকে না; যথা সম্ভব ছোটখাটো করা হয়, যেন কোনরূপে পায়ে জড়াইয়া থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই সমুদয় গহনার অধিকাংশই রৌপ্য নির্মিত কেবল "সোনানগ" এবং কোন কোন স্থলে "ঝম্বলি" গুলিমাত্র সোনায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। *তবে এক্ষণে কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্বর্ণালঙ্কারের পশার বাড়িতেছে;এবং প্রাচীন-প্রথার গহনা গুলিও ক্রমশঃ নির্বাসিত হইতেছে।* কিন্তু সাধারণ পরিবারে রাজা বা তৎক্ষমতালব্ধ দেওয়ানের অনুজ্ঞাব্যতিরেকে কেহ বাহু, চন্দ্রহার, চরণমল প্রভৃতি রৌপ্যালঙ্কার পরিধানেও সক্ষম নহে, প্রত্যুত স্বর্ণাভরণের ব্যবহারও তাহাদিগের পক্ষে কদাপি অনুমোদিত হইতে পারে না। পূর্বে ইহাও বলিয়া আসিয়াছি, ইহারা স্বামীর মৃত্যুতে অন্ততঃ সাতদিনের নিমিত্ত যাবতীয় অলঙ্কার বর্জন করে; পরে অন্যান্য গহনা ধারণ করিলেও পুনর্বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত "হাঁচুলী" গলায় দিতে পারে না। বৃদ্ধা বিধবাগণ অলঙ্কারমাত্রই ধারণে বিমুখ হয় এবং কেহ কেহ হিন্দু বিধবার অনুকরণে থানের কাপড় পরিধানে বিরহবিধুর জীবন কাটাইয়া থাকে।

২

সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে সম্পন্ন মহাশয়েরদিগের বাড়ীতে প্রায় কোন দ্রব্যের অভাব দেখা যায় না। এমন কি, আমাদের দেশের সাধারণ জমীদারগৃহেও তাদৃশ সাজ-সরঞ্জাম সকলের থাকে না। তাঁহাদের গৃহের আস্‌বাবাদি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক সভ্যতানুমোদিত। সুতরাং তৎসমুদয়ের অনাবশ্যক বিবরণী দিয়া বক্তব্য প্রসঙ্গের নিরর্থক কলেবর বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন মনে করি না। কেবল নিঃস্ব প্রায় সাধারণ পরিবারের চিত্রখানি এস্থলে অঙ্কিত করিয়াই

আস্‌বাব

এবিষয়ে ক্ষান্ত হইব। অমিতব্যয়িতা রূপ রাহুগ্রাসে ইহাদের সুখশশী নিরন্তর কবলিত হইতেছে। তাহারই ফলে এবং উত্তমর্ণদিগের কৃপায় ইহারা দিন দিন দরিদ্রতর হইয়া যাইতেছে। অনেককেই কদলপত্রে ভোজন এবং লাউয়ের খোলে জলপানে কোনরূপে হতভাগ্য জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। হয়ত ঘরে কাঁথাখানি পর্যন্ত নাই, অথচ তাহাদের উৎপাদিত তুলায় লেপ প্রস্তুত করিয়া কত লোকে শীত নিবারণ করিতেছে। যখন পার্বত্য প্রদেশের নিদারুণ শীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় করিয়া তোলে, জীর্ণ-দীর্ণ বস্ত্রখণ্ড মাত্র তাহাদের সেই দুঃখসময়ের সম্বল হয়। এবং গৃহমঞ্চের মধ্যভাগে যে অগ্নি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে, হিম-নির্যাতন তাদৃশ অসহ্য হইলে পরিবারের সকলে তাহার চতুর্দিকে বসিয়া

গোষ্ঠিসুখ উপভোগ করে এবং সেই সময়ে প্রিয়তমার অনলদীপ্তি-প্রদীপ্ত মুখচন্দ্রখানি দেখিতে দেখিতে—পাহাড়ী যুবক অপার আনন্দে অধীর রহে। ফলতঃ ইহাই তাহাদের শান্তি-ইহাই তাহাদিগের সুখ। হায়। এসমুদয় দরিদ্র পরিবারে রাত্রিতে তৈল জ্বালাইবার পর্যন্ত সামর্থ নাই; 'বাখারী'র মশাল মাত্র অনন্য ভরসা। তাহাদের সাধারণ কার্য গৃহমধ্যে রক্ষিত অগ্নির প্রোজ্জল জ্যোতিতেই নির্বাহিত হইয়া থাকে। নিম্নে সাধারণ গৃহস্থেরই নিতান্ত আবশ্যক কতিপয় সামগ্রীর উল্লেখ করা গেল ঃ—

"তাগল" — অর্থাৎ দা। ইহা সকলেরই নিত্য প্রয়োজনীয় কর্তনাস্ত্র। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় আঠার ইঞ্চি হইবে। অগ্রভাগ প্রশস্ত, ধার একপার্শ্বে — বাটালির ন্যায়। বাঁট সচরাচর গাছ কিংবা বংশগুঁড়িরই দেওয়া হয়; তবে শেষোক্ত ব্যবস্থাই প্রকৃষ্টতর। ওজন-ব্যবহর্তার শক্তি-অনুযায়ী; অবলা এবং বালকদিগের "তাগল" অবশ্য হাল্কা করা হয়। তরি-তরকারী সংগ্রহে, গৃহাদি নির্মাণে এবং জুমের কার্যে "তাগলের" নিত্য ব্যবহার। খন্তা, কুড়ুল, কোদালী, বাইস প্রভৃতির কার্য ইহারা এই একমাত্র "তাগল" দ্বারা নির্বাহ করে। এমন কি, পূর্বে তৎসমুদায় অস্ত্রের নামগন্ধও ইহারা জানিত কিনা সন্দেহ। অধুনা অবশ্য সৌকর্যার্থে অনেকেই "মাডি কোড়নী" (খন্তা) "বাইচ্‌" (বাইস) প্রভৃতি দু'একখানি গ্রহণ করিয়াছে। পথপর্যনেও "তাগল" ইহাদিগের প্রধান সহায়। এতদ্বারা তাহারা একদিকে যেমন এই পর্বতাকীর্ণ দেশে পথভ্রম ঘটিলে জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা করিয়া লয়, অপর দিকে তেমনি বন্যজন্তুর করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ এই পার্বত্য পথের পার্শ্বে অজগর সাপ প্রায়ই বিচরণ করে। তাহারা সুবিধা পাইলে পথিকের পদবেষ্টনপূর্বক বিষম অনর্থ ঘটায়। সুতরাং সে সময় দা সঙ্গে থাকিলে পদবেষ্টিত সর্পের মাথাটি কাটিয়া ফেলিয়া কোনরূপে রক্ষালাভ হয়। এককথায় এই অস্ত্রব্যতীত ইহাদিগের জীবন যাপন একরূপ অসম্ভব। সাধারণ প্রত্যেকেরই সঙ্গে তাহাদের স্ব স্ব "তাগল" থাকিতে দেখা যায়। ইহা হয়তঃ হাতেই থাকে, অন্যথা নিতম্বের দক্ষিণপার্শ্বে পরিধেয়াস্তরালে গুঁজিয়া রাখে। ইহার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ সাবধানতার প্রয়োজন; নতুবা কর্তক নিজেই আহত হয়। সচরাচর দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বাম পদের দিকে এবং প্রত্যানয়নে ঠিক বিপরীতাভিমুখে আঘাত করা হইয়া থাকে। পুরাকালীন যুদ্ধাস্ত্রগুলি এই 'দা' বিশেষমাত্র। তবে কিনা সেগুলি অতিশয় লম্বা ও ভারী। মালয় দেশীয় "পৈরংলটক" এর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। সেকালে তৎসমুদায় যুদ্ধাস্ত্র কোষনিবদ্ধ করিয়া কটিদেশে ঝুলাইয়া লওয়া হইত। ইহাছাড়া জুমের শস্য বপন করিতে — "চুচ্যাং তাগল" ব্যবহৃত হয়। ইহার অগ্রভাগ "চুচ্যাং" অর্থাৎ সুঁচালো। শস্য বুনিবার সময় ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত করা হয়। তদ্ভিন্ন এদেশে অনেকে এমন এক রকমের কুড়ুল ব্যবহার করে, তাহার লৌহাংশ খুলিয়া ফিরাইয়া লইলে বাইসের কাজ চলে। "চারি" — কাস্তেবিশেষ। কিন্তু ইহার গঠনে বিশেষত্ব আছে। লম্বে তাদৃশ অধিক নহে এবং তত বক্রও নয়। কারণ লম্বা কাস্তে দিয়া জুম ক্ষেত্রে সুবিধা হয় না। তাহাতে এক শস্যের গাছ ছেদনকালে অপর শস্যের গাছও কাটা যাইবার আশঙ্কা আছে। বলা বাহুল্য,

ধান্যাদি গাছ কর্তনের নিমিত্তই এই "চারি" ব্যবহৃত হয়। ইহা দেখিতে ঠিক "কাটারী"র ন্যায়; ধারে কাস্তের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাটা আছে।

"দুল" — (ডোল), "বারাং" "দিংর" প্রভৃতি বংশনির্মিত ধান্যাদি রক্ষণাধার। বৃহত্তর "বারাং"কেই "দিংরা" কহে। "কালোলায়াং ও বংশনির্মিত ঝুড়ি বটে, ইহা ধান কাটিতে, তরি-তরকারী সংগ্রহ করিতে, কাষ্ঠাদি বহন করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু এই সমুদয়েরই সাধারণ আখ্যা — "থুরুং"। এতদ্ভিন্ন বংশনির্মিত আরও কয়েক রকমের ঝুড়ি আছে; তৎসমুদয় বিভিন্ন কার্যে আবশ্যক হয়। যথা — "পুল্যাং" করিয়া জল সিঁচে, "করুং" বীজশস্য লইবার এবং তিল তুলিবার সময় প্রয়োজনে আসে। "ফুল বারাং" এর মধ্যে পোষাকী কাপড়, গহনা পত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্যাদি রক্ষা করা হয়। তা'ছাড়া কার্পাস রাখিবার নিমিত্ত "ফালি" শস্যাদি শুকাইতে "ছাবরা", তলই;মাছ ধরিতে "লুই "ঝোঙা", "জ-চেই", "ভুম্বু-চেই", "রাম-চেই", "আং-চেই", "ডুব" শস্যাদি ঝাড়িতে চালিতে একমাত্র "চালনই"; ঔষধাদি রাখিবার "ছাম্মোয়া", ভাত খাইবার " মেজাং" ইত্যাদি ইত্যাদি ছোটখাটো নানাবিধ জিনিষ থাকে। এসমুদয়ের মূল্যও অবশ্য বেশী নহে, প্রায় সকলেই নিজেরা তৈয়ার করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত মাছ রাখিবার "ডুলা", শস্যাদি মাপিবার "আড়ি" "সেরী" এবং ছেলে দোলাইবার "ধুলন" প্রভৃতি কতিপয় জিনিষ মাত্র বেত দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"ডাবা" ইহাদিগের পরিবারে নিত্য প্রয়োজনীয়। ইতিপূর্বে তামাকের ব্যবহার প্রাচুর্যের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি; তাহা হইতেই ইহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সম্পন্ন পরিবারে নারিকেলের খোল এবং কেহ কেহ বা "মাট্যা (মৃন্ময়) হুক্কা" ব্যবহার করে। নতুবা বাঁশের ডাবাই সর্বসাধারণ। পথপর্যটন কি জুম ক্ষেত্রের নিমিত্ত বংশ লুঁকাই প্রায়শ প্রচলিত দেখা যায়। ইহা এক পাক বাঁশ মাত্র, মধ্যে কল্কে বসাইবার জন্য একটি নল বসান থাকে। উর্দ্ধ প্রান্ত খোলা। মুখমধ্যে তাহা প্রবেশ করাইয়া দিয়া বা হস্তদ্বারা বিস্তৃতপথ সঙ্কুচিত করিয়া তাহাতে মুখ প্রদানে মনের সাধে ধূমপান করিতে থাকে। প্রতি পরিবারে এইরূপ ডাবা (মঘকথায়-চিবিদং) অন্যূন ২/৩ টা দেখা যায়।

চড়কা, চড়কী ও ধনু। — কার্পাসের বীজ ছাড়াইতে "চড়্কী" ধুনিবার নিমিত্ত "ধনু" এবং সুতা কাটিবার জন্য "চড়্কা" ও ইহাদের অনেকের ঘরে থাকে।

সাধারণ পরিবারে মৃন্ময়পাত্রেই প্রায় যাবতীয় ব্যবহার চলে। কিন্তু মৃন্ময় ভাণ্ডও এদেশে সাতিশয় দুর্মূল্য। কারণ এখানে কুম্ভকার নাই, তদ্ব্যবসায়ের প্রতিও এযাবৎ কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। পূর্বে ইহারা এই মৃত্তিকাপাত্রের ব্যবহারও জানিত না, বাঁশের 'চুঙায়' করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিত।[৩২৭] অপরাপর জাতির অনুকরণেই অবশেষে তাহাদের মধ্যে 'হাঁড়ী',

(৩২৭) এখনো অনেক পরিবারে কোন কোন ব্যঞ্জন ('অবশ্য সখ করিয়া) 'চুঙা'য় পাক করিয়া খায়, তাহাতে নাকি ব্যঞ্জনের আস্বাদ বাড়ে।

'পাতিল', 'তেলইন', 'ঘড়া' (কলসী) ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে যে সকল মৃত্তিকার জিনিষ এখানে আমদানী হয়, পথে তৎসমুদয়ের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ব্যবসায়ীরা অবশিষ্টগুলি অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। পরন্তু মূল্য যাহাই হউক, হুক্কা কল্কি এবং হাঁড়ীপাতিলাদি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীগুলি প্রত্যেক সংসারে অবশ্যই থাকে। অবস্থাভেদে কাঁসা-পিতলের বাসনাদিও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তের উল্লেখ আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

এই পার্বত্য প্রদেশে গাছের অভাব নাই। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে আসবাবাদিতে কাষ্ঠের ব্যবহার এত কম যে ভাবিলে অতিশয় দুঃখ হয়। সাধারণতঃ ঢেঁকি, মঞ্চের "সাঁকো" এবং মহিষের গলায় "ঘন্টি" প্রভৃতি দু'চারিটি জিনিষ মাত্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হয়। শিল্প জ্ঞানের অভাবই ইহার বিশিষ্ট কারণ হইবে! তবে বর্তমানে অবস্থাপন্ন পরিবারে বিদেশীয় সাজসরঞ্জামাদি তাদৃশ বিরল নহে। নিতান্ত দরিদ্র না হইলে — 'আলমারী' থাকুক আর নাই থাকুক, বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি অবশ্যই আছে। তদ্ভিন্ন লাঙ্গলের চাষ প্রবর্তিত হওয়া অবধি সাধারণ পরিবারেও কাষ্ঠের কতিপয় সরঞ্জাম বাড়িয়াছে। যথাসময়ে উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছে যে, ইহাদিগের মধ্যে বাঁশের আরও একটি আসবাব আছে, তাহা বস্ত্রাদি রাখিবার "আল্না' বিশেষ; নাম "সারবাঁশ"। ইহা সচবাচর "গুদী"র মধ্যেই থাকে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

(কৃষি)

(১) জুম—হল— বৈজ্ঞানিক চাষ;

এবং

(২) ধান কার্পাসাদি উৎপন্ন দ্রব্য

১

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদৰ্দ্ধং কৃষি কৰ্ম্মণি।"

লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান অৰ্দ্ধমাত্রায় হইলেও কৃষি মানবের জীবন স্বরূপ। সংসারে যে সমুদয় স্বার্থকোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য মনুষ্যরক্তে লোলুপ হয়, কৃষিতে তাহারও নিবৃত্তি ঘটে। কৃষি ও শিল্পদ্বারা প্রকৃত পক্ষে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, বাণিজ্যে কেবল ধনের হস্তান্তর ঘটে মাত্র। হায়, যে ভারতে মিথিলাধীশ্বর জনক স্বহস্তে হল চালনা করিতেন, তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া অভিমান-দৃপ্ত আমরা ঈদৃশ লোকহিতকর কার্যকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করি! সত্য বটে অধুনা ভারতের চারিদিকে এই কৃষিশিল্প লইয়া আলোচনা চলিতেছে, এবং স্থানে স্থানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বিরাট জনসংঘের তুলনায় সে আন্দোলন অতি সামান্য মাত্র। ভারতভূমি স্বর্ণপ্রসূ;ভূভাগ প্রায় বিনা যত্নেই অনন্ত রত্নরাশি প্রাদন করিতেছে। যদি আমরা কৃষির প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হই, তাহা হইলে রপ্তানীরাক্ষসী শতজিহ্বা বিস্তারেও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না;বরং তাহাতে রত্নগর্ভা ভারতের ঐশ্বর্য দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

কৃষি

পাঠক শুনিয়া সুখী হইবেন, যে কৃষিকর্মের প্রতি চাক্‌মাদিগের অবজ্ঞার ভাব মাত্রই নাই। বংশ ও শিক্ষাভিমান নির্বিশেষে ইহাতে প্রায় সকলেরই আসক্তি দেখা যায়। সম্ভ্রান্ত দেওয়ান তালুকদারেরা নিজেরা সমস্ত কাজ করেন না বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও অবকাশ পাইলে অসঙ্কুচিত চিত্তে কৃষিকর্মে যোগদান করিয়া থাকে, এবং পাঠ্য জীবনের উপসংহারে যতদিন না অভিলষিত কর্মের যোগাড় হয়, অর্থাৎ যখন আমাদের যুবকগণ তাস-পাশায় কি উৎসব-আমোদে উন্মত্ত থাকে, সেই সময়টুকুও ইহারা কৃষিপ্রভৃতি গৃহকর্মের সবিশেষ তৎপর থাকে। তাই নব প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে বড়ই উপযোগী হইয়াছে, আশা হয় কালে এতদ্বারা এদেশ পার্বত্য সুইজার্লেণ্ডের ন্যায় মনোরম হইয়া উঠিবে।

সমাজের আসক্তি

বস্তুতঃ এই পার্বত্যপ্রদেশে কৃষির উপযোগী বিস্তর ভূমি পড়িয়া আছে; সামান্য চেষ্টা করিলেই আবাদ করা যাইতে পারে। ভূমিও বিশেষ উর্বরা; তাহাতে আবার বহুকাল যাবৎ অনাবাদে পতিত থাকায় যথেষ্ট বল সঞ্চিত রহিয়াছে। এহেন ক্ষেত্রে একটু মনোযোগের সহিত চাষের নিমিত্ত খাটিলেই উন্নতি নিঃসন্দেহ। অভাবের তাড়নায় এব কর্মক্ষেত্রের ভীষণ প্রতিযোগিতায় ইহারা ক্রমেই চাষের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছে। এতৎপ্রতি

চেষ্টা

প্রজাসাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণমানসে বর্তমান রাজা বাহাদুর রাজবিলাস নামক স্থানে সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে "মডেল ফারম্" খুলিয়াছেন এবং কুমার বাহাদুরও অপর এক "আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" খুলিয়াছেন। তাঁহাদের শুভচেষ্টা সফল হউক, ইহাই কামনা।

ইহাদিগের কৃষিকর্ম দ্বিবিধপ্রকারে নির্বাহিত হয়। প্রথমতঃ জুম এবং দ্বিতীয় হল। এই 'জুম' শব্দটি ইতিপূর্বে বহুবার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি; তাহা বুঝিতে হয়ত অনেকেরই কষ্ট হইয়াছে।

জুম

কিন্তু পার্বত্যপ্রদেশ মাত্রেই অর্থাৎ যে সকল ভূমিতে হলচালনার সুবিধা নাই তাহাতে, জুম করা হয়। সব্রহ্ম ভারতের সমুদয় পার্বত্য জাতির মধ্যে এই প্রথায় কৃষি চলিয়া থাকে। হিমালয় হইতে শ্যাম পর্যন্ত ইহার বিস্তার দেখা যায়। ইহা ব্রহ্মও আরাকানে "টংগ্যা" এবং মধ্যপ্রদেশে "ধৈয়া" নামে প্রসিদ্ধ। আর বাঙ্গালার এই "জুম" শব্দটি "জঙ্গম" শব্দ হইতে প্রসূত কিনা, সুধীসমাজের বিবেচ্য—কেননা ইহাও গমন অর্থাৎ স্থান পরিবর্তনশীল, যেখানে এক বৎসর জুম করা হয়, ৩/৪ বৎসরের মধ্যে সে ক্ষেত্রে পুনরায় সেইরূপে ফসল করা চলে না। সুতরাং অনায়াসলভ্য বিস্তীর্ণ ভূমি থাকিলে এই প্রথা মন্দ নহে। কিঞ্চিৎ অধিক পরিশ্রম প্রয়োজন হইলেও যৎসামান্য মূলধন চলিতে পারে। অথচ বার্ষিক চারি টাকা মাত্র রাজস্বে — এক দম্পতি সচরাচর দুই একর, নিয়মিত পোড়া (কেননা ভালপোড় না হইলে জুমক্ষেত্রে ঘাস কম হয় বলিয়া পরিশ্রমের লাঘব ঘটে.) হওয়ার উপযোগী "আকাবৃবন" (নিবিড় জঙ্গল) পাওয়া গেলে, চারি একর পর্যন্ত জুম করিতে পারে। এই কারণে অধিকাংশ সাধারণ পরিবারে ইহাই একমাত্র উপজীব্য। সেন্সাস রিপোর্টে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহাদিগের ১৪৭৭২ পুরুষ ও ১২৭৮৯ স্ত্রীলোক কৃষিজীবী; তন্মধ্যে ১৪০২৩ পুরুষ ও ১২০৬০ স্ত্রীলোক জুম করিয়া থাকে।

পরন্তু এই জুম প্রথার ফলাফল লইয়া বর্তমানে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। ইহাতে প্রধান আপত্তির কারণ — প্রথম বন্যদ্রব্য নষ্ট হয়, দ্বিতীয় তাহাদের স্থিতিহীনতা বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

জুমের ফলাফল

এই প্রথম আপত্তি সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। কারণ যে যে স্থানের বনজাতি দ্রব্যাদি রপ্তানী হওয়ার সুবিধা আছে, গভর্নমেন্ট প্রায় তত্তৎস্থান-সমূহ, এই পার্বত্য প্রদেশের প্রায় চতুর্থাংশ ভূমি,(৩২৮) রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং যে সকল স্থানের বন্যদ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার উপায় নাই, জুমপ্রথা না থাকিলে সে সব ক্ষেত্র পতিত থাকিত। এক্ষণে সেই সকল স্থানে কত ধন-সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে। তদ্বারা দেশেরও কত উপকার হইতেছে এবং গভর্নমেন্টও কত রাজস্ব লাভ করিতেছেন। পক্ষান্তরে ইহাতে চাষের ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা নাই। কেননা পাহাড় (যেখানে চাষ চলে না) ছাড়া জুম হয় না। আর এই পাহাড়গুলি প্রধানতঃ বাঁশবনে আচ্ছন্ন, জুমিয়ারা প্রধানতঃ বাঁশবন অনুসন্ধান করিয়াই

(৩২৮) প্রায় ১৩৫১.২ বর্গমাইল ছিল। তন্মধ্য হইতে "চাষের ভূমির বিস্তারের নিমিত্ত" গত ১লা মে (১৯০৯) মাননীয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্নমেন্ট মা ইয়নী উপত্যাকাংশীভূত রিজার্ভ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ক্ষেত্র নির্বাচন করে। বাঁশের উৎপাদিকাশক্তি এত অধিক যে, একবার জুম করিয়া গেলে — ৫/৬ বৎসরের মধ্যে সেই ভূমি পুনরায় জুমের উপযুক্ত হয়। কিন্তু জুমে জঙ্গল কমায় বলিয়া বৃষ্টিও কমিয়া যাইতেছে। ভূতপূর্ব ডেপুটি কমিশনার মিঃ ফোর্বস একদা বলিয়াছিলেন, "এই জুমের ফলে কর্ণফুলী নদী একসময়ে বালিতে মাজিয়া যাইবে।" বস্তুত তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া উঠিতেছে, এখন শীতকালে ইহার অনেক স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।[৩২৯] সম্প্রতি "নাইন্টিন্থ সেন্সুরী" নামক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জে, নিস্‌বেট ইহার কারণস্বরূপ বলিয়াছেন, জঙ্গল কাটিয়া ফেলিলে সন্নিহিত ঝরণাগুলি শুকাইয়া যায়; কাজেই শীতসমাগমে নদীর জল কমিয়া আইসে। তিনি আরও বলেন, জঙ্গলকর্তনে নিকটবর্তী ভূমির উর্বরতা হ্রাস হয়;সুতরাং আবাদী ভূমির পরিমাণ বেশী হইলেও, ফলে উৎপন্ন অধিক হয় না। দ্বিতীয়তঃ জুমদ্বারা যে স্থিতিহীনতা বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা কতকটা সত্য বটে। যদিও অধুনা কোন কোন জুমিয়ার স্থায়ী বাসস্থানও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা খুবই বিরল এবং অধিকাংশই চিরস্থায়ী নহে। দুঃখের বিষয় চাক্‌মাদিগের অনেকেই অমিতব্যয়িতায় প্রায় রিক্তহস্ত থাকে, মূলধনের অভাবে বাধ্য হইয়া জুমে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে বাধ্য হয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণীর মঘগণ তেমন নহে।

পৌষ-মাঘ মাস হইতেই ইহারা জুমের উপযোগী নিবিড় বনভূমি অনুসন্ধান করিতে থাকে। পরন্তু জুমক্ষেত্র যথাসাধ্য একে অপরের অনতিদূরে নির্বাচন করিবার চেষ্টা করে; তাহাতে বীজবপন, ঘাস উৎপাটন, ফসল সংগ্রহ প্রভৃতিতে ইহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য পায়। ফাল্গুনের প্রারম্ভে—যখন মলয়কর সঞ্চালনে তরুলতা নবীন-ললিত সুষমা ছড়াইয়া চতুর্দিক আকুল করিয়া তোলে, এবং বসন্তের এহেন সজ্জায়-কোকিলের অশ্রান্ত অনুরাগে পরসুখকাতরা

কর্তন ও দাহন

বিরহিনীগণ অন্তরে অন্তরে তুষানলে জ্বলিতে থাকে, তাহাদিগের সহানুভূতিতেই যেন সেই সুখ-দুঃখের সম্মিলনকালে "জুমিয়াগণ" বিরহিনীকুলবৈরী বৃক্ষবল্লবীর সর্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা পূর্বপুণ্য-ফলে বিরাটকায়, অথচ ফসলের কোন অনিষ্ট ঘটাইবার সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ বৃক্ষগুলি মাত্র বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতেই যে হতভাগ্যগণ যন্ত্রণাদায় হইতে রক্ষা পাইল তাহা নহে;অনন্তর যখন চৈত্র শেষে হুতাশনের লোলজিহ্বায় "খাণ্ডবদাহন" অভিনীত হয়, তখন মনে হয়, এরূপ গরমে জ্বলিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তাহাদের সে সময়েই জুমিয়া দিগের করাল "তাগলা" ঘাতে নিহত হওয়া ছিল ভাল! কর্তনপর্বের পর হইতে ইহাদিগের সহধর্মিনীগণও প্রাণান্তপণে স্বামীর সহায়তায় তৎপরা হয়। ইহাদের সেই কর্মজীবন বর্ণনার অতীত! চৈত্রের খরতর মার্তণ্ডময়ূখমালা

(৩২৯) পূর্ববঙ্গ ও আসামের বর্তমান লেপ্টেনান্ট গভর্নর স্যার লেন্সলেট হেয়ার কে, সি, এস, আই;সি, আই,ই, মহোদয়ের গত পরিদর্শনকালে স্থানীয় অধিবাসিবর্গ কর্ণফুলীর এই চর কাটাইবার প্রার্থনা উপস্থিত করিয়াছিলেন;তাহাতে তিনি বিশেষ আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন। আশা করি অচিরে অন্ততঃ রাঙামাটি পর্যন্ত শীতকালে অবাধে ষ্টিমার চলিবার সুবিধা ঘটিবে।

ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, মনে হয় যেন — স্মরহর এবার কালাগ্নি সদৃশ কোপবহ্নিতে ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীকরণে উদ্যত হইয়াছেন, সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া জুমিয়া দম্পতি অনাবৃত মস্তকে — অবিচলিত উৎসাহে সকার্য সাধনে নিরত রহিয়াছেন! দরদর ধারায় ঘর্ম প্রবাহিত হয়, ধমনীনিচয়ের ঘন ঘন সঞ্চালনে গৌরাঙ্গ আরক্তিম হইয়া উঠে, এই অবকাশে একবার পরস্পরের দৃষ্টিতে আসিলে যাবতীয় ক্লান্তি অবসান পায়, বিশ্রাম আকাঙ্খা মিটিয়া যায়! সুরসিক যাহারা সেই নির্জন প্রদেশে উদ্‌ভ্রান্ত রাগিণীর লহরী তুলিয়া অপূর্ব প্রণয় সঙ্গীতে আকুল পিয়াসা চরিতার্থ করে;এবং গানের উপসংহার সূচক "কুই" ধবনিতে দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া প্রাণের উৎফুল্লভাব পরিস্ফূরিত হয়। এতদতিরিক্ত উপহাস-বিদ্রূপ এবং ঠাট্টাকৌতুক ইত্যাদি ইত্যাদি কতই আছে! দম্পতির এহেন সম্মলিত শ্রম কত যে বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ, তাহা কল্পনায় আসিবে না, — কার্যে অনুভব করিবার সামগ্রী!!

বস্তুতঃ জুমে অগ্নিসংযোগ এক ভীষণ ব্যাপার! সে সময়ে সবিশেষ সাবধান না থাকিলে বিষম অনিষ্ট, এমন কি প্রাণ-বিয়োগ পর্যন্ত ঘটিতে পারে। আগুন লাগিলে চৌদিগবদ্ধ গিরিগুহায় বায়ুদেব দিশাহারা হইয়া যান, তাই রোষে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া আততায়ীর প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করেন। এইরূপে সমুদয় বনস্থলীতে ঘোর দাবদাহ উপস্থিত হয়, কোন কোন সময় সেই উদ্দাম হুতাশন-জিহ্বা লোকবসতি আক্রমণ করিয়া অসীম ক্ষতি সংঘটিত করে! আগুন দিবার পূর্বে শুষ্ক বৃক্ষবল্লীর এমনি সুকৌশলে সাজাইতে হয়, যেন সর্বাংশে সমভাবে জ্বলিতে পারে, এবং তাহা অকর্তিত জঙ্গলের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। সচরাচর বাতাসের নিশ্চল সুযোগেই অগ্নিসংযোগ করা হয়, তখন জুমিয়া দম্পতি সপল্লব শাখা হস্তে অনলদেবের সীমা রক্ষা করে। যদি সর্বভুকের অব্যাহত প্রভাবে নিতান্ত বৃহত্তর কাষ্ঠগুলি ব্যতীত আর সমুদয় ভস্মসাৎ হইয়া একাধিক ইঞ্চি পরিমিত ভূপৃষ্ঠ ভাগ পর্যন্ত পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা জুমের শুভলক্ষণ মনে করিয়া থাকে। অনন্তর দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠগুলিকে ক্ষেত্রপার্শ্বে সরাইয়া ফেলে;তাহারই সাধারণ সংজ্ঞা — 'আনূনী ছুতা', আমাদের কথায় — প্রথম বাছন।

আনূনী ছুতা

এক্ষণে বপনের কার্য। বরুণদেব পবিত্র স্নেহধারায় ধরিত্রীকে শীতল করিলে, জুমিয়া পরিবারের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই কাটিদেশে ধান্য, তিল, ভুট্টা, লাউ, কুমুড়, শসা, আলু, কচু, মার্ফা, বেগুন, চিনার, কার্পাস, তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ শস্যের বীজপূর্ণ "কুরুং" লইয়া "চুচ্যাং তাগল" হস্তে ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তাগল দ্বারা দক্ষিণ হস্তে সমদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত করিয়া বাম হস্তে তন্মধ্যে কতক মিশ্রিত বীজ রোপন করে। এই সকল গর্ত তিন ইঞ্চির অধিক গভীর করা হয় না;বীজবপনের পর সামান্য মৃত্তিকা উপরিভাগে চাপা দেওয়া হয়।

বপন

অনন্তর বৃষ্টি পড়িলে যখন যাবতীয় শস্যের চারা উঠিয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে মধ্যে যে সকল আগাছা জন্মে, তৎসমুদয় অন্ততঃ তিনবার পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়। প্রথমবার জ্যৈষ্ঠ মাসে যে বাছন হয়, তাহার নাম — "বীজপোতনা"। দ্বিতীয়বার আষাঢ় মাসে এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ বাছন প্রায়শঃ শ্রাবণ মাসেই হইয়া থাকে। এই দুই 'ছুতাকে' ইহারা যথাক্রমে "ছুতীকুচ্যা" বা কোমর ছুতা এবং "মিরছুতা" সংজ্ঞায় অভিহিত করে; এতদ্ব্যতীত জুমক্ষেত্র নিড়ানের আবশ্যক হয় না। পরন্তু জুম-কৃষিতে বৃষ্টি অধিক হইলে তরি-তরকারীর গাছ গুলি প্রায় নষ্ট হয়, কার্পাসেরও অপকার ঘটে।

"বীজপোতনা," কোমর ছুতা" ও "মির ছুতা"

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন ফসল বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে, সে সময়ে তাহারা "জুম পূজায়" ব্রতী হয়। ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী কোনও বনস্পতিছায়ায় বাঁশের একটি কার্পাসবৃক্ষাকৃতি প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাদের মোট যত দেবতা আছেন, প্রত্যেকেরই উদ্দেশে এক একখানি "মারেই" দুই-দু খানি পাতায় গাঁথিয়া তন্মূলদেশে প্রোথিত করিয়া থাকে। প্রথমে "বৃহত্তারা" দেবের পূজার নিয়ম, অনন্তর গঙ্গাপূজা। ইহাতে নদীকূলে ছাগল দুইটি বলি দিতে হয়। পরে "গইরা" প্রভৃতি অপ-দেবতাকে পূজা করিয়া একটি শূকর, ১৬টি মোরগ এবং হাঁস, পারাবত ইত্যাদি বলি দেয়। এই উপলক্ষে নিমন্ত্রনের আড়ম্বরও কম নহে; পূজায় মদ্যই প্রধানতম উপচার। সঙ্গে একখানি "তাগল"ও দেওয়া হয়। অতঃপর ধান পাকিলে "মা-লক্ষ্মী-মা"র পূজা করিবার রীতি আছে। ইহাতে পূজা পদ্ধতি কিছুই নাই, কেবল ওঝা ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া একটি শূকর অথবা দুইটি মোরগ কাটিয়া দেয়, এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ মদও ঢালিয়া দিতে হয়। তার পর এক গুচ্ছ ধানগাছ "থুরুং" মধ্যে পৃষ্ঠোপরি লইয়া গৃহাভিমুখে আসিতে পরিবারের সকলে "লক্ষ্মী মা আস" "লক্ষ্মী মা আস" বলিয়া ধান্য গুচ্ছকে অভ্যর্থনা পূর্বক গৃহে লইয়া যায়, এবং উচ্চ স্থানে স্থাপন করে। তৎপর একখানি "মেজাং"-এর উপর থালা কি পাতায়, ভাত ও বলিদত্ত প্রাণীর একখানি পা ও মস্তক সাজাইয়া "লক্ষ্মী-মা"র সম্মুখে তুলিয়া রাখে, পরিশেষে সমাগত সকলকে পরিপাটিরূপে খাওয়ান হয় এবং প্রসাদীভোজ্য নামাইয়া লয়।

জুম পূজা

পূর্বেই বলিয়াছি, বন্যপশুর উপদ্রব হইতে ফল রক্ষা করিবার নিমিত্ত জুম-ক্ষেত্রের উচ্চতম শৃঙ্গোপরি "মইন ঘর" প্রস্তুত করিয়া থাকে। জুমিয়া-গণ এই সময়ে বৃদ্ধ বা নিতান্ত অক্ষমদিগকে মাত্র গৃহে রাখিয়া স্ত্রী-পুত্রাদিসহ এখানে আসিয়া বাস করে। বন্য হরিণ, শূকর, কুক্কুর প্রভৃতির উৎপাত অতিশয় ভয়ানক; বিশেষতঃ ক্ষেত্রে দৌড়াদৌড়ি করিলে শস্য একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর উৎপন্ন ফসল সংগৃহীত হইলে ইহারা স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্তন করে।

পাহারা

বলা বাহুল্য, যাবতীয় ফসল এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ লাউ, কুমুড়, শসা, বেগুন,

মার্ফা চিনার তরমুজ, ভুট্টা ইত্যাদি যথাক্রমে দেখা যায়; পরে প্রায় আশ্বিন মাসে ধান পাকে। কার্পাস ও তিল পাইতে কার্তিক মাস আসিয়া পড়ে, এই তাহাদের শেষ ফসল। কাপ্তান লুইন নির্দেশ করিয়াছেন,[৩৩০] — এক দম্পতি বৎসরে নয় কানি (প্রায় এগার বিঘা) জমিতে জুম করিতে পারে। এই ভূমিতে বীজের নিমিত্ত গড়ে ৬ আড়ি[৩৩১] ধান, ৩ আড়ি কার্পাস এবং এই অনুপাতে তিল, ভুট্টা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। তদ্ভিন্ন তরি-তরকারীর জন্য লাউ, কুমুড়, মার্ফা, শসা প্রভৃতির বীজের আবশ্যক। নিম্নে তাঁহার নির্দ্ধারিত আয়-ব্যয়ের তালিকাখানি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।—

ফসল সংগ্রহ

উপরি - নির্দিষ্ট জুম-আবাদে আনুমানিক শ্রম মূল্য,—

জঙ্গল পরিষ্করণ—	একজনের ২০ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	৬৷৷০
বহস্তম, কাষ্ঠাদি স্থানান্তর করণ ও সাজান—	একজনের ১০ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	৩।৶
দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠ দূরক্ষেপণ—	দম্পতির একজনের ১০ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	৬।০
বীজবপণ—	দম্পতির একজনের ৭ দিন দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	৪।৶০
ঘাস উৎপাটন (প্রথমবার) —	একজনের ২৪ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	১৫ টাকা
ঘাস উৎপাদন (দ্বিতীয়বার)—	একজনের ১২ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	৭৷.০
ঘাস উৎপাদন (তৃতীয়বার)—	একজনের ৬ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	৩৷০
ধান কাটা—	একজনের ৩৬ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	২২৷৷০
শস্যাদির গুঁড়ি কর্তন—	একজনের ৩ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	১৸৶
কার্পাস তোলা (প্রথমবার) —	একজনের ১৮ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	১১৷৷০
কার্পাস তোলা (দ্বিতীয়বার) —	একজনের ২৭ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে	১৬৸৶

(৩৩০) Appendix D (The Joom) – The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers there in.
(৩৩১) এক আড়ির ওজন সমান চৌদ্দ সের।

কার্পাস তোলা (তৃতীয়বার)— একজনের ৩ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে ১।৵০

শস্য আহরণ এবং

কার্পাসের খোসা ছাড়ান— একজনের ১২ দিন - দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে ৭।।০

১০৮।৵০

বীজের মূল্য — ৪।।০

দা - প্রভৃতি — ২।।০

ঝুড়ি প্রভৃতি — ৮ টাকা

১৫ টাকা .... ১৫ টাকা

সর্বমোট — ১২৩/০

এক্ষণে দেখা যাউক উল্লিখিত ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফসলের মূল্য পরিমাণ কি হইতে পারে ঃ—

ধান্য — ১৮০ আড়ি, টাকায় ৫ আড়ি হিসাবে	....	৩৬ টাকা
কার্পাস — ১২।।০ মণ, মণপ্রতি তিন টাকা	....	৩৬ টাকা
তিল ও তরিতরকারী প্রভৃতির মূল্য	....	৪ টাকা
		৭৬ টাকা
এতদ্ব্যতীত বাঁশকাটা, নৌকাগঠন প্রভৃতি দ্বারা অতিরিক্ত উপার্জন যেন	....	৩০ টাকা
	সর্বমোট	১০৬ টাকা

কিন্তু এক দম্পতির বৎসরের নৈমিত্তিক খরচ যথা —

ধান্য ১২০ আড়ি	..	...	মূল্য	৩০ টাকা
মৎস্য ...	...	...	মূল্য	৪ টাকা
তৈল ...	...	...	মূল্য	১ টাকা
লবণ-মরিচ প্রভৃতি	..	...	মূল্য	৬ টাকা
সুপারি-তামাক প্রভৃতি	...	...	মূল্য	১০ টাকা
কাপড়	...	..	মূল্য	১২ টাকা
পূজা প্রভৃতি	...	...	মূল্য	৮ টাকা
উৎসবাদিতে	...	...	মূল্য	৬ টাকা
চিকিৎসা ব্যয়	..	...	মূল্য	৭ টাকা
অলঙ্কার বিবাহাদিতে ব্যয়	..	...	মূল্য	১৫ টাকা
জুমের দা প্রভৃতিতে ব্যয়	..	...	মূল্য	২।।০ টাকা
জুমের বীজ প্রভৃতিতে	...	...	মূল্য	৪।।০ টাকা
			মোট	১০৬ টাকা

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহারা যাহা উপার্জন করে, তৎসমস্তই অতি আবশ্যকীয় খরচেই শূন্য হয়।[৩৩২] অত্তিন্ন জুমকর ও অপরাপর অপরিহার্য কার্যের নিমিত্ত ইহাদিগকে হয়ত এ সকলকে সংক্ষেপ করিতে হয়; নতুবা ঋণ নিশ্চিত। আমি রাজপুরুষের উপরোক্ত তালিকার কোনও পরিবর্তন করি নাই। অথচ তিনি যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ইহাদিগের পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ্য সহজেই প্রতীয়মান হয়। পরন্তু ইতিমধ্যে ইহাদিগের উপর কয়েকটি নূতন কর চাপান হইয়াছে এবং কালের কুটিল গতিতে সাংসারিক খরচের মাত্রও বাড়িয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহাদিগের যে অমিতব্যয়িতার উদাহরণ দিয়াছি; তাহা ছাড়িয়া দিলেও এই তালিকা - নির্দিষ্ট পথেও পরিবার পরিচালন দুরূহ ব্যাপার। অনেকেই তাদৃশ দুঃসময়ে অনশনব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয় এবং সামান্য অনাবৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস করাল-জিহ্বা বিস্তার করিতে থাকে।

জুমিয়ার অভাব

পূর্বে এদেশে হল চালনার প্রচলন ছিল না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লুইন বলিয়াছেন,[৩৩৩] "হলকর্ষণ দ্বারা কৃষি করে এমন একজন পাহাড়ীকেও আমি জানি না, বাস্তবিক জুম ব্যতীত অন্যবিধ উপায়ে জীবিকার্জন কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় সম্পন্ন ব্যক্তির বাসসমীপবর্তী সামান্য ভূমিখন্ড মাত্র কোন কোন সময়ে হলকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহারা তজ্জন্য বাঙ্গালী চাকর নিযুক্ত করিয়া থাকে। সম্প্রতি "বন্য-সংরক্ষণী (Forest Reserve) বিধি" প্রবর্তিত হইয়াছে। আশা করা যায়, অতঃপর তাহারা (জুমের ক্ষেত্রাভাবে) লাঙ্গলের চাষ অবলম্বন করিবে"। পরন্তু তাঁহারই তিন বৎসর পরবর্তী মত,[৩৩৪] — "চাকমাদিগের মধ্যে এমন এক শক্তি জন্মিতেছে যে, তাহারা হেডম্যানদের হইতে স্বকীয় স্বার্থ প্রথমে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। সুবিধারূপ বন্দোবস্ত দ্বারা পাঁচবৎসরের মধ্যে এই জাতির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ হইতে পারিবে।"

হল

তদীয় ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। গভর্নমেন্টের সহৃদয়তা এবং স্বর্গগত মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও নীলচন্দ্র দেওয়ান মহোদয়দ্বয়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে এদেশে যে, লাঙ্গলের চাষ প্রবর্তিত হয়, অধুনা তাহা বহুল বিস্তারিত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন এসম্বন্ধে আপত্তি উঠে, সরকার বাহাদুর অতি ধীরভাবে তদ্বিচার মীমাংসা করিয়াছেন।[৩৩৫] তাহাছাড়া, ১৮৯২ সালের আইন প্রণয়কালেও ইহার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। প্রথম তিনবৎসর সম্পূর্ণ নিষ্কর ভোগদখল করা যায়। পরে একবার চোয়ালিয়া নিরিখে যে কর নিদ্ধারিত হয়, তাহা দশ বৎসর যাবৎ অপরিবর্তিত থাকে। সাধারণত হালচাষের প্রতি লোকের

চাষে সাহায্য

(৩৩২) বর্তমানে ধান্য-কার্পাসাদি যেমন মহার্ঘ হইয়াছে, সেই অনুপাতে মজুরের বেতনও সাতিশয় চড়িয়া গিয়াছে।

(৩৩৩) The Hill Tracts of Chittagong and dwellers therein – P. 13-14.

(৩৩৪) Letter No. 532 – To the Commissioner of Chittagong, dated 1st July 1872.

(৩৩৫) See the offg. secretary of Bengal – Mr. A. P. Macdonall's letter No. 1985 - 797 L.R. dated 1.9.1881.

উৎসাহ বৃদ্ধির মানসে করের হার খুবই কম রাখা হয়। রাজা এই প্রাপ্ত করের ষোড়শাংশ মাত্র পাইলে হেড্‌ম্যান অষ্টমাংস পাইবার ব্যবস্থা হয়। তাহাতে ইহার কারণও লিখিত রহিয়াছে। হেড্‌ম্যানগণ চাষকার্য বিস্তৃতকরিতে অধিকতর চেষ্টা করিবেন আশায় তাঁহাদিগকে রাজা হইতে এত অধিক পরিমিত লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরবর্তী বিধিতেই চাষকরের প্রাপ্ত টাকা প্রতি হেড্‌ম্যানের তিন আনা এবং রাজাবাহাদুরের ভাগে দুই আনা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বড়ই সুখের বিষয়, কর্তৃপক্ষের এতাদৃশী চেষ্টা ফলবতী হইতে আরম্ভ হইয়াছে।(৩৩৬) অধুনা চাক্‌মাদিগের চাষের প্রতি একটু মতিগতি ফিরিয়াছে। উপযুক্ত মূলধন সংগৃহীত হইলে ইহারা স্বতঃই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। ফেণী ও চেঙ্গীর তীরবর্তী সমতল ভূমি সমূহে একমাত্র হল চালনাতেই আবাদ চলিতেছে; তথাকার জমিগুলিতে উৎপাদিকা শক্তিও সর্বাপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে এই চাষবিস্তারের ফলে — ইহারা যে পূর্বে নিয়ত বসতি স্থানান্তরিত করিত, তাহা বহু কমিয়াছে; এক্ষণে অনেকেই স্থায়ী বাড়ীঘর প্রস্তুত করিতেছে।

চাষের বিস্তার

কিন্তু ইহাদিগের ভিতর এই চাষবিস্তারের মূলে বাঙ্গালীদিগের সহায়তাও কম উল্লেখযোগ্য নহে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ডেপুটি কমিশনার মিঃ পাউয়ার বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরের নিকট যে (নম্বর-৪৭২) পত্র দেন, তাহাতে উল্লিখিত ছিল, "এই জিলায় ত্রিবিধ প্রথায় ভূমির চাষ হয়। (১) কেবল মাত্র বাঙ্গালীদিগের চাষ, (২) বাঙ্গালী ও চাক্‌মাদিগের সম্মিলনে চাষ (রাঙামাটি ও নীলচন্দ্র দেওয়ানের গ্রামে) এবং (৩) পাহাড়ীগণদ্বারা কর্ষণ।" পরবর্তী কমিশনার মিঃ বীমসও বাঙ্গালী সংসর্গজনিত এই উপকার স্বীকার করিয়াছেন।(৩৩৭) তবে আক্ষেপের কথা এই যে, এত বৎসরের সহায়তাতেও চাক্‌মাদিগের অধিকাংশ এযাবৎ সম্পূর্ণ অনন্যনির্ভর ভাবে লাঙ্গলের কাজ চালাইতে পারে না; বাঙ্গালী ভৃত্য রাখা অনেকেরই আবশ্যক হইয়া পড়ে। শুনিতেছি "রাজবিলাস মডেল ফারমে" রাজাবাহাদুরের কোনও লাভ নাই, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাহার কারণ, একে ত পরনির্ভরতা, তাহাতে আবার বিজাতীয় বিদেশীয় চাকর, তাহাদের তত সহানুভূতি থাকিবে কেন? যাহা হউক, তথাপি যে তিনি নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রজাসাধারণের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি যথার্থ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। পরনির্ভর হইলেও ইহারা যে চাষে পাহাড়ী আর সকলের দৃষ্টান্তস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী সাহায্য

(৩৩৬) সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায়, ১৯০৩-০৪ সালে

চাক্‌মা সার্কেলে ৬০৯৫ একর ১ রোড ৩৩ পোল
বোমাং সার্কেলে ৪১১২ একর ২ রোড ১০ পোল
মঙ সার্কেলে ৪১৭৪ একর ২ রোড ৩২ পোল

ভূমির আবাদ হইয়াছে। তাহার রাজস্ব পরিমাণ ২২০০০ টাকা। কিন্তু ১৮৭৫ সনে কৃষিসংক্রান্ত কর মাত্রই ছিল না।

(৩৩৭) See the letter No. 227 H. dated 5.9.1879

এই তো গেল ধানের চাষের কথা; ইক্ষুর চাষও ইহাদের মধ্যে সাতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে সুবিধাও আছে মন্দ নহে। একবার বপন করিলে তিন বৎসর যাবৎ ফসল পাওয়া যায়। পূর্বে ইহারা এতাদৃশী সুবিধার কথা অবগত ছিল না। কয়েক বৎসর হইল অত্রত্য বাঙ্গালী অফিসার (Officers) বাবুরা যৌথ মূলধনে রাঙামাটির পার্শ্ববর্তী মাঠে ইক্ষুর চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিচালকের ত্রুটিতে তাহা অকালে ধ্বংস হইলেও তদ্দ্বারা পার্বত্যদিগের ইক্ষুচাষের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহারা শীতকাল আসিলে শুষ্ক নদী সৈকতে তাম্রকূট বীজ বপন করে। ইহাতে বিশেষ কোন পরিশ্রম নাই, তেমন শক্ত বেড়াও দিতে হয় না। কেবল মাত্র কষ্ট এই যে, পাতার মূল দিয়া যে সমুদয় নবমুকুল বাহির হয়, প্রত্যহ তৎসমস্ত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রয়োজন; নতুবা পত্রগুলি সতেজ হইতে পারে না। আর হলকৃষ্ট ভূমিতে সরিষাও ছড়ায়। শীতাগমে ফুল ফুটিলে ক্ষেত্রের হরিদ্রাভায় দূর হইতে দর্শকের নয়নপ্রাণ বিমুগ্ধ হইয়া যায়! "রাজবিলাস মডেল ফারমে" নবপ্রচলিত বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হয় না। কিন্তু কুমার রমণী বাবু স্বীয় "আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে" এনিমিত্ত যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন। তিনি চট্টগ্রাম "বিভাগীয় কৃষিসমিতির"র অন্যতম সভ্য; সুতরাং তাহাতেও সাতিশয় সাহায্য পাইতেছেন। তা'ছাড়া কৃষিসম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তিকা এবং মাসিক পত্র অবলম্বনে তাঁহার যাদৃশী চেষ্টা দেখিতেছি, তাহাতে আশা হইতেছে, — "আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" কালে নিশ্চিতই সফলতা প্রদান করিবে। সবডেপুটি বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান কৃষিবিষয়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে তদীয় রাঙামাটি বাসার অনতিবিস্তৃত প্রাঙ্গণে বৎসর বৎসর শাকসবজীর চাষ করিয়া থাকেন। মৃত্তিকার অনুর্বরতানিবন্ধন তাহার বহু চেষ্টাতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। বাবু কৃষ্ণকিশোর দেওয়ান তাঁহার বাড়ীতে আলুর চাষ করিয়াছিলেন তদুৎপাদিত এক একটা আলু ওজনে প্রায় আধপোয়া তিনছটাক হইবে; কিন্তু আস্বাদে ননীতালের আলুর সমান নহে। তথাপি ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে। এজন্য তিনি অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র! "কাচালঙ্গের মুখ' নিবাসী বাবু ইন্দ্রজয় দেওয়ানের নাম এস্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য, তিনি গতপূর্ব প্রদর্শনীতে সকলকে দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছেন যে, এই পার্বত্য মৃত্তিকাগর্ভে বিস্তর বহুমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে! প্রধানতঃ তাঁহার উৎপন্ন কলা, মূলা, সালগম, বেগুন, কুমুড় ও কচু সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। স্বীয় অসামান্য অধ্যবসায় এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রমুখ কতিপয় সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষি বিদগণের প্রচারিত গ্রন্থ সাহায্যেই তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় প্রদর্শনীর উচ্চতম পুরস্কারও তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। যদি সহৃদয় গভর্নমেন্ট এজন্য তদীয় পোষকতা করেন; তবে তিনি আরও উন্নতি করিতে পারিবেন, — আশা করা যায়।

ইক্ষু, তাম্রাক ও সরিষার চাষ

বৈজ্ঞানিক চাষ

২

ধান্য — নানা জাতীয়। তন্মধ্যে আবার প্রত্যেক জাতি কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা— বিনি দ্বাদশ প্রকার। "কবা বিনি"(৩৩৮) "বাঁদরা" "নুখ বিনি", শূকরের "লৌ-বিনি", "পেরেৎছা বিনি" "ফৌৎছা বিনি", অথবা "লবা বিনি", "থোবা বিনি", "উত্তরো বিনি", "রাতা বিনি", "কুড়ি বিনি", "লকা বিনি", "থেবি বিনি", "লঙ্কাপোড়া বিনি" ইত্যাদি, "তুর্কি" দুইপ্রকার, সাদা ও কাল। "বাড়েয়া" ত্রিবিধ — "বড় বাড়েয়া", "ছোট বাড়েয়া" এবং "চিকণ বাড়েয়া"। "কাম্রং" ও তিনি জাতীয়-বড়, ছোট ও চিকণ। "ছুরী" দ্বিবিধ—"জৈট ছুরী" এবং "এমি ছুরী"। এইগুলি প্রায় ভাদ্রের শেষভাগে পাকে। আর সকলের মধ্যে "মেইলি" দুই প্রকার — "মেইলি" ও "রঙ্গী";কবোরক ষড়বিধ — "কলা", "রাঙা", "বোরি", "হৈইল", "লুমব্রু" ও "পেলাং"। এই সমুদয় এবং "গেইলং" প্রভৃতি শ্রাবণের শেষ কি ভাদ্রের প্রথমেই পরিপক্ক হয়। এতদ্ভিন্ন "ট্যার্খো" "পর্ত্তকি" ও মধুমালতী প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠমাসে বপন করে, আশ্বিন মাসে পাকিয়া যায়; এবং "কামইন ধান" ভাদ্রমাসের মধ্যেই পাকে।

ভুট্টা — স্থানীয় নাম মোক্কা, ইহা চারি জাতীয়। যথা, — "বিনিমোক্কা", "চিত্রমোক্কা", "লালমোক্কা" ও "ধোপামোক্কা"। এগুলিও ভাদ্র মাসের মধ্যে পাকিয়া যায়।

তিল — দুই প্রকার;সাদা ও কাল। কিন্তু সরিষার — কোনও প্রকার ভেদ নাই। কার্পাস(৩৩৯)— দ্বিবিধ; "ফুলসূতা" ও "বিনিসূতা"। "ফুলসূতা" ধবলবর্ণ ও উৎকৃষ্ট। জুমে প্রধানতঃ ইহারই চাষ হয়। "বিনিসূতা" গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ — কেহ ইচ্ছা করিয়া ইহার বীজ বপন করে না। "ফুলের" বীজের সহিত ইহার বীজ মিশ্রিত হইলে সামান্য পরিমাণে দেখা যায়।

তামাক — "কফিপাতা" "খোলমোকরা" প্রভৃতি নানা জাতীয় আছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত রকমই প্রাধান।

আউকও — দুই তিন রকমের আছে, তন্মধ্যে "খাওগ্যা" শ্রেণীর নূতন আমদানী হইয়াছে। ইহার ছাল শক্ত বলিয়া বন্য পশুতে নষ্ট করিতে পারে না। ইক্ষুর স্থানীয় নাম - "কুছ্যাল্", চট্টগ্রামে "কুস্যার" বলে।

আলু — "মোম (লাল) আলু," "বাঁশতারা আলু", "ছিমি আলু," "রেং আলু", "জুরো আলু", "কুইয়াং আলু", "লাল ফেইলা আলু" এবং "সাদা ফেইলা আলু" প্রভৃতি।

(৩৩৮) আমরা এস্থলে অসুবিধায় পড়িয়া কোটেসন চিহ্নে চাক্‌মা নাম দিতে বাধ্য হইলাম।

(৩৩৯) কার্পাস এদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় বটে, কিন্তু এ সকল কার্পাস অতি নিকৃষ্ট। বস্ত্রসূত্র পক্ষে এ সমুদয় সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইহার অধিকাংশ পশমের সহিত মিশাল দেওয়ার নিমিত্ত জার্মানিতে চালান যায়। যদি সদাশয় গভর্ণমেন্ট এদেশে উৎকৃষ্ট কার্পাসের বীজ বিতরণ করেন, তবে বড়ই উপকার হয়।

কচু — "ওল কচু" (ওজনে প্রায় ১.৫ মণেরও অধিক হয়), মানকচু, "চাক্‌মা কচু", "কুল্‌পা কচু", "বিনি কচু", "শুক্‌না কচু", "কসুরী কচু", "নদে কচু" "বিষ কচু", "ছু-কচু", প্রভৃতি স্থলজাত এবং "পান্যা কচু", "হেরা কচু", "মোদ্দম কচু", "কাল গোয়ারী কচু", "সাদা গোয়ারী কচু" ইত্যাদি জলজ।

তরি-তরকারী — বেগুন দ্বিবিধ — "বারমাস্যা বিগুন" ও "জৈট্‌ বিগুন"। এতদ্ভিন্ন "মাম্বারা", "চিন্দিরা", "কুদুগুলা" (লাউ)[৩৪০], "ছুঁউরীগুলা" (কুমুড়), "কাঁরাগুলা" (কাঁকরোল), "তিতাগুলা" (উচ্ছে), "ঢেরস", "ঝিঙা", "কৈঁদা", "ছমি" (সিম), "দুমিছমি" (অরহর);শাকের মধ্যে পুঁইশাক, "ছাব্রেংশাক", "ফুছিশাক", "ওজন শাক", "মারিস শাক", "নারিচ শাক" "গাং-কুল্যা শাক", "ইয়ারং শাক", কচু শাক, ঢেঁকি শাক এবং লেংরা শাক ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন— লঙ্কা ও— নানা-জাতীয় আছে;এবং বাখরের মধ্যে "রাইবাহর", "জুম্মোয়া বাহর" প্রভৃতিও পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে।

(৩৪০) ইহারা যাবতীয় 'ফল' অর্থেই "গুলা" শব্দ ব্যবহার করে। এই সঙ্গে এতদ্দেশে উৎপন্ন কতিপয় বন্য ফলেরও তালিকা রাখিয়া গেলাম। যথা, — "খেরে আম", "রামকলা", "কেরেঙ্গা", "হাজা লেমু" (পাতিলেমু);"কন্নাল" (বাতাবি লেমু), "তরুঙ্গা", "মিঠালেমু", "নারেং কমলা", "কাদালেমু", "পুরুরেং", "ধল-কো", "রোগুচ্‌- কো", "পুণৎপাতা-কো", "আম্রা" (আমড়া), "জলপেই", "কাদামালা" (আমলকী, "হত্যল" (হরিতকী), "বটাগুলা" (বহেরা), "কুসুমগুলা", "ভারাগুাগুলা", 'পিলাগুলা", "দেমলগুলা", "ছুরেইগুলা", বত্তাগুলা, "জেইৎগুট্‌ গুট্যা", "মঘগুট্‌গুট্যা।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শিল্প

(১) বস্ত্রশিল্প — (২) বেতের বুনন — (৩) নৌকাগঠনাদি

শিল্পরচনায় চাক্‌মাজাতি পশ্চাৎপদ নহে। বরং তন্নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে একটি উৎকট আকাঙ্খা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে আমাদের রমণীসমাজ নিদ্রালস্যে কিংবা 'নভেল' পাঠে কাল অতিবাহিত করেন, চাক্‌মাগৃহিণী সেই সময়ে সাংসারিক অভাব পূরণে নিরত থাকে। দিনের বেলায় তাহাদের অবসর মাত্রই নাই। যদি গৃহকর্ম সারিয়া যৎকিঞ্চিৎ অবকাশ লাভ হয়, তখন তাঁতখানি হইলেও লইয়া বসে। রাত্রিরও অধিকাংশ সময় ধরিয়া সূতা কাটা বা সূতার বীজ ছাড়াইতে ব্যস্ত থাকে। ইহাদিগের এতাদৃশ অশ্রান্ত কর্মতৎপরতা দেখিলে দয়া ও ভক্তি যুগপৎ প্রবাহিত হইয়া হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া তোলে। আমরা এই পাহাড়ীজীবনের আলোচনাকালে তৎপ্রতি বঙ্গীয় পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা আছে, ইহাদের হইতে তাঁহারা গৃহিণীপনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শিল্পশক্তি

বর্তমান সভ্যতার সংজ্ঞামতে যে জাতি যত অধিক পরিমাণে আত্মনির্ভর, তাহাদের সভ্যতা গৌরবও তত বেশী। ইহাই শুধু সভ্যতার পরিমাপক হইলে চাক্‌মাদিগকে অসভ্য বলিয়া ভ্রূকুঞ্চন কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাদের মধ্যে সূত্রধর, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার ইত্যাদি রূপে শ্রমবিভাগের দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক নাই। সুতরাং বংশমর্যাদা - নির্বিশেষে সকলেই শিল্পোন্নতি সাধনে সুবিধা পাইয়া থাকে। এমন কি ইহাতে ধনী নির্ধনের মধ্যেও কোন তারতম্য দেখা যায় না। ইহাও একটি গৌরবের কারণ বটে যে, চাক্‌মাগণ কর্তব্য সাধনকালে স্বকীয় পদগৌরব সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষার অপরিসরতা নিবন্ধন ইহাদিগের শিল্প সাধনায় এযাবৎ বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা অতি সামান্য পরিমাণেই প্রবেশ করিতে পারিয়াছে।

শিল্প পরিমাপ

এই পাহাড়ীদিগের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি কল্পে — অত্রত্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ হাচিন্সন মহোদয়ের উদ্যোগপরায়ণতায় বিগত কয় বৎসর ধরিয়া "প্রদর্শনী"[৩৪১] হইয়া আসিতেছে। মাননীয় গভর্নমেন্ট তজ্জন্য বার্ষিক ২০০ টাকা দুইশত টাকা করিয়া দিয়া উদারতার পরিচয় দিতেছেন। ইহাতে স্থানীয় রাজন্যবর্গও অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। রাঙামাটিতে এই "প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হয়। ইহা দুই দিন যাবৎ স্থায়ী থাকে। এ উপলক্ষে যাত্রা, সার্কাস, নৌকাচালান, দড়িটানা (Tug of war), দৌড় প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদেরও অভাব হয় না। পাহাড়ীরা তাহাদের প্রদর্শিত দ্রব্যের নিমিত্ত যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে। ইতিমধ্যে তাহাদের প্রতিযোগিতা যেরূপ উন্নতিশালী হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, "প্রদর্শনী"র উদ্দেশ্য শীঘ্রই সুফলপ্রসূ হইবে। এই পুরস্কৃত লোকদিগের অধিকাংশই

শিল্পে সাহায্য

---

৩৪১) The Industrial and Agricultural Exhibition

চাক্‌মা জাতীয়। গুণসাপেক্ষ বিচার হওয়াতে ইহারাই সমধিক লাভবান হইতেছে। তদ্দ্বারাও অবশ্য বুঝিতে পারা যায় যে, অত্রত্য পাহাড়ীদিগের মধ্যে চাক্‌মাগণই কৃষি ও শিল্পে অপেক্ষাকৃত উন্নত।

১

প্রদর্শিতদ্রব্যসকলের মধ্যে ইহাদের বস্ত্রশিল্পই সাতিশয় উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে ভারতের সর্বত্রই এতৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, প্রত্যেক ভারতবাসীরই ইহা লইয়া ধীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। কিন্তু শত ধন্য চাক্‌মা মহিলায়, তাহারা লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া নাই। শুনিয়াছি, প্রথম বক্ষে জড়াইবার বস্ত্র (খাদী) খানি প্রত্যেকের নিজেকেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কথাটা সত্য হইলে তাহাকে শিল্প-শিক্ষায় এক মনোরম শাসন বলিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক চাক্‌মা মহিলাই বস্ত্র বয়নে অল্পবিস্তর পারদর্শিনী; বয়ন শিল্প তাহাদের শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ।(৩৪২)

শিল্পশাসন

ইহাদিগের (হাতের) তাঁতে বস্ত্র বয়ন একটু সময়সাপেক্ষ সত্য, কিন্তু তাহাতে এমনি মনোহর ফুল তোলা যায় যে, দেখিতে স্বতঃই প্রশংসা করিবার ইচ্ছা জন্মে! এই সকল তাঁতে মোটা সুতার কাজই ভাল চলে। পরন্তু ইহারা বেশী বস্ত্র শিল্পেও সবিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতেছে। স্বর্গীয়া চাক্‌মারানী দয়াময়ীর স্বহস্ত নির্মিত দুইখন্ড রেশমী বস্ত্র "বোম্বাই প্রদর্শনী"তে কিরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর সকলের মধ্যে "কাচালঙেরমুখ" নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ান এবং তদীয় শ্বশুর চেঙ্গীতীরবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ানের পরিবারেই অপেক্ষাকৃত পটুতা দেখা যায়। সম্প্রতি শেষোক্ত মহোদয়ের অন্যতম জামাতা চেঙ্গীবাসী বাবু শশীমোহন দেওয়ান একখানি "ফ্লাইসাটেল্‌লুম" আনিয়া স্বীয় বাড়ীতে কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহার কাজ যে কিরূপ চলিতেছে, এযাবৎ সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে ইহাদের হাত যখন অভ্যস্ত আছে, তখন সফলতা লাভে যে বহু বিলম্ব, বোধ হয় না। ইহারা সরুসূতা কাটিতে জানে না। সুতরাং অধিকাংশ কাপড়েব নিমিত্ত বিদেশজাত সূতা আমদানী হইয়া থাকে। এ সকল সূতা সাদাই আসে। পরে ইহারা প্রয়োজন মতে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষবল্লবীর নির্যাস দ্বারা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লয়। সচরাচর "কালাগাব" বৃক্ষের বল্কল জলে সিদ্ধ করিয়া কাল রং, তাহাতে কাল্‌মা যোগে নীলকৃষ্ণ, কার্মাপাতা পঁচাইয়া চুন মিশাইলে বা হল্‌দি ও আমগাছের ছাল দিয়া পীত, কাল্‌মা ও হল্‌দিতে সবুজ এবং "রঙগাছের" শিকড় চূর্ণ ক্ষারের জলে মিশাইয়া লোহিত রঙ করিয়া লইয়া থাকে। এই সকল রঙকে পাকা করিতেও বনজপত্র বিশেষের রস ব্যবহৃত হয়।

উন্নতি

(৩৪২) শুনিতে পাই, পূর্বকালে ইংরাজ অর্ধাঙ্গিনীগণও বস্ত্র বয়নে তৎপরা ছিলেন, তন্মূলক এংগ্লোসাক্সন "wifian" শব্দ হইতে ইংরাজী ওয়াইফ্ (wife) কথাটী আসিয়াছে। তাহা হইলে এক্ষণে কয়জন ইংরাজ-ললনা সার্থক ওয়াইফ্ (wife) সংজ্ঞার অধিকারী?

ইহাদিগের নির্মিত সাধারণ বস্ত্রশিল্পগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল। যথা —

"পিন্দন" — স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র। পূর্বেও ইহার একরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা লম্বে তিন হাত এবং প্রস্থে দুই হাত পরিমিত হইবে। বর্ণ গাঢ় নীল, মধ্যে প্রায় চারি অঙ্গুলী করিয়া বিস্তৃত লোহিত বর্ণের দুইটি সুদীর্ঘ ডোরা থাকে। ইহা প্রধানতঃ মোটা সুতাতেই প্রস্তুত হয়।

বস্ত্রপরিচয়

"খাদী" — বক্ষোবন্ধন বস্ত্র দৈর্ঘ্যে ২.৫ কি ৩ হাত, কিন্তু প্রস্থ এক ফুটের অনধিক। "খাদী" দুই জাতীয় — "রাঙা খাদী" ও "ফুল খাদী", "রাঙা খাদীতে" লাল সূতার কাজই বেশী, "ফুল খাদী"তে ফুল রচনাতেই অধিকতর মনোযোগ থাকে। ইহাতে "বাদই চোখ", "ত্রিপুরাউলু ফুল", "করঙা ফুল" প্রভৃতি নানা রকমের ফুল তোলা হয়।

"খবং" — পাগড়ী। ইহার সুতা সাদা, তবে যুবতীদের "খবং" প্রান্তে লোহিত বর্ণ রঞ্জিত সুতার "ফুল" তুলিয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন হাতেরও অধিক, প্রস্থ কোনরূপে এক হাত মাত্র হইতে পারে।

"কর্জাল" — 'ব্যাগ' (Bag) বা থলি বিশেষ। ইহা স্কন্ধোপরি হইতে উপবীত প্রায় ঝুলাইয়া লয়।

"পানের খল্যা" — ইহাকেও থলি বলা যায়; পান, সুপারী প্রভৃতি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

"গামছা খানি" — সচরাচর গা-মুছিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেও অনেক পুরুষ গরীব-দুঃখী ইহা পরিধানও করিয়া থাকে। ইহা নানা বর্ণেরই হয়। দীর্ঘ ৩ কি ৩.৫ হাত এবং প্রস্থ ১ কি ১.৫ হাত; কোন কোন "গামছা খানি" তে ফুলও তোলা হয়।

"তৈইলা" — ইংরাজী towel শব্দের অপভ্রংশ। ইহা যে অনুকরণে আসিয়াছে, সহজে বুঝা যায়। এখনও সকলে এমন কি অধিকাংশ স্ত্রীলোকে ইহা প্রস্তুত করিতে জানে না। ইন্দ্রজয় ও রাজচন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যে তোয়ালে প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় বিলাতী 'তোয়েল'রই অনুরূপ। সম্ভবতঃ সর্বাদৌ তাঁহাদের পরিবারেই এই অনুকরণ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

"আলাম" — ইংরাজী (chart) "চার্টের"ই অনুরূপ। ইহাতে হরেক রকমের ফল লতাদির নমুনা রক্ষিত হয়। বস্ত্র বয়নকালে ইহা আদর্শরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"বার্গি" — ইহা "গিলাপ" নামেও প্রসিদ্ধ। সাধারণত বর্ণ ধবল, দুই দীর্ঘ ধারে লোহিত বর্ণের সামান্যরূপ পাইর। দৈর্ঘ্যে ১০ হাত ও প্রস্থে দুই হাতের দুই খানি কাপড় তৈয়ার করিয়া উভয় খানিকে জোড়াইয়া চারি হস্ত পরিমাণ বিস্তৃত করে। অনন্তর তাহাকে দুই ভাজ অর্থাৎ ৫ হাতে ৪ হাতে করিয়া শীতের সময় গায়ে দেয়।

এতদ্ভিন্ন চাক্‌মারমণীর প্রস্তুত "ছিলুম" (কোর্তা, এর কাপড়, বালিসের কাপড়, বিছানার চাদর, টেবিলের চাদর, বিশেষতঃ দাবা-পাশা প্রভৃতি 'খোলার ঘরে' সুন্দর কারুকার্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বয়ন প্রণালী — তাঁত অপেক্ষাকৃত ছোট, স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয় বলিয়া প্রস্থে কোনরূপে দুই হস্তের অধিক নহে। কারণ, ইহাতেও তাহাদিগকে হেলিয়া ঢলিয়া মাকু চালাইতে হয়। তাঁত ঝুলাইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র কোন ঘর নাই। সচরাচর "ইজরে" বসিয়াই বস্ত্রবয়ন করিতে দেখা যায়। জুমের খন্দকালে জুমিয়া মহিলাগণ তাঁতের কাজে হাত দিতে পারে না। পরে অবসর মতে অর্থাৎ সাংসারিক নৈমিত্তিক কার্যাদি সারিয়া — যে সময়ে আমাদের বঙ্গমহিলাগণ নিদ্রাসুখ-সম্ভোগে কাটায়, তখন ইহারা তাঁতখানি লইয়া বসে। এইরূপে "পিধনের" মত একখানি কাপড় তৈয়ার করিতে প্রায় মাসাধিককাল গত হয়। কিন্তু কাপড়ও এরূপ টেকঁসই হয় যে, দুই খানি "পিঁধনে" অবাধে দুই বৎসর কাটিয়া যায়।



টানাগুলির উভয় প্রান্ত দৃঢ় সন্নিবদ্ধ থাকে, এক প্রান্ত "তাম্বোয়া বাঁশে(৩৪৩) আবদ্ধ করিয়া, বাঁশের উভয় দিক্ সম্মুখস্থিত কোনও স্তম্ভে বাঁধিয়া দেয়। অপর প্রান্ত "তাগলক যোড়ে"(৩৪৪) আটকাইয়া দু'পাশে দুইখণ্ড রজ্জু মহিষচর্মের "তাবৃছি" সহযোগে কটিদেশে টানাইয়া লয়। কর্কশ রজ্জুতে মেরুদণ্ডে ব্যথা লাগে; তাই এ চর্ম "তাবৃছির" প্রয়োজন। টানা গুলির কতক উপরে ও কতক নিম্নে থাকে, সেই উর্দ্ধাধঃ অবস্থান পরিবর্তন করিতে "ব-কাঠি"(৩৪৫) ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কৌশলের সহিত সামান্য জোরে নাড়া দিলেই উপরের টানা নীচে এবং নীচের

(৩৪৩) "তাম্বোয় বাঁশ" — ইহা সাধারণ বংশখণ্ড মাত্র।

(৩৪৪) "তাগলক্ যোড়" — বাঁশের দুই খানি বাখারী মাত্র।

(৩৪৫) "ব-কাঠি" — ব অর্থাৎ সূত্র - কাঠি। সচরাচর এই কাঠিতে টানাগুলি একান্তরে জড়াইতে হয়। তবে ফুল-লতাদি তুলিতে "আলাম" দেখিয়া টানা জড়াইয়া থাকে।

টানা উপরে চলিয়া আইসে। এতদ্ভিন্ন কাপড়ে যত অধিক ফুল তুলিতে হয়, "ব-কাঠি"ও তত অধিক প্রয়োজন। ফুলে বা লতার প্রত্যেক রূপান্তরে একএকখানি "ব-কাঠি"র আবশ্যক হইয়া থাকে। "ব-কাঠির"র সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড "ছুচ্যাক্ বাঁশ"(৩৪৬)ও থাকে; তদ্দারা "ব-কাঠি" চাপিবার সুবিধা হয়। টানাগুলি যাহাতে ইতস্ততঃ সরিতে না পারে, তাই তৎসমুদয় "স্যয়ং" নামধেয় সরু বংশ-খণ্ডে সুকৌশলে জড়িত থাকে। এইরূপে টানা সজ্জিত হইলে "থুরচুঙা"য়(৩৪৭) পড়েন চালাইয়া "ব্যং"(৩৪৮) দ্বারা তাহা চাপিয়া দেয়। একটি পড়েন ফিরাইতে প্রথমতঃ "ব্যাং" দ্বারা পূর্ব বিন্যস্ত পড়েন চাপিয়া "ছুচ্যাক বাঁশে"র সাহায্যে "ব-কাঠি"র উপরের টানাগুলি নীচে এবং নীচের টানাগুলিকে উপরে তুলিয়া লয়, এবং "ব্যং" খানি সেই উন্মুক্ত পথে চালাইয়া পুনরায় চাপ দ্বারা পড়েনের স্থান অব্যাহত করে। অনন্তর "থুবচুঙা" বিপরীতাভিমুখে চালাইলেই পড়েন পড়িয়া যায়। যদি কোনরূপে টানা বা পড়েন সঙ্কুচিত বা জটিল বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, সজারুকন্টকের সাহায্যে তাহার শৃঙ্খলা বিধান করা হয়। এই কাঁটার সাধারণ নাম — "কুদুক্-কাদা"।(৩৪৯)

বস্ত্র বয়নের প্রধান কার্য — টানা এবং "ব-কাঠ" ঠিক কবিয়া লওয়া। তা' না হয় "ব্যং" চাপন ও "থুরচুঙা" চালনে কোনও বিশেষ পারদর্শিতা নাই। পরন্তু একবার 'পড়েন' ফিরাইতে ইহাতের প্রায় ৩/৪ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, টানা বসাইবার পূর্বে সুতাগুলি কলপে মাখিয়া লয়, অন্নমন্ডই ইহাদিগের একমাত্র কল্প। এইরূপে —

"কার্পাসে কর্কশ বস্ত্র বুনে বিনোদিনী;
সুবর্ণ অঙ্গুলিচয়
— কিন্তু কোমলতা ময়,—
নাচে তন্ত যন্ত্রে, (নীচে গায় কল্লোলিনী!)"

১০ম শ্লোক, "জুমিয়া জীবন।"

২

বুনন কার্যে পুরুষ চাক্মা মাত্রেই প্রায় সিদ্ধহস্ত। তাহারা ঝুড়ি প্রভৃতি এত চিক্কণ ও পারদর্শিতা সহকারে প্রস্তুত করে যে দেখিয়া চোখ ফিরান কঠিন হয়। তবে এই সকল কার্যে বাঁশের চেঁচাড়ীরই প্রচলন অধিক। শীর্ষদেশে যদিও 'বেতের বুনন' সংজ্ঞা দেওয়া হইল, কিন্তু

(৩৪৬) "ছুচ্যাক্ বাঁশ" — ইহা প্রায় "তাম্বোয়া বাঁশেরই অনুরূপ; বিশেষত্ব মাত্র এই যে, ইহার এক প্রান্ত সূঁচালো।

(৩৪৭) থুরচুঙা — বংশ নির্মিত মাকু। ইহা একটি এক প্রান্ত বদ্ধ সাধারণ 'চুঙা' বিশেষ। গাঁইট বিশিষ্ট প্রান্ত অপেক্ষাকৃত সূঁচালো করা হয়। তা'ছাড়া চুঙার পার্শ্বে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। সূত্রনলী চুঙার মধ্যে ভরিয়া খোলা প্রান্তে ফুৎকার দিলেই ছিদ্র দিয়া নলী হইতে সূত্র প্রান্ত বাহির হইয়া আসে।

(৩৪৮) "ব্যং" — একখানি মসৃণ ও ভারী বংশখণ্ড।

(৩৪৯) "কুদুক — সজারু, কাদা — কাঁটা, অর্থাৎ সজারু কন্টক। কেহ কেহ হরিণ শৃঙ্গ সূচাগ্র কবিয়াও এনিমিত্ত ব্যবহার করে।

বেত অল্প কাজেই ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ বাঁশ অধিকতর সহজলভ্য বলিয়া বেতের প্রতি তাদৃশ নজর পড়ে না। এই পাহাড়ে এগার জাতীয় বাঁশ পাওয়া যায়। নাম যথা, — "এগজ্যা" "ফার্বোয়া" (পাইয়া), ওঢ়া, "মিদিঙা" (মিতিয়াঁ), ডলু, "কালিছিরি", "ভুদুম", "নয়ানসুক", "লুদি" (লোথা), বারিয়ালা বা বাইরা, এবং কাঁটা বাইরা। ইহার যে কোন বাঁশ দিয়া সকল কাজ করা যায় না। মিতিয়া, ডলু ও লোথা বাঁশই ঝুড়ি নির্মাণে বিশেষ উপযোগী; তন্মধ্যে ডলু বাঁশেরই প্রচলন অধিক। এই বাঁশ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫ হাত এবং পরিধিও ১৫/১৬ ইঞ্চি পরিমিত হইবে। নিম্নে এতদ্বারা প্রস্তুত ঝুড়িগুলির বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

ডলু বাঁশের কাজ

"দুল" — আমাদের কথায় ডোল। ইহা এত বড়ও দেখা যায় যে, ৭/৮ মণ জিনিষ অনায়াসেই রাখা যাইতে পারে। "দিংরা" — ইহাতে সচরাচর ধান্যাদি শস্য রাখা হয়; আকারে ডোল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। "বারেং" — গঠন প্রণালী "দিংরার"ই অনুরূপ। ইহাকে ছোট "দিংরা" বলা যাইতে পারে। খুঁটা প্রভৃতি দিয়া বিশেষ কারু-কার্যের সহিত প্রস্তুত হইলে ইহা "ফুলবারেং" নামে কথিত হয়। গহনা বস্ত্রাদি বহুমূল্য সামগ্রী ইহাতে সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ "বারেং" ও "ফুলবারেং" ইহাদের সিন্দুকের অভাব পূরণ করে। "কাল্লোয়াং"—সাধারণ "বারেং" এর সহিত তারতম্য অতি সামান্য মাত্র; কিন্তু ইহাদিগের নিত্য প্রয়োজনে আসে। খুঁটা চারিটী লাগাইয়া "পিঠাকাল্লোয়াং" প্রস্তুত করা হয়; বাজারাদিতে যাইবার সময় ইহা পৃষ্ঠের উপর দিয়া কপালের সঙ্গে ঝুলাইয়া লইয়া থাকে। "কাল্লোয়াং" ভারী না হইলে, বিশেষতঃ সমতলভূমিতে চলিতে কপাল হইতে দড়িখানি স্কন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্তে টানিয়া রাখে। আবার ভারী বোঝা লইয়া বেশী দূরে যাইতে হইলে "কাল্লোয়াং" এর সহিত দুই খানি "খিয়াম্" অর্থাৎ আঁকুড় বাঁধিয়া লয়; দুই স্কন্ধে "খিয়াম" দুইখানি দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে, সুতরাং কপালে জোর খুব কম পড়ে। "কুরুং" — "কাল্যোরং" হইতেও অনেক ছোট এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছিদ্র। শস্য বপন কালে ইহাতে করিয়া বীজ লওয়া হয়।

মিতিয়াঁ বাঁশের কাজ

তৎপরে "মিতিয়াঁ বাঁশ"। ইহা ২০ হাত পর্যন্ত লম্বা হয় এবং পরিধিও প্রায় ৯/১০ ইঞ্চি পর্যন্ত দেখা গিয়াছে। আকারে ও গঠনে "পাইয়া বাঁশ" ও প্রায় একরূপ। কিন্তু "মিতিয়াঁ বাঁশে" "পাইয়া বাঁশ" অপেক্ষা স্থিতিস্থাপকতা শক্তি অধিক; বেধও কিঞ্চিৎ বেশী হইবে। এই নিমিত্তই ছোটখাট ঝুড়ি সমুদয় "মিতিয়াঁ বাঁশে" নির্মিত হইয়া থাকে। কয়েকটীর বিবরণ যথা — "পূল্যাং" — সেঁচনী বিশেষ, গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এতদতিরিক্ত "লুই"[(৩৫০)] এবং কুলা-চালুনি, ডুব ও নানাবিধ "চাই"[(৩৫১)] এই "মিতিয়াঁ বাঁশে" প্রস্তুত হয়।

(৩৫০) "লুইর" গঠন প্রণালী সেঁচনীর ন্যায়, কিন্তু সারা গায়ে জল সরিয়া পড়িতে পারে অথচ মাছ যাইতে না পারে এমন সব ছিদ্র আছে। জল সেঁচিয়া ইহাতে ফেলা হয়। সিঞ্চিত জলের সহিত যদি কোন মাছ যায়; তৎসমুদয় ইহাতে আবদ্ধ হইয়া যায়।

(৩৫১) মৎস্য ধরিবার কল বিশেষ, কোন কোন দেশে ইহাকে ঘুনী বলা হয়।

কিন্তু বুন্‌ন কার্যের পক্ষে "লোথা বাঁশই" সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই বাঁশ সকলের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপক এবং চেঁচাড়ি গুলিও বিশেষ মসৃণ হইয়া থাকে। এই বাঁশের "ছাম্মোয়া" অর্থাৎ বাক্সবিশেষ অতীব মনোহর। ইহার বাহিবে নানা কোণ এবং ভিতরে বিবিধ কক্ষ গঠিত করিয়া অশেষ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ কবা হয়। "কুম" অর্থাৎ কলসির ত্রিকোণ বিশিষ্ট ঢাকনীও "লোথা বাঁশে" নির্মিত হইয়া থাকে।

লোথা বাঁশের কাজ

বেতসও এই প্রদেশে অষ্টবিধ, যথা;— "মরিজা", "চিকণ মরিজা", "গল্লাক", "কেরেৎ", "কর্কজ্যা", "বাঁদরী", "লুদুং" এবং "জ্যাং"। কিন্তু ঝুড়ি, ঝাঁপী প্রভৃতি বুনন কার্যে "গল্লাক", "বাঁদরী" ও "মরিজা" — এই তিন রকমের বেত মাত্র ব্যবহারে আসে। বেতের কাজ তত অধিক নহে, পূর্বোক্ত ঝুড়ি, ঝাঁপীও ইহাদের মধ্যে বিরল প্রচলিত। তা'ছাড়া, ধান্যাদি শস্য মাপিবার আড়ি, সেরী, ছেলে দোলাইবার — দোলনা এবং মৎস্য সংগ্রহের "দুলা" মাত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আড়ি, সেরী, "ফুলবারেং", "পিঠকাল্লোয়াং" এর খুঁটিগুলি একমাত্র "গল্লাক" বেত দ্বারাই দেওয়া হইয়া থাকে।

বেতের কাজ

৩

নৌকা প্রস্তুত করাও ইহাদিগের জীবিকাসংস্থানের একতম উপায়। জুমের বপন ও বাছন কার্য শেষ হইয়া গেলে, সাধারণত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেই ইহারা নৌকা কাটিতে যায়, নদীস্রোত প্রবল থাকিতে থাকিতেই নামাইয়া লইয়া আসে। এই কার্যে পুরুষেরা অনুগ্রহ করিয়া সহধর্মিনীগণকে ছাড়িয়া যায়। তাহারা "মইন ঘরে" থাকিয়া জুমক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে। বস্তুতঃ যৌথ-পরিবারেই নৌকা কাটিবার বেশ সুবিধা। তদ্ভিন্ন যে পরিবারে সামর্থ্যশালী একাধিক পুরুষ নাই, অন্যান্যকে তন্নিমিত্ত অংশীদার করিয়া লইতে হয়। ফলকথা, একজনের দ্বারা নৌকাকাটা কোনরকমেই চলে না। ইহাদের প্রস্তুত নৌকা কেবল যে চট্টগ্রামে মাত্র পশার লাভ করিয়াছে এমত নহে, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি দূর দেশেও বিস্তর সংখ্যায় রপ্তানী হইয়া থাকে। বর্তমানে অত্রত্য অন্যান্য সার্কেলের তুলনায় বোমাংসার্কেলেই নৌকা প্রস্তুত করিবার উপযোগী গায় বেশী। চাক্‌মা-সার্কেলের মাইয়নিতেও যথেষ্ট গাছ আছে, কিন্তু তৎসমস্ত এতদিন 'রিজার্ভ' ছিল বলিয়া পাওয়া যায় নাই।

তেলসুর, চাপালিস ও জারুল গাছের নৌকাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। বিশেষতঃ তেলসুর ও চাপালিস কাঠ ওজনে পাতলা এবং জলে বেশী দিন স্থায়ী হয়। এই দুই কাষ্ঠের শাল্‌তিরই প্রচলন অধিক। কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি দেশে প্রধানতঃ শালতিই রপ্তানী হইয়া থাকে। যদিও চাপালিস তেলসুরের সমান স্থায়ী নহে, কিন্তু প্রধানতঃ এই শ্রেণীর গাছ হইতেই আকাবে বৃহত্তম নৌকা বা শাল্‌তি পাওয়া যায়। জারুল গাছ অত্যন্ত সুদৃঢ়, তাহার নৌকাও বৃহদায়তনে প্রস্তুত হইতে পারে, এমন কি ৩০ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ দেখা যায়।

নৌকার কাঠ

কিন্তু এই গাছের নৌকা গুরুত্বের আধিক্য নিবন্ধন বেশী চলে না। কস্তুরী, কামদেব, ও গামার নৌকা নির্মাণের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাছ। এতদ্ভিন্ন করই, তালি, গুটগুট্যা, পিত্রাজ, গর্জ্জন, বৌলসুর, কাঁকড়া, ভাদী প্রভৃতি গাছেরও নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে ইহাদিগের নৌকাগঠনে একটি বিশেষ ত্রুটী আছে। একটি গাছ খোদিয়া ইহারা একখানি মাত্র নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহাতে যে কাঠ নষ্ট হয়, সেই পরিমিত কাঠে তক্তাচিরা নৌকার তিন-চারি খানি নির্ম্মিত হইতে পারে। এইরূপ তক্তা চিরিয়া নৌকা প্রস্তুত করিতে জানিলে, ইহাদের কাঠ ও শ্রমের যথেষ্ট লাভ হইত। কিন্তু কাষ্ঠশিল্পের আরও উন্নতি না হইলে সে আশা কোথায়!

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাকালে ইহাদিগের "তাগল" ভিন্ন সচরাচর ব্যবহার্য বিশেষ কোন অস্ত্র ছিল না; একমাত্র "তাগল" দ্বারাই ইহারা যাবতীয় কর্ম নির্বাহ করিত। অধুনা ইহাদের মধ্যে নৌকাদি গঠনের নিমিত্ত কুরুল, "বাইস্" প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে। এই অস্ত্রের সাহায্যে

নৌকা খোদা

প্রথমে গাছের মধ্যভাগ খোদিয়া লয়; অনন্তর "সামাতেইজং"[(৩৫২)] দ্বারা ছিদ্র করিয়া কোনও নির্দিষ্ট পরিমিত কাঠের একটি সরু কাঠি ঢুকাইয়া দেয়, এবং নৌকার অভীপ্সিতবেদ বাদ রাখিয়া বহির্ভাগ হইতে অবশিষ্টাংশ চাঁছিয়া ফেলে। অর্থাৎ যেন কোন ক্ষোদিত-বক্ষ কাষ্টখন্ডের তলদেশ ছিদ্র করিয়া অষ্ট অঙ্গুলী পরিমিত একটি কাঠি ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। নৌকার বেধ রাখা হইবে — চারি অঙ্গুলী মাত্র। তাহা হইলে উক্ত কাষ্ঠখন্ডের বহিঃপ্রদেশ এরূপ চাঁছিতে হইবে, যেন উক্ত কাঠির চারি অঙ্গুলী পরিমিত নৌকার পৃষ্ঠ-বহির্ভূত থাকে। পরে কাঠিটি খুলিয়া সেই ছিদ্র ভালরূপে আঁটিয়া দেওয়া হয়। অনেকে "সামাতেইজং"-এর পরিবর্তে "খোল বাটালীও" ব্যবহার করে।

(৩৫২) এক প্রকার 'বুরুম' বিশেষ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

(১) পশুপালন ও (২) শিকার

১

পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়, আদিমজাতি মাত্রেই পশুপালন দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিত। ইহা আর্য ঋষিদিগের অতি পবিত্র কার্যরূপে পরিগণিত ছিল। বিশেষতঃ গো-সেবা হিন্দুদিগের এক প্রধান কর্তব্য কর্ম! তাঁহারা গাভীকে ভগবতী জ্ঞানে ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। অদ্যাপি কোন কোন বাড়ীর কর্তা গো-গৃহের কাজকর্মসমূহ নিজে দেখিয়া পরে অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পরিবারের আর সকলের ন্যায় গৃহপালিত পশুগুলি যেমন একদিকে আমাদিগের আশ্রিত ও পোষ্য, অপর দিকে তেমনি সর্বথা যত্নের পাত্র। আমরা মনুষ্য বলিয়া যাদৃশ সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করি, এক্ষেত্রে তাহারই সম্যক্ পরীক্ষা প্রকাশ পায়। কিন্তু অত্রত্য পাহাড়ীগণ যে সকল পশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে, তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহারা তৎপ্রতি এত উদাসীন থাকে যে, অনেকে হয়ত বাড়ীতে কয়টি গরু বা কয়টি ছাগল আছে, তাহারও খবর রাখে না। গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি জঙ্গলে চরিয়া বেড়ায়, গৃহস্থ তৎসমুদয় রক্ষা তৎপর থাকিবে দূরে থাকুক, রাত্রিতে কয়টি ঘরে আসিল বা আসিল না, তাহাও একবার খুঁজিয়া দেখে না। অনেক গরু, মহিষ সপ্তাহের মধ্যেও দুই একবার ঘরে আসে না। গৃহস্থ কোনটিকে ২/৩ মাস যাবৎ বাড়ী ফিরিতে না দেখিলে বাঘে বা অন্য কিছুতে মারিয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। অধিকাংশ গৃহস্থেরই এই হতভাগ্য পশুগুলি থাকিবার কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। উহাদের কোন কোনটি মঞ্চের নিম্নে আশ্রয় লয়, অথবা অনাবৃত স্থানে ভূপ্রোথিত গোঁজে একত্রে দুই তিনটা আবদ্ধ হইয়া অদৃষ্ট ফল ভোগ করে। বর্ষাকালে দেখা যায়, এসকলের হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবিয়া আছে।

পালনে পোষণ

গরু, ছাগল, মহিষ, শূকর, কুকুর প্রভৃতি চাক্‌মাদিগের সাধারণ গৃহপালিত পশু। গয়াল (বন্য গরু বিশেষ; ইহাদের দুগ্ধ অতিশয় গাঢ় ও সুমিষ্ট। জ্বাল দিবার পূর্বে জল মিশাইয়া লইতে হয়, নতুবা তলানি জমিয়া পুড়িয়া যায়! জর্মান সম্রাট্ গো-জাতির উন্নতির নিমিত্ত ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে দুইটী সুপুষ্ট বৃষ লইয়া যাইতে লোক পাঠাইয়া ছিলেন। এখান হইতে আটটি গয়াল প্রেরিত হয়। শুনিয়াছি, পথে মরিতে মরিতে জর্মানিতে দুইটি মাত্র পৌঁছিয়াছিল)। অতি অল্প পরিবারেই আশ্রয় পায়। কাপ্তেন লুইন বলেন, 'গরু ও মহিষ ফেণীতীরবর্তী প্রদেশসমূহে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। তত্রত্য অধিবাসিবর্গ বহু গোচারণ মাঠ হইতে পশু পালনের সাহায্য পাইয়া থাকে।' কিন্তু অনেক চাক্‌মা বাড়ীতেই গরু ও ছাগল পোষিত হয়; অবশ্য তাহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক হয় সন্দেহ নাই। মহিষের মূল্য অধিক বলিয়া সকলে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। ইহাদিগের পশুপালন দুগ্ধপ্রাপ্তির নিমিত্ত নহে; পালিত পশুর বংশবৃদ্ধিই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকে। ইতিপূর্বেও লিখিত

গরু, ছাগল ও মহিষ

হইয়াছে যে, ইহাদের ঘরে অপর্যাপ্ত দুধ থাকিতেও অনেকে খাইতে চাহে না। দুধ বিক্রয় করিতেও সচরাচর দেখা যায় না; তবে সাধারণ গৃহস্থেরা দধি করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু বাজারের সুবিধা না থাকিলে তাহাও হইবার উপায় নাই। সম্পন্ন পরিবারের গরুর জন্য "উরা" থাকে; ইহার অন্য নাম "গোছাল শাল" অর্থাৎ গোয়াল। প্রত্যেকে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের অধিকার পাইলেও সেই "উরা" বাসী গরুগুলিকে অপরের তুলনায় সমধিক সৌভাগ্যশালী মনে করা যায়। কিন্তু মহিষকে গৃহে বাঁধিবার কোন পরিবারেই নিয়ম নাই। অধিকাংশ গৃহস্থই উহাদিগকে ভাবি সর্ষপক্ষেত্রে বাঁধিবার জন্য ব্যবস্থা করে। মহিষের বিষ্ঠা সরিষার প্রধান সার।

শূকর — প্রায় সকল বাড়ীতেই আছে। ইহা দুই জাতীয় — সাদা ও কাল। তন্মধ্যে কাল শূকরই সচরাচর অধিক। যতদিন ক্ষেতে কচু থাকে, ততদিন যাবৎ মোটা মোটা গাছের বেষ্টনে "গোরা" করিয়া, তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়;অন্য সময়ে ছাড়িয়া দেয়। কেননা কচুর প্রতি শূকরের বড়ই লোভ; সুবিধা পাইলেই ক্ষেতে গিয়া সমূলে খায় ও নষ্ট করে। আরও একটা কথা, শূকর ও মোরগ ইহাদিগের বাড়ীকে অপরিষ্কৃত হইতে দেয় না;নিজেরা যাহা কিছু দুর্গন্ধ করে মাত্র।

কুকুর — পাহাড়ী মাত্রেরই প্রধান সহচর। তাহাদের ধন সম্পত্তি এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ইহাদ্বারা রক্ষিত হয়। ইহার ভরসাতেই পাহাড়ীগণ এই ব্যাঘ্রভল্লুকাদি ভীষণ শ্বাপদপরিবৃত জঙ্গল বাস করিতে সাহস পায়। এমনও দেখা গিয়াছে, কোন কোন গৃহস্থ কুকুরের উপর গো-চারণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। সারমেয় প্রভু গো-পালের মধ্যস্থলে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতে থাকে;ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলেও পালের কাছছাড়া হয় না। যদি কোন বিপদ দেখিতে পায়, পূর্বেই বিকৃত চীৎকার দ্বারা গরুগুলিকে সাবধান করিয়া দেয়;তাহাদের পলায়ন অসম্ভব বুঝিলে প্রাণান্তপণে পাল রক্ষার নিমিত্ত বিপদের সম্মুখীন হয়।

হরিণ — কোন কোন বাড়ীতে মাত্র ক্বচিৎ পোষিত দেখা যায়। কিন্তু সচরাচর পোষা হরিণ বড় হইলে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া থাকে। "ধনপাতা (একটি ছড়া)র মুখ"-বাসী "কাশ্যার বাপ" আখ্যায় প্রসিদ্ধ জনৈক চাক্‌মা একটি হরিণী পোষিয়াছিল। সেইটি এত পোষ মানিয়াছে যে, জঙ্গল হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় তাহার বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লয়। বনের হরিণের সঙ্গে মিশিয়া গর্ভও হয়, তদ্বারা সে এযাবৎ তিনটী শাবক পাইয়াছে। তা'ছাড়া কোন কোন কামোন্মত্ত হরিণ এই পোষিতা হরিণীর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তাহাদের বাড়ী পর্যন্ত আসিয়া পড়ে। তাহাতেও সে ইতিমধ্যে দুইটি মারিয়া খাইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে একদিকে যেমন একপ্রকার চাষ চলিতেছে, অপরদিকে ফাঁদও মন্দ নহে!

এই সঙ্গে চাক্‌মাদিগের প্রতিপালিত পক্ষিগুলির বিবরণ সংক্ষেপরূপে হইলেও রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করিতেছি; বোধ হয় তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মোরগ ছোট বড় প্রায় সকল বাড়ীতেই আছে। মথুরাও কেহ কেহ পোষে বটে, কিন্তু বাঁচাইয়া রাখা অতিশয় কষ্টসাধ্য।

হাঁসও খুব কম। এতদ্ভিন্ন সখের লালসায় পোষিত তোতা, ময়না, ধনেশ প্রভৃতি পক্ষীও কোন কোন বাড়ীর গৃহপ্রাঙ্গনে শোভা পাইয়া থাকে।

২

অতঃপর শিকারের কথা! ইহা গণনার অতীত কাল হইতে আর্য ও অনার্য সকলেরই নিত্য কর্মের এক প্রধান অঙ্গস্বরূপে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে সভ্য বলিয়া যাঁহাদের গৌরব আছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এ মন্ত্রে দীক্ষিত, "একস্য ক্ষণিকা প্রীতি অন্যৈপ্রাণৈর্বিমুচ্যতে"—এ কেমন সভ্যতার নীতি, মনে করিলেও লজ্জা বোধ হয়। মধ্যযুগে যখন বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্মদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল, "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" মন্ত্রের গম্ভীর নির্ঘোষে প্রাচ্য বক্ষ বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন এতদ্দেশে শান্তির এক বিমল প্রবাহ দেখা দিয়াছিল;কিন্তু তাহা আর রহিল কই? আবাব সেই রুধিরপিপাসা বাড়িয়া উঠিয়াছে! সৃষ্টির প্রকৃষ্ট জীব মানব সম্প্রদায় তুচ্ছ শক্তি প্রকাশ-ব্যপদেশে — অকিঞ্চিৎকর বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শোণিত ধারায় পৃথিবীকে ঘোর কলুষিত করিতেছে!

শিকারনীতি

পূর্বকালে পশুপক্ষীগণ মাত্র শিকারীদিগের লক্ষ্য ছিল। অধুনা সভ্যতার উন্নতিতে মনুষ্যনামধারী কতিপয় দুর্বল নিরীহ জীবও ক্ষমতাদৃপ্ত মহাপুরুষগণেব ব্যসনপিপাসা তৃপ্ত করিতে হতভাগ্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে! সুতরাং এহেন সভ্যতার যুগে (বুদ্ধবিশ্বাসী হইলেও) চাক্মাগণ যে, বন্য জন্তু হইতে প্রাণ ও ক্ষেত্রের শস্যাদি রক্ষার নিমিত্ত শিকার পরঙ্মুখ হইবে না, তাহাতে বিচিত্র কি? এজন্য বাল্যকাল হইতেই ইহারা শিকারে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে কুমার বাহাদুরের শিকার নৈপুণ্যের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাকালে পক্ষীশিকারে "কামঠাগুলি" এবং পশুশিকারে "তীরধনু" ব্যবহৃত হইত। পূর্বে একস্থলে বলিয়াছি, কয়েকটি বালক "কাম্ঠা-গুলি"র সাহায্যেই কুকিদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রচলন অতীব বিরল; বন্দুকের আমদানীই ইহার কারণ হইবে। তাহা ছাড়া "কাবুক" নামে ইহাদের অন্যতম এক অস্ত্র ছিল, তদ্দ্বার ব্যাঘ্রাদি শিকার চলিত। ইহা সূচাগ্র বংশখণ্ডমাত্র। মাথায় বিষাক্ত দ্রব্য মাখিয়া বধার্হ পশুর চলাচলপথে স্থাপনপূর্বক তাহার সহিত একখণ্ড অবনমিত বাখারীর যোগ করিয়া দেওয়া হইত। তাহা কোনরূপে নাড়া পড়িলে উক্ত "কাবুক" বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া আঘাতকারীকে বিদ্ধ করে এবং অচিরে প্রাণবিয়োগ ঘটায়! ইহাতে সময়ে সময়ে অনভিজ্ঞ পথিকেরও জীবন নাশ হইত। তাই সহৃদয় ইংরাজ গভর্নমেন্ট বর্তমানে এই "কাবুক" স্থাপনের ব্যবস্থা বহিত করিয়া দিয়াছেন; এক্ষণে মাত্র ফুঁারিয়া শূকর বধ করিবার নিমিত্তই "কাবুক" ব্যবহৃত হয়। সে যাহা হউক, অধুনা একমাত্র বন্দুকের সাহায্যেই শিকার চলে। পূর্বে এদেশে "লাইসেন্স" (License) ছিল না, কিন্তু ১৯০৩ ইংরাজিতে তাহাও প্রচলিত হইয়াছে; তজ্জন্য ইহাদিগকে বন্দুক প্রতি বার্ষিক চারি আনা করিয়া কর দিতে হয়।

শিকারাস্ত্র

শিকারের সময় ইহাদের বিশেষ সজ্জা "কৰ্জ্জাল" অর্থাৎ থলিবিশেষ মাত্র। তন্মধ্যে ছড়া, বারুদ, কেপ প্রভৃতি এমন কি ক্লান্তি অপনোদক পান-তামাকেরও যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণ করিয়া স্কন্ধোপরি ঝুলাইয়া লয়। সুতরাং তাহাতে শিকারীদিগের কোন অসুবিধা থাকে না। সঙ্গে থাকে প্রভুভক্ত সারমেয়। সে অধিকাংশ সময় সারথির কাজ করে, আগে আগে দৌড়িয়া সম্মুখীন অবস্থা পরিদর্শন করিয়া লয়। যদি কোন শিকারের সন্ধান পায়, নীরবে প্রভুসকাশে আসিয়া সঙ্কেত দেয়; অথবা বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে বিকট চীৎকারে প্রভুকে সাবধান করিয়া রক্ষা করিতে ধাইয়া আসে, এতাদৃশ বিশ্বস্ত শরীররক্ষক সঙ্গে থাকিলে শিকারীর আর ভয় কি!

সজ্জা ও সঙ্গী

কোন কোন জাতির নিয়ম আছে, শিকারলব্ধ পশু বা পক্ষী প্রাণবিয়োগের পূর্বে গলদেশ ছেদন করিয়া লয়। ইহাকেই বলা যায়, "মরার উপর খাঁড়ার ঘা"! কিন্তু চাক্‌মাদিগের তাহা নাই। বরং কেহ কেহ সেই শিকারাহত মুমূর্ষুজীবের ব্যাকুল কাতরতার মুখে জল দান করে; তাহা অবশ্য মন্দের ভাল, সন্দেহ নাই। আবার ইহাও বিরল নহে যে, অনেকে তাদৃশ ছট্‌ফটানিতে আমোদ উপভোগ করে। সাধারণ রায়তেরা যে সকল পশু শিকার করে, রাজসরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হেড্‌ম্যানগণ সেই সব শিকারলব্ধ পশুর অংশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে একখানা করিয়া "রাণ" অর্থাৎ সমূল পদ দিতে হয়। হেড্‌ম্যানের বাড়ী দূরে হইলে তাহা শুকাইয়া রাখে; অতঃপর তাহাদের সত্বরতম অবকাশে দিয়া আসে। এতদ্ভিন্ন বড় পশু শিকারে তন্মাংস "লুটে' অর্থাৎ আদমের প্রত্যেক স্বতন্ত্র পরিবারে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। খাজানা দিবার সময় যে সকল পরিবার স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হয়; এস্থলেও তাহারা স্বতন্ত্র মাংসাংশ পাইয়া থাকে। এইত গেল পশুপক্ষী শিকারের বিবরণ, মৎস্যশিকারেও ইহারা বাঙ্গালীদিগের জাল, "চাই" বড়শী প্রভৃতি ধরিয়াছে।

শিকারের মাংস

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অপরাপর সাধারণ ব্যবসায়

সংসারে মানবের উপজীব্য নানাবিধ। অসংখ্য উপায়ে নির্ভর করিয়া পৃথিবীর লোক চলিতেছে। এমন কোনও সাধারণ পথ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহাতে সকলেই সেই পথে গিয়া সফল মনোরথ হইতে পারে। সুতরাং এসকলের মধ্যে কোন পন্থা যে প্রকৃষ্টতর তদবধারণও এক বিরাট সমস্যা। অধুনা অর্থকরী ব্যবসায় সমাজের সর্বত্র সম্মানিত। যাহাতে অর্থের অনটন পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক লোকই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে কি অর্থই সংসারের সারসর্বস্ব? অর্থ ভিন্ন পৃথিবীতে সাধনার বিষয় আর কিছুই কি নাই? তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি? যখন ধর্মের ক্রিয়াগুলি অর্থের পৃষ্ঠোপরি পদাঙ্ক রেখা অঙ্কিত করিয়া যায়, তদুভয়ের মধ্যে তুলনা করিতেও ভরসা হয় না। ধর্মের উপর অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে যেমন সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, ধর্মহীন অর্থ তদপেক্ষা শত-সহস্রগুণে নিকৃষ্ট ও ঘৃণনীয়। অতএব উপজীবিকার প্রধান লক্ষ্য এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে ধর্ম ও অর্থের সাধনা অব্যাহত থাকিতে পায়।

উপজীব্য

জীব মাত্রেই স্বাতন্ত্র্য প্রয়াসী। বনের পাখিটীও সুবর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া রাজোপকরণ উপভোগেও অস্বচ্ছন্দ মনে করে। সুতরাং সভ্যতাদৃপ্ত মানবসমাজ স্বাধীন ব্যবসায় ভাল বাসিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র কি? এই আত্ম-মর্যাদাজ্ঞানটুকু সকলেরই থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। "একান্ত বশংবদ ভৃত্য" জীবন কত যে দুর্বিষহ, ভুক্তভোগী ভিন্ন তাহা অপরে অনুভব করিতে পারে না;দূর হইতে পরিষ্কার বাবুগিরির উজ্জ্বল দীপ্তিতে দিশাহারা হইয়া পতঙ্গ প্রায় আত্মসমর্পণ করে, আর তখন হইতে "চোখ বাঁধা বলদের মত, খেটে মরে অবিরত।" হায়! এহেন সুখের চাকরী লইয়া আবার তুমুল প্রতিযোগিতা! বস্তুতঃ চাকরিতে বিবেক শক্তিকে বলিদান করিতে হয়, নতুবা পদরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে। তাই নীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।" আর হতভাগ্য বাঙ্গালী সেই চাকরী-পীড়িত ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া থাকে, — "চাকরী গুখোরী না করি কি করি?" সম্প্রতিমাত্র স্বাধীনতাভ্রষ্ট চাকমা সমাজ এই আত্মসম্মানবর্জিত চাকরিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকে। ইহারা অনাহারে মরিলেও অন্যের চাকরী করিতে চাহে না। কাপ্তেন লুইন বলিয়া গিয়াছেন[৩৫৩] — "১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই পার্বত্য প্রদেশে একটি রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু চাক্‌মাদিগকে অধিক বেতন দিতে বলাতেও তাহার মুজুরি স্বীকার করে নাই। অবশেষে গভর্নমেন্টকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চট্টগ্রাম হইতে কুলি আনিতে হইয়াছিল।" সে পুরানো কথা কেন, বিগত ভীষণ দুর্ভিক্ষকালে যখন ইহাদের অধিকাংশ অদৃষ্টের দারুণ নির্যাতন ভোগ করিতেছিল, স্ত্রী পুত্রের অনাহার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্বহ জীবন ভার কমাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল,

শ্ববৃত্তি

(৩৫৩) The Hill Tracts of Chittagong and the dewellers therein – P 35

তখনও ইহাদিগের অনেকে মুজুরি খাটিতে স্বীকার করে নাই। পোড়া উদর-জ্বালায় সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে, এমন কাহাকে যদি কোন সামান্য কাজ করিতেও বলা হইত, অমনি সে অভিমানিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিত। অধিক কি, একবার স্থানীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহোদয় এই অনশনক্লিষ্ট সাহায্য প্রার্থিগণকে অগ্রিম টাকা নিয়া দৈনিক টাকা মুজুরিতে একখানি রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, ইহারা তাহাতে সাহায্য প্রার্থনাও ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। যাহাহউক, এবারে শতকরা ৮/১০ জন লোকের মতি ফিরিয়াছে, দেখা গেল। তাহারা উপবাস কষ্ট আর সহিতে না পারিয়া প্রস্তরোৎপাটন, জঙ্গলকাটা, মোট বহন প্রভৃতি নানা কাজ করিয়াছে।

দাসত্ব

ইহাদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, 'মাংসাভ্যন্তরস্থ কন্টক প্রায় আত্মীয়ের দাসত্ব অসহনীয়' — কথাটা অবশ্য বর্ণে বর্ণে সত্য। চাকরী ও গোলামী কার্যতঃ এক হইলেও দায়িত্বে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। দগ্ধোদরকে কোনরূপে প্রবোধ দিতে পারিলে চাকরির গঞ্জনা হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু দাসত্ব খত হইতে রক্ষা পাওয়া পূর্বে একরূপ অসম্ভব ছিল, সহৃদয় ইংরাজ গভর্নমেন্টের ইহা এক মহীয়সী কীর্তি, — যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক অধীনতার কঠোর নিগড়মুক্ত হইয়া স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছে। সরকারী কাগজ পত্রে দেখা যায়, এই পার্বত্য প্রদেশ হইতেও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখের সেই বিধিমতে তিন শতাধিক অধমর্ণ দাস উদ্ধার পাইয়াছিল। ইহাতে চাক্‌মাদাসও যে ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এই প্রথা যদিও সমাজের চক্ষে নিতান্ত ঘৃণিত জ্ঞান হইত, তথাপি অভাবের তাড়নায় এবং চট্টগ্রামবাসীদিগের অনুকরণে ইহারাও যে দাসত্ব অবলম্বন করে নাই, এমত নহে। চট্টগ্রামের শাসন কর্তা মিঃ গুডউইন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মাননীয় গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় — তখন চট্টগ্রামে দাসত্ব প্রভাব বিলক্ষণ প্রবল ছিল। পিতৃমাতৃহীন এবং অপর সম্পর্ক শূন্য নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অভাবে পড়িয়া আত্মবিক্রয়ে দাসত্ব গ্রহণ করিত। প্রভুদের আবার বিক্রয় ক্ষমতাও ছিল, ক্রেতা প্রভুত্বের সম্পূর্ণ অধিকার পাইতেন। পক্ষান্তরে দাসপত্নী প্রভুপত্নীর চিরন্তন সহচারিণী হইত। এইরূপে পুরুষানুক্রমে এবংবিধ অধিকার ও অধীনতা অব্যাহত থাকিত। বলিতে কি, অদ্যাপি ইহার আভাষ পরিদৃষ্ট হয়। আইন শাসনে যদিও দাস বিক্রয় রহিত, কিন্তু আত্মবিক্রয় এবং ভূমির কর মুক্তিতে দাসপনা বিরল নহে।[৩৫৪] চট্টগ্রামের তাদৃশী ব্যবস্থা ইহাদিগের উপরও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। তবে এই দাসত্ব প্রথায় কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব এই যে, অধিকাংশ স্থলে ঋণের দায়ে দাসত্ব গ্রহণ করিতে দেখা যায়। নিরুপায় অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করে; নির্দিষ্ট বেতন হইতে সুদ বাদ গিয়া ক্রমে মূলধন পরিশোধ হইতে থাকে। কেহ কেহ বা সন্তান কি পরিবারের অপর কাহাকেও উত্তমর্ণের গৃহে রাখে; বলা বাহুল্য ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলে ইহাদের দাসত্বদায় ঘুচিয়া যায়। বেতনভোগী চাকর অপেক্ষা

(৩৫৪) আইনের নজিরে দেখা যায়, পূজ্যপাদ মাতামহ স্বর্গগত হরগোবিন্দ রাহাই চট্টগ্রামের বর্তমান "চাকরাণ" ব্যবস্থার কারণ। গোলামেরা মুক্তি কামনায় যে অভিযোগ করে, তিনি তদ্বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন।

ইহাদের উপর কাজকর্মে দায়িত্ব ভার কম থাকে এবং ইহারাও পরিবারস্থ লোকের ন্যায় ব্যবহৃত হয়; কোনরূপ কর্কশাচরণ পরিলক্ষিত হয় না। জাতীয় বিচারের অর্থদণ্ড শোধে অসমর্থ ব্যক্তিত্ব বিচারকের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা ক্রমে পরিশোধ করিয়া দিয়া থাকে।

কিন্তু প্রচলিত শিক্ষায় চাকরিই আমাদের অনন্যগতি। তাই চাক্‌মাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও প্রায় বাঙ্গালীদিগেরই মত সেই পুরুষ পরম্পরা ঘৃণিত চাকুরীলোলুপ হইয়াছেন। তবে কিনা তাঁহারা এযাবৎ রাজকর্ম ছাড়া অপর কোন সাধারণ কার্য গ্রহণ করেন নাই। মাননীয় গভর্নমেন্টও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট আনুকূল্য দেখাইয়া আসিতেছেন। তাহারই ফলে — বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ও তাহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান উভয়েই সব ডেপুটি কালেক্টরে এবং জামাতা বাবু অবিনাশচন্দ্র দেওয়ান স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টবের পদ লাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বাবু ত্রিজৎ দেওয়ান স্থানীয় ট্রেজারীর খাজাঞ্চী, বাবু শশীকুমার দেওয়ান, বাবু শরচ্চন্দ্র দেওয়ান ও বাবু ভগবানচন্দ্র দেওয়ান পুলিস সব্ ইন্‌স্পেক্টর; শ্রীমান মদনমোহন দেওয়ান — হস্‌পিটাল এসিঃ, শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার সুপাঃ অফিসের অন্যতম কেরানী, বাবু লালমণি চাক্‌মা ভেক্সিনেসন সব্ ইন্‌স্পেক্টর, শ্রীমান রাজচন্দ্র চাক্‌মা শ্রীমান শম্ভুমণি চাক্‌মা রাইটার কন্‌ষ্টাবলের কার্যে আছেন। শুনিতেছি, স্থানীয় বর্তমান সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ হাচিন্সন মহোদয় ইহাদিগকে আরও অধিকতর পরিমাণে রাজকর্মে প্রবেশাধিকার দিতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্যদিকে রাজবাহাদুরের অফিসেও বাবু মধুচন্দ্র দেওয়ান ইংলিস ক্লার্কের কার্যে আছেন।

কর্মচারী

সমগ্র চাক্‌মা সমাজের তুলনায় এইরূপ চাকুরের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় মাত্র। তাই বলিয়া আর আর সকলে কেবল আত্মাভিমানের মদগর্বে বসিয়া নাই। স্বাধীনতাস্পৃহা আত্মনির্ভরতাকে উত্তেজিত করে, নতুবা উদর নামক বৃহৎ গহ্বরটির পুর্ত্তি চলিবে কিরূপে? পরন্তু জীবন যাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষ প্রায় সমভাবে চেষ্টা করে; উভয়েই উভয়ের সহচর ও সাহায্যকারী। নিতান্ত অসমর্থ ভিন্ন কেহই অপরের গলগ্রহ হইতে চাহে না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা বাহিরের কাজে পুরুষদের সমান পরিশ্রম করিয়াও সাংসারিক যাবতীয় কর্ম অনন্য-অপেক্ষায় সম্পাদন করিয়া থাকে। তদুপরি পতিসেবা, সন্তান পালন, অতিথি সৎকার ইত্যাদি আরও কত আছে। চাক্‌মা মহিলার এই অপূর্ব মহত্ব বার বার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, আরও শত-সহস্র বার বলিয়া গেলেও যেন বলা ফুরাইবে না! বাস্তবিক ইহা অপর সাধারণের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বিগত (১৯০১ সালের) আদমসুমারিতে দেখা যায়, ইহাদিগের ১৪৮৭৩ জন পুরুষ এবং ১২৮৮১ জন স্ত্রীলোক নিয়মিতরূপে খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। তন্মধ্যে ১৪৭৭২ জন পুরুষ ও ১২৭৮৯ জন স্ত্রীলোক কৃষিকার্যে, ৮ জন পুরুষ ও ২ জন স্ত্রীলোক শিক্ষাদান কার্যে এবং ২৬ জন পুরুষ শাসন সম্বন্ধীয় কর্মে লিপ্ত; অবশিষ্ট ৯০ জন পুরুষ ও ৬৭ জন স্ত্রীলোক ছোট বড় নানা কাজ লইয়া আছে। সুতরাং সমুদয় জাতির মধ্যে আর ২১৯৬৪ জন বালবৃদ্ধবণিতা মাত্র সম্প্রতি অকর্ম্মণ্য।

বিভিন্ন শ্রম

বস্তুতঃ শাসন, কৃষি, শিল্প, যজন, চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিকার, চাকরী, পশুপালন ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ই চাক্‌মাদিগের সাধারণ উপজীব্য। তবে ইহাদের সমাজে উপরোক্ত ব্যবসায়গুলির মধ্যে যথাসন্নিহিত পরবর্তী হইতে ক্রমে পূর্ববর্তীগুলি অধিকতর সম্মানজনক। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়গত শ্রমবিভাগ নাই। সুতরাং যাহার যে কর্মে অভিরুচি এবং দক্ষতা আছে, কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে তাহা সে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারে। কেবল শাসনসম্বন্ধীয় কার্যের নির্বাচনভার মাত্র অধুনা গভর্নমেন্টের হস্তে রাখিয়াছেন, তাহাও আবার উপযুক্ততার উপর নির্ভর করে। গ্রামবাসী যাঁহাকে উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করে এবং রাজাভিমতও তদনুকুল হইলে গভর্নমেন্ট তাঁহাকেই তৎপদ প্রদান করেন। যজন, চিকিৎসা এবং চাকরীও কথঞ্চিৎ পরিমাণে সেরূপ উপযুক্ততা-সাপেক্ষ; অপর দিকে কৃষি, শিল্প, শিকার, পশুপালন প্রায় সকল পরিবারেই আছে। কেবল বাণিজ্যে মাত্র ইহাদিগের আসক্তি আশানুরূপ নহে। হায়! যে উপায়ে বিদেশীয়গণ আসিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সপরিবারে অহর্নিশি অবিশ্রান্ত খাটিয়াও যাহার করাল আক্রমণে তাহাদিগকে আত্মসমর্পন করিতে হইতেছে, তৎপ্রতি সমুচিত দৃষ্টি-নিক্ষেপে অদ্যাপি তাহারা উদাসীন!

নানা পন্থা

এই পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বৎসরে একমাত্র চাক্‌মাদিগেরই শ্রমলব্ধ প্রায় পাঁচলক্ষ টাকার কার্পাস, তিল, অরণ্যজাত কাষ্ঠ, নৌকা, বেত, ছন ও জ্বালানী কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে, কিন্তু বলিতে কি, বিদেশীয় মহাজনেরা দাদন খাটাইয়া তাহা হইতেও প্রায় তৃতীয়াংশ আত্মসাৎ করে। তাহা ছাড়া এ সকল দ্রব্য চন্দ্রঘোনা অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমা ছাড়াইলেই প্রায় দেড়গুণ মূল্য ধারণ করে, চট্টগ্রাম পৌছিতে পৌছিতে আরও বেশী হয়। পরন্তু এই লভ্যাংশের সিকি পয়সাটিও ইহাদিগের ভাগ্যে ঘটে না — সমস্তই বিদেশীয়দিগের সিন্ধুকজাত হয়। কিছুকাল হইতে কুমার রমণীমোহন কার্পাস ও তিলের ব্যবসায় খুলিয়াছেন কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানাভাবে তেমন সুবিধা হইতেছে না। সাবডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দেওয়ানও রাইখ্যং বাজারে একখানি দোকান খুলিয়াছিলেন; সুবিধানুরূপ চালাইতে না পারায় তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এতদ্ভিন্ন আরও দু'চারিজন বেপারী দেখা যায় বটে, কিন্তু এই বিরাট জাতির পক্ষে এতৎসমুদয়কে নিতান্ত অগণ্য বলিলেও চলে। বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্যের প্রতি আরও দু'একজনের আন্তরিক অনুরাগ দেখা যায়। উপযুক্ত মূলধনের অভাবে তাঁহারা কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। যদি ধনশালী মহোদয়গণ তাঁহদিগকে সামান্য অংশমাত্র দিয়া হইলেও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা ঘটিতে পারে।

বাণিজ্য

সচরাচর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকরী ইত্যাদিতে একটি সাধারণ সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে এ সমুদয় সম্বন্ধে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে; তৎসমস্তের ব্যাপক-আলোচনা স্বরূপে বলা

যাইতে পারে, জুম নিতান্ত দরিদ্র শ্রেণীরই অবলম্ব্য। সম্ভ্রান্তসম্প্রদায় — মোট কথা উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে সকলেই লাঙ্গলের চাষ আরম্ভ করিয়া দেয়। সাধারণতঃ এই দল হইতেই অধিক পরিমাণে লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং চাকরীওয়ালার সংখ্যাও এই দলে অধিক। আর গরীব জুমিয়াগণ অভাবে পড়িয়া নানা প্রকার বেতের কাজ, নৌকাগঠন প্রভৃতি দ্বারা এবং বনজাত উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ, জ্বালানী কাঠ ও ছন ইত্যাদি কাটিয়া জীবিকা-নির্বাহে বাধ্য হয়। এই সমস্ত এবং জুমোৎপন্ন অপরাপর দ্রব্য-নিচয় তাহারা নিকটবর্তী বাজারে নিয়া বিক্রয় করে। ইহাই তাহাদিগের একমাত্র অন্তর্বাণিজ্য। সুতরাং জুমিয়াদিগের দ্বারাই শিল্প ও বাণিজ্য কার্য প্রধানতঃ চলিয়া থাকে। তাহা না হইয়াও উপায় নাই; যখন নৌকাগঠনাদির সময় আসে, তখন চাষাদিগের অবকাশ মাত্রই থাকে না। কিন্তু বস্ত্রবয়নের ভার উভয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীসমাজের উপরই ন্যস্ত রাখিয়াছে। পশুপালন চাষাদিগেরই অবশ্য কর্তব্য কর্মের অন্তর্গত। সাধারণ মোরগ, শূকর ইত্যাদি ভিন্ন চিরপরিবর্তনশীল জুমিয়াদিগের অপর পশুপালন পোষায় না। তবে শিকারে চাষাগণ হইতে জুমিয়াদিগের অধিক প্রয়োজন হয় বটে। এতদ্ভিন্ন যজন কাজও শেষোক্ত দলের অধিকারে অধিক।

ব্যবসায়ে সাধারণ সূত্র

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
(১) শিক্ষা (স্ত্রী শিক্ষা)
এবং
(২) ভাষা — বর্ণাবলী — অপরাপর ভাষার সহিত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ

অবশ্যই ইহা স্বীকার্য যে, শিক্ষায় চাক্‌মাজাতি অদ্যাপি বহু পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। সরকারী কাজপত্রে[৩৫৫] পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রায় অর্ধলক্ষ অধিবাসী মধ্যে ২১৫৬ জন পুরুষ এবং ৪৪ জন স্ত্রীলোক মাত্র শিক্ষিত। তন্মধ্যে ৭৮৮ জন পুরুষ ও ২৪ জন স্ত্রীলোক বাঙ্গলা, আর ৫৫ জন পুরুষ মাত্র ইংরাজী জানে। অবশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা । লিখিতে পড়িতে পারে। পক্ষান্তরে বাঙ্গলাভাষা-শিক্ষিতদিগের মধ্যে ২৯০ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রীলোক চাক্‌মা লেখাপড়াতেও পরিপক্ক; এবং ১২ জন পুরুষের মঘ ভাষাতে অভিজ্ঞতা আছে। এক কথায় শতকরা ৪।।০ জন মাত্র কোন-রূপে শিক্ষিত সংজ্ঞা লাভের যোগ্য। এখনও অনেকেই লেখাপড়ার উপযোগিতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই; তাই ইহাদের সমাজে জ্ঞান-জ্যোতিঃ এতই ক্ষীণ! সাধারণ সকলে স্থূল দৃষ্টিতে আলোচনা করে, লেখাপড়া শিখিলে বিলাসিতা আসে, সাংসারিক কাজকর্মে অভিজ্ঞতা জন্মে না, বিশেষতঃ তদ্দারা অর্থোপার্জনের যাহা কিছু উপায় — তাহাও অতি ঘৃণার্হ। একে ত চাকরী — তাও আবার বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া[৩৫৬]! ফলে বর্তমানে যাহাদের মন শিক্ষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরও অনেকে পাঠশালার শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া থাকে।

শিক্ষার পরিমাণ

অতিশয় কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, সহৃদয় ইংরাজ গভর্নমেন্ট এপ্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া অবধি এই পার্বত্য জাতিসমূহের শিক্ষার নিমিত্ত বিস্তর অনুগ্রহ দেখাইতেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত সরকারী রাজস্ব হইতেই একখানি মধ্য ইংরাজী স্কুল, চারিখানি উচ্চ প্রাথমিক এবং ৭৭ খানি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে[৩৫৭] সাহায্য প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য গভর্নমেন্টের বার্ষিক প্রায় সাড়ে বার হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়া

সুবিধা

(৩৫৫) Cencus Report – 1901 &c.

(৩৫৬) রামকমলবাবু একবার জনৈক চাক্‌মাকে বিদ্যার উপযোগিতা বুঝাইতে গিয়া বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। সে বলিয়াছিল, 'মাষ্টার, তুমিও ত লেখাপড়া শিখিয়াছ, তার ফলে স্ত্রীপুত্রাদি ছাড়িয়া এই বিদেশে বিদেশে ঘুরিতেছ। আমার ছেলে লেখাপড়া শিখিলে তাহার অবস্থাও ত এইরূপ হইবে? হায় — লেখাপড়ার এই ত পরিণতি। বস্তুতঃ আমাদের বর্তমান শিক্ষার পরিণাম যে চাকুরি — তাহাতে জীবনধারণ ভার-স্বরূপ নহে কি?

(৩৫৭) এই জেলায় মোট প্রাইমারী স্কুল সংখ্যা বালকের ৯০, এবং বালিকার ২, তাছাড়া ২৩ খানি ক্যাংস্কুল এবং ৪ খানি মক্তবও আছে। এই শিক্ষা বিস্তৃতির মূলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব সিভিল সার্জন ও শিক্ষা

থাকে। এ সমুদয়ের কোন স্কুল হইতেই ছাত্রবেতন লওয়া হয় না, ফলতঃ গভর্নমেন্টের অভীপ্সিত অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের সঙ্কল্প এদেশেই বহুকাল হইতে কার্যকরী হইতেছে। এতদ্ভিন্ন খাস গভর্নমেন্টেরই সম্যক্ পরিচালনাধীনে রাঙামাটিতে এক উচ্চ ইংরাজী স্কুল[৩৫৮] চলিতেছে, তাহাতে পাহাড়ী ছাত্রগণকে উল্লিখিতরূপ অবৈতনিক শিক্ষা ব্যতীত পঞ্চাশ জন ছাত্রকে স্বচ্ছন্দরূপ আহার পর্যন্ত দেওয়া হয়; এবং নিতান্ত দরিদ্রদিগের পুস্তকের জন্যও কিছু টাকা নির্দিষ্ট আছে। সম্প্রতি আবার প্রথম চারি শ্রেণীতে অধ্যয়নপর দরিদ্র ছাত্রদিগের নিমিত্ত দুই ও তিন টাকার দুই দুইটি বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত ডাক্তারের বন্দোবস্ত আছে এবং প্রধান শিক্ষক ও অন্যতম সহকারী শিক্ষকের উপর সুপারিন্টেন্ডেন্টের ভার ন্যস্ত। বোর্ডিং-এ পাচক, ভিস্তি, মেথর প্রভৃতিও যথা নিয়মে আছে, এমন কি তাহাদের বস্ত্রাদি পরিস্করণের নিমিত্ত সরকার হইতে একজন ধোপাও নিযুক্ত রহিয়াছে। পূর্বে ইহাদের জল খাবার এবং পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত দেওয়া হইত, কয়েক বৎসর হইতে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে যখন বিভাগীয় কমিশনার কি উর্দ্ধতন রাজ কর্মচারী স্কুল পরিদর্শনে আসিতেন তখন শিক্ষায় ইহাদের আসক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত থলে খুলিয়া 'হরিলুটের বাতাসা'র ন্যায় টাকা ছড়াইতেন। আর বালকগণ হুড়াহুড়ি করিয়া তৎসমুদয় লুটিতে দেখিলে, তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া হাততালি দিতেন।

হায়! এত সুবিধা ও প্রলোভন সত্ত্বেও ছাত্র সংগ্রহের নিমিত্ত নাকি পূর্বতন শিক্ষকগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। তাঁহারা এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া

বিভাগের অবৈতনিক সেক্রেটারী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ সাহা এবং অত্যত্র স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর পরলোকগত গগনচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয়দ্বয়ের চেষ্টা সাতিশয় প্রশংসার্হ। সম্প্রতি প্রিয়সুহৃদ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দেওয়ান সবইন্‌স্পেক্টরের কার্যে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা বিস্তারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন; আশা করা যায় -- তাহা দ্বারা দেশের অধিকতর উন্নতি হইবে।

(৩৫৮) এই স্কুল প্রথমতঃ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রঘোনায় স্থাপিত হয়। তখন ইহার "চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুল" -আখ্যা ছিল। ইহাতে দুইজন মাত্র শিক্ষক ছিলেন, ছাত্রগণও মাত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অনন্তর সমগ্র স্কুল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগের শ্রেণীগুলির নাম হইল "বার্মিজ্ ক্লাস", অন্য ভাগের শ্রেণীগুলির নাম হইল "চাক্‌মা ক্লাস"। বার্মিজ্ ক্লাসে — বার্মিজ্, ইংরাজী ও বাঙ্গালা বা বার্মিজ ও বাঙ্গালা পড়ান হইত এবং চাকমা ক্লাসে - বাঙ্গালা ও ইংরাজী অথবা কেবল বাঙ্গালা অধ্যাপনা চলিত। অনন্তর ১৮৬৯ অব্দের প্রারম্ভেই ডেপুটি কমিশনার অফিস চন্দ্রঘোনা হইতে রাঙামাটিতে উঠিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এই স্কুলও চলিয়া আইসে তখন হইতে "রাঙামাটি গভর্নমেন্ট বোর্ডিং স্কুল" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ইহাতে মধ্য ইংরাজী শ্রেণী খোলা হয়। তাহাতে ১৯ জন মধ্য ইংরাজী, ৪ জন মধ্যবাঙ্গালা এবং ৪০ জন উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইহাকে উচ্চ ইংরাজীতে উন্নীত করিয়াছেন। এ যাবৎ ইহাতে ১২ জন পাহাড়ী এবং ২৬ জন বাঙ্গালী ছাত্র প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্বে ইহার কর্মচারী সংখ্যা অত্যল্প মাত্র ছিল। বর্তমানে শিক্ষক ১১ জন, দপ্তরী ১, দারোয়ান ১, মালী ১, মেথর ১ হইয়াছে। ১৯০৮- -০৯ অব্দে গভর্ণমেন্টের স্কুলের জন্য ৭১৭৫ এবং বোর্ডিং এর জন্য ২৭২৯ টাকা ব্যয় গিয়াছে; তন্মধ্যে ৯২৯ টাকা মাত্র ছাত্রবেতন আদায় হইয়াছে।

ছাত্রান্বেষণ করিতেন। কোন কোন স্থানে তাঁহারা "ছেলেধরার" লোক[৩৫৯] বলিয়া বিপদেও পড়িতেন। এই কারণেই একবার কতিপয় দুষ্টলোক ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামকমল দাস মহোদয়ের নৌকা ডুবাইয়া দেয়, তিনি অতি কষ্টে প্রাণে ফিরিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য ইহাতেই তাঁহার সেই উদ্যম ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহারই ঐকান্তিক অধ্যবসায় বলে এই স্কুলের বর্তমান উন্নতি ঘটিয়াছে। অধুনা অবশ্য তেমন দ্বারে দ্বারে ছাত্রসংগ্রহ করিতে যাইতে হয় না বটে, কিন্তু গভর্নমেন্টের আগ্রহানুরূপ ছাত্র পাওয়া যাইতেছে না। ফলতঃ শিক্ষার উন্নতি যাদৃশ মন্দ, তাহাতে মনে হয় — আরও বহুদিন ধরিয়া গভর্ণমেন্টকে এই বোর্ডিং ব্যয় বহন করিতে হইবে।

ছাত্রধরা

এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে খৃষ্টিয়ান মিশনারীগণের চেষ্টাও অবশ্য উল্লেখযোগ্য। তাঁহারাও স্থানে স্থানে বোর্ডিং পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং রাঙামাটিতেই বোর্ডিং যুক্ত এক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় রাখিয়াছেন। উপসংহারভাগে তাঁহাদের অধ্যবসায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল। সে যাহা হউক তাঁহাদিগের সেই উৎকট ধর্মবিস্তার চেষ্টাও এতদ্দেশে শিক্ষা বিস্তারের কম অনুকূল নহে। ফলতঃ পার্বত্য যুবকদিগের শিক্ষানুরাগবর্দ্ধনের জন্য এই সমুদয়ই যথেষ্ট নহে, সহৃদয় গভর্নমেন্ট এই জেলার মধ্য পরীক্ষায় ১টী, উচ্চ প্রাথমিকে ২টী ও নিম্ন প্রাথমিকে ৮টী বৃত্তি প্রদান করিতেছেন এবং কেবল এই রাঙামাটি স্কুলেরই নিমিত্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকার এক বৃত্তি রাখিয়াছেন এবং উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়নার্থিকে বিশেষ বৃত্তি দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কুমার রমণী বাবু প্রতিবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম পাহাড়ী ছাত্রকে "সৈরিন্ধ্রী মেডেল" নামে এক রৌপ্যপদক দিতেছিলেন, সম্প্রতি তৎপরিবর্তে প্রবেশিকার উক্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত চাক্মা ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার সাহায্যার্থ দুই বৎসর স্থায়ী মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯১৭ ইংরাজীর মধ্যে যে চাক্মাছাত্র সর্বপ্রথমে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তিনি তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দান করিবেন।

পুরস্কার

এতসব চেষ্টার ফল নিতান্ত সামান্য হইলেও এবং মঘ, কুকি, মুরুং, ত্রিপুরা, বনজুগী প্রভৃতি সকলের প্রতি গভর্নমেন্টের তুল্য-দৃষ্টি থাকিলেও পাহাড়ীদিগের মধ্যে চাক্মাগণই শিক্ষায় সমধিক অগ্রসর হইয়াছে। কি পাঠাশালায় — কি স্কুলে, অধিকাংশই চাক্মা ছাত্র। অপরাপর পাহাড়ী ছাত্রের তুলনায় চাক্মাছাত্র অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই শিক্ষারম্ভ করে। বর্তমানে কেবল চাক্মা পল্লিতে দুইখানি উচ্চপ্রাথমিক এবং ৩২ খানি নিম্নপ্রাইমারী বিদ্যালয় আছে; তাহাতে ৫২৬ জন চাক্মা ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অধুনা অন্যান্য স্থানে অধ্যয়ন নিরত চাক্মা ছাত্রসংখ্যাও প্রায় শত সংখ্যক হইবে। অপরদিকে দেখা যায়,

ফল

(৩৫৯) পূর্বে পর্তুগীজ দস্যুগণ কাহাকেও সুবিধা মত পাইলে ধরিয়া নিয়া তাহদের দলভুক্ত করিত, তাহারাই "ছেলেধরা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বাঙামাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় গত দশ বৎসরের মধ্যে মাত্র ৯৪ জন চাক্‌মা ছাত্র ভর্তি হইয়াছে; সুতরাং বার্ষিক দশ জনও নহে। পার্বত্য অপরাপর জাতির তুলনায় ইহাদিগের শিক্ষা শক্তি যদিও ন্যূন নয়, কিন্তু বিরাট সমাজের গণনায় উহা নিতান্ত সামান্য বলিতে হইবে। পরীক্ষা ফলও তাদৃশ সন্তোষপ্রদ নহে। এযাবৎ ইহাদের হইতে নিম্ন প্রাইমারীতে ৬৮ জন, উচ্চ প্রাইমারীতে ৮ জন এবং মধ্য পরীক্ষায় ৩ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। উচ্চশিক্ষার ফল ততোধিক শোচনীয়। মাত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ানই বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়াছেন। তিনি ছাড়া বর্তমান রাজা ও কুমার — ভ্রাতৃযুগল, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দেওয়ান, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেওয়ান ও শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার, ফাষ্ট আর্ট পর্যন্ত পড়িয়াছেন, নবকুমার দেওয়ান নামে আর একটি ছেলে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশের সংবাদ বাহির না হইতেই করালকাল হতভাগ্যকে ইহলোক হইতে সরাইয়া নিয়াছে। তাহারই সমপাঠী শ্রীমান্ মদনমোহন দেওয়ান প্রবেশিকা পাশের পর কেম্বেল স্কুল হইতে হস্‌পিটাল এসিষ্টান্টসিপ্ পাশ করিয়া আসিয়াছেন। অবশিষ্ট শ্রীমান্ যামিনীকুমার দেওয়ান ও শ্রীমান মতিলাল চাক্‌মা এই বৎসরে উত্তীর্ণ। এতাদৃশী উন্নতি কোন জাতীয়-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয় সত্য, তবে সুখের ও আশার কথা এই, ক্রমেই ইহা বিস্মৃত হইতেছে। বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসর ধবিয়া ইহা যেরূপ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে কালে ইহার প্রভূত উন্নতি আশা করা যায়।

এস্থলে একবার স্ত্রীশিক্ষার আলোচনাটুকু কবিয়া রাখা মন্দ নহে। এই সভ্যতাদৃপ্ত বিংশ শতাব্দীতে ইহার উপযোগিতা প্রায় সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নিতান্ত অসুবিধা বিশেষ না থাকিলে অধুনা স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহদানে কাহাকেও বিমুখ দেখা যায় না। বস্তুতঃ অর্ধাঙ্গ লইয়া সমাজ কত আর অগ্রসর হইতে পারে? গৃহিণীকে দিয়া যদি পারিবারিক

স্ত্রী শিক্ষা

নিত্যনৈমিত্তিক কর্মগুলিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা না যায়, তবে আর সে পরিবারে সুখ কোথায়! শিক্ষা না পাইলে বাহ্য জ্ঞান লাভেরও সুবিধা পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহাদের হৃদয়ে শিক্ষাদীপ প্রজ্জ্বলিত নহে, তাহাদিগের দ্বারা পারিবারিক সুখের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। বর্তমানে অবরোধ পালিতা বঙ্গীয় ললনাগণ শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। সম্ভ্রান্ত চাক্‌মাগণও তদনুকরণে নিজেদের পরিবার গঠনে চেষ্টা করিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বিগত আদমসুমারিতে ৪৪ জন শিক্ষিতা চাক্‌মা রমণীর খবর পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ২৪ জন বাঙ্গালা এবং ২০ জন চাক্‌মা লেখাপড়ায় অভিজ্ঞ। ইহাদের মধ্যে চারিজনের উভয়বিধ লেখাপড়াতেই পরিপক্কতা আছে। যতদূর দেখা যায়, এতদুৎসাহদাতৃগণেব মধ্যে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ানই সর্বপ্রধান। তাঁহার দুইটি কন্যাই শিক্ষিতা। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরযূবালা দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ছাত্র বৃত্তি পর্যন্ত পড়িয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী ষোড়শীবালা প্রথম বিভাগে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা পাশের পর উচ্চপ্রাথমিকের পাঠ্য শেষ করিয়াছেন। ইহারা ছাড়া শ্রীযুক্ত পূর্ণ দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী

উচ্চপ্রাথমিকের পাঠ্য পর্যন্ত পড়িয়াছেন। অপর শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী ইন্দ্রানী ও শ্রীমতী সুরবালা, শ্রীযুক্ত বসিকচন্দ্র দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী এবং সবডেপুটিকালেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী যশোদা নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। তদীয় দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পদ্মগন্ধা পরীক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু নিম্নপ্রাইমারীর পাঠ শেষ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা নব্যা সম্প্রদায়ের তালিকা। প্রাচীনাদের মধ্যেও সামান্য রকমের বিদুষী মহিলা দুষ্প্রাপ্য হইলেও অপ্রাপ্য নহে। যাহা হউক বর্তমান এ উন্নতিতে স্ত্রী-শিক্ষা যে ভবিষ্যতে সুফলপ্রদ হইতে পারিবে, বেশ সূচিত হইতেছে। এক্ষণে যাহাতে ইহা সাধারণ পরিবারেও প্রসারিত হয়, সমাজ-হিতৈষী বৃন্দের নিকট তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টা প্রার্থনীয়।

সার্বভৌমক ভাষা

দেশভেদে ভাষার বিভিন্নতা স্বতঃসিদ্ধ। যদি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া একমাত্র ভাষায় ভাবের আদানপ্রদান চলিত, তবে কত যে সুখের ও সুবিধার আশা ছিল, তাহা পরিমাণ করা যায় না; কেননা, প্রত্যেক দেশের সুধী সম্প্রদায় বহুশ্রমার্জিত তত্ত্বরাশি স্ব স্ব দেশজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছেন; সে সমুদয় আয়ত্ত করিতে হইলে তত্তৎভাষায় পারদর্শী হওয়া সর্বাগ্রে আবশ্যক। সুতরাং পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অধিকার না থাকিলে সমস্ত রহস্যও উদঘাটিত করা দুরূহ। কিন্তু তাদৃশ সার্বভৌমিক শিক্ষা সামান্য মানবজীবনে লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম সমগ্র পৃথিবীর এক সাধারণ ভাষা হইলে উপকারের পরিসীমা ছিল না। পূর্বে এক সময়ে এ ভারতের প্রায় সর্বাংশে হিন্দিতে কথোপকথন চলিত;কালক্রমে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় বঙ্গীয় কৃতবিদ্য বাঙ্গালাভাষাকে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইলে — দেশের এক গুরুতর অভাব নিরাকৃত হইবে।

ভাষাভেদ

ভাষাতত্ত্ব আলোচনা কালে দেখা যায়, দেশের অবস্থানের উপরই ভাষার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ইহা আবার বিবিধ কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম — দেশবাসীর কর্মতৎপরতা, দ্বিতীয় — প্রতিবেশী অপরাপর ভাষার সংঘর্ষণ এবং তৃতীয়তঃ — দেশের অবস্থানুসারে আবহাওয়ার প্রকৃতি। যে দেশের লোক সাতিশয় কর্মতৎপর (যেমন বন্দরাদিতে), এমন কি ভালরূপে কথাটি বলিবারও অবকাশ পায় না, তথাকার ভাষা সংক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক — অনেকস্থলে সঙ্কেতমাত্র অবলম্বনে কার্য চালাইতে বাধ্য হয়। পার্বত্য প্রদেশের পক্ষেও এই অবস্থা কতক পরিমাণে খাটে; কারণ এখানকার জীবনকেও পরিশ্রমের কঠোর শাসনে পরিচালিত করিতে প্রকৃতিই বাধ্য করে। আবার বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে আসিলে, তাহাতেও একটা খিচড়ী না হইয়া যায় না। অধুনা আমরা অনেকগুলি ইংরাজী শব্দ একবোরে খাসদখলে আনিয়া ফেলিয়াছি। এই যে "খাসদখল" শব্দটী প্রয়োগ করিলাম, তাহাও নিজস্ব নহে। এস্থলে তৎপরিবর্তে 'নিজ অধিকার' বসাইলে ঠিক উপযুক্ত (idomatic) প্রয়োগ হইল না বলিয়া সম্ভবতঃ অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। এইরূপে

সকল ভাষাই কিছু না কিছু পরিমাণে বিভিন্ন ভাষা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেশের জলবায়ু এবং শীতাতপের বিভিন্নতাও ভাষা বিচ্ছেদ ঘটাইবার পক্ষে সামান্য কারণ নহে। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, কোন কোন দেশের আবহাওয়ায় জিহ্বার এত জড়তা জন্মে যে, উচ্চারণে নিতান্ত বিকৃত ঘটে। কোথাওবা কেবল অনুনাসিক উচ্চারণই ভাষার প্রকাশক। দেশ ভেদে এইরূপ নানা উচ্চারণ-বৈষম্যে ক্রমে পরস্পরের অবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

চাক্‌মাদিগের মূল ভাষা বাঙ্গালা;তবে ইহা প্রচলিত বাঙ্গালার তুলনায় নিতান্ত বিকৃত, এবং সংক্ষিপ্ত কম নহে। ইংরাজ রাজপুরুষেরা ইহাকে "চাক্‌মা-বাঙ্গলা" (The language is Chakma Bengali) নামে অভিহিত করিয়াছেন[৩৬০]। বস্তুতঃ বঙ্গভাষা ক্রমেই পূর্বদিকে বিকৃত হইয়া আসিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ এ সকল দেশে পূর্বে মঘের বসতি ছিল। পরে যখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে বাঙ্গালিগণ এখানে উপনিবেশ

চাক্‌মা-বাঙ্গালা

সংস্থাপন করিতে আসেন, তখন তাঁহাদের সেই প্রাচীন অর্থাৎ প্রাকৃতবহুল বাঙ্গালামাত্র সম্বল ছিল[৩৬১]। পরবর্তী যুগে নবদ্বীপ সংস্কৃত আলোচনার কেন্দ্রস্থল হওয়াতে তৎপার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে বাঙ্গালার যে অংশ যত অধিক দূরে অবস্থিত, তথাকার বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দের পসার তত অল্প। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ভাষার সংঘর্ষেও যে কোন ভাষা বিকৃত এবং নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। চাক্‌মাভাষার মূল বাঙ্গালা হইলেও মঘ, ত্রিপুরা এবং মুসলমানী ভাষার সহিত সংমিশ্রণ অতিশয় বিস্তৃত। ফলকথা, ইহারা বিজাতীয় সমাজ হইতে যাহা যাহা অনুকরণ করিয়াছে, ভাষা তন্মধ্যে সাধারণ মোটামুটি বলা যাইতে পারে, চাক্‌মাগণ হিন্দুদের হইতে ভাষা ও দেবদেবী; মঘদিগের ধর্ম, ব্যবহার, ভাষা, এমন কি অক্ষরগুলি পর্যন্ত;ত্রিপুরাদের ভাষা, পূজাপদ্ধতি ও আচার ব্যবহার;এবং মুসলমানদিগের ভাষা ও খাঁ প্রভৃতি উপাধি ইত্যাদি — পার্শ্ববর্তী প্রায় সমুদয় জাতি হইতেই কিছু কিছু করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই নিমিত্ত ইহাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত সাতিশয় জটিল, এবং ভাষাও এত দুরূহ হইয়াছে যে, অপর কোন জাতিরই সহজবোধ্য নহে। পরন্তু ধীরে ধীরে বলিলে সাধারণ চাক্‌মাও সরল বাঙ্গালা বুঝিতে পারে, এবং প্রায় বোধযোগ্য করিয়া উত্তর প্রদান করে। আবার ইহাদের মধ্যে "গোছা" বিশেষেরও কথার পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন "লার্মা", "খেয়ংচেগে" ও "কুরাকুট্যা" গোছার লোকে "যাঙল" (যাঙর), "এজঙ্গল্"

(৩৬০) Vide - Appendix VII; part of A (Bengal code of cencus procedure).

(৩৬১) দৃষ্টান্তস্বরূপ চট্টগ্রামে প্রচলিত অনেক কথা 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল' ও প্রাচীন পদাবলী প্রভৃতি হইতে তুলিয়া দেখাইতে পারা যায়। তা ছাড়া এখানে এমতও অনেক কথা আছে, যা পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অপর কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। এ সকল এবং আরও অন্যান্য কারণে বর্তমান চট্টগ্রামবাসী অধিকাংশ হিন্দুই যে দক্ষিণ রাঢ়জ, তাহা সুদৃঢ় রূপে প্রমাণিত হয়।

(এজঙর) ইত্যাদি রূপে "র" স্থলে "ল" বলে আবার কোন কোন "গোছার" কথার টানও বিভিন্ন।

ইহারা কতিপয় সংস্কৃত শব্দ এমনি অবিকৃতরূপে গ্রহণ করিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তন্মধ্যে — দয়া, ধর্ম, শক্তি, ভক্তি, দান, মান, কৃপা, পীড়া, চিৎ, অমৃত, সুখ, গুণ, উপকার, সম্পত্তি, বন্ধু মন, বিপদ, আপদ, ধন, ধনী, মিত্র, বিচার, অন্তর, অকূল, শাক, গুড় প্রভৃতি শব্দগুলি সুপ্রথিত। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সং· · · বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত। যথা ঃ-

সংস্কৃত শব্দ

মূল সংস্কৃত	চাক্‌মা ভাষায়
অভুক্ত	আভুখদা
আর্য্য	আর্য
উনানশাল	উনানশাল
কলুষ	কুলুক
কুত্র	কুধু
কুত্রাৎ (কস্মাৎ)	কুযৎ
কর্ম	কাম
গোশালা	গোয়াল
গুচ্ছ	গোছা
ছায়া	ছাবা
জড়	জুর
ঝটিতি	ঝাদি
দুঃখ	দুখ
পিষুণ	পিজুম
প্রত্যয়	পাত্যায়
পিচ্ছিল	পিচ্ছোল
বাস (গন্ধ)	বাচ
	মে দে
মে দেহি	চবাশালা
শবশালা	
সন্দেহ ভাষা	ছন্দভাচ্
হৃদয়ে	হৃদৎ ইত্যাদি।

ধর্ম ভিন্ন প্রচলিত কথায় প্রাকৃত-প্রভাব তাদৃশ অধিক নহে। সচরাচর কথোপকথনে — "উজু" (উজ্জু), "এজ্যা" (অজ্জ), "লডি" (লট্‌ঠী), "পাথর" (পত্থর), "দুয়ার", "ঘর", "খাম" (খম্ভ), "দুদ্" (দুধ্ধ), "দৈ", (দহী), "শ্যিয়াল" (শিআ), "জিদু" (জেট্‌ঠা), বাবন (বক্ষণ), "দঢ়", "আদ্বান" (অদ্ধ) "দুনা" (দুনা), 'বুরা" (বুড়ঢা), "তেল", "মু" (মহু), "রূপা" (রূপ্পা), "মাছি" (মচ্ছি), "হোলদ্" (হলদ্দা), "পুথি" (পোত্থি) প্রভৃতি মূল এবং ঈষদ্বিকৃত পালি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

পালি শব্দ

আর অবিকৃত বাঙ্গালা শব্দও কম নহে। তন্মধ্যে ফুল, ভাল, মন্দ, ঢাক, গরীব, বৈদ্য, ভাজা, নিজ, চোখ, ওঝা, পরাণ ইত্যাদি শব্দগুলি সাধারণ। আবার উচ্চারণ-বিকৃতি দোষে কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ সামান্য রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, — "দুষ" (দোষ), "বিচ্ছাচ্" (বিশ্বাস), "ভাপ" (ভাব), "কদা" (কথা), "বিগুণ" (বেগুন), "বালোস্" (বালিস), "বিঝম্ লাগা" (বিষম লাগা), "বিছ্লাগা" (বিষলাগা) ইত্যাদি। এ ছাড়া, কোন কোন শব্দ বিশেষ পরিবর্তিত এবং কোনটী বা অর্থান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কয়েকটী উদাহরণ যথা,— "অবুজ" (অবোধ), "অমগদ" (গোঁয়ার), "শ্বেতখানা" (পায়খানা) "পূর" (ম্যাদ), "দো-ল্" (সুন্দর), "বারিজা" (বর্ষা), "কমলে" (কোন সময়ে) এবং "কাণা" শব্দে অন্ধকে বুঝায়। পাঠক মহোদয়েরা দেখিলেন, ইহারা সংস্কৃত কি বাঙ্গালার এমন অনেক শব্দে বিকৃত বা অবিকৃতভাবে ব্যবহার করে যে সমুদয় পূর্ব কি উত্তর বঙ্গেও প্রচলিত নাই। তাহা ছাড়াও "মুজুং" (মৌসুম) "মাড়া" প্রভৃতি কতিপয় শব্দ পশ্চিমবঙ্গেরই অনুকরণে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বাঙ্গালা শব্দ

পরন্তু আত্মীয় আহ্বানেও বাঙ্গালীদিগের বিশেষতঃ হিন্দুগণের যথেষ্ট অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়, কোন কোন স্থলে সামান্য বিকৃতি ঘটিয়াছে মাত্র। যথা - পিতা বা শ্বশুর — "বা", মাতা বা শাশুড়ী — "মা", পিতৃব্য — "জিধু" (জ্যেষ্ঠতাত), "খুরা", "কাকা", পিতৃব্যানী - "জেবেই" (জ্যেষ্ঠতাতপত্নী) "খুরী", "কাকী", জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা — "দাদা", জ্যেষ্ঠাভগ্নী — "বেই", কনিষ্ঠ ভাই-ভগ্নী — (স্নেহসূচক) "লক্ষ", জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ — "ভুজি"[৩৬২], মায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী — "মুঝি", মায়ের জেষ্ঠা ভগ্নী — "জেধেই", "মুঝি"— পতি — "মইঝা" এবং "জেধেই"—পতি-জিধু" পিসী — "পিঝেই", পিসা— "পিঝা", মামা-"মামু", — মামী-"মামী", পিতামহ বা মাতামহ-"আযু", "দা", পিতামহী বা মাতামহী — "বই", "নানু", ভগ্নীপতি — "বোনই"[৩৬৩]। ,

আত্মীয় আহ্বান

সর্বোপরি ইহাদিগের সংখ্যা-গণনা এক অদ্ভুত ব্যাপার। মোট কুড়িটী রাশি আছে কিন্তু প্রত্যেকটীরই অভিধা বিভিন্ন। ততোধিক গণনার আবশ্যক হইলে 'এক কুড়ি এত' বা 'দুই কুড়ি এত' বলিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ পাঁচবার কুড়ি কুড়ি গণনার পর তবে এক শতের সাক্ষাৎ

(৩৬২) চট্টগ্রামের হিন্দুগণ "ভইজ" এবং মুসলমানেরা "ভউজ" সম্বোধনে "ভাজি" বলিয়া থাকে।

(৩৬৩) চট্টগ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বলে "বোনাই"।

পাওয়া যায়। বলিতে কি, এতাদৃশ প্রথা অদ্যাপি চট্টগ্রামের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ ইহা তাহারই সংক্রমণ ফল। কিন্তু এই সংখ্যাগুলির নাম প্রায় বাঙ্গালা-প্রসূত হইলেও কোন অর্থে স্থিরীকৃত হইয়াছে, নির্ণয় করা দুরূহ। যথা ঃ— ১ এক্‌থ, ২ দিথ, ৩ তিতির, ৪ তিথ, ৫ কাচ, ৬ কতম, ৭ বোলাই, ৮ নিল, ৯ রাজা, ১০ দিন, ১১ হাত, ১২ গাৎ, ১৩ ব্রাহ্মা, ১৪ ছক্কি, ১৫ ধর্ল্যা, ১৬ তাৎ, ১৭ গন্দা, ১৮ গন্দি, ১৯ উনিশ, ২০ কুড়ি। কিন্তু বর্তমানে এবংবিধ আখ্যায় গণনা এত বিরল যে, অশিক্ষিত সমাজেও কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়, প্রায় সকলেই এক দুই করিয়াই গুণে।

সংখ্যা গণনায়

ক্রিয়াপদের রূপ সংস্কৃত-অনুকরণে হইলেও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া তৎসমুদায় অধিকতর দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালায় উপনীত হইবার কালে একটা মহাবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। একবচন ও বহুবচন লইয়া ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। কাল, পুরুষ ও বচনভেদে বিভক্তি সকল অষ্টাদশবিধ। ক্রিয়া বিভক্তি যথা ঃ-

ক্রিয়া বিভক্তি

		একবচন	বহুবচন
বর্তমান কাল	উত্তম পুরুষ	আং	এই
	মধ্যম পুরুষ	এইচ্‌	অ
	প্রথম পুরুষ	য	ন্‌
ভবিষ্যৎ কাল	উত্তম পুরুষ	এইম্‌	এবং
	মধ্যম পুরুষ	এবে	এবা
	প্রথম পুরুষ	এব	এবাক্‌
অতীত কাল	উত্তম পুরুষ	এইয়ং	ইয়েই
	মধ্যম পুরুষ	ইয়চ্‌	ইয়
	প্রথম পুরুষ	ইয়ে	ইয়ন্‌

বাঙ্গালা পদ্যের "মুই", "তুই" সর্বনাম চাক্‌মাভাষায় যথাক্রমে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের একবচনে তুচ্ছার্থে এবং অতুচ্ছার্থে প্রচলিত, কিন্তু আশ্চর্য রূপান্তর এই, ইহারা "আমি" এবং "তুমি" শব্দে বহুবচনার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্যতঃ প্রথম পুরুষের একবচনে — সংস্কৃত "তে" এবং বহুবচনে বাঙ্গলা পদ্যের "তারা" সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয়, সর্বনামের সম্ভ্রমার্থে কোন বিশেষ রূপ নাই বটে, কিন্তু তাদৃশ সম্মানিত স্থলে সংস্কৃতের অনুকরণে একের প্রতিও বহুবচনের রূপ ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে।

সর্বনাম

আমাদের বক্তব্য কিঞ্চিৎ স্পষ্টতর করিতে এস্থলে একটী ক্রিয়ারূপ উপযুক্ত সর্বনাম সহযোগে প্রদর্শিত হইল। গমনার্থ-বোধক ক্রিয়ারূপ যথা ঃ—

বর্তমান কাল

বাঙ্গালা কথা	চাকমা কথা
আমি যাই	মুই যাং
আমরা যাই	আমি যেই
তুই বা তুমি যাও	তুই যেইচ্
তোরা বা তোমরা যাও, অথবা আপনি যান	তুমি য
সে যায়	তে যায়
তাহারা যায় বা তিনি যান	তারা যান

ভবিষ্যৎ কাল

আমি যাব	মুই যেইম্
আমরা যাব	আমি যিবই
তুই যাবি বা তুমি যাবে	তুই যেবে
তোরা যাবি বা তোমরা যাবে অথবা আপনি যাবেন	তুমি যেবা
সে যাবে	তে যেব
তাহারা যাবে বা তিনি যাবেন	তারা যেবাক্

অতীত কাল

আমি গিয়াছিলাম	মুই যেইয়ং
আমরা গিয়াছিলাম	আমি যিয়েই
তুই গিযাছিলি বা তুমি গিয়াছিলে	তুই যিয়চ্
তোরা গিয়াছিলি বা তোমরা গিয়াছিলে অথবা আপনি গিয়াছিলেন	তুমি যিয়
সে গিয়াছিল	তে যিয়ে
তাহারা গিয়াছিল বা তিনি গিয়াছিলেন	তারা যিয়ন

পূর্বে বলিয়াছি, ইহারা মঘভাষা হইতে বর্ণগুলি অনুকরণ করিয়াছে। কেননা ইহাদিগের বর্ণমালা এবং বর্ণসংযোগে ব্রহ্মবাসীদের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ফলত ব্রহ্মা এবং বঙ্গীয়

বর্ণাবলী

বর্ণাবলীর উৎপত্তিস্থলও বিভিন্ন নহে, একই বৃক্ষের কাণ্ড হইতে নানা শাখা নানা আকারে গঠিত হইয়া ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" প্রদর্শিত অশোকের সময় (২৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দ) হইতে বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রমবিকাশের সহিত ব্রহ্মা ও চাক্‌মা বর্ণ সমূহের সাদৃশ্য দেখাইয়া পরবর্তী পৃষ্ঠায় এক খানি তালিকা প্রদত্ত হইল।

ইহাতে দেখা যায় খ, গ, ঘ, থ, ম, য, স এবং হ তে কোন পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। অবশিষ্টের মধ্যে অ, ক, চ, ছ, ড, ঢ, ত, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ এবং ল প্রভৃতি বর্ণ যৎসামান্য রূপান্তরিত মাত্র। এতদতিরিক্ত যে বর্ণাবলী রহিল, তাহাদের মধ্যেও যে আকৃতিগত একটা সম্পর্ক না রহিয়াছে, এমত নহে। সময়সাগরের কত তরঙ্গাভিঘাত চলিয়া গিয়াছে, তথাপি এত পরবর্তীকালের জীব আমরা যে প্রাচীন নিদর্শনের এতটা সাদৃশ্যেরও অস্তিত্ব পাইতেছি, তাহাও পরম সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মার সহিত চাক্‌মা বর্ণমালার সাদৃশ্য এবং সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠযুক্ত। সম্ভবতঃ ত্রিপুরাদিগের ন্যায় চাক্‌মাদিগেরও লিখন প্রথা বা বর্ণমালা ছিল না, অনন্তর ব্রহ্মদেশে অবস্থিতিকালে নানা অসুবিধায় পড়িয়া তথাকার বর্ণাবলী গ্রহণ করিয়া থাকিবে। পূর্বপৃষ্ঠায় বিন্যস্ত আদর্শেই পরিলক্ষিত হইবে, স্বরবর্ণ গুলির মধ্যে 'উ' টী সম্পূর্ণ অবিকৃত; 'অ' ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়াছে; এবং অপর দুইটী — ই, এ বর্ণে তারতম্য কিঞ্চিত অধিক থাকিলেও ব্রহ্মার দ্বিতীয় পর্যায়ের সহিত তাদৃশ অনৈক্য নহে। ব্যঞ্জন বর্ণে — ক, খ, গ, ঘ, ত, থ, প, ফ, ব, ম, য, ব (ওয়া), স ব্রহ্মাবর্ণের সহিত অভিন্নপ্রায়; ঙ, চ, ছ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ন, দ, ধ, ভ, ল, হ ইত্যাদি বর্ণেও অতিসামান্য রূপান্তর ঘটিয়াছে, অধিকন্তু তৎ ক্রমপরিবর্তন সুস্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট জ, ঝ, ন, র এবং হল তে সামঞ্জস্য উদ্ধার কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মূলতঃ সৌসাদৃশ্য সহজেই অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যায়। চাক্‌মা-সমাজের এ অনুকরণ অল্পদিনের কথা নয় ইহার উপর দিয়া কত কত রাজামহারাজার প্রভুত্ব—জগতের কত অনন্ত পরিবর্তন চলিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় বর্ণমালার এ সামান্য পরিবর্তন ধর্তব্যই নহে। বিশেষতঃ অনুকরণে প্রায়ই খাঁটি জিনিষ থাকে না, অনুকারী হয়তঃ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির সংযোগে একটা অভিনব পদার্থ গড়িয়া তোলে, অন্যথা তাহা যতদূর পারা যায়—সংক্ষিপ্ত সংস্করণে প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রাচীন বাঙ্গলা, ব্রহ্মা এবং চাক্‌মা

ব্রহ্মা ও চাক্‌মা

এক্ষেত্রে কেবল আকৃতিগত সামান্য পরিবর্তন করিয়াই অনুকরণ-কর্তা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, বর্ণসংখ্যাও যথাসাধ্য সংক্ষেপের চেষ্টা হইয়াছে। সংস্কৃত মাতৃক বলিয়া এই বর্ণগুলিও স্বর এবং ব্যঞ্জনভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রহ্মাদিগের মূল স্বরবর্ণ দশটী — ঋ এবং ঌ ইহাদের নাই। কিন্তু চাক্‌মাগণ তাহা হইতে অ-ই-উ-এ বর্ণচতুষ্টয়মাত্র গ্রহণ করিয়াছে। ই-ঈ এবং উ-ঊ পরস্পরে কোন প্রভেদ নাই। 'অ' এর উচ্চারণ— আ; তদুপরি ( ) খা তুলিয়া দিলে অর্থাৎ রেফাক্রান্ত করিলে 'অ' উচ্চারিত হয়। তা' ছাড়া 'অ' এর উপর ( ) বা: খী আর একখানি শিখা তুলিয়া 'ঐ' এবং 'অ' এর নীচে 'উ' দিলে 'ও' উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন, —

স্বরবর্ণ

অ উচ্চারণে —

এ উচ্চারণে —

ও উচ্চারণে —

ঔ উচ্চারণে — ইহাদের মধ্যে নাই।

ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ব্রহ্মভাষারই অনুরূপ বত্রিশটী। তৎমধ্যে বর্গীয়বর্ণগুলি ঠিকই আছে; অন্তস্থ বর্ণের য — 'য়্যা' এবং ব — 'ওয়া'[(৩৬৪)] সংজ্ঞায় প্রথিত। পালির ন্যায় তালব্য 'শ' ও মূর্দ্ধণ্য 'ষ' এর শাসন ইহাদের মধ্যে নাই। উষ্মবর্ণে অবশিষ্ট 'স' ও 'হ' ব্যতীত ব্রহ্মবর্ণাবলীর অনুকরণে (লাজিয়ে) 'হল' নামে আর একটী বর্ণ আছে, তাহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বিরল।

ব্যঞ্জনবর্ণ

এতদ্ব্যতিরিক্ত অনুস্বার এবং বিসর্গের প্রচলনও ইহারা অজ্ঞাত নহে;তবে চন্দ্রবিন্দুর কাজ ন্ দ্বারা সরিয়া যায়। পরন্তু পালির ন্যায় ব্যঞ্জনবর্ণ সকল কা-খা-গা-ঘা-ইত্যাদি ক্রমে আকারান্ত করিয়া উচ্চারিত হয়;বিশেষ পরিচয়স্থলে — তৎসঙ্গে আকৃতি সূচক বিশেষণ যোগে পাঠ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য — তৎসমুদয় বিশেষণ "আঁকুড়ে ক" "বকা ঠোঁটে খ" প্রভৃতি রূপান্তর মাত্র। তাহা দেখাইবার পূর্বে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, ইহারা সচরাচর 'স' কে 'ছ' এর ন্যায় উচ্চারণ করে এবং ট, ঠ, ড, ঢ এর উচ্চারণ যথাক্রমে ত, থ, দ, ধ, এর সহিত বিনিময় করিয়া থাকে। যথা, ক — "চুচ্যাঙ্গ্যা কা", খ- "গুজাঙ্গ্যা খা", গ — "চান্দ্যা গা", ঘ— "তিনঠাল্যা ঘা", ঙ — "ছিলামুগুা ঙা", চ — "দ্বিজাচ্যা চা", ছ — "মজছ্যা ছা", জ—"দ্বিপদলা জা", ঝ — "উরাভরি ঝা", ঞ — "তিলচ্যা এ্যা", ট — "দ্বিয়াদা তা", ঠা — "ফোডাদিয়া থা", ড — "আঁড়ুভাঙা দা', ঢ — "লেজভরা ধা", ন — "পেট্টোয়া না", ত — "গঙ্গা টা", থ — "জয়দা ঠা", দ — "দুলনি ডা", ধ — "তলমো ঢা", ন — "ফার্বাণ্যা না", প — "পাল্যা পা", ফ — "উয়রবোঝা ফা", ব — "উয়রমু বা", ভ — "চেরেদা ভা", ম — "বুগদ-পদলা মা", য — "ছিমুছ্যা য়্যা", র, — "দ্বিদাজ্যা রা" ল — "তলমুয়া লা" ব — "বাজন্যা ওয়া", স — "ভূতিবক্যা ছা", হ — "উয়রমুয়া হা" এবং হল — "লাজিয়ে হলা"।

এই সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণকে অকারান্ত উচ্চারণের উপযোগী করিতে পূর্বোক্তরূপে মস্তকোপরি (৫) রেফস্থাপন প্রয়োজন। ই-ঈকার (০) শূন্য বিশেষ মাত্র, ব্যঞ্জনের দক্ষিণ পার্শ্বোপরি বসে।

স্বরসংযোগ

এবং উ-ঊকার (\ বা ^) একটান বা দুইটান নিম্নে, একার (৻) — ঠিক বাঙ্গলার ন্যায় পূর্বভাগে স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে ঐকার যোগ করিতে হইলে, মস্তকে রেফ্ এবং বামমুখী শিখা উত্তোলন, ওকারে মস্তকে রেফ এবং পাদদেশে 'উ' সংযুক্ত করা গিয়া থাকে। উদাহরণ যথা —

ক কা কি কু কূ কে কৈ কো

অনুস্বার বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু — পৃথক বর্ণ নহে, হলন্ত বর্ণেরই রূপান্তর মাত্র। বলিতে কি, ইহাদের মধ্যেও তাদৃশ বিধি লঙ্ঘিত হয় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, চাক্‌মালেখায় হলন্ত 'ন' দ্বারা চন্দ্রবিন্দুর উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। অপর অনুস্বার এবং বিসর্গের নিমিত্ত সংস্কৃতানুকরণে যথাক্রমে (•) একটি এবং (••) দুইটি বিন্দু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু এই বিন্দুগুলি

(৩৬৪) এই 'ওয়া' উচ্চারণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও শুনিতে পাওয়া যায়— দ্বোয়ারী (দ্বারী), ঈশোয়ার (ঈশ্বর) ইত্যাদি।

সংযোক্তব্য বর্ণের মস্তকোপরি স্থান পায়। হসন্তচিহ্নও (—) মাত্রার ন্যায়;তবে বর্ণের ইষদোপরি স্থাপিত হয়। ইহাদিগের ভাষায় ক, ঙ, চ, ঞ, ত, ন, প, ম, য়, র এবং ল এই কয়কটি বর্ণে মাত্র

হসন্তবিধান ।

হসন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তম্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে হসন্তযোগে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইয়া থাকে। যথা, — ক্ (কাক্), ঙ্ (কাঙ্) চ্ (কাচ্), ঞ্ (ঞেই), ত্ (কাৎ), ন্ (কোন্) প্ (কোপ্) ম্ (কাম্), য়্ (কই), র্ (কার্), ল্ (কাল্) ইত্যাদি। কিন্তু অপর কোন স্বরান্ত ব্যঞ্জনের সহযোগে উচ্চারণের উক্ত 'ক' ইৎ যায়। হলন্ত 'ওয' ব উচ্চারণ — য়। বর্ণবিন্যাসের এই অংশ অত্যন্ত দুরূহ। তবে সংযুক্তবর্ণ লিখিবার একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। ইহা সামান্যরূপ জটিল হইলেও অপরাপর নিয়মের তুলনায় বর্ণবিন্যাসের সরল সঙ্কেত বলিতে হইবে। উপরেই দেখান হইয়াছে, বর্গীয় বর্ণের প্রথম ও পঞ্চম বর্ণে মাত্র হসন্তযোগ করিতে পারা যায়। সংযুক্ত বর্ণের যে বর্ণটি নিঃস্বর, তাহা যদি বর্গের প্রথম বা পঞ্চম বর্ণ না হয়, তবে সেইটি যে বর্গের — সে বর্গের প্রথম বর্ণোপরি হসন্ত চিহ্ন দিয়া, পরে উক্ত বর্ণ অকারান্ত করিয়া বসাইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেমন 'লগ্ন';চাক্‌মলেখায় — 'লক্‌গন'। অন্যতঃ 'স' তে হসন্তচিহ্ন প্রয়োগ করিবাব ব্যবস্থা নাই। যেখানে 'স' কে হলন্ত কবিবার প্রয়োজন হয়, তথায় 'চ' — 'স' এর অধিকাব পায়। যেমন পুরচ্‌কার (পুরস্কার), বাচ্‌প (বাষ্প) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে রেফের কোন ভিন্ন ব্যবস্থা নাই;রেফ্ যুক্ত কবিতে হইলে পূর্বভাগে 'র' স্থাপন করিয়া তৎপার্শ্বে বর্ণটি লিখিতে হয়। উচ্চারণের পক্ষে ইহাদের আরও একটি সরলবিধি এই যে, শব্দের অন্ত্য যে ব্যঞ্জন হলন্ত করিয়া উচ্চারিত হয়, লিখিবার সময়ও তাহাতে হসন্ত চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে।

য (য়), ব এবং ব (ওয়া) এই কতিপয় বর্ণ মাত্র 'ফলা' রূপে অপর ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হয়। 'য ফলা' টী (ৡ) প্রায় বাঙ্গালাবই অনুরূপ-বর্ণের পশ্চাতে বসে। 'র ফলা' টী (~) একটু

ফলা

অধিক বক্র বটে, কিন্তু দেখিলেই বাঙ্গালাভাব আসে এবং তদনুরূপ পদমূলে বসিয়া থাকে। প্রথমেই বলিয়া আসিযাছি, ইহাদের স্বতন্ত্র কোন ঋকার নাই। কিন্তু এতক্ষণ যাবৎ তাহার কার্য বুঝাইবার সুবিধা পাইযাছিলাম না। কোন বর্ণে ঋকার যোগের প্রয়োজন হইলে তাহাতে 'র ফলা' ও ইকার যোগ করিলেই উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়। যথা, — ক্রিত (কৃত)। এতদ্ভিন্ন 'ব' অর্থাৎ 'ওয়াফলা'ও (0) একটি শূন্য মাত্র — বর্ণের পদপ্রান্তে স্থান পায়; উচ্চারণ সেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেরই মত 'ওযা' অর্থাৎ দোয়ারী (দ্বারী), দোয়ারিকা (দ্বাবিকা) ইত্যাদিক্রমে হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত প্রতিলিপি হইতে আশা করি, মদীয় বক্তব্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। —

স ৎ পু এ বং স উ চ্ জ ল ক রে

গ্রি চ্ ম কা লে র বি র কি র ণ তি ক ণ হ য়

ভাষার মূল এবং গঠনপ্রণালী যথাসম্ভবরূপে প্রদর্শিত হইল। পরিশেষে বাঙ্গলা, পালি এবং সংস্কৃত ভিন্ন অপরাপর ভাষা হইতে যে যে শব্দ ইহাদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়াই বর্তমান পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি। তবে ইহা দ্বারা বিজাতীয় সংস্রবের গভীরতা পরিমাণ করিতে গেলে, প্রমাদে পতিত হইতে হইবে মাত্র। কারণ মঘত্রিপুরাদি জাতির, যাহাদের সহিত ইহাদিগের বহুকাল ধরিয়া একত্র বসবাস চলিতেছে, অতি অল্প সংখ্যক শব্দই চাক্‌মা সমাজে অধিকার পাইয়াছে। সুতরাং প্রচলিত শব্দসংখ্যা লইয়া জাতীয় নৈকট্য পরিমাপ নির্ণীত হইলে বিপরীত ফলই লাভ হইবে। মঘভাষার শব্দ যথা ঃ— খবং (গম্বং), খিমা (কিজা), গুয়াম্ (গুয়াঁবা অর্থাৎ পেয়ারা), খিরা (দং খেরাবাঁ অর্থাৎ ক্ষিরা), লোতা (লোরা অর্থাৎ ঘটী)। ইত্যাদি; ত্রিপুরাভাষার শব্দ যথা ঃ— তাগল (তাকুয়াল অর্থাৎ দা) ইত্যাদি; আরবী ভাষার শব্দ যথা ঃ— হাগিম, হুগুম, মুলবী (মৌলবী), মেজবান্, চাবি, চালাগ, জিদ ইত্যাদি; পারসীভাষার শব্দ যথা ঃ— ফৌজদারী, কাছারী, লেঠ, জোয়ানবন্দি (জবানবন্দী), ফর্য্যাদি (ফরিয়াদী) ইত্যাদি; হিন্দীভাষার শব্দ যথা ঃ— মামী, জার (জারা অর্থাৎ শীত), আন্দাজ, চেয়ারা (চেহারা) জঁয়ল (জঙ্গল) ইত্যাদি; চীনভাষার শব্দ যথা ঃ— ছাটিন্ (সাটিন) লেছু (নিছু), চিনি ইত্যাদি; মালয়ভাষার শব্দ যথা ঃ— ছাউ (সাগু) ইত্যাদি; হিব্রুভাষার শব্দ যথা ঃ— সেতান (সয়তান) ইত্যাদি; ইংরাজী ভাষার শব্দ যথা ঃ— গভর্নমেন্ট (গভর্ণমেন্ট) কামিছনার (কমিশনার), জজ, মাজস্টর (ম্যাজিস্ট্রেট), আপিল, নুটিস (নোটিস), গলস (গ্লাস) রেফার (রফর) ইত্যাদি; ফরাসী ভাষার শব্দ যথা ঃ — ফেঁরাঁই (ফিরিঙ্গি), জিন বিছ্‌কুট (বিসকিট) ইত্যাদি; পর্টুগীজ ভাষার শব্দ যথা ঃ বারাণ্ডা (বারেন্দা), ফিতা, বেলা (বেহালা), গির্জা (ইগ্রিজা — আমাদের কথায় গির্জা), পাদারী (পাদ্রী), কাদিরা (কেদেরা), ছাবন (সাবান), আলমারী (আলমিরা) ইত্যাদি; স্পেনীয় ভাষায় শব্দ যথা ঃ— সেরি ইত্যাদি; দেনমার্ক-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা ঃ— বারান্দি (ব্রাণ্ডী), ডেক ইত্যাদি; ইতালী-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা ঃ— সোদা (সোডা), কুম্পেনী (কোম্পানী), পিতল, লিস্তি (লিষ্ট) বরুছ্ (ব্রাস্) কাপ্তান, ইত্যাদি নানা বিজাতীয় শব্দের দ্বারা চাক্‌মাভাষা ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতেছে এবং কদর্য্য বাঙ্গলা শব্দগুলিও ক্রমে সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মূল শব্দের সন্ধান পাওয়া গেলে অপভ্রষ্টতার নির্বাসন স্বাভাবিক। অধুনা ইহাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত কথোপকথনে তাদৃশ কোন শব্দ বিকৃতি সহজে ধরিতে পারা যায় না। আশা করা যায়— শিক্ষার প্রভূত বিস্তার হইলে, বাঙ্গলা ও চাক্‌মাভাষায় উপলব্ধি করিবার উপযোগী কোন বিশেষ তারতম্য থাকিবে না।

অপরাপর ভাষায় শব্দ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

(১) কবি ও কবিতা
(২) বারমাস — (৩) ছড়া —
(৪) হেঁয়ালী

১

কবিতা ও সঙ্গীত

কবিতা সঙ্গীত শাস্ত্রের সুশোভন পরিণাম। ভগবদ্দত্ত মধুর কণ্ঠ না পাইয়াও কবি ভাবের নীরব ঝঙ্কারে ছন্দের মোহিনী ক্রিয়ার জগৎ মাতাইয়া তোলেন; সেতার, এস্রাজ, পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতি নানা রাগকাহিনী আলাপী মনোহর যন্ত্রনিচয় তাঁহাদের প্রয়োজনে আসে না। সঙ্গীতের পদ জানা থাকিলেও তদ্দ্বারা কর্ণতৃপ্তিমানসে সুগায়কের আশ্রয় আবশ্যক; কিন্তু কবি সেরূপ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। উভয়ের রচনা প্রণালীতেও প্রভেদ বিস্তর। কবিতায় ভাষা ও ব্যাকরণের প্রভাব যত অধিক, সঙ্গীতে তেমন নয়। সঙ্গীতে পদ্য-গৌরব যেন অতি সামান্য, তাহাতে কেবল মাত্রা লইয়া গণনা; শেষ ভাগে স্বর বা ব্যঞ্জনের ঈষৎ সাদৃশ্য থাকিলেই যথেষ্ট। পরন্তু কবিতা অমিত্রাক্ষরে চলিলেও চরণ পূরণ কঠিনতর — প্রত্যেক স্বরবর্ণ লইয়া অক্ষর গণনা করা হয়। তদুপরি আবার যতির কড়া শাসন রহিয়াছে।

কবিতায় কথকতা

ফলতঃ এস্থলে আমার এতাদৃশী ভূমিকা নিতান্ত নিরর্থক। চাক্‌মাদিগের কবিতাগুলি এযাবৎ সঙ্গীতের পাশমুক্ত হইতে পারে নাই। প্রায় কবিতাই প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত গানের অনুরূপ অন্য এক উপবাক্যের সহিত অতি নিকৃষ্ট মিলনে সহবাস করিতেছে। এমন কি, এ সকল তান-লয় সমন্বয়ে গীত হইয়াও থাকে। তথাপি তাহাদিগকে যে কবিতা আখ্যা দিলাম, সে কেবল ভাব-প্রবণতা এবং ঐতিহাসিকতার সন্নির্বন্ধ অনুবোধে, নানা রাগ-রাগিণীতে উদ্গীত হইলেও রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকা-গুলিকে যেমন কবিতাসমষ্টি ধরা হয়, এইগুলিও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। উৎসব-আমোদে চাক্‌মাগণ কথকদিগের সাহায্যে সেই পৌরাণিক কাহিনী সমূহ শুনিবার ব্যবস্থা করে। প্রসস্ত স্থানে "সভাস্থল" সজ্জিত হইয়া থাকে। পরে যথাসময়ে নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে "গেনকুলী" মহাশয় কোকিল-বিনিন্দিত রাগিনীতে সভাজনকে বিমুগ্ধ করিয়া বক্তব্য আরম্ভ করে। নান্দীপাঠ তাহার প্রথম কার্য, — 'সভাবন্দন' দ্বিতীয়। আখ্যায়িকার উপসংহার হইলে গৃহস্থও উপস্থিত সাধারণের মঙ্গল প্রার্থনা এবং স্বকীয় বিনীত নিবেদন ইত্যাদি করা হয়। এ সময়ে উপস্থিত সকলেই "গেনকুলীকে" পুরস্কৃত করে; বলা বাহুল্য, অপর সাধারণ অপেক্ষা গৃহস্থের পারিতোষিকের পরিমাণ অধিক থাকে।

কথকতা শিক্ষা সাপেক্ষ। এই তানলয়বদ্ধ কাহিনী এবং তদ্‌ব্যাখ্যা প্রভৃতিও শিখিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ চাক্‌মাদিগের এ সকল কথকগণকেও কবি বলা যাইতে পারে। যদিও তাহাদের বর্ণিত আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ নিজস্ব নহে, তথাপি মধ্যে মধ্যে লোকরঞ্জন মানসে তাহাদের স্বীয় যোজনা যথেষ্ট দেখা যায়। সমগ্র চাক্‌মা সমাজে বর্তমানে প্রায় ১৫।২০ জন প্রথিতনামা কথক আছে; তন্মধ্যে 'আক্কুকাণা' নামক অন্ধই সর্ব-প্রধান। ইহার বাড়ী চেঙ্গীরকূলে, সাকিন তৈচাক্‌মা — "ফাক্‌সা গোছা" "বালকাগোষ্ঠী" সম্ভূত। জন্মদিন লিপিবদ্ধ নাই, বয়স অনুমান ৫৬, ৫৭ বৎসর। এ বৃদ্ধ বয়সেও তাহার সুমধুর কণ্ঠে শ্রোতৃবর্গ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়, পরমপিতা তাহাকে দৃষ্টিশক্তিহীন করিয়া কোন সদুদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে তজ্জন্য ক্ষতি অনুভব করিতেছি।

কবি বা কথক

আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে "ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান", "চাটিগাঁ ছাড়া" "সৃষ্টিপত্তন", "স্বর্গপালা" এবং "লক্ষ্মীচরিত্রের" নামই বিশেষ, উল্লেখ যোগ্য। প্রথমোক্ত আখ্যায়িকাদ্বয়ের স্থূলমর্ম্ম প্রথম পরিচ্ছেদেওবিবৃত করিয়াছি;এস্থলে সবিস্তার বর্ণনা প্রদত্ত হইল। যে যে স্থানে বর্ণনা-বৈচিত্র পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তত্তৎস্থল মাত্র অবিকৃত রাখিয়া পাঠক সাধারণের বোধ-সৌকর্যার্থে অপর আখ্যাযিকা ভাগ গদ্যে রূপান্তরিত করিয়া দিলাম —

কবিগ্রন্থ

ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যান।

সাধিংগিরি বাজার একমাত্র কন্যা, নাম কপতি। কপতি স্বযংববা হইয়া জয়মঙ্গলকে বিবাহ করে। তাহাদের সংসার বড়ই সুখে চলিতেছিল; কিছুকাল পরে কপতি এক কন্যা প্রসব করিল; তাহার নাম হইল "ধনপতি"।

চম্পক নগরে সাধিংগিরি রাজা ছাড়া হরিশচন্দ্র নামে অপর এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পাটরাণীর নাম — মেনকা। রাধামোহন ইহাঁদের পুত্র এবং নিলপতি কন্যা। বাল্যকাল হইতেই কপতি ও মেনকার মধ্যে বড় বেশী ভাব জন্মিযাছিল। বয়সাধিক্যের সহিত তাহা অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। একে অপরকে প্রাণান্তপণে সাহায্য কবিত; একে কোন স্থানে কার্যোপলক্ষে যাইতে হইলে আপন পুত্র কন্যাকে অন্যের হেপাজতে রাখিয়া যাইত। একবার মেনকা রাধামোহনকে কপতির নিকট রাখিয়া যায়। বাজা সাধিংগিরি তখন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বাৎসল্যাকর্ষণে ধনপতি ও রাধামোহনকে একই দোলনায় বাখিয়া নিজেই দোলাইতে লাগিলেন এবং গাহিতেছিলেন, —

কপতি ও মেনকা

"সোনা-দোলনৎ রূপার দড়ি
দাদালৈ বেবেই ঘুম্ যাদন্ সমারে পড়ি।
অলিরে অলি ধি-ধি-ধি।।"

অস্যার্থ ঃ— "সোনার দোলনায় রূপার দড়ি; নাতনী আমার নাতীর সঙ্গে পড়িয়া ঘুম যাইতেছে। (অলিরে ইত্যাদি দোলনার তান।)"

বৃদ্ধ যেন লোকাতীত প্রতিভাবলে ভবিষ্যতের মনোমুগ্ধকর চিত্র দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। তাঁহার দোলনার আপর গান যথা ঃ—

"হাদৎ লয়ে বাদোল্ বাশ কুর্জ্জাৎ লয়ে
গুলি;
আমা-দাদা মারি আনি দিব গৈ বনর
পাখী।
অলিরে অলি ধি-ধি-ধি।।"

অস্যার্থ ঃ— "হাতে 'কামঠা' ও কোচরে 'গুলি' লইয়া (রাধামোহন) দাদা আমাব বনের পাখী মারিয়া আনিয়া দিবে। অলিরে ইত্যাদি।"

ইহাতেও বৃদ্ধের দূরদর্শিতা পরিব্যক্ত হইতেছে।

ধনপতি ও রাধামোহন

ক্রমে ধনপতি ও রাধামোহন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যৌবনে পদার্পন কবিলে, উভযেব মধ্যে অলক্ষিত ভাবে প্রণয় সংস্থাপিত হয়। অবশেষে একদা রজনীভাগে উভয়ে অরণ্যে পলাইয়া যায়। এদিকে তাঁহাদের খোঁজ আরম্ভ হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহারা এক নদীকূলে ধৃত হন। প্রত্যাবর্তনের পব বিশেষ আড়ম্বর সহকারে যথাবিধি তাঁহাদের পরিণয কার্য সুসম্পাদিত হইল।

চম্পকনগরের প্রধান রাজার নাম উদয়গিরি, সাম্বিংগিরি ও হরিশচন্দ্র তাঁহাবই সামন্ত রাজা। উদয়গিরি রাজার দুই পুত্র,বিজয়গিরি জ্যেষ্ঠ এবং সমরগিরি কনিষ্ঠ। বাজা বার্ধক্যদশায়

রাধামোহনকে সৈনাপত্যে বরণ

উপনীত; উপযুক্ত পুত্র বিজয়গিরির হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু বিজয়গিরি ইতিমধ্যে দিগ্বিজয ব্যপদেশে দক্ষিণাভিমুখে অভিযান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে রাধামোহনকেই সেনাপতিপদে বরণ স্থিরীকৃত হইল। তজ্জন্য রাধামোহনেব নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। ধনপতি পূর্বরাত্রে ভীমরাজ নামক পক্ষীবিশেষের ক্রন্দনধবনি শুনিযাছিলেন। সেই কারণে অনিষ্টপাত ভয়ে ধনপতি রাধামোহনকে রাজালয গমনে প্রথমতঃ বাবণ কবেন, কিন্তু রাধামোহন রাজাদেশেব প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে সাহস করিলেন না। বিজযগিরি সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি রাধামোহনকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিতে পারেন, তবে তাঁহাকে বিজিত বাজ্যের অর্ধাংশ সমর্পণ করিবেন। ইহাতে রাধামোহন অধিকতর উৎসাহিত হইয়া অবিলম্বে মধুসখা চৈত্রের দশম দিবসে চম্পকনগর হইতে যাত্রা করিলেন। পথে আসিতে মনে হইল, এ সময়েব একবার

ধনপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া কর্তব্য। সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে স্বীয় প্রাণেশ্বরকে রণসজ্জায় বিভূষিত দেখিয়া ধনপতি পূর্বোক্ত অমঙ্গলশঙ্কায় অধীরা হইলেন। রাধামোহন নানাবিধ প্রবোধ বাক্যেও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। অনন্তর রাধামোহন —

("সুরে এওন্ পিপীরা,")[৩৬৫]
এয়জি তগাঙ্গে তিবিরা।"

প্রতিনিধি দিবার জন্য 'ত্রিপুরা' অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

"(কুচি রাণ্যা কদোবন,)
জয়নারাণ রোয়াজা-ইদু গেল্ রাধামন।"

রাধামোহন (ত্রিপুরাদিগের জনৈক সর্দার) জয় নারায়ণ রোয়াজার নিকটে গেলেন।

"(ছরা আগারে জুনি যায়,)
তুমি রাধামন কুনি যায়?"
(তাপিত ভাঙি পিপাতা,)
জয় নারাণ রোয়াজা পুঝার লয় এই কথা।"

রাধামোহন আপনি কোথায় যাইতেছেন, জয়-নারায়ণ রোয়াজা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"(চৈদে বৈশাখে পৈল্ বিজু,)
এয়জি তগেছং এছোাং তর্ ইদু।"

(রাধামোহন বলিলেন) তোমার এখানে (যুদ্ধের) প্রতিনিধি খুঁজিতে আসিয়াছি।

("আলু কুরি কামাত্তুন,)
এয়জি প্যেম্মে তমা-পাড়াত্তুন?"

তোমার পাড়া হইতে প্রতিনিধি পাইব কি?

"(বেইনে বুনি কর তারাম্)
পাড়াপড়সী ডাকিল জয়নারায়ণ।"

জয়নারায়ণ (রোয়াজা এই কথায়) প্রতিবাসীগণকে ডাকিলেন।

"ধারেয়া তাগল্লে কাবং বন,)
এয়জি আগনে কোন জন?"

(৩৬৫) এই বন্ধনীবদ্ধ পংক্তিগুলি কেবল পদমিলনের জন্য ব্যবহৃত; বক্তব্য বিষয়ের সহিত তাহাদের অর্থগত কোন সম্বন্ধ নাই।

(জিজ্ঞাসা করিলেন) তোমরা কেহ (সেনাপতি রাধামোহনের) প্রতিনিধিরূপে অগ্রসব হইতে পার?

"(গুলা খেলুং কুসুমে,)
ছয় কুড়ি টেঙা দিদ কয় মুজুঙে।"

(এজন্য) আগামীতে ১২০ টাকা দিতে বলিতেছে।

ইহাতে তাহারা বলিল ঃ—

"(চৈল্ কারি ঝারিদং নয়,)
ছয় কুড়ি টেঙা ক্যা — দ্বিশত টেঙা দিলেও আমি পার্ত্তং নয়।"

১২০ টাকা কেন — দুইশত টাকা দিলেও আমরা পারিব না।

অনন্তর—

"(সুপারী কিনি আধাপণ)
তিবিরা ন প্যেই ফিরি এল ঘরৎ রাধামন।"

রাধামোহন ত্রিপুরা (প্রতিনিধি) না পাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

"(উড়েল বয়ারে রণগতি,)
এয়জি পেলে কি নপেলে পুঝার লয়
ধনপতি।"

ধনপতি (রাধামোহনকে) প্রতিনিধি পাইলেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাধামোহন বলিলেন ঃ—

"(ইঁজরৎ নিগলি চান্ ন-চান্,)
দ্বিশত টেঙা দিলেও তিবিরা খাম
ন-খান্।"

দুইশত টাকা দিলেও কোন ত্রিপুরা সাহস করে না।

পরিশেষে রাধামোহন ধনপতিকে অনেক বুঝাইয়া চৈত্রের ১৫ই তারিখে রণযাত্রা করিলেন। আর এদিকে পতিবিরহ বিধুরা ধনপতি বিলাপ করিতে লাগিলেন ঃ—

"লইয়ে পরাণে বিড় বিড়
খেলুং মাথা তর রাজা বিজয়গিরি।"

'পরাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে, (যুবরাজ অর্থে) রাজা বিজয়গিরি তোর মাথা খাই।'

বলিয়া রাখা ভাল এ সময়ে ধনপতির গর্ভলক্ষণ দেখা দিয়াছিল।

ইতি ধনপতি-রাধামোহনেব উপাখ্যান ভাগ সমাপ্ত।

চাটিগাঁ ছাড়া

এই আখ্যায়িকাখানি উপরিউক্ত উপাখ্যানের দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র। তবে ইহার বর্ণনীয় কথা যে দ্বিগ্বিজয়, তাহার প্রথম উদ্যোগ হইতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যথা;ঃ—

যখন যুবরাজ বিজয়গিরি দক্ষিণাভিমুখে দিগ্বিজয় গমনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন, সেই সময়ে —

"(রাঙা কালা সুইং ছিনে),
নানান্ কুসপন্ দেগে রোয়াং রাজা দগিনে।।"

দক্ষিণে রোয়াং রাজা[৩৬৬] অর্থাৎ আরাকান রাজ নানা কুস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

কেবল স্বপ্ন নহে, দিনে শৃগালের ডাক, অহর্নিশ শকুনি প্রভৃতি উড়িতেছে; বেড়াইতে বাহির হইলে শব দর্শন ইত্যাদি নানা অমঙ্গল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। একদা তাঁহার জলপূর্ণ ঘটী হইতে কুকুর আসিয়া জল খাইয়া গেল। এইরূপে নানা অশুভ চিহ্ন দর্শনে মঘরাজা ব্যাকুল হইলেন এবং কারণ জানিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ ডাকিলেন। দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলিলেন ঃ—

"(বজ লগে বুধবারে)
জন্মেয়ে শত্তুর উত্তরে।"

'উত্তর দিকে শত্রু জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

ইহা শুনিয়া মঘরাজ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন এবং গোপনে শত্রু-বিনাশের জন্য জনৈক পারদর্শী দূত পাঠাইলেন। কিন্তু সে শত্রুর কোনও সন্ধান পাইল না, অধিকন্তু রাজাকে আসিয়া নিরাপদ আশ্বাস দিল। রাজাও তাহাতে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন।

এদিকে যুবরাজ বিজয়গিরি সেনাপতি রাধামোহনকে অগ্রে পাঠাইয়া অবিলম্বে তিনি স্বয়ংও আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। কালাবাঘা প্রদেশে তদীয় শিবির সংস্থাপিত হইল। যুবরাজকে তথায় রাখিয়া রাধামোহন সৈন্য সামন্তগণসহ যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। সৈন্যগণ যুদ্ধে যাইতে যাইতে বলিতেছে ঃ—

"(গেলুং ছ্বার নে উজানি,)
মঘদেশ কৃদু আগে কি জানি?"

ছ্বার উজানাভিমুখী যাইতেছি, কিন্তু সীমা পাওয়া যাইতেছে না, — মঘদেশ যে কোথায় আছে কে জানে?

"(মানেক বেগানা জল্‌জলি)
কত সৈন্য কওন কল্‌কলি।"

(৩৬৬) প্রকৃত শব্দ ম্রোহং রোযাং বর্তমান আরাকান।

কতকগুলি সৈন্য কোলাহল করিতেছে।

"(তামা পিদোল কেচ্‌তন্ দে,),
কত সৈন্যগণ এওন্ দে।"

কত যে অর্থাৎ অগণিত সৈন্য আসিতেছে।

"(তোনে রাণিনি ভাত খেলাক্)
সমুদ্র সাগর নি লাগ পেলাক্।"

(অবশেষে) সমুদ্রতীরে আসিয়া সকলে উপনীত হইল।
সেনাপতি বলিতেছেন —

"(আগুণং দিলে ঘি গলে,)
সমুদ্র পার হবং গম দোলে।"

সুবিধামতই সমুদ্র পার হইব।
কবি দেখিলেন ঃ—

"নাজের উল্লাসে রাধামন
কৈগাং পলাক্কি সৈন্যগণ।"

সৈন্যগণ কৈগাং নদীতীরে উপস্থিত হইলে রাধামোহন আনন্দে নাচিতে লাগিলেন।

অনন্তর মঘরাজ-সমীপে দূত প্রেরণ করা হইল। সংবাদ পাইয়া মঘরাজা অস্থির হইলেন এবং কিংকর্তব্য পরামর্শের নিমিত্ত মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধ করাই মন্ত্রণা স্থির হইল। দূত আসিয়া উত্তর জ্ঞাপন করিলে সেনাপতির আদেশক্রমে —

"(জাদি পূজাৎ দিলুং ঘি,)
মঘদেশ কূলে সৈন্যগণ পলাক্কি।"

সৈন্যগণ মঘদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"(পাজারি দোকানৎ ফিটকিদি,)
জাগা নদে মঘরাজা এককিদি।"

মঘরাজা তাহাদিগকে একটুকু স্থানও দিলেন না।

"(বর্ঝিৎ বাজের ধলবাজা,)
মঘরাজা ক'ত্তে কুত্তুন্ এল কন্ রাজা?"

মঘরাজা বলেন, কোথা হইতে কোন্ রাজা আসিল।

অতঃপর রাধামোহনের সঙ্গে মঘরাজার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কবির ভাষায়

"রাধামনর সা'স ডাঙর,
আস্তে আস্তে চাক্‌মারাজা রাজ্য মারি
লয়।"

রাধামোহনের সাহস খুব বেশী; তদ্বলে চাক্‌মারাজ্য ধীরে ধীরে দেশ জয় করিতে লাগিলেন।

ক্রমে —

"লৈইন্যায় সমারে সৈন্যগণ,
রোয়াংকূলে লুম্লৈগে রাধামন।"

রাধামোহন সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রোয়াং কূলে অর্থাৎ বর্তমান আরাকানে উপস্থিত হইলেন।

ইহাতে অতিশয় কুপিত হইয়া

"(ছুরাছ্বিৎ নে গাবিব,)
মঘরাজা 'ক' স্তে চাক্‌মারাজাকে কাবিব।"

'মঘরাজা বলিলেন, 'চাক্‌মারাজাকে কাটিব।'

কিন্তু —

"(বর্জ্বিবেইন্যায় আধারে,)
রোয়াং রাজা লারেই ন-গরে;
লারেই গরে পাওরে।"

'রোয়াং রাজা নিজে যুদ্ধ করিলেন না, তদীয় পাত্র অর্থাৎ সেনাপতি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

(অথ যুদ্ধ বর্ণনা।)

কবি বলিতেছেন ঃ—

"ডাকের তুলি ঘনে ঘন,
মার মার হুকুম দিল দাদা রাধামন।"

দাদা বাধামোহন ভীষণ শব্দে ঘন ঘন চীৎকার তুলিয়া 'মার মার' আদেশ দিলেন।

'গওন মঘে লিক্‌লিকি,
মঘ-ইন্দি সৈন্য পওনদে কমি কি?"

মঘেরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল; তাহাদের পক্ষে কি কম অর্থাৎ অগণিত সৈন্য পড়িতেছে।

"মঘে গওন হাহাকার,
রাজ্য গওন চাক্‌মায় মঘের অনাচার।"

চাক্‌মারা মঘদের রাজ্যে অত্যাচার করিতেছে; মঘেরা হাহাকার করিতে লাগিল।

'পিঝে মঘরাজা হ্‌দিল,
রাধামন সমারে ন কিন্‌ল।"

অবশেষে মঘরাজা পরাস্ত হইলেন; রাধামোহনের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলেন না।

"(বর্ঝিৎ বাজের ধলরাজা,)
তুদি গরি ডাগের মঘরাজা।"

মঘরাজা (রাধামোহনকে) সবিনয়ে আহ্বান করিলেন।

"কহে মঘরাজা রাধারে
রেজ্য গঝেদ্যং তুমারে।"

মঘরাজা রাধামোহনকে কহিলেন, তোমাকে রাজ্য বুঝাইয়া দিতেছি।

"গয়া গঙ্গা কল্লুং দান
চাংগে তত্তুন্ পরাণ দান।"

গয়া গঙ্গা অর্থাৎ সর্বস্বই তোমাকে দান করিলাম ; তোমার নিকট (মাত্র) প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি।

তদনন্তর রাধামোহন রোয়াংকূল হইতে সয়ং দেশজয় করিতে ছুটিলেন। প্রায় পাঁচদিনে—

" জালি পাগর্য্যা লুমে লাগ,
ছিদু সৈন্যগণ জিরে লাগ্।"

(খ্যয়ং দেশের) জালিপাগর্য্যা নামক স্থানে উপনীত হইয়া তথায় সৈন্যগণ বিশ্রাম করিল।

তখন —

"জাদি পূজাৎ নে ঘি দিল,
বিজয়গিরি রাজা দ্বিরাজা জিদিল।"

(যুব) রাজ বিজয়গিরি দুই রাজ্য জয় করাতে ধর্মকামে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন।

"রণৎ জিনি বার্ল্য তেজ,
সিত্তুন গেলাক্ বিলে(৩৬৭) অক্সাদেশ।"

যুদ্ধে জয়লাভে (রাধা মোহনের) তেজ বাড়িল—অনন্তর তথা হইতে অক্সাদেশ (উচ্চব্রহ্ম) যাত্রা করিলেন।

(৩৬৭) বিলে - পদপূরণে।

এখানে অক্সাগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। তাহাতে রাধামোহন মূর্চ্ছাগত হইয়াছিলেন।

রাধামোহনের মূৰ্চ্ছা

কথিত আছে, নারায়ণ স্বয়ং বৈদ্যবেশে আসিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদান করেন। সেনাপতির মূর্চ্ছাসংবাদ লইয়া তদীয় সারথি কুঞ্জধন কালাবাঘা প্রদেশে যুবরাজ বিজয়গিরির নিকট যায়। তচ্ছ্রবণে বিজয়গিরি বিলাপ করিতে লাগিলেনঃ—

"ওরে পাত্রগণ কি হব?
লারেই সদ্দার লারেৎ পোল্‌ কি হব?"

ওহে অমাত্য সকল, যুদ্ধের সেনাপতি পড়িয়া গেলেন; উপায় কি হইবে?

অবশেষে যুবরাজ রাধামোহনের উদ্ধারর্থ কুঞ্জধনের সহিত আরও অধিকতর সৈন্য পাঠাইলেন। এদিকে সেনাপতি সংজ্ঞালাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি নবাগত সৈন্যসমূহকে লইয়া এরূপ বিক্রমের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন যে, অবিলম্বে —

"(পিদা দুবি সিজেল,)
রাধমন তিন রাজা জিদিল।"

রাধামোহন (মঘদেশ, খ্যয়ং রাজ্য এবং অক্সাদেশ) রাজত্রয়কে জয় করিলেন।

অনন্তর রাধামোহন অক্সাদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুরীদেশ আক্রমণ করিলেন। ইহার বর্তমান নাম কাঞ্চনপুর।

"কাঞ্চন রাজা লারেই ক্ষেমা দিল,
রাধামনে কাঞ্চন নগব জিদিল।"

কাঞ্চনপুররাজ যুদ্ধ করিলেন না, সুতরাং রাধামোহন অনায়াসেই কাঞ্চননগর জয় করিলেন।

তখন বলিলেন ঃ-

"ত্রবে জিদিলুং কাঞ্চন দেশ,
ফিরি উল্লা বেড়েংবৈ পূগর দেশ।"

'এখন কাঞ্চন দেশ জয় করিলাম, আবার পূর্বদেশ বেড়াইতে বাহির হইব।'

"পূগে আগে রেজ্য কালঞ্জর,
সে মুখ্যা রাধামন দিল লড়।"

পূর্বদিকে কালঞ্জর অর্থাৎ কুকিদেশ আছে রাধামোহন তদভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া—

"কালঞ্জর রাজা কিগল্ল,
পাথরী কিল্লা জুগাল্ল।"

কুকিরাজ কি করিলেন? প্রস্তর নির্মিত দুর্গে প্রস্তুত করিলেন।

পনর দিন ধরিয়া কুকিরাজার সহিত রাধামোহনের যুদ্ধ হয়; অবশেষে কুকিরাজ পরাজিত হন। দিগ্বিজয় ব্যাপার শেষ করিয়া, রাধামোহন যুবরাজ-সমীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন —

"সে সংবাদ শুনি কি গম্ম,
সিত্তুন বিজয়গিরি রাজা লড় দিল"

রাজা বিজয়গিরি সেই সংবাদ শুনিয়া (কালাবাঘ প্রদেশ হইতে) ছুটিলেন।

"(জাদি পূজাৎ দিলুং ঘি)
মোগল দেশৎ পলাক্কি।"

'মোগল দেশে অর্থাৎ চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চাক্‌মারাজ আসিতেছেন শুনিয়া মঘরাজা শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

"(গাজ - আগাৎ তদেগ্‌খুল)
লুম্যেগৈ রাজা সাপ্রেয়োয় কূল।"

(যুবরাজ বিজয়াগিরি একিবারে) সাপ্রেয়োয় কূলে (বক্ষদেশে) উপনীত হইলেন।

রাধামোহন সাপ্রেয়োয় কূলে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা জানাইলেন। বিজয়গিরি হৃষ্টান্তঃকরণে সেনাপতিকে বিদায় দিলেন। প্রায় বার বৎসরের পর রাধামোহন স্বীয় ভবনে উপস্থিত। ধনপতির গর্ভজাত পুত্র সারাবন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। পুত্রকে বক্ষে করিতে পাইয়া রাধামোহন আনন্দসাগরে ভাসিলেন। ধনপতিও বহুকাল পরে হৃদয়ের ধন হৃদয়ে পাইয়া হৃদয় জুড়াইয়া লইলেন।

রাধামোহনের স্বদেশযাত্রা

বিজয়গিরির দিগ্বিজয় যাত্রার কিছুকাল পরে বৃদ্ধ রাজা উদয়গিরি কালগ্রাসে পতিত হন। সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিলে পাছে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, এই ভয়ে কনিষ্ঠ সমরগিরি সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। রাধামোহন প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া রাজা সমরগিরি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাধামোহন রাজসকাশে সমাগত হইলে সমরগিরি তাঁহাব প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রথমেই জ্যেষ্ঠ সহোদরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধামোহন তদুত্তরে বিজয়গিরির উপদেশানুসারে বলিলেনঃ— 'তিনি আগামী অগ্রহায়ণ মাসে নিশ্চয়ই ফিরিবেন।' অনন্তর যুদ্ধের বিবরণ আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে বিজিত রাজ্যের বর্ণনা শেষ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

রাজা সমরগিরি

এদিকে বিজয়গিরি বিজিত রাজ্যের সুশৃঙ্খলাবিধান করিয়া কথিত অগ্রহায়ণ মাসে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কালবাঘা প্রদেশে আসিয়া শুনিলেন যে, অনেকদিন গত হইল, বৃদ্ধ রাজা লোকান্তর গমন করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ সহোদর সমরগিরি সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছেন। তখন তিনি খেদ সহাকারে বলিতে

বিজয়গিরির খেদ

লাগিলেনঃ—

"(গুলা খ্যেই নাই কুসুমে)
কি'দোলে জানেইদুং গুরা ভেইয়রে সালামে।"

কিরূপে গিয়া কনিষ্ঠ সহোদরকে সম্মান জানাইব।

"পবের্বায়া পণ্ডিত নেই যে দেশৎ
যেদং নয় সৈন্যগণ সেই দেশৎ।"

'যে দেশে শিক্ষিত পণ্ডিত নাই, হে সৈন্যগণ আর সেই দেশে যাইব না।

"যেই যেই সৈন্যগণ যেই যেই,
ফিরি যেই সাপ্পেরেয়য় কূলে ফিরি যেই।

'চল সৈন্যগণ সাপ্যেরেয়য়কূলে ফিরিয়া যাই।

এইরূপে বহু আক্ষেপ করিয়া বিজয়গিরি সাপ্পেরেয়য় কূলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় সৈন্যগণকে বিজিত দেশবাসীদের হইতে পত্নীগ্রহণে অনুমতি দিলেন এবং তিনি নিজেও অপেক্ষাকৃত উচ্চবংশ-সম্ভূতা রূপে গুণে বরণীয়া এক মহিলার পানি গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধর্ম ও আচারপদ্ধতি অবলম্বনে বনবাস আরম্ভ করিলেন।

ইতি চাটিগাঁছাড়া সমাপ্ত।

অবশিষ্ট "সৃষ্টি পত্তন", "স্বর্ণপালা" এবং "লক্ষ্মীচরিত্র" পালাও এই ভাবের কবিতাপুঞ্জ মাত্র। কল্পনার তাদৃশ পারিপাট্য না থাকায় এখানে তাহার উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করিলাম না। এতদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে নানা উপকথাও শুনা যায়, তৎসমুদয়ের 'কিম্ভুত কিমাকৃতিতে' আরব্য-পারস্যোপন্যাসও হার মানে অধিকাংশই রাজা বা রাজকন্যার রহস্য লইয়া অনুস্যূত, তাহার সহিত "রাক্ষসখোক্ষসের" বিবরণও বিরল নহে। দুঃখের বিষয় আলোচনার অভাবে ঐ সকল কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে! অমরলেখক বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় উপন্যাস প্রবাহে যে হিল্লোল তুলিয়াগিয়াছেন, সমাজ তাহারই আন্দোলনে আত্মহারা! বিচার-বিবেচনাহীন বালকের দল যুবক-যুবতীর সেই সব প্রেমগাথা পড়িতে পড়িতে অকালপক্ক হইয়া উঠিতেছে এখন আর ঠাকুরমার মুখের অনাবিল "আষাঢ়ে গল্পে" মনোযোগ যাইরে কেন? সেই কারণে হতাশ্বাস হইয়া এবং পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে এস্থলে "জামাই মারণী" এবং "গোমতী নদী"ব বিবরণ গর্ভ দুইটী মাত্র ঐতিহাসিক কাহিনী প্রদান করিতেছি, জানি না ইহারা পাঠকবর্গের কতদূর অনুগ্রহ লাভ করিবে।

"আক্‌করি[৩৬৮] এক রাজা এইল[৩৬৯] তাত্থুন[৩৭০] এক্‌কোয়া[৩৭১] খুব্ দোল[৩৭২] ঝি এইল্। তার দোল্ সম্বাদ্ দেজে[৩৭৩] দেজে রাষ্ট্র হোল্, আমাত্যসকল্ লগর[৩৭৪] গাভূর্[৩৭৫] গাভূর্ পোয়া-লগে[৩৭৬]

(৩৬৮) প্রাচীনকালে, (৩৬৯) ছিল, (৩৭০) তাহার নিকট, (৩৭১) একটী, (৩৭২) সুন্দর, (৩৭৩) দেশে, (৩৭৪)

তারে লভার্দ্যাই[৩৭৭] ছট্ফদি লাগিলাক্, পরে রাজা ঠিক্-গরি দিলদে[৩৭৮], একখান্ টারেঙ্[৩৭৯] মাদাত্তুন্[৩৮০] যে ঝাম্ দিনাই[৩৮১] — বড় গাঙৎ পড়ি নাই[৩৮২], সাজুরি নাই[৩৮৩] উকূলে পরে হই পারিব, তারে তা-ঝিয়োরে দিব। কদজনে[৩৮৪] ঝম্ দি দি মনাগ্[৩৮৫] পিজে[৩৮৬] এক দিন্যা এক রাজা-পোয়া এই নাই[৩৮৭], রাজা-ঝিবে পেবদ্যাই[৩৮৮], ঝাম্ দিদ চৈল[৩৮৯], রাজা তারে ছিন্যা[৩৯০] ঝাম্ দিবার নদিল, তার পর দিন্যা ঝাম্ দিবার কদা[৩৯১] হল্। রেঙ্গেৎ[৩৯২] ঝাম্ রাজা সপ্পনে দে'ল এক্কোয়া বুড়ী এই নাই, রাজারে বুদ্ধি শিগেই[৩৯৩] দিলদে, বুগৎ-পিদৎ ও দ্বিহাদৎ[৩৯৪] দ্বিবা বালোজ বানি[৩৯৫] দিজ, আর হাদৎ এক্কোয়া ছাদি[৩৯৬] ধরিনাই মিনি দিদ কোচ্[৩৯৭]। এই কই' নাই সেই বুড়া মিলাবোয়া[৩৯৮] অদেগা[৩৯৯] হোল্। বেইন্যা[৪০০] ঘুমত্তুন্ উদিনাই[৪০১] রাজা পোয়াবোয়া[৪০২] রাজা-কদাদগে[৪০৩] বালোজ বানি নাই ঝাম্ দিল। ঝাম দি নাই সাজুরি নাই বড়গাং পার হই নাই এইল্। রাজা খুজী[৪০৪] হই নাই, সেই রাজাপোয়াবোয়ারে তা' ঝিয়োরে দিল।"

জামাই মারণীর গল্প

এই উত্তুঙ্গশৃঙ্গ কালকুক্ষিতে বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন এই কাহিনী ঘুচিয়া যাইবার নয়। তাহাতে আবার বন্ধুবর সুকবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত মহোদয় কবির ভাষায় যে এই অপূর্ব্ব "প্রেমের সাধনা" বঙ্গভাষার দপ্তরে খতিয়া রাখিয়া (আলোচনা নামক মাসিক ৯ম সংখ্যা, ১৩১৫ দ্রষ্টব্য) তাহার স্থায়ীত্ব আরও দৃষ্ট করিযাছেন। আমরা তাহা হইতে অন্ততঃ শেষ শ্লোকটী এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথা —

"নাজানি এ কবের কথা কে কহিবে হায়,-
'জামাই মারা' পাহাড় যেরে
তেমনি ভাবে বিরাজ করে
নদী কিনারায়
জাগেগো কত ব্যাকুলতা তায়।"

এত্তে[৪০৫] এক বুর্য্যা। তে এদগ[৪০৬] আল্জি[৪০৭] যে, কলা তায়ৎ[৪০৮] এরেই[৪০৯] ন খায়। তাত্তুন[৪১০] দ্বিবা[৪১১] ঝি এলাগ[৪১২]। বুর্য্যা তারারদ্যায়[৪১৩] একখান জুন কাবি দিনাই[৪১৪] কিছু ন

অমাত্য সকলের, (৩৭৫) যুবক, (৩৭৬) পুত্রের সঙ্গে, (৩৭৭) লইবার অর্থাৎ বিবাহ করিবার জন্য, (৩৭৮) দিল যে, (৩৭৯) পর্যন্ত শৃঙ্গ;ইহা "জামাই মারণী" আখ্যায় কর্ণফুলী উত্তরতীরে সীতা পাহাড় ফরেষ্ট বিভাগের অন্তর্গত চিৎমরং নামক স্থানে উপরি উক্ত ঘটনা সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত।

(৩৮০) শীর্ষ হইতে, (৩৮১) ঝাঁপ দিয়া, (৩৮২) পড়িয়া (৩৮৩) সাঁতরিয়া (৩৮৪) কত জনে, (৩৮৫) মরিলো। (৩৮৬) শেষে (৩৮৭) আসিয়া (৩৮৮) পাওয়ার নিমিত্ত (৩৮৯) ঝাঁপ দিতে চাহিল, (৩৯০) সেই দিন, (৩৯১) কথা, (৩৯২) রাত্রিতে, (৩৯৩) শিখাইয়া (৩৯৪) বুকে পিঠে ও দুই হাতে, (৩৯৫) দুইটি বালস বাঁধিয়া, (৩৯৬) ছাতি (৩৯৭) কহিও, (৩৯৮) বৃদ্ধা স্ত্রী লোকটা (৩৯৯) অদৃশ্য (৪০০) প্রভাতে (৪০১) ঘুম হইতে উঠিয়া (৪০২) রাজপুত্রটা (৪০৩) রাজার কথামতে (৪০৪) খুসি। (৪০৫) অর্থ, (৪০৬) এত যে, (৪০৭) অলস, (৪০৮) পর্যন্ত, (৪০৯) বাকল ছাড়াইয়া (৪১০) তাহার (৪১১) নিকট দুইটা (৪১২) কন্যা ছিল (৪১৩) তাহাদের জন্য (৪১৪) দিয়া।

গত্ত[৪১৫]। একদিন কালবৈশাগী দিনৎ যগন তা' দ্বিবা ঝি জুমৎ ধান কুজিদাগ্[৪১৬] জেইয়ন্[৪১৭], বেল্[৪১৮] কদ্দুর জেইনাই[৪১৯] দেবা[৪২০] আঁধার্য্যা কোলা গল্লগৈ[৪২১], চের - কেইওাত্তুন[৪২২] ব[৪২৩] বেদ[৪২৪] লাগিল। তারা থেবা[৪২৫] জাগা নেই দেই নাই[৪২৬] কপাল বিনেই বিনেই[৪২৭] কান্দাগ্ লাগিলাগ। দাঙর্বোয়া[৪২৮] করদেয়[৪২৯], সাব্[৪৩০] হোগ বেঙ্ হোগ্, দ্য[৪৩১] হোগ্, দেবতা হোগ্, ভূত্ হোগ্ পেরেৎ হোগ্ রাজা হোগ্, রেইয়ৎ হোগ্, যে আমারে ইথ্যে[৪৩২] একখান্ ঘর তুলি দিব, মুইতার লোম[৪৩৩], সিয়ান[৪৩৪] শুনি (নাই এক্— কোয়া বড় সাবে) রাজভার্[৪৩৫] বোই নাই[৪৩৬], তারা দ্যায় একখান ঘর তুলি দিল। তারা দ্বি বোনতুন[৪৩৭] দাঙর বোন্ নোয়াই[৪৩৮] সে

গোমতী নদীর কথা

সাবেবায়ারে লল[৪৩৯]। তারা-বাবে[৪৪০], বুর্য্যায় সেই কদা[৪৪১] শুনি নাই সেই সাবোয়ারে কাবি ফেল্ল। তা-ঝি য়ে[৪৪২] কান্দে কান্দে চোগ-পানিয়ে[৪৪৩] ছরা জেই চাই[৪৪৪] সেই ছরা-পানিৎ ডুবিনাই মর্য্যে। সেই ছরান নাং[৪৪৫] গোমেদ গাং। তিবিরা রাজা পোয়ায়ই[৪৪৬] সাব-বেজ্[৪৪৭] ধরিনাই তারাদ্যায় বিলে ঘর তুলি দ্যে - গৈ[৪৪৮]।

২

প্রাচীন সাহিত্য ভাণ্ডারে "বারমাস" একটি আদরের সামগ্রী। কবির কবিত্ব ইহাতে একটি আদরের সামগ্রী। কবির কবিত্ব ইহাতে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিবার সুবিধা ছিল।

বারমাস

বারমাসের অবকাশও সুদীর্ঘ, এই অবসরে কবি মনের যাবতীয় পিপাসা মিটাইয়া লইতেন। সচরাচর নায়িকার মনোব্যথা লইয়াই ইহা গ্রথিত হইত; বঙ্গীয় ললনাগণ বারমাসের উপর্য্যুপরি লাঞ্ছনায় ঝালাপালা হইয়া মনের উচ্ছ্বাসে "বারমাস" জুড়িয়া দিতেন। এই সকল হিন্দু অবলার 'বারমাস' ও চাক্‌মা-সমাজে যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের নিজস্বও কম নহে। "কির্ব্বাবি'র বারমাস," "শেয্যোয়া কন্যার বারমাস", অন্যাবির বারমাস," "রঞ্জনমালার বারমাস," "কালিন্দী রানীর বারমাস" ইত্যাদি কতই আছে। তন্মধ্যে প্রথমখানি আমরা নিম্নে তুলিয়া দিলাম। পাঠক দেখিবেন, ইহার ভাষা যদিও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা নহে, কিন্তু তজ্জন্য যেন প্রভূত চেষ্টা হইয়াছে। মূল চাক্‌মা ভাষার তুলনায় ইহার ভাষা বহুপরিমাণে মাজ্জিত।

(৪১৫) আর কিছুই করিত না, (৪১৬) রোপণ করিতে, (৪১৭) গিয়াছিল (৪১৮) বেলা, (৪১৯) কতদূর গেলে (৪২০) দেবতা এখানে আকাশ, (৪২১) কাল অর্থাৎ ঘোর অন্ধকার করিল, (৪২২) চারিদিক হইতে, (৪২৩) বাতাস, (৪২৪) বহিতে, (৪২৫) থাকিবার, (৪২৬) দেখিয়া (৪২৭) করাঘাত করিতে, (৪২৮) বড়টী, (৪২৯) কহিল যে, (৪৩০) সর্প (৪৩১) দেব (৪৩২) এখন (৪৩৩) আমি তাহাকে লইব অর্থাৎ বিবাহ করিব, (৪৩৪) সেই কথা, (৪৩৫) বাঁশের ভার (৪৩৬) বহিয়া, (৪৩৭) দুই ভগ্নী হইতে, (৪৩৮) ভগ্নিটীই (৪৩৯) লইল অর্থাৎ বিবাহ করিল, (৪৪০) তাহাদের পিতা (৪৪১) কথা, (৪৪২) তাহার কন্যা, (৪৪৩) চক্ষের জলে, (৪৪৪) ছরা বহিয়া যাইয়া, (৪৪৫) ছরাটীর নাম, (৪৪৬) ত্রিপুরা রাজপুত্রই, (৪৪৭) সর্পের বেশ, (৪৪৮) দিয়াছিল।

যথাঃ- কিৰ্ব্বাবি' (কৃপাবিবি)র বারমাস।

কার্ত্তিক মাসেতে কিৰ্ব্বা বৃক্ষপত্র ঝরে।
ধৰ্ম্মফলে জন্ম হৈল সুন্দরী-বাপের[৪৪৯] ঘরে।।
পুত্রের সমান করি মায়ে বাপে পালে।
হেন দুঃখ দিল কিৰ্ব্বা শরীর-অন্তরে।।
হেন মতে পালে যেন কন্যা রত্নমালা।
দিনে দিনে বাড়ে যেন পূর্ণ চন্দ্রকলা।। ১।
আগ্রণ মাসেতে কিৰ্ব্বা কুরঙ্গ নয়ানী।
কান দু'টী বরুন তার ক্ষীণ মাজাখানি।।

....

চন্দ্রের সমান মুখ নাসিকা তিল ফুল।
দেখিতে সুন্দর (অঙ্গ) কন্যা রতনের মূল।।
খঞ্জন গমনে হাঁটে কিৰ্ব্বা চন্দ্রমুখী।
গৃধিনী সাবাশে কর্ণ ক্ষীণামাজাখানি।। ২।
পৌষ মাসেতে কিৰ্ব্বা শীতে পরে ধারে।
পূর্ণিমার চন্দ্র (যেন দিনে দিনে বাড়ে।।)
"আতুরা"[৪৫০] জন্মিল যদি লাক্‌মনের ঘর।
কিৰ্ব্বাবি'র মিলন (কথা শুন সৰ্ব্ব নর।।)
(খারি কারা নদী ছিল পূর্ব্বে, আর উত্তরে।)
দৈবযোগে গেল কিৰ্ব্বা সেই নদীকূলে।।
সেই দিন আতুরার সঙ্গে দরশন।
দুই জনে যুক্তি করি প্রবেশিল বন।। ৩।
মাঘ মাসেতে কিৰ্ব্বা মনে করি সার।

....

... কৌতুক করি দিল আলিঙ্গন।
দুইজনে যুক্তি করি প্রবেশিলা বন।।
কত দিন ভ্রমিয়া কন্যা জঙ্গল মাঝার।
ঘরেতে আসিল কন্যা লোকেতে প্রচার।।
আমুলুকে মিলি করি[৪৫১] যুক্তি করি সার।
বাড়াইয়া দিল কন্যা ঘরে আপনার।। ৪।
ফাল্গুন মাসেতে কিৰ্ব্বা ফাউ[৪৫২] খেলে দোলে।
ত্রিপুরাছরী দুয়ারে নিল সালিশ করিবারে।।
সভাতে বসিয়া কন্যা উঠিল দঢ়[৪৫৩] হইয়া।
জয় খিসা[৪৫৪] হুকুম দিল কন্যা দৈগে বিয়া।।

(৪৪৯) সুন্দরী নাম্মী যুবতীর পিতার, (৪৫০) অলস অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের আখ্যা, (৪৫১) মিলিত হইয়া, (৪৫২) হোলির উপকরণ আবির নামে খ্যাত, (৪৫৩) শক্ত, (৪৫৪) ব্যক্তি বিশেষের নাম।

সর্ব্বলোকে মিলি যদি বিয়া দেগৈ কোইল[৪৫৫]।
জয়চন্দ্র খিসা উঠি কিছু না বলিল।।
বহু মূল্য ধন দিয়া তুলি নিল বাপে।
রহিতে নপারে কিব্বর্া মনের অনুতাপে।। ৫।
চৈত্র মাসেতে কিব্বর্া রৌদ্রতে হরন[৪৫৬]।
বুঝাইতে নাহি পারে কন্যার পরণে।।
ভীম-সুত গলে দিয়া জলেতে গমন।
তবে সে পাইব আমি প্রভু দরশন।।
রামেরে হারাইল যদি সীতা মহাদেবী।
সেই মতে হারাইল কিব্বর্া গুণনিধি।। ৬।
বৈশাখ মাসেতে কিব্বর্া বৈসে তরুতলে।
ছাড়িবারে না পাইলুম প্রভুর মায়াজালে।।
রহিবারে না পাইলুম ভাইবন্ধু ঘরে।

.... ..

নিত্য নিত্য কৃষ্ণসুতে দহে রাত্রিদিন।
কেমনে ছাড়িয়া গেল কন্যা সুবদনে।।

(ত্রিপদী।)

অষ্টসীতা বলে পুনি, কোথা যাব সুবদনী
তত্ত্বকথা[৪৫৭] কহি শুন সার।
কন্যা বলে সুবদনী নিবেদন করি আমি
সত্য কথা কহি শুন আর।।
জ্ঞাতিবন্ধু ঘরে বৈলুম বহুদুঃখ মনে পাইলুম
শুন প্রভু করি নিবেদন।
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া অনলেতে প্রবেশিয়া
তবে প্রভু পাব দরশন।।
আদিচন্দ্র নিজচন্দ্র উলমস্থ চন্দ্র
গৌরচন্দ্র রোহিনী চন্দ্র করিমু যে পান।
কৃষ্ণসুতে সহিল উত্তর না দিয়া গেল
তবে পাইব প্রভুর উদ্দেশ
এত দুঃখ না সয় শরীরে
বালিসুতে জর জর কাঁদি আমি নিরন্তর
কোনমতে পাইমু প্রভু দরশনি।

(৪৫৫) কহিল, (৪৫৬) পরিশ্রান্ত, (৪৫৭) বিশ্বস্ত বাক্য।

অষ্টসীতা বসাইল নানা যুক্তি দেখাইল
সে অঞ্চলে কন্যা সুবদনী।।
কন্যা বলে অষ্টসীতা অষ্টাশিব মোব পিতা
ন কহিও কভু আত্ম
কন্যা কথা না কহিও অঙ্গে অনল জ্বলিও.
তবে (মোর) পিতা হবে বধভাগী।।

(পয়ার)

আঙু, পারজ্যা আর সীতা চরণে শ্বশুর।
বাড়াইয়া দিল কন্যা আর কতদূর।।
হেন মতে না কহিও তত্ত্বকথা সাব।
অবশ্য হইবে জান লোকেতে প্রচার।। ৭।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে কির্ব্বা পূরে মনোরথ।
অষ্টসীতা দেখাই দিল সেই নিজপথ।
সেই দিন গেল জান সেলচ্‌ছরী-থুমে[৪৫৮]
কতদিন রাখিল কন্যা তন্যাপারা লোকে।।
'পাজাচখা' নদী দিল নাক্‌ন নন্দিনী।
তার ঘরে গুপ্তবেশে রৈল (কন্যা) সুবদনী।।
কত দিনে তার পিতায়, করিল উদ্দেশ।
উদ্দেশ না পাইয়া আইল আপনার দেশ।। ৮।
আষাঢ় মাসেতে কির্ব্বা মনে নাহি সুখ।
কন্যা হইয়া পিতায় এত দিল দুখ।।
পুনর্ব্বার সেই কন্যা আতুরায় পাইল।
বিচিত্র তনয় যেন ... ভুঞ্জিল।।
আতুরায বলে শুন (প্রিয়া) এথায় কেনে আইলা।
ব্যাঘ্র ভয়ে আর তুমি কেন না ডরাইলা।।
কির্ব্বায় বলে ভক্তি আছে মোর মনে।
লাচারী প্রবন্ধে মুই দুঃখ বিবরণে।।

(ত্রিপদী।)

একেশ্বরী চলিলুম বহু দুঃখ পাইলুম
তারে কহিলাম বাণী
মোরে দুঃখ ডাকিছিল নানা যুক্তি ‘তবে দিল
তবে চলে সেই নিজ পথে।।

(৪৫৮) সেলচ্‌ছরী নাম্নী স্রোতস্বতীর উৎপত্তিস্থলে

জঙ্গল কানন ভ্রমিয়া ছাড়ি আইলুম নিজ'পরি রহিয়া)
সঙ্গে নাই কোন জন মোর।
দিল প্রভু আলিঙ্গনে সন্দে[৪৫৯] ছিল মোর মন
জুড়াই গেল অঙ্গ শরীর।।
পূর্ব্বফলে জন্ম হইলুম ধর্ম্মফলে তোরে পাইলুম
তবে মোর পূর্ণ হইল মনে।
তোমারে ছাড়িয়া আমি রাত্রি দিন কাঁদি আমি
নিদ্রাকালে দেখিলুম স্বপনে।
তুমি মোর নিজ বন্ধু তরাইবে ভবসিন্ধু
তবে তুমি হইও নিজ পতি।
আতুরায় বলে ... ...
গুণনিধি বিধাতায় মিলাইল আনি।
বাপে তোরে তুলি নিল বিধাতায় বিমুখিল
তোর লাগি অন্ন নাহি জানি।।
সীতা হারাইল রাম না পূরাল মনস্কাম
উদ্ধারিয়া নিজরানী লইল।
সেই মতে তোরে পাইল কামানলে দহিছিল
রাত্রিদিনে করি রাজ কেলি।।
সদায় আনন্দময়ে কৃষ্ণসুতে নিশি।
কির্ব্বায় বলে অষ্টসার ন পূরাইলাম পুনর্ব্বার
হারাইলে না পাইব ...।।

(পয়ার)

এই মতে আতুরায় নিজ কন্যা? পাইল।
শিশু পাইয়া ইন্দ্র যেন আনন্দ হইল।। ৯।
শ্রাবণ মাসেতে কির্ব্বা খালে নালে পানি[৪৬০]।
পূর্ব্বফলে বিধাতায় মিলাল যে আনি।।
দূর চাঁদ ধরা পাইল যেন সফল সরস্বতী।
হেন মতে পাইল আতুরায় কির্ব্বা গুণনিধি।।
বিভীষণে পাইল লঙ্কা রাবণার শেষে।
কন্যা লইয়া আতুরায় যাইব কোন দেশে।।
মুনি বাপ বুদ্ধি পাব তনু কর্‌ল্য ক্ষীণ।
ঠাগুরজ্যার ঘরে আনি রাখে কতদিন।। ১০।

(৪৫৯) সন্দেহ, (৪৬০) জল।

এই ভাদ্রমাসে কিব্বর্বা রূপে গুণে ধন্যা।
'বগাছরী থুমে' নিয়া রাখিলেক কন্যা।।
পুরুষের বেশ ধরি চলে কন্যা খালি।
হাঁটিতে না নড়ে পা খঞ্জনের মুখী।।
নিল দশ প্রিয়া লাগি আছে অঙ্গে।
দুই জনে চলি গেল বুড়াবুড়ী সঙ্গে।।
সুন্দর খঞ্জন কন্যা দুই চক্ষু লাল।
পুত্রবন্ধু ঘরে রাখিতে খাইল জঞ্জাল।। ১১।
আশ্বিন মাসেতে কিব্বর্বা পুষ্পবসে মেলা।
আতুরায় পাইল যেন চিকনিয়া কালা।।
যেবা গায় যেবা শুনে কিব্বর্বা - বারমাস।
পাপ ছাড়ি পুণ্য বৈকুণ্ঠে নিরাস।। ১২।। সমাপ্ত।।

এই বারমাসের একখানি মাত্র প্রাচীন হস্তলিপি আমি বহু যত্নে লাভ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে যথাসাধ্য পাঠোদ্ধার করিয়া উপরে প্রকাশিত হইল। উহার স্থানে স্থানে আমার দন্তস্ফুট হয় নাই, বহু প্রাচীন ব্যক্তিও হার মানিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকবর্গকে অধিক আর কি কৈফিয়ৎ দিব! অপর কথা মূল "বারমাস" খানি বর্ণাশুদ্ধিতে জর্জ্জরিত, তাহাতে পাঠকবর্গের অর্থোপলব্ধি করিবার যথেষ্ট ব্যাঘাত হইত। তাই আমি উদ্ধৃত করিবার কালে অধিকাংশ স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া লইয়াছি। তথাপি স্থানে স্থানে অর্থভেদ ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় লিপিকরের অনভিজ্ঞতার ফল। 'বারমাস' খানির ভাষা ও রচনাচাতুর্য্য বস্তুতই প্রণিধান যোগ্য। ইহা যে অপরাপর বাঙ্গলা বার মাসের অনুকরণে লিখিত ও আধুনিক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও বর্ত্তমানেরই অদূরবর্ত্তী এই কিব্বর্বার সুন্দরী, আতুরা, অষ্টসীতা বা জয়চন্দ্র খিসা ইত্যাদি কাহারও পরিচয় পাওয়া গেল না। 'বারমাস' খানির প্রতি পঙ্ক্তিতে চাক্‌মাদিগের জাতীয় কাহিনী নিহিত রহিয়াছে। কিরিবা বিবি ও আতুরার প্রেমাভিনয় চাক্‌মা সমাজে অদ্যাপি প্রায়শঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। পরিশেষে কবি তদীয় কাহিনীর গৌরব বাড়াইতেন —

"যেবা গায় যেবা শুনে কিব্বর্বার বারমাস।
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে নিবাস।।"

কথায় উপসংহার করিয়াছেন। বারমাস রচনায় ইহা এক নূতন আশ্বাস বটে!

৩

যখন আমাদের জ্ঞান নিতান্ত সঙ্কীর্ণ থাকে, সঙ্গীতের বিশ্বমিমোহিনী ক্রীড়া উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য জন্মে না, ততদিন যাবৎ এই ছড়া মাত্র সম্বল লইয়া আমরা প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ

পরিব্যক্ত করি। হায়! সেই ছড়া গাইতে গাইতে বা শুনিতে শুনিতে যে কি উদার আনন্দে আত্মহারা হইতাম, আর তাহা স্মরণ করিতেও প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে। সেই অতীত ও
ছড়া।[৪৬১] বর্ত্তমানে যেন — যুগযুগান্তর। আর, সেই 'অতীত সুখের দিনে — পুনঃ আর ডেকে এনে কি হইবে? ঐ দেখুন, বিমল কৌমুদী তলে দাঁড়াইয়া চাক্‌মাজননী সুকোমল হস্ত প্রসারণে ক্রোড়স্থ শিশুকে আকাশের চাঁদ আনিয়া দিতেছে, এবং সুর-লয় সহযোগে চন্দ্রের আবাহন করিতেছে,

"আয় চান্ এলাদে — মেলা দে,
ভাঙ্গা কূলা নোয়ান[৪৬২] দে।
গরুয়ে বিয়াইয়ে ধল ডেগা[৪৬৩],
ধল ডেগাবোয়া ন খায় দুধ।
লক্ষর মাথাৎ[৪৬৪] সোনার টুপ।।"

আবার কোথাও বা জননী সন্তানকে দোলাইয়া দোলাইয়া 'ঘুম পাড়ানিয়া' গাইতেছে —

"অলি — অলি — অলি,
বাঁশপাতার ঝলি[৪৬৫],
বুর্য্যা[৪৬৬] বাবা ঘুম যার[৪৬৭] সোনা-ধুলনৎ[৪৬৮] পড়ি"

" সোনা-ধুলনৎ রূপার দড়ি,
বুর্য্যা বাবা ঘুম যায় সোনা-ধুলনৎ পড়ি।' ২।

"হাদৎ লয়ে বাদোল বাঁশ[৪৬৯]।
কুয্যাৎ[৪৭০] লয়ে গুলি,
বুর্য্যা বাবা মারি আনি দিবগৈ বনর পাখী।"৩।
(খেলা দেওয়ার ছলে,—)
উন্দুরে গত্তন কজমজ[৪৭১],
বিলেই[৪৭২] আগে বই—
বুর্য্যা বাবা ঘুম যায় সোনার ধুলন লই।"৪।

(৪৬১) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যপ্রযুক্ত বঙ্গভাষার মূল্যবান ছড়া সমূহ কালের কুক্ষিতে লয় পাইতেছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশ করিয়া তৎসমুদয় রক্ষার এক আদর্শ ঝুড়ি উন্মুক্ত করি দেখাইযাছেন, তৎপ্রতি সাহিত্যসেবক মাত্রেরই কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনীয়। 'পরিষদের' অন্যতম হিতৈষী 'চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া'র সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদয় ও এজন্য ধন্যবাদের পাত্র।

(৪৬২) নয়খানা, (৪৬৩) সদা বাছুর; (৪৬৪) লক্ষ বাবার মাথা, (৪৬৫) বেড়া, (৪৬৬) বুড়া (স্নেহসূচক আহ্বান, (৪৬৭) যাইতেছে,, (৪৬৮) সুবর্ণ দোলনায, (৪৬৯) কামঠা, (৪৭০) কোচড়ে, (৪৭১) ইন্দুরে কিচিমিচি করিতেছে, (৪৭২) বিড়াল,

"আলু পাতা তালু রে
কুচ্ছ্যাল পাতা লং[৪৭৩],
যুবানালৈ যুবনি ন এচ্ছ্যলং।
ম্যাজাক্ ছ-গুণে[৪৭৪] ঘুঁৎ খাঁ গরতন্দে,
নয়ন ঘর ভিদিয়ে[৪৭৫] ভালুক কেশ,
এসয়ে বাপমা চলয়ে দেশ।" ৫।

(আবার ক্রন্দনের সান্ত্বনায় —)

"এ কূলে কলাগাছ, ওকূলে ছরা,
পরণ্যো বাবা[৪৭৬] ন কানিজ্[৪৭৭] ভাঙির গলা।"৬।
বাবা বুর্য্যা ন কানিজ তুই,
বাঙালে[৪৭৮] কলা মলা আন্নে
লৈ দিম্বে[৪৭৯] মুই।"৭।

"দারু[৪৮০] তুলি জারী ফুল[৪৮১],
ন কানিজ্ বাবুধন
রেঙ্গুন স'রথুন[৪৮২] ত-বারে[৪৮৩] আনি দিব নারিকুল[৪৮৪]"।৮।

"হাদৎ লয়ে বাদোল বাঁশ
কুশৎ লয়ে ম্যাং[৪৮৫]
বুর্য্যা বাবা ন কানিজ্ অলি জাগি দ্যাং[৪৮৬]।" ৯।

(ক্রন্দন থামিতেছে না দেখিয়া ভীতিমিশ্রিত স্নেহ —)

"জাদু ঘুম যারে তুই,
পুরাণ কাল্যা[৪৮৭] হস্তী এচ্ছে[৪৮৮]
মাতাই আইয়ম্[৪৮৯] মুই,
জাদু ঘুম যাবে তুই।" ১০।

(৪৭৩) ইক্ষুপাতা লম্বা, (৪৭৪) শাবক সকলে, (৪৭৫) ভেদ করিয়া, (৪৭৬) প্রাণের বাপ্পধন, (৪৭৭) কাঁদেস্ না, (৪৭৮) বাঙ্গালী (ব্যবসায়ীরা), (৪৭৯) লইয়া (ক্রয় করিয়া) দিব, (৪৮০) ঔষধ, (৪৮১) বৈদ্যক-দ্রব্য, (৪৮২) সহর হইতে, (৪৮৩) ভোরবাপরে, (৪৮৪) নারিকেল, (৪৮৫) গুলি, (৪৮৬) ডাকিয়া দিতেছি, (৪৮৭) প্রাচীন কালের, (৪৮৮) আসিয়াছে, (৪৮৯) সাক্ষাৎ করিয়া আসি

"ঘরর পিছে[৪৯০] লাল খাগরা[৪৯১]
মাথার মুথুর্ করে
হাল্যা ঘরের[৪৯২] কাল্যা কুর্ত্তা[৪৯৩]
কেমন কেমন করে।
জাদু ঘুম যারে তুই।" ১১। ইত্যাদি।

আবার কোথায়ও বা চাক্‌মা - ছেলের দল 'বৃষ্টি প্রার্থনা' করিতেছেঃ-

"দেশরে দেবা[৪৯৪] দেরে ঝড়[৪৯৫],
গাজর আসায় আগায়[৪৯৬] পানি গর[৪৯৭]।
কলা কাবি[৪৯৮] গর দে,
মামু[৪৯৯] দেবায় ঝড় দে।।"

এ সব ছাড়া ছেলে-মেয়েদের অর্থহীন "বিহুতি কথা" ও যথেষ্ট। নমুনা যথাঃ-

"পদ্মাবতী চরণে
আমা - বুর্য্যা মরণে,
ধনে তলইবা[৫০০] রাখইয়া[৫০১] নেই;

জোগরা[৫০২] কুম্মোয়া[৫০৩] খেইয়া নেই;
রাজা-পোয়া[৫০৪] মর্য্যন দে[৫০৫] কানাহয়া[৫০৬] নেই;
শণফুল ফুট্যন্‌দে[৫০৭] তোলইয়া[৫০৮] নেই।" ১।
"চল খুৎ খুৎ চল মুঝি[৫০৯],
চল্ কূলা লে[৫১০] বেড়াল্লে[৫১১] মুঝি;
কাপড় চোপড় ভুড়ি[৫১২] বান[৫১৩],
ও' মানিক চাঁন ধদুপ[৫১৪] আন।" ২।
"দিম্ দিম[৫১৫] বিয়ালে[৫১৬],
না ক্কোয়া[৫১৭] নিল শ্যিয়ালে[৫১৮],

(৪৯০) গৃহের পশ্চাতে, (৪৯১) জঙ্গল তৃণ বিশেষ, (৪৯২) চাষার ঘরের, (৪৯৩) কালা কুকুর, (৪৯৪) দেবতা (এখানে আকাশ), (৪৯৫) বৃষ্টি, (৪৯৬) বৃক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, (৪৯৭) জল কর, (৪৯৮) কাটিয়া, (৪৯৯) মাতুল, (৫০০) ধান শুষ্ক করিবার চ্যাঙ বিশেষ, (৫০১) রক্ষা করিবার। (৫০২) মদ বিশেষ, (৫০৩) মদের কলসী, (৫০৪) রাজ পুত্র, (৫০৫) মরিয়াছে যে, (৫০৬) কাঁদিবার লোক, (৫০৭) ফুটিয়াছে, (৫০৮) তুলিবার লোক, (৫০৯) মায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী, (৫১০) (চাউলাদি ঝাড়িবার) কুলা লইয়া, (৫১১) বেড়াই গিয়া, (৫১২) পুট্‌লী, (৫১৩) বাঁধ, (৫১৪) বাদ্য যন্ত্র বিশেষ, (৫১৫) দিব, (৫১৬) বৈকালে, (৫১৭) নাকটী, (৫১৮) শৃগালে

সে নাক্কোয়া কদক দূর[৫১৯],
বড় গাং কূলর[৫২০] দগিন কূল[৫২১],
দগিন কূলং 'অরা' বাঁশ,
ঘর তুলি[৫২২] দিম্ আগন মাস[৫২৩];
আগন মাসর 'করকড়ি' বেঙ্,
বাবনা[৫২৪] নিল গরুর ঠেং।" ৩।

তেং তেয়রীর "গান" ঃ-

"তেং তেয়রি তেং তেয়রি[৫২৫],
বাড়া বান[৫২৬];
কার্য্যা চোলর[৫২৭] ভাত দ্বিবা[৫২৮] রান[৫২৯]।
রাম্থে রাম্থে[৫৩০] চাম্পাফুল,
চাম্পা মত পড়ে,
দাদা ভুজি[৫৩১] ঘরৎ[৫৩২] নেই
সোনার নাথেঙা[৫৩৩] জ্বলে।

ভুজি যিয়ে[৫৩৪] ভাত চরা[৫৩৫],
দাদা যিয়ে মঘপাড়া;
দাদার মোগর[৫৩৬] দীঘল চুল,
বান্থে বান্থে চাম্পাফুল;
চাম্পাফুলর তলে,
দ্বিবা[৫৩৭] হরিণ লড়ে;
হরিণ নয় চোঙরা[৫৩৮],
চোখর পাতা[৫৩৯] ভোমরা।" ৪।

এই গেল শিশু বা বালককালের কৌতুকলহরী। ইহার সঙ্গে কর্ম্মীদিগের একটি কর্ম্ম-সঙ্গীতের নমুনাও প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই ছড়াটি পাহাড়ী জুমিয়াদের বিশেষতঃ যাহারা "কাট্টন" করে অর্থাৎ কাঠ বা নৌকা কাটে, তাহাদিগের প্রায় নিত্য প্রয়োজনে আইসে। গাছ টানিতে ও তুলিতে সুরলয় যোগে ইহার আবৃত্তিতে বড়ই জোর পাওয়া যায় ইহা একদিকে যেমন উৎসাহ বৃদ্ধি করে, অপর দিকে তেমনই সুরলয়ে সকলেরই বল যুগপৎ নিযন্ত্রিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই ছড়ায়

"কাট্টনের ডাক"

(৫১৯) কতদূর, (৫২০) নদীতীরের, (৫২১) দক্ষিণ পাড়, (৫২২) ঘর উঠাইয়া, (৫২৩) অগ্রহায়ণ মাস, (৫২৪) ব্রাহ্মণে, (৫২৫) তেং তেয়রী কীট বিশেষ, (৫২৬) ধানভান, (৫২৭) ছাটা চাউলের, (৫২৮) দুইটী, (৫২৯) রন্ধন কর, (৫৩০) রাঁধিতে রাঁধিতে, (৫৩১) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, (৫৩২) ঘরে, (৫৩৩) কর্ণাভরণ বিশেষ। (৫৩৪) গিয়াছে, (৫৩৫) ভাত চড়াইতে, (৫৩৬) স্ত্রীর, (৫৩৭) দুইটী, (৫৩৮) বড় হরিণ, (৫৩৯) চোখের পাতা।

সহজেই অল্পবলে অধিক কাজ আদায় করা চলে। ইহাতে দলপতি দলের সকলকে সাবধানপূর্ব্বক উত্তেজিত করিয়া "ডাক" বলিতে থাকে, আর তাহারা একযোগে প্রত্যেক ডাকের সঙ্গে সঙ্গে "হেইয়া" "হেইয়া" বলিতে বলিতে বল প্রয়োগ করে। যথা;—

দলপতি — "ধর্‌রে ধর, বাবা সকল, ভাইয়া সকল,
ধর্‌রে দর — জোর করিয়া সমান করিয়া"

দলপতি	— "মারে মা!"	দলের অপরেরা —	"হেইয়া"
"	তোর পুতে ডাকে শুন্‌ছ না?	"	"
"	শুনিয়া পুত করিম্‌ কি ?	"	"
"	ধীরে ধীরে চলেছি!	"	"
"	চল সুন্দরী হাতের তাড়[৫৪০]	"	"
"	জাঙাল বাইয়া[৫৪১] বন্ধুয়া যার	"	"
	* * *		
"	লাজপায়লি[৫৪২] বাজারৎ[৫৪৩] ঘর	"	"
"	একদিন গম যাই[৫৪৪] দু'দিন জ্বর	"	"
"	চল সুন্দরী করি মন	"	"
"	আমরা খাইতাম সাউধের[৫৪৫] ধন	"	"
"	আল্লার বরে নবির বরে	"	"
"	সাতালি পর্ব্বত জক্‌ৎ লড়ে।	"	"
"	ডাক শুনাইতে আন্‌লাম্‌ গাভুর	"	"
	* * *		
"	আনলাম্‌ গাভুর বাছি বাছি	"	"
"	ছিঁড়ি ফেলিদে লোহার কাছি[৫৪৬]	"	"
"	লোহার কাছি ন ধরে টান	"	"
"	আলঙর কাছি[৫৪৭] পাকাইয়া আন।	"	"
"	জোরের জঙ্গী[৫৪৮]	"	"
"	মাথায় ভঙ্গী[৫৪৯]	"	"
"	ভঙ্গীর লাজে	"	"
"	ঘুম না আইসে ফাউঝা বাসে[৫৫০]	"	"
"	বীর হনুমান!	"	"

(৫৪০) হস্তাভরণ বিশেষ, (৫৪১) রাস্তা বাহিয়া, (৫৪২) লজ্জাবতী, (৫৪৩) বাজারে, (৫৪৪) সুস্থ থাকিয়া (৫৪৫) সদাগরের, (৫৪৬) রজ্জু, (৫৪৭) মোটা দড়ী, (৫৪৮) সিপাহী, (৫৪৯) পাগড়ী, (৫৫০) দুর্গন্ধে,

” হনুর বেটা[৫৫১] ভানুর নাম ” ”
” খারু[৫৫২] গড়াইদে[৫৫৩] নাইয়র[৫৫৪] যাম্ ” ”
” খারু বেচি[৫৫৫] লাড়ু খাম্ ” ”
” লাড়ু লইয়া সহরৎ[৫৫৬] যাম্। ” ”
” জোরের কাম, ” ”
” পড়ের[৫৫৭] ঘাম ” ”
” ঘামের ঘুম ” ”
” সুন্দরীর মুখে কে দিল চুম? ” ”
” রস্যার মুখে কে দিল চুম? ” ”
” হায়রে হায়! ” ”
” হায় বোলায়!! ” ”
” গা ঢুলাইয়া হায় বোলায় !!! ” ইত্যাদি।

৪

'হেঁয়ালী' চাক্‌মা সংজ্ঞায় 'বানা'

এ সকল ছড়ায় কৌতুক আছে, উদার আনন্দ আছে, অধিকন্তু ললিত শব্দ বিন্যাসে কতকগুলি খাপছাড়া ভাবও গ্রথিত আছে। ইহাতে ভাবুক বা বুদ্ধিমান পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন কি না, বলা যায় না। যাহা জলের মত গেলা যায়, বুদ্ধিমান সমাজে তাহার আদর কোথায়? বুঝি বুঝি করিয়াও বুঝি না, বুঝিত বুঝাইতে পারি না, — এরূপ না হইলে কি আর ভাব বলা যায়? বস্তুতঃ ভাব হৃদয়ে অনুভব করিবার বিষয়, ভাষায় প্রকাশিত হইতে পরিলে তাহার গৌরব কমিয়াই যায় বটে। তাই বলিতে ছিলাম, ছড়া — 'বুদ্ধিমানের জন্য নহে, উহা নেহাৎ "ছেলে ভুলানো" তবে যে "কাট্টলের ডাক"কেও ছড়ার কৌটায় রাখিয়াছি, সে কেবল কবিত্বের অভাবে। আর যখন বালক-বালিকাদের মস্তিস্ক পরিচালনার ক্ষমতা জন্মে খেল ও কৌতুকের ভিতর দিয়া তাহাদিগেব বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ করিতে এক প্রকারেব কবিতা আছে, সে গুলিকে আমরা 'হেঁয়ালি' বলি। চাক্‌মা দিগের প্রচলিত সংজ্ঞা "বা—না।" এই হেঁয়ালী বা "বা—না" তে শব্দ লালিত্য এবং সরল আনন্দোচ্ছ্বাসও আছে, অথচ বুদ্ধি র জটিলতা ও ভাবের বাঁধুনিও রহিয়াছে। কিন্তু হায়! এ গুলি সংরক্ষণের প্রতি শিক্ষিত সমাজের আসক্তি এত সামান্য যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ নগণ্য হইলেও এই সমুদয় প্রাচীন টোটকা টুট্‌কো উপেক্ষার জিনিষ নহে।

(৫৫১) বেটা অর্থাৎ পুত্র, কিন্তু ইহাতে ভানুকে হনুর বেটা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত 'ডাক' রচয়িতাকে দোষী করা আমরা সমীচীন বোধ করি না। সম্ভবত নিরক্ষর শাস্ত্রানভিজ্ঞ 'ডাক' কথকেরা ভানুর বেটা হনুকে হনুর বেটা ভানু করিয়া ফেলিয়াছে। (৫৫২) গহনা, (৫৫৩) গড়িয়া দাও, (৫৫৪) বেড়াইতে, (৫৫৫) বিক্রয় করিয়া, (৫৫৬) সহরে, (৫৫৭) পড়িতেছে।

চট্টগ্রামে প্রচলিত অনেক হেঁয়ালী ইহাদিগের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। সেগুলি বাছিয়া ফেলিলেও মূল চাক্‌মা 'বানা'র সংখ্যা কম নহে। পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে এখানে চাক্‌মা-সমাজ প্রচলিত ২৬ টি মাত্র "বানা" রক্ষা করা গেল। জাতীয় প্রত্যেক অঙ্গের পরিচয় প্রদানই আমার বিশেষ লক্ষ্য। —

"উয়রে মালা তলে মালা,
থগ্‌দি থগ্‌দি হাঁদে ভালা"১।

১। উপরেও মালা, নীচেও মালা অর্থাৎ দুই দিকেই শক্ত খোলা, থাকিয়া থাকিয়া হাঁটিতে বেশ — ভাল দেখায়।
উত্তর ঃ কচ্ছপ

"ফল্যাং কাল্যা জীরা,
উদিল ছদরক পা,
ফুদিল মালতি ফুল,
ধর্‌ল্য করঙা" ২।

২। কৃষ্ণজীরা ফেলিলাম, গাঁদা ফুলের গাছ উঠিল, মালতীফুল ফুটিল, কামরাঙা ধরিল।
উত্তর ঃ তিল।

"গাং কূলে কূলে বড়ই গাছ,
লড়ে চড়ে ন পড়ে।" ৩।

৩। নদীর তীরে তীরে কূল গাছ, নড়েচড়ে পড়ে না।
উত্তর ঃ পক্ষ্ম অর্থাৎ চক্ষুলোম।

"দশ ভাইয়ে লড়াই ধরে,
দুই ভাইয়ে মারে"। ৪।

৪। (দশভাইয়ে দৌড়াইয়া ধরে) দুই ভাইয়ে মিলিয়া মারে।
উত্তর ঃ উকুন অন্বেষণ ও মারা।

"পাঁচ ভাইয়ে তুলে
বত্রিশ ভাইয়ে ভিড়ে'
এক ভাইয়ে ঠেলা মারলে
দৈর্য্যামুরৎ পড়ে"। ৫।

৫। পাঁচভাই তুলিয়া ধরে, বত্রিশ ভাই মিলিয়া করে, অন্য এক ভাই ঠেলা মারিলে সমুদ্র গর্ভে পড়ে।
উত্তর ঃ ভাত খাওয়া।

"বাবু সান্যা বজে,
চলা সান্যা বাজে,
বাঘ সান্যা লাফ মারে,
পাত্র সান্যা ডুবে"। ৬।

৬। বাবুর মত বসে, কাঠ বিড়ালের ন্যায় ডাকে, বাঘের মত লাফ দেয়, পাত্র অর্থাৎ আধারের ন্যায় ডুবে।
উত্তর ঃ ভেক্

"ইঁজর-মাদাৎ খের-কুর
মেলি চেলে চাম্পা ফুল"। ৭।

৭। "ইঁজরের" মাথায় খড়ের গাদা খুলিয়া দেখিলে চাঁপা ফুল।
উত্তর ঃ কাঁঠাল

"আগজে ঝিলিমিলি
পাতালে লেজ,
কন্ খাদায় বানাই দিয়ে
কালিকল্‌জ্যায় কেজ্"। ৮।

৮। আকাশে ঝিলমিল করে, পাতালে জে, কোন ইশ্বরে হৃদপিণ্ডে কেশ করিয়া দিয়াছে।
উত্তর ঃ আম।

"কাজালক্কে ভেক্‌ভেক্যা,
পাগিলে সিন্দুর
যে ভাঙিৎ ন পারে,
তে গুত্তি সুদ্দা উন্দুর"। ৯।

"মাথাৎ খড়া, টিকিনিৎ চুল,
দশ ঠেং আগে —
তিন লেঙুর"। ১০।

"একূলে ধুম্‌ধাম
ও কূলে বিয়া,
ভাঙা নারিকুল জোড়া দিয়া"। ১১।

"আট হাত ষোল আঁদু,
মাচমারা যিয়ে সাধু,
চুভুনা খালৎ ফেল্যুং জাল,
মাচ মারতে পরাণ যার"। ১২।

"হেদ নয় ঘোরাও নয়,
ফিরে পাকে পাকে,
সুন্দর পুরুষ নয়,
থাগে ত্রি-লগে।"১৩।

"লোহারে লোহা,
লোহারে ধরল্য ঘুনে
স্বর্গপুরে আগুন লাগ্যে
মারি দিব কনে?" ১৪।

ধরিৎ নপারে, বেতাগী কাঁদা"। ১৫।

"হিলৎ বিলৎ পানি নেই
গাজর আগাৎ কূয়া"। ১৬।

"এক হাত গাচ্ছোয়া
ফুল ফুদে পাঁচ্চোয়া"। ১৭।

"এক পাতায় বুড়া হয়।" ১৮।

৯। কাঁচা সময়ে নরম, পাকিলে সিন্দুর, যে ইহা কি বলিতে না পারে, তাহারা সগোষ্ঠি ইঁদুর।
উত্তর ঃ মেটে পাতিল।

১০। মাথায় খড়া, টিকিতে চুল, দশ পা এবং তিন খানি লেজ আছে।
উত্তর ঃ চিংড়িমাছ

১১। ভাঙা নারিকেল জোড়া দিয়া — এই কূলে ধুম ধাম ঐকুলে বিবাহ।
উত্তর ঃ বন্দুক

১২। আট হাত, ষোল হাঁটু সাধু মাছ মরতে গিয়াছে, শুকনা খালে জাল ফেলিলাম, মাছ মারিতে প্রাণ বাহিরায়।
উত্তর ঃ মাকড়সা

১৩। হাতীও নয়, ঘোড়াও নয়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে, সুন্দর পুরুষও নহে, অথচ স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে।
উত্তর ঃ চরকা

১৪। লৌহরে লৌহ, লৌহকে ঘুনে ধরিল স্বর্গপুরীতে আগুন লাগিয়াছে, কে নিভাইয়া দিবে?
উত্তর ঃ রৌদ্র

১৫। হলদে ফুল, চন্দনের মালা, বেতস কাঁটা প্রযুক্ত ধরিতে পারা যায় না।
উত্তর ঃ মৌচাক

১৬। খাল বিল (কোথায়ও) জল নাই, গাছের আগায় কূয়া।
উত্তর ঃ নারিকেল

১৭। এক হাত লম্বা গাছ, পাঁচটী ফুল ফুটে।
উত্তর ঃ হস্ত

১৮। এক পাতাতেই (গাছ) বুড়া হইয়া থাকে।
উত্তর ঃ ওল।

"বড় কল্‌গৎ সূতা ফুদে"। ১৯।

"খায়দে গুলার বদু নেই"। ২০।

"দুই ভাইয়ে লড়ালড়ি"। ২১।

"আগা কাবিলে গরা মরে।" ২২।

"তগায়, পেলে ন আনে"। ২৩।

"পরাণ নেই, মানুষ গিলে"। ২৪।

"চাল আগে, তলা নেই,
পঁঝা থবার জাগা নেই"। ২৫।

"চালর উয়র শ্যিয়াল ছা,
কিজাক্‌ কিজাক্‌ করে রা"। ২৬।

১৯। বৃহৎ পবর্বত গাত্রে সুতা ফুটে।
উত্তর ঃ তারা

২০। এমন কোন ভয্যফল, যার বোঁটা নাই।
উত্তর ঃ ডিম

২১। দুই ভাই মিলিয়া যুঝাযুঝি করে।
উত্তব ঃ মানুষের হাঁটা

২২। অগ্রভাগ কাটিলে বা বাঁধিয়া রাখিলে গোঁড়াও মরিয়া য'য়
উত্তর ঃ খাল

২৩। তালাস করে, পাইলে আনেনা।।
উত্তর ঃ পথ

২৪। প্রাণ নাই, (অথচ) মানুষ গ্রাস করে।
উত্তর ঃ কোর্ত্তা

২৫। চাল আছে, তলা নাই বোঝা রাখিবার জায়গাও নাই।
উত্তর ঃ ছাতি

২৬। চালের উপর শৃগাল শাবক, কিরকম শব্দ করে।
উত্তর ঃ মেঘ গর্জ্জন

বিংশ পরিচ্ছেদ

(১) ক্রীড়া, — (২) কৌতুক (— নাচ, বাজীপোড়ান প্রভৃতি)
(৩) বাদ্য ও (৪) সঙ্গীত।

১

আধুনিক সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় ক্রীড়াগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। তৎপরিবর্তে কেবল যে বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া যাইতেছে এমন নহে, তদ্দ্বারা জাতীয় বলবীর্যও যথেষ্টরূপে রক্ষা পাইতেছে না। কারণ, প্রাকৃতিক শক্তির অনুকূলে গতি পরিচালিত করিতে পারিলে যেমন সফলকাম হওয়া যায়; প্রতিকূলাচরণে তেমনি অনিষ্টের সম্ভাবনা! শীতপ্রধান দেশোচিত ক্রীড়াসেবায় আমাদের উপকারের আশা যত, অপকারভীতি ততোধিক। আর দেশীয় ক্রীড়াগুলিতে কাণাকড়িটিও খরচ নাই, অথচ প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করা চলে; কিন্তু সভ্যতার চাকচিক্য নাই বলিয়া তৎসমুদায় অধুনাঅবজ্ঞাত হইতেছে! "চট্টগ্রামাদি সভ্যতাবিরল দেশে" অদ্যাপি পল্লীগ্রামের নিভৃত অন্তরালে সেই সব প্রাচীন ক্রীড়া রাজত্ব করিতেছে দেখিয়া, দূর হইতে সেই "সভ্যতা"কে নমস্কার করিতে ইচ্ছা যায়! কিন্তু সমাজ কি আর আমাদের নিষেধে কর্ণপাত করিবে? অনুচীকির্ষু যে আমরা, ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য কোথায়? জানি না, ভগবান এই হতভাগ্যদিগের প্রতি কবে কৃপা-কটাক্ষপাত করিবেন।

ক্রীড়া

যাহা হউক এই পার্বতীয়দিগের মধ্যে প্রাচীন ক্রীড়াগুলির যথেষ্ট সম্মান আছে। রাঙামাটিবাসী ছাত্রগণ ব্যতিরেকে কেহই তথাকথিত 'সভ্য খেলা' গুলির আশ্রয় পায় না। সুতরাং অনন্যোপায়েই হউক, তাহাদের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। চাক্‌মাদের ক্রীড়াগুলির মধ্যে কয়টি আমাদিগের অনুকৃত, কোনটি বা সামান্য রূপান্তরিত এবং কোন কোন "খারা" আবার এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ক্রীড়াগুলিকে মোটামুটি তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শিশুক্রীড়া, — ইহাতে মন ও শরীরের বিশেষ কোন চালনা থাকে না, কেবল অনাবিল আনন্দমাত্র লাভ হয়। বলাধানের সহিত স্ফূর্তির নিমিত্ত বালক এবং কিশোরগণ দ্বিতীয় প্রকারের ক্রীড়াগুলি গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, এইগুলি কিছু শক্তিসাপেক্ষ। পূর্বকালে এ সকল "খারা"য় যুবক এবং প্রৌঢ়ের দলও যোগদান করিত; এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। তাহার বিশেষ, কারণ, — সেকালে জীবনযাত্রা এত দুর্বহ ছিল না; কঠোর সাংসারিক চিন্তায় এক্ষণে তাহাদের সে সুখ উৎসন্ন গিয়াছে। ৮। ৯ বৎসরের শিশুসন্তান গুলিতে পর্যন্ত আর সেরূপ বালসুলভ মাধুরিমা খেলিতে দেখা যায় না, যেন

পুরাতনের আদর

সকলেই "অন্নচিন্তাচমৎকারা"! দারুণ ভবিষৎভয়ে কাতর ও সন্ত্রস্ত! তৃতীয় শ্রেণীতে যে সমুদয় ক্রীড়াকে ভুক্ত করা যায়, তাহাতে বুদ্ধি-বৃত্তিই মার্জিত হইয়া থাকে; শরীরের কোন ব্যায়াম হয় না।

শিশুক্রীড়া বহু বধ, তন্মধ্যে কেবল দুইটিমাত্র এস্থলে উল্লেখিত হইতেছে।

যথা ঃ—

(ক) "ইজিবিজি খারা"য় কতিপয় শিশু মণ্ডলাকারে বসে এবং তাহাদের হাতগুলি সন্মুখে বিন্যস্ত করে। দলের সেয়ানা শিশু —

"ইজি — বিজি — কার্‌মা — বিজি —
মইচ্‌ — চরে — ঘোড়া চরে —
সাধু — বইয়ে — কদু — রান —
বার্গি — উত্তান — মনোরাম —
এর্গা — দের্গা — রাজা — বাবু —
কৈয়েদে — শুধা — হাওান — নেজা" —

বলিতে বলিতে প্রত্যেক শব্দের সহিত যথাক্রমে এক একজনের হাত স্পর্শ করিতে থাকে। এইরূপে চক্রাকারে হাত ঘুরাইয়া বিন্যস্ত হস্ত সমুদয় স্পর্শ করিতে করিতে যে হাতে শেষোক্ত "নজা" শব্দটি উচ্চারিত হয়, সেই হাত তখনই উঠাইয়া লওয়া হয়। অনন্তর পুনরায় এবংবিধ প্রক্রিয়ার আবৃত্তি চলিতে থাকে। সর্বশেষে যাহার হাতখানি অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই পরাজিত সাব্যস্ত করা হয়।

(খ) "কভাজাং খারা"য় দুই বা ততোধিক শিশু পরস্পরের হস্তপৃষ্ঠ-চর্মাকর্ষণে ধীরে ধীরে আন্দোলন করিতে করিতে —

"কভাজাং — কভাজাং
মইনর — উয়য়, বা — যাং
এক্যোয়া বদা খোলা গরি খাং"

বলিয়া হঠাৎ প্রত্যেকে স্ব স্ব হস্ত সবলে আকর্ষণ করতঃ করতালুতে আপনাপন মুখ নির্গত শব্দে বাধা দিতে দিতে "আবা" "আবা" করিতে থাকে। ইহাতে কোন জায়পরাজয়ের প্রতিযোগিতা নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রীড়া সমুদয়কে আবার দ্বিবিধ পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। তাহার প্রথম পর্যায়ে কেবল সরল অপোগন্ড বালকগণ মাত্র থাকে; দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহাদিগহইতেবয়োবৃদ্ধ

দল অর্থাৎ কিশোর-যুবকগণই অধিকাংশরূপে যোগদান করে। বালকের খেলা যেমন ঃ—

(ক) "পলাপলি খারা"। ইহা লুকোচুরি ক্রীড়ারই নামান্তর মাত্র। বালকগণ সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একদল কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বেচ্ছানুরূপ সুবিধায় লুকাইয়া থাকে। অপর দলপতি জিজ্ঞাসা করে, — "তোমরা সকলে পলাইয়াছ;এখন আমরা খুঁজিতে পারি?" ইহাতে কোনও উত্তর পাওয়া না গেলে, বুঝিতে হইবে — "মৌনাং সম্মতি লক্ষণং"। তখন তাহারা সোৎসাহে বিরুদ্ধদলকে খুঁজিতে আরম্ভ করে। যদি কাহাকেও তালাস করিয়া না পাওয়া যায়, ধৃত সকলে অন্বেষণকারী দলকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিলে 'কি হারাইবে' স্বীকার করাইয়া তবে বলিয়া দেয়। পক্ষান্তরে তাহারা এক "পির" হারিয়া যায়।

(খ) "পুৎপুৎ খারা"। ইহা জলক্রীড়া বিশেষ। আনাভি জলে সকলে দাঁড়াইয়া, তাহাদের মধ্যে একজনে সকলেরই সম্মুখে কোন ভাসমান বস্তু খণ্ড ডুবাইয়া আচম্বিতে ছাড়িয়া দেয়। আর সেই মুহূর্ত হইতেই সকলে জলপৃষ্ঠোপবি ঘন ঘন আঘাত করিতে থাকে। ইতিমধ্যে যে ঐ ভাসমান বস্তু হস্তগত করিয়া মস্তকটি জলে ডুবাইতে পারে, সেই জয়ী হয়। কিন্তু সে ডুব দিবার পূর্বে যদি অপরেরা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের লক্ষ পদার্থ উহার হস্তগত হইয়াছে, তখন তাহারা শারীরিক বলের প্রতিযোগিতা দেখায়। যাহার সামর্থ অধিক, সে অপর সকল হইতে বস্তুটি বলে গ্রহণপূর্বক মস্তক জলে ডুবাইয়া জয়লাভ করে।

(গ) "বুদ্ধিমান খারা"। ইহাতে একজনকে রাজা করিয়া অপরেরা দুই ভাগ হইয়া যায়। রাজা মধ্যস্থলে এবং তাহারা দূরে দূরে থাকে। পরে একদল ইহাতে একটি বালক আসিয়া রাজার নিকট অতি গোপনে অপরদলের কোন বালকের নামোল্লেখ মাত্র করিয়া যায়। ইহাতে বিরুদ্ধদলের সকলে বিবেচনা করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রাজার কাছে পাঠায়। তাহাতে যদি সেই নামোল্লিখিত বালকই আসে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে 'মৃত' ঠিক করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেয়;অন্যথা সে বালক প্রতিযোগী দলের কাহারও নাম বলিয়া যায়, তখন সেই দল হইতে বালক আসে। এইরূপে কোন দলের সকলেই মরিয়া গেলে "একপির" পরাস্ত হয়।

(ঘ) "ঘর চাক বাহির চাক খারা"। সমতল ভূমিতে একটি সুবৃহৎ বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া সমবিভক্ত বালকগণের একদল পরিধিমধ্যে এবং অপর দল বাহিরে থাকে। অনন্তর "ঘর চাক্ না বা'র চাক", "বা'র ছাক্" বলিতে "ঘরের দল 'বাহিরের' দলকে এবং 'বাহিরের' দল 'ঘরের' দলকে যথাসাধ্য বল প্রয়োগ টানিয়া আনিয়া স্ব স্ব দল পুষ্টির চেষ্টা করে। যদি কোন দলের সকলকেই সীমাতিক্রম করাইতে পারা যায়, তখন অপর দলের বালকেরা সানন্দে উঠে — "এক পির"।

(ঙ) "পতি খারা"। ইহাতেও সুবৃহৎ বৃত্তের ভিতরে এবং বাহিরে বালকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া থাকে। পরে 'ডু ডু খেলা'র ন্যায় দুই পক্ষ হইতে, পর্য্যায়ক্রমে এক একজন "পত্তি"...." রবে নিশ্বাস লইয়া সীমার বহির্ভূত অপর দলকে আহ্বান করিয়া আসে। যদি বিপক্ষীয়েরা আহ্বানকারীকে আবদ্ধ করিতে পারে, কিম্বা তাহার নিশ্বাস ফুরাইয়া গেলে মাত্র ছুঁইয়া দিতে সমর্থ হয়, তবে সে মরিয়া যায়। আপর দলে এইরূপে কেহ যখন 'মরে', তখন তাহার বিপক্ষদলের 'মৃত' ব্যাক্তি 'বাঁচিয়া' খেলার অধিকার পায়। এইরূপে কোন দলের সকলে 'মরিয়া' গেলে 'এক পির' আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে।

শেষোক্ত ক্রীড়াদ্বয়ে শারীরিক বলের প্রয়োজনীয়তাই অধিক। সুতরাং এই দুই খেলায় আধিকতর বলবান্ বালকের আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন ছোট ছোট বালকদিগের উপযোগী "ঘিলাখারা", "নাদেং (লাটিস) খারা", "মাছখারা" "প্যেক্‌খারা", "কুমীর খারা", "শামুক খারা" প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক ব্যায়ামের অনেক ক্রীড়া আছে। শারীরিক ব্যায়ামপ্রধান আর দুইটী খেলা আছে। তাহাতে বালক-কিশোব-যুবক ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের লোকই যোগদান করিয়া থাকে। সেই দুইটী যথা ঃ-

(ক) "গুদু খারা"। ইহা "ডুডু খেলা'রই নামান্তর মাত্র। সুতরাং তাহার বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে উল্লেখযোগ্য কথা এই, উভয় দলের মধ্যে যাহাতে সীমা নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার আখ্যা — 'গাং' অর্থাৎ সুতরাং অপর পারে যাইতে হইলে পূর্ব্বহ্নে পারের শক্তি বুঝিতে হয়।

(খ) "পোর খারা"। ইহা চট্টগ্রামে 'পড়খেলা' নামে প্রথিত। যাবতীয় শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে এই ব্যয় শূন্য ক্রীড়াই যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শারীরিক ক্রীড়ার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাতে তাহা অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে সমান ও নিয়মিতরূপে রক্ত সঞ্চালিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আধুনিক সমাজে ইহার আদর ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। এই খেলার নিয়ম যথাঃ—

ক্রীড়কগণ দুই সমানভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেকবারে একদল পলাইতে চায়, আপর দল বাধা দান করে। বাধাদানকারীদের পক্ষে একজনের উপর প্রাধান্য অর্পিত হয়, তাহার উপাধি - মোইল্লা"। তাহার দলের প্রত্যেকের জন্য সমতল ভূমিতে এক এক একটী সমান্তরাল স্থূলরেখা ক্রীড়াভূমিতে অঙ্কিত থাকে। তাহারা স্ব স্ব রেখায় দাঁড়াইয়া অপর দলের যাহাকে বিপক্ষদলকে আহ্বান করে — 'পৌর' অর্থাৎ পড়। তাহাদিগকে 'পড়িতে' বা পলাইতে এই রেখাগুলিতে অবস্থিত বাধাদাতা ও 'মোইল্লার' হাত হইতে নিরাপদে অতিক্রম করিয়া

যাইতে হয়। যদি কেহ পলাইবার সময় তাহার বাধাদাতা তাহাকে কোনরূপে স্পর্শ করিতে পারে, অথবা 'মোহল্লা' রেখাগুলির দুই পার্শ্ব ও মধ্য দিয়া পরিভ্রমণকালে যদি বিরুদ্ধ দলের কাহাকেও কোন প্রকারে স্পর্শ করে, তবে পলায়ন কারিদল পরাজিত হয়। অন্যথা কোনরূপে এই সমুদয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দলের একজনও যদি এই রেখাগুলি পার হইতে এবং পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তবে তাহাদেরই জয় হয়। ফিরে বার খেলিতে পরাজিত দলের উপরই বাধাদন করিবার ভার পড়ে।

তৃতীয় শ্রেণীর — তাস, পাশা, "প্যেক্ (পাখী) খাবা" (১) প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালক ক্রীড়ারও অভাব নাই বটে, কিন্তু অতিশয় অল্প। এই সকল দ্বারা মস্তিষ্কচালনা ব্যতীত অপর কোনও উপকার হয় না। সুতরাং শরীব রক্ষা কার্য্যে এই গুলিতে উপাকার হইতে অপকার অধিকতর। দুরূহ সংসারকষ্ট-বিমোচনের নিমিত্ত আমাদিগের যেরূপ অহর্নিশ খাটিবার প্রয়োজনঅ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, এই শ্রেণীর ক্রীড়াসকল যে উন্নতির একান্ত পরিপন্থী — তাহা অচিরে সবর্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এস্থলে বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, দস্যুতার রূপান্তর --- সভ্য কি অসভ্যের উপযুক্ত কার্য্য বলিতে চাহি না, কোন প্রকারের "জুয়া খেলা" ইহাদের মধ্যে এযাবৎ প্রবেশ করে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, নিতান্ত অভাবক্লিষ্ট হইলেও ইহারা স্বীয় অবস্থায় আনেকটা সন্তুষ্ট থাকিতে জানে। সুতরাং তাদৃশী দুর্নীতি অবলম্বনে অর্থোপার্জ্জনে ইহাদের নিকট অদ্যাপি ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হয়।

কিন্তু যাদুকরদিগের "তুম্বরী খরো" ইহাদিগের মধ্যে বেশ পশারলাভ করিয়াছে। মন্ত্রবলে অতদ্ভুত রহস্যসমূহ উৎসব — আমোদে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদর্শিত হয়। তজন্য তাহার উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকে।

২

কৌতুক নানাবিধ। মনুষ্যজীবনও কৌতুকময়! বাক্যে যেরূপ যতি, কর্মজীবনেও তেমনি মধ্যে মধ্যে কৌতুকের প্রয়োজন। ইহাতে মন প্রফুল্ল থাকে, কার্যেও নিত্য নূতন বল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা যথাসম্ভব নির্দোষ হওয়া উচিত। কৌতুকলীলা একান্নবর্তী পরিবারেই যেন সমধিক। পরস্পর পরস্পরে হাসিয়া খেলিযা থাকিতে অবশ্য সকলেই ইচ্ছা করে। আব কেবল দাম্পত্য

অর্থাৎ পৃথগীভূত পরিবারে যে কৌতুক, তাহা নিতান্তই এক ঘেয়ে। তাই একান্নবর্তিতার অভাবে চাক্‌মাসমাজে কৌতুকের অবসর বড়ই দুর্লভ;সাময়িক পর্ব বা উৎসব বিশেষ মাত্র যাহা কিছু সামান্য প্রচলিত আছে। অথচ বিলাত প্রভৃতি দেশে একাগ্রবর্তিকা বিরল হইলেও ইহার প্রাধান্য বিস্তর। তাহার কারণ, সেসব দেশে সর্ববিধ স্বাধীনতা বিদ্যমান এবং দেশও তদুপযোগী অর্থশালী। আমাদের ন্যায় 'অন্ন-চিন্তা-বিষধর-দংশন-কাতর' পরিবারে কত আর কৌতুকের আকাঙ্খা করা যাইতে পারে?

কৌতুক

মদ্য সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তর বলা হইয়াছে। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, অতিরিক্ত সুরাক্ষয় ইহাদিগের উৎসবের প্রধান লক্ষ্য। যাবতীয় অনুষ্ঠানের পূর্বাহ্নেই ইহাদিগকে সুরার আয়োজন করিতে হয়। রাজা বা হেড্‌ম্যানগণের ক্রিয়াকর্মাদিতেও প্রজাসাধারণের যথানিয়মে মদ্য উপঢৌকন দিবার প্রথা আছে, অন্যথা তাহাদিগকে দণ্ডিত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন ধর্মকার্য মাত্রেই সুরাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইতিপূর্বে ইহাও দেখাইয়া আসিয়াছি যে, সুরা ব্যাতিরেকে ইহাদের 'তত্ত্ব' দেওয়া চলে না। বিশেষতঃ বিবাহের প্রস্তাবনা উপস্থিতকালে উহার একান্ত প্রয়োজন। উৎসবাদিতে অহর্নিশ সুরাসত্র খোলা থাকে, যাহার যত ইচ্ছা পান করুক, — কোনও বাধা পাইবে না। আর তৎপরিণামে যখন সমস্তাৎ বীভৎস রহস্যসমুদয় প্রকটিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহাতে পরিবারের সকলে ও সমাগত আবালবৃদ্ধবনিতা সশঙ্ক আনন্দ অনুভব করিতে থাকে।

মদ্যোৎসব

অপরাপর জাতিতে যেমন নৃত্যাদি দ্বারা আমোদ-প্রমোদের রীতি আছে, ইহাদিগের তেমন কিছুই নাই। বস্তুতঃ সুসভ্য জাতিসমূহের পক্ষে ইহা একটি কলঙ্ক বিশেষ। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির এহেন নিকৃষ্ট আয়োজন — কেবল পবিত্রতার বিরোধী নহে, শিষ্টাচারের পক্ষেও নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হয়! কতকগুলি নীচশ্রেণীর ভাড়াটে মেয়ে বা নির্দিষ্ট কয়েক রাত্রির নিমিত্ত ধারকরা নর্তকী জঘন্য অঙ্গভঙ্গী করে, আর পিতা, পুত্র, গুরু, শিষ্য প্রভৃতি সকলে মিলিয়া হা করিয়া তাহাদের প্রতি তাকাইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে 'বাহবা বাহবা' ধ্বনিতে পাপস্ফুর্তিজ্ঞাপন করে! কি বীভৎস দৃশ্য! যাহারা ইচ্ছা করিয়া এরূপে মনকে কলুষিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের কর্তব্যবুদ্ধির কখনও প্রশংসা করা যায় না। চাক্‌মাদিগের যাহা কিছু নৃত্য "মহমুনি" মেলায় দেখাইয়া আসিয়াছি; সেই অবিবাহিত যুবকযুবতীদিগের উদ্‌ভ্রান্ত নৃত্য দেখিলেও লজ্জায় চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসে। পরস্পরের বাহুলতা বেষ্টনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন প্রকারে যে নর্তনলীলা প্রকটিত করে, তাদৃশ্য কুরুচিপূর্ণ দৃশ্য আর চিত্রিত করিতে চাহি না।

নাচ

ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বাজী পোড়াইবার ব্যবস্থাটি মন্দ নহে। ইহা একদিকে যেমন বিশুদ্ধ, পক্ষান্তরে তেমনি শিল্পকলা-প্রদর্শক। আমাদের বর্তমান দুর্গতজীবনে কামানের নাম শুনিলেই ভয় পাই; বোমের আওয়াজটা মাত্র অতিকষ্টে সহিয়া লইতে পারি। এতদ্ভিন্ন

আগ্নেয় যন্ত্র যাহা কিছু সমস্তই আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। কেহ কেহ বা বাজীতে কতকগুলি টাকা ভস্মসাৎ করিয়া নিরর্থক অপব্যয়ে স্বীকৃত নহেন। তাঁহাদের এইরূপ সদ্যুক্তিতে অবশ্য আমাদেরও সহানুভূতি রহিয়াছে; কিন্তু সেই ব্যয়িত টাকাগুলি বস্তুতঃ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয় না, তৎসমুদয় অনেকেরই জীবনযাত্রার সাহায্য করে। তবে বাজীর খরচটা অপর কোন সৎকর্মে ব্যয় করাই শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা। সাধারণ বিবাহাদিতে চাক্‌মাগণ বাজীর জন্য ব্যয় তত উপযোগী মনে করে না; কিন্তু অন্ত্যেষ্টিকালে ইহার বিরাট আয়োজন হইয়া থাকে। যতদূর অনুমিত হয়, ঈদৃশী প্রথা মঘদিগের সাহচর্যেই সংক্রামিত হইয়া থাকিবে।

বাজী পোড়ান

৩

সুবিধা পাইলে ইহারা বিবাহ এবং অপরাপর উৎসবসমূহে অধুনা বিদেশীয় বাদকদল আনয়ন করে; স্বকীয় বাদ্য যন্ত্রাদির ব্যবহারে তাহাদিগকে প্রায়ই উদাসীন দেখা যায়। জুমমঞ্চে বা যুবকসম্প্রদায়ের লীলানিকেতনে মাত্র বাঁশী, মুরলী, শিঙা, "জান্দুরা" এবং "ধুদুগ" প্রভৃতি যন্ত্র প্রচলিত। এসকল ব্যতীত বেহেলা, সানাই, সারঙ্গ প্রভৃতিরও আমদানী হইয়া থাকে। পূর্বে সাধারণ উৎসবাদিতেও আমোদ-প্রমোদের অঙ্গস্বরূপ এ সমুদয়ের 'সঙ্গত' চলিত; এক্ষণে তাহা কদাচিৎ মাত্র পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু যখন হয়, তৎসঙ্গে "ঢুল" (ঢোল) "খেংগরং" প্রভৃতিও থাকে। এস্থলে শিঙা, ধুদুক, জান্দুরা খেংগরং ইত্যাদি যন্ত্রনিচয়ের পরিভাষিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন হইতেছে। প্রথমে তৎপরিচয় দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য প্রক্রিয়াও বিবৃত করিতেছি ঃ—

বাদ্য

"শিঙা" — মহিষশৃঙ্গেরই প্রশস্ত। তদভাবে শূন্যগর্ভ পাতলা অথচ মোটা বাঁশের মুখে 'বিগুলের ন্যায় অপর এক সরু বাঁশের মুখ লাগাইয়া লয়, তাহাতেই ধীরগম্ভীর ফুৎকার দিয়া বাজাইয়া থাকে। বন্য পশুপক্ষী তাড়াইতে জুমক্ষেত্রে ইহা প্রায়ই নিনাদিত হয়।

"ধুদুগ" — দুই প্রান্তে "গিরে" থাকে, এমন বাঁশের পর্বখণ্ড লইয়া মধ্যভাগ হইতে সামান্য একখানি বাখারি পরিত্যাগে প্রস্তুত হয়। ইহা উদর পার্শ্বে লাগাইয়া কাঠিদ্বারা বাদ্য করে। তখন সেইরূপ আর একটি ভূমিতে রাখিয়া দুই কাঠিতে ধুদুগের তাল রক্ষা করিয়া থাকে; তাহার আখ্যা হয় "দগর"।

"জান্দুরা" — বাঁশের ন্যায় উদ্ভিদ বিশেষের দ্বারা প্রস্তুত। দীর্ঘ প্রস্থ — প্রায় এক হাত করিয়া হইবে। কাঠিগুলি পাশাপাশি করে সাজান মাত্র। তাহার এক পৃষ্ঠে ধরিয়া অন্যপৃষ্ঠে করতলাঘাতে বাদ্য করে।

"খেংগরং" — লৌহনির্মিত চক্রাকৃতি পদার্থ। একদিকে লৌহশলাকার প্রান্তদ্বয় বাহির হইয়া থাকে; মধ্যভাগে একটি 'জিহ্বা' ও দেওয়া হয়। কেহ কেহ বাখারিখণ্ড দিয়াও ইহা প্রস্তুত

করিয়া থাকে। খেংগরং বাজাইবার সময় মিলিত প্রান্তদ্বয়ে একখানি সূতা বাঁধিয়া লয়। উক্ত জিহ্বায় মুখ লাগাইয়া থাকিয়া থাকিয়া সূতাখানি টানিতে টানিতে মৃদুলতানে নানা রাগ রাগিনীর ঝঙ্কার দেয়।

"ঢুল" — আমাদের দেশীয় ঢোলই এখানে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃত নামে পরিচিত। অন্যান্য সময়ে ত আছেই, মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী স্নানাদির সময় এবং অন্ত্যেষ্টিকালেও ইহার বাদ্য একান্ত আবশ্যক। এজন্য প্রায় প্রতি গ্রামেই 'ঢুল' রক্ষিত হয়। তাহা না হইলে গ্রামান্তর হইতে হাওলাত লওয়াও চলে।

বংশী ও মুরলীর গঠনপ্রণালী প্রায় সমান, তারতম্য মাত্র এই, বাঁশীব একপ্রান্ত মুখের মধ্যে দিয়া বাজাইবার নিমিত্ত চেটানো আছে, মুরলীর তাহা নাই। কেননা, মুরলী আড় করিয়া ফুৎকারমাত্র প্রয়োগে ধ্বনি তুলিতে হয়। ইহারা বাঁশী এবং মুরলী বাজাইতে সাতিশয় পটু। এতদুভয়ের সাহায্যে অধিকাংশ যুবক ব্রজলীলার অভিনয় করিয়া থাকে।

৪

অধুনা ইহাদিগকে যাত্রা, কবির গান প্রভৃতিতে যথাসাধ্য উৎসাহ দান করিতে দেখা যায়। সম্পন্ন পরিবার মাত্রেই উৎসবাদি উপলক্ষে এই সমুদয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সঙ্গীতকে যাহারা ভালবাসিতে জানে না, এ সংসারে তাহাদের জীবন সাতিশয় নীরস। ইহা যে কেবল 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' যায় তাহা নহে, হৃদয়কে এমন অনির্বচনীয় শক্তিতে উত্তেজিত করে, যাহাতে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। পাপকোলাহলপূর্ণ জগতের জটিলতা — কুটিলতা ও কামিনী — কাঞ্চনের চিন্তা ছাড়িয়া প্রাণ যে উধাওভাবে কোথায় সেই সচ্চিদানন্দে গিয়া[৫৫৮] মগ্ন হয়, সঙ্গীতের সুললীত রাগরাগিনীপূর্ণ ঝঙ্কার ততদূর পৌঁছিতে না পারিলেও গায়ক কি শ্রোতা তাহার প্রতি আর লক্ষ্য করে না, অথবা ফিরিয়া দেখিবারও আবশ্যক মনে করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'প্রসাদী মাল্‌সা' পদলালিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ নহে, অথচ তাহা কর্ণ অপেক্ষা অন্তঃকরণকে অধিকতর পরিতৃপ্ত করে।

সঙ্গীত

ইহাদিগের সঙ্গীত সমুদয়কে রসভেদে বিভক্ত করা দুঃসাধ্য, এমন কি অনেক স্থলে অসাধ্যই বটে। কেননা, প্রায় সঙ্গীতেই দুই বা ততোধিক রসের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাই

(৫৫৮) কিন্তু মহাকবি মিল্টন 'Paradise lost'-এর একস্থলে লিখিয়াছে৷ "Music charms the sense, eloquence the soul" কথাটা নিতান্তই একদেশ দর্শিতাসূচক বটে, তবে তাঁহার জীবনের যাবতীয় কবিতাগুলির আলোচনায় বুঝা যায় যে, পারিবারিক বিপ্লবে সবিশেষ উপদ্রুত হইয়া তিনি এইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভাবচতুষ্টয়

এস্থলে ভাবানুসারেই শ্রেণীভেদ করা হইল। ভাবচতুষ্টয়, যথাঃ— ভক্তি, উদাস, বিবহ এবং প্রেম। নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণীতে — ক্রমপরবর্তী অপেক্ষা ক্রমপূর্ববর্তী ভাবের সমাদর অধিকতর; সুতরাং সমাজ অনুন্নত বলিয়া ক্রম — পূর্ববর্তী অপেক্ষা ক্রমে পরবর্তী ভাবের সঙ্গীতই ইহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত।

স্তোত্রগান

পূর্বেই বলিয়াছি, উৎসবামোদে ইহারা "গেন্‌কুলী" আনিয়া কথকতা শ্রবণ করে বলিতে কি, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহাতে বিশেষ পরিতোষ লাভ কবিয়া থাকে। রঙ-খেয়াল বা কাহিনীর ভিতর দিয়া গভীর ধর্মভাব এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সহযোগে সুনীতি - গর্ভ উপদেশ সমূহ যখন নানাবিধ সুর সংযোগে প্রকটিত হয়, তখন প্রত্যেকেরই মনোরঞ্জন হইবার কথা। বস্তুতঃ এতাদৃশ নির্মল আমোদ সকল সম্প্রদায়েরই প্রাণের সমগ্রী। পিতা — পুত্র, মাতা — কন্যা ভ্রাতা — ভগিনী যে আমোদপ্রমোদ একত্র মিলিয়া উপভোগ করিতে পারে, তাহা কেনই বা আদরের না হইবে? 'গেন্‌কুলি'গণ সচরাচর যে সকল 'পালা' গান করে, তন্মধ্যে "গোজনের লামা" অর্থাৎ গোঁসাইর (পরমেশ্বরের) স্তোত্র সর্বাপেক্ষা হৃদয়াকর্ষক! ইহার আগাগোড়া উদাসিভক্তেব মরম কথায় পরিপূর্ণ। উহার রচয়িতা শিবচরণ সংসারা-সক্তি বিরহিত ছিলেন।

উদাসী শিবচরণ

"কান্তীগোছা"য় তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই একমাত্র পুত্রের উদাসভাব দেখিযা, তদীয় পিতামাতা অতিশয় চিন্তাকুল হইয়াছিলেন; তজ্জন্য বিবাহ কবাইয়া তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সেই প্রলোভনে ফেলিতে পারা যায় নাই। অনন্তর বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা হয়, — তথাপি তিনি আপন ইচ্ছায় চলিয়া যাইতেন। আহারের সময় মাতা পুত্রকে না পাইয়া তাঁহার নিমিত্ত "ভাত মোচা"(৫৫৯) "ফুলবারেঙে"র মধ্যে রাখিয়া দিতেন। আশ্চর্যের কথা, ২।৩ মাস পরে শিবচরণ আসিলেও নাকি সেই ভাত গরম পাওয়া যাইত; এমন কি কোন কোন বারে সেই পর্য্যুসিত ভাত হইতে বাষ্পও উঠিত! অবশেষে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। তারপর তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তৎকৃত "গোজেনের লামা" সমাজে বিশেষ, প্রসিদ্ধ; প্রায় সকলেই উহার প্রতি ভক্তিমান্। শুনা যায়, তাঁহার প্রণীত সাতটি 'লামা' আছে, কিন্তু আমি বহু অনুসন্ধানেও ছয়টির অধিক পাই নাই। যাহা পাইয়াছি, নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

গোজেনের লামা

(প্রথম)

উজানি ছরা লামনি ধার,
ন আছিল সৃষ্টি জলৎকার।
জল - - উপরে গর্য্যে(৫৬০) স্থল,

(৫৫৯) ভাতের পুটলী (৫৬০) গড়িয়াছে .

বানেল[৫৬১] গোজেনে জীব সকল।
আয়রে[৫৬২] বানেয়ে যার জনম;
আগে ছালাম্ দ্যাং[৫৬৩] তার চরণ।
চাঁনে সূর্য্যে স (হো) দর ভেই[৫৬৪],
ছালাম্‌দ্যাং উদ্দিশে ভূমিৎ থেই[৫৬৫]।
সর্ম্মুখে ছালাম্‌দ্যাং পূগেদি[৫৬৬]
পছিমে ছালাম্‌দ্যাং পিজেদি[৫৬৭]।
উত্তরে ছালাম্‌দ্যাং বাঙেদি,
দক্ষিণে ছালাম্‌দ্যাং দেনেদি[৫৬৮]।
মোরে বিধিয়ে দয়া হোক;
তিন দেব-চরণৎ ছালাম্ রোখ[৫৬৯]।
ন বুঝে তিন দেবে যেই সকল,
সেই সকল বড় কমল, ফুল কমল।
মা সরস্বতী ছালামৎ,
যোগাই দিত গাই গীতপদ।
ছালাম মানেই তাপসী,
ধর্ম্মশীলা সন্ন্যাসী।
একা মনে ভজঙর[৫৭০]
ছালামৎ জানেলুম দেব কমল।
পূজার গুরু মানে লুং,
হাজার ছালামে জানেলুং।
মর্তে পড়ি জনম যার;
তার চরণে নমস্কার।
দশমাস দশদিন দুখ পিয়ে[৫৭১];
জম্বু দিবৎ নি[৫৭২] জন্মিয়ে।
পূরি চেলুং[৫৭৩] চোখ ভরি;
মা-বাপ পারা[৫৭৪] নেই দেশভরি।
পড়োয়া[৫৭৫] বুঝে আখরৎ[৫৭৬];
এজের[৫৭৭] মানেই লোক সংসারে।

---

(৫৬১) বানাইল (তৈয়ার করিল), (৫৬২) পূর্বে, (৫৬৩) সালাম দিতেছি, (৫৬৪) ভাই, (৫৬৫) ভূমিতে থাকিয়া, (৫৬৬) পূর্বদিকে, (৫৬৭) পেছন দিকে, (৫৬৮) ডান দিকে, (৫৬৯) থাকুক, (৫৭০) ভজনা করিতেছি, (৫৭১) পাইয়া, (৫৭২) জম্বুদ্বীপে কি, (৫৭৩) চাহিলুম (দেখিলাম), (৫৭৪) অপেক্ষা, (৫৭৫) শিক্ষিত, (৫৭৬) অক্ষরে, (৫৭৭) আসিতেছে

মা-বাপ চরণে ভজিলেই[৫৭৮]
সকল তিথ্য[৫৭৯] ফল পাই ভেই।
জ্ঞানী ধ্যানী ছালাম দ্যং;
পড়োয়া পণ্ডিত বুঝিলং।
সবায় ছালাম মুই দিলুং;
গীত সাধনান সাধিলুং।
গীত একলামা পূরেয়ে[৫৮০].
বুঝিল বুঝিব মানেয়ে[৫৮১]।।

(দ্বিতীয়)

তঁদাৎ[৫৮২] ধোপ[৫৮৩] কাপড়;
গোজেন — চরণৎ ভজঙর।
আগে ছালাম দেয় শিবচরণ,
মাগং[৫৮৪] গোজেনের তুন[৫৮৫] দুই চরণ।
ছেয়ার[৫৮৬] তলে রাখে-দ[৫৮৭],
একালে ওকালে তরে-দ[৫৮৮];
জন্মে জন্মে দেখা হক,
চিত্তে মনে একা হক,
দেবাংশি গোজেনে ন দোষি,
অবুঝা মানেরে ন বুঝি।
শুন শুনরে পড়োয়া ভেই;
দ্বি-বা অক্ষরে তরি যেই।
গুরু সাধি না পেয়ে[৫৮৯];
অনা গুরুয়ে[৫৯০] পার হয়ে?
সাধি আনং[৫৯১] আর জনম,
সকল দান করঙর[৫৯২] এই জনম।
জুরি-ন পাল্লে[৫৯৩] কুয়ৎ পেব[৫৯৪]?
ভজিলে চরণে কূল পেব?

(৫৭৮) ভজনা করিলেই, (৫৭৯) তীর্থ, (৫৮০) পূর্ণ হইয়াছে, (৫৮১) মনুষ্যে, (৫৮২) গলায়, (৫৮৩) শুভ্র অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন, (৫৮৪) মাগিতেছি, (৫৮৫) হইতে, (৫৮৬) ছায়ার; (৫৮৭) রাখিত, (৫৮৮) তরাইত, (৫৮৯) পাইয়া, (৫৯০) গুরুব্যতিরেকে, (৫৯১) আনি, (৫৯২) করিতেছি, (৫৯৩) জুটাইতে না পারিলে, (৫৯৪) কোথায় পাইব

ন-র'লে[৫৯৫] ধন মান সাধনে;
তরিব মানেই লোক ফুল দানে।
গুরুচরণ সার করে;
বংশ ধন কি পার করে?
একামনে ভজিলে;
সকল তীথ্য ফল পায় বেলে[৫৯৬]
দয়া দে-লে[৫৯৭] সার করে;
সাধিলে দজগৎ[৫৯৮] পার করে।
অপার পানি[৫৯৯] সাগরে;
ত্রিশ তিন জাতি[৬০০] ভাজ[৬০১] পড়তুম-গই[৬০২] আগরে[৬০৩]।
ভজে মানেই লোক এই কালে;
যমে না ধরিব ঐ কালে।
যে বর মাগে সে বর পায়,
গোজেনে বর দিলে ন ফুরায়।
গোজেন-মেইয়া[৬০৪] উদ' নেই[৬০৫];
বুঝি পারি কে ভাই সেই।
পরম বৃক্ষে ভর দিয়া;
বুঝি পারে কে তোর মেইয়া?
সকল জীবে বেদয়ে[৬০৬] হোক;
চিত্তে মনে একা হোক।
পরম গোজেন কিয়ৎ[৬০৭] থায়[৬০৮]?
সাতবার সাধিলে সেই ন পায়!
তঁদা[৬০৯] সাধি আনিব;
পরম গোজেনে ভুজিব।
চরণে ছালামে ভুঝিলে;
ধর্ম সাধনান পাই বেলে।
ছালাম দিবার কাছেল যে[৬১০]
গীত দ্বি-লামা ফুরেল যে[৬১১]।

(৫৯৫) না থাকিলে, (৫৯৬) বলিয়া, (৫৯৭) দেখিলে, (৫৯৮) মুসলমানী শব্দ - -নরক হইতে, (৫৯৯) জল, (৬০০) তেত্রিশ জাতি; (৬০১) ভাষা; (৬০২) পড়িতাম গিয়ে; (৬০৩) অক্ষরে; (৬০৪) ঈশ্বরের মায়া; (৬০৫) অন্তনাই; (৬০৬) দেখা; (৬০৭) কিসে; (৬০৮) থাকে; (৬০৯) এস্থলে সুকণ্ঠ; (৬১০) কাছাইল অর্থাৎ ফুরাইয়া আসিল যে; (৬১১) ফুরাইল যে;

দ্বি-লামা ছিরেলে[৬১২] ন যেবং[৬১৩];
গোজেন — সর্ম্মখে বর লবং[৬১৪]।

(তৃতীয়)

তঁদাৎবেরেই কাপড়ে,
আরাধন করঙর হাত যোড়ে।
দুখ্যাকুলে যার জনম,
তঁদা সাধঙর পায জনম।
হীন কুলে ন — দিদুং[৬১৫],
দুখ্যাকুলে ন — হদুং[৬১৬]।
হাদে[৬১৭] ন — করতুম্[৬১৮] জীববধ,
যুগে যুগে ন-পড়তুম[৬১৯] দজগৎ।
পরম বৃক্ষি মোর ন-হদ[৬২০]।
চিদা-চর্জ্জা[৬২১] ন — খেদ[৬২২]।
কথা ন — কদ[৬২৩] তলেদি[৬২৪];
লোকে ন — কও[৬২৫] কলঙ্কী।
রোগে বেদে[৬২৬] ন ধও[৬২৭],
অজল[৬২৮] নীজ দাৎ ন — হদ[৬২৯]।
পোড়া ন — পিদুং[৬৩০] ধান দি,
উনা[৬৩১] ন — হদুং গোই[৬৩২] জনেদি।
অবুঝ[৬৩৩] জন্ম ন — হদুং,
তিতা কথা[৬৩৪] ন — শুন্দুং[৬৩৫]।
কানে ন — শুন্দুং কুকথা,
পরে ন — কথ কুকথা।
পড়োয় পণ্ডিত যেই দেশে,
জন্ম হদুং — গৈ[৬৩৬] সেই দেশে।
আর্নি[৬৩৭] রাজার দেশ লাক্ — ন — পাং[৬৩৮],

(৬১২) শেষ হইলে, (৬১৩) যাইব না, (৬১৪) লইব, (৬১৫) না যাইতাম, (৬১৬) না হইতাম অর্থাৎ না জন্মিতাম, (৬১৭) হাতে, (৬১৮) না করিতাম, (৬১৯) পড়িতাম না, (৬২০) না হইত, না হইতাম, (৬২১) চিন্তাভাবনাদি, (৬২২) না থাকিত, (৬২৩) না কহিত, (৬২৪) নীচ অর্থাৎ তোষমুদী, (৬২৫) না কবিত, (৬২৬) ব্যাধিতে, (৬২৭) না ধরিত, (৬২৮) উচ্চ, (৬২৯) না হইত, (৬৩০) পাইতাম, (৬৩১) কম, (৬৩২) না হইতাম গিয়ে; (৬৩৩) মূর্খ, (৬৩৪) কর্কশবাক্য, (৬৩৫) না শুনিতাম, (৬৩৬) হইতাম গিয়ে, (৬৩৭) আরও, (৬৩৮) দেখা না পাই

অগাধে অপথে যে — ন — পাং[৬৩৯]।
যেদক্[৬৪০] চিদা থায় ন — জান্দুং[৬৪১],
যেদক্ পোড়াধোয়া[৬৪২] ন — পেদুং।
গীত তিন লামা ফুরেলুং[৬৪৩],
সভায় হুজুর জানেলুং[৬৪৪]।

(চতুর্থ)

তঁদাৎ বেরেই কাপড়ন,
ভজিলুং গোজেন — চরণান।
গীতে রঙে উল্লাসে
সাধঙর[৬৪৫] সাধনান[৬৪৬] খোলাসে[৬৪৭]।
দুখ্যা জন্ম ন — হদুং,
সুখ্যা জন্ম হদুং — গোই,
বাবে[৬৪৮] এ-দ[৬৪৯] গম্[৬৫০] দিনে,
জন্ম দিত সুক্ষেণে[৬৫১];
সাদি[৬৫২] ঘরৎ উবশ্‌তুম[৬৫৩],
মন খোলাসে খেলেদুং[৬৫৪];
জাতে কূলে হদুং গোই,
থানে ঠমগে[৬৫৫] হদুং গোই।
ধর্ম্মী মা-বাপ লাগ-পিদুং[৬৫৬],
চিদ-সুখে মন-সুখে দুধ খেদুং[৬৫৭];
সাত ভেই সাত ভোন[৬৫৮] লাগ-পিদুং,
ননেয়া[৬৫৯] খুলা বো'য়া[৬৬০] মুই হদুং;
সোনা—ধূলনৎ ধুলে দাক্[৬৬১],
দ্য'র[৬৬২] ভঙানি[৬৬৩] ভঙ্গেদাক্;
জেওা[৬৬৪] সমারে জেদেঙা[৬৬৫];
ঘুত্তা[৬৬৬] সমারে খুড়াঙা[৬৬৭];

(৬৩৯) যাইতে না পারি, (৬৪০) যত, (৬৪১) না জানিতাম, (৬৪২) লাঞ্ছনাদি, (৬৪৩) ফুরাইলাম, (৬৪৪) জানাইলাম, (৬৪৫) সাধিতেছি, (৬৪৬) সাধনা, (৬৪৭) খোলসা করিয়া অর্থাৎ সরলচিত্তে, (৬৪৮) বাপে, (৬৪৯) আসিত, (৬৫০) ভাল, (৬৫১) সুক্ষণে বা শুভক্ষণে, (৬৫২) ভাল, (৬৫৩) উপস্থিত হইতাম, (৬৫৪) খেলিতাম, (৬৫৫) সম্ভ্রান্তঘরে, (৬৫৬) দেখা পাইতাম, (৬৫৭) খাইতাম, (৬৫৮) ভগ্নী, (৬৫৯) স্নেহপাত্র, (৬৬০) কনিষ্ঠ - বউটী, (৬৬১) দোলাইত, (৬৬২) দেবতার, (৬৬৩) ধ্বনি, (৬৬৪) জেঠা, (৬৬৫) জেঠী, (৬৬৬) খুড়া, (৬৬৭) খুড়ী

কালী কুশ্যারী বের বাড়ক্ (৬৬৮),
গুত্তিগুদরি (৬৬৯) ডেল (৬৭০) বাড়ক্।
ধনে জনে হদ (৬৭১) মোর,
পনে খুজি (৬৭২) দুধ দুধ খুজি দুবাবের।
সমারি (৬৭৩) বন্ধু পাংপারা (৬৭৪),
লোকে কুদুমে (৬৭৫) সব পুরা।
কথা'নি (৬৭৬) হলে মু—মিদা (৬৭৭),
গীতি রঙে গম্ গলা।
মাদা জগা (৬৭৮) চুল ধরোক্ (৬৭৯),
মাদুরগা হ'দ দ্বিবা চোখ।
বেঙা (৬৮০) হ'দ চোখ-ভং (৬৮১),
মুজুঙ (৬৮২) দাততুন (৬৮৩) হ'দ সং (৬৮৪)।
চেবার (৬৮৫) গম্ হ'দ উত্তানি (৬৮৬),
গোজনে বানেদ (৬৮৭) হাত্তানি (৬৮৮)।
তঁদা পেদুং দেবগড়ন (৬৮৯),
বারা অজার (৬৯০) বুকভরণ (৬৯১)।
ছানে শিক্যায় (৬৯২) গড়নে,
রূপে রঙে পিদুং সবখানে।
রাজা বাদার (৬৯৩) পান খেদুং (৬৯৪),
গুরু সাধি নাং (৬৯৫) পেদুং।
সাদি ঘরৎ উবুস্তুম,
পড়োয়া পণ্ডিত মুই হদুং।
দর্য্যা (৬৯৬) করলি (৬৯৭) পাই গণং (৬৯৮),
আকাজে চান্ (৬৯৯) তারা হাদে (৭০০) গণং।
সাধি পেদুং মুই বিয়া (৭০১),

(৬৬৮) কালীকুস্যারী ধান্য বিশেষের গাছের ন্যায় বাড়িতে থাকুক, (৬৬৯) গোষ্ঠী প্রভৃতিতে, (৬৭০) ডাল, (৬৭১) হইত, (৬৭২) বাঞ্ছা করি; (৬৭৩) মঙ্গীয, (৬৭৪) পাই মত, (৬৭৫) কুটুম্বে, (৬৭৬) কথাগুলি, (৬৭৭) মুখমিষ্ট, (৬৭৮) মাথা জুড়িয়া, (৬৭৯) ধরুক, (৬৮০) বক্র, (৬৮১) ভ্রু, (৬৮২) সম্মুখে, (৬৮৩) দাঁতগুলি, (৬৮৪) সমান, (৬৮৫) দেখিবাব, (৬৮৬) ওট অর্থাৎ ওষ্ঠখানি, (৬৮৭) নির্মাণ করিত, (৬৮৮) হাতখানি, (৬৮৯) দেবতার গঠন, (৬৯০) বাহু ওসার অর্থাৎ বিস্তৃত, (৬৯১) বুক মাংসল, (৬৯২) সৌন্দর্যে, (৬৯৩) বাটাব, (৬৯৪) খাইতাম, (৬৯৫) নাম, (৬৯৬) দরিয় অর্থাৎ সমুদ্র, (৬৯৭) কচ্ছপ, (৬৯৮) গণিতে পারিতাম, (৬৯৯) চন্দ্র, (৭০০) হাতে, (৭০১) বিবাহ এখানে স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত

লোকে মাদেত [৭০২] হাজিয়া [৭০৩]
সর্বলোকে পূজিতাক [৭০৪],
দে'লে [৭০৫] শত্তুরে [৭০৬] ভজদাক্ [৭০৭]।
হাদে পেদুং লেখা বর [৭০৮];
কেইয়াৎ [৭০৯] পেদুং রূপ-বর [৭১০]।
গীত চারিলামা ফুরেই যায়;
তঁদা সাধঙর আর বার।

(পঞ্চম)

তঁদাৎ বেরেই কাপড়ান,
ভজিলুং গোজেনর, চরণান;
চরণে ছালামে, ভজিলে,
সকল তিথ্য ফল পাই বেলে।
পাচফুল দান-ফল পেদুং গোই;
রথে বলে [৭১১] হদুং গোই।
গোজেন — সম্মুখে কর্ পাদং [৭১২],
সাত পুত চাই যদি বর মাগং [৭১৩]।
ডেনে [৭১৪] মাগং ধনবর;
বাঙে [৭১৫] মাগং জনবর;
ধনে সম্পদে সব পূরা [৭১৬],
জুরি—পাত্তুংগোই [৭১৭] হেৎ [৭১৮] ঘোড়া।
যে বর মাগঙর [৭১৯] মনের সাধ;
সেই বর পেদুং গোই হাদে হাদ।
হাল্যা [৭২০] উবুজিনে [৭২১] লেই সাধি [৭২২],
জুম্মোয়া উবুজিনে তং সাধি [৭২৩],
দেওয়ান উবুজিলে বীর সাধি,
রাজা উবুজিলে সেখাভূয়া সাধি [৭২৪]
কেইয়াৎ পেদুং সাজানা [৭২৫],
ত্রিশ তিন জাতিখুন্ পেদুংগোই খাজানা;

(৭০২) মাতাইত অর্থাৎ কথা বলিত, (৭০৩) হাসিয়া, (৭০৪) পূজা করিত, (৭০৫) দেখিলে, (৭০৬) শত্রুতে, (৭০৭) ভজনা করিত, (৭০৮) বিদ্যাবব, (৭০৯) কায়ায, (৭১০) রূপের বর, (৭১১) গতবে, (৭১২) হাত পাতি, (৭১৩) মাগি, (৭১৪) ডাইনে, (৭১৫) রাখে, (৭১৬) পূণ, (৭১৭) জুটাইতে পারিতাম গিয়ে, (৭১৮) হাতী, (৭১৯) মাগিতেছি, (৭২০) কৃষক, (৭২১) জন্মিলে, (৭২২) যেন 'লই' অর্থাৎ ঝাড়ি বিশেষ পাহ, (৭২৩) যেন জুনের টংঘর পাহ, (৭২৪) উঠিয়া যাইতে, (৭২৫) সাজসজ্জা;

খাদে [৭২৬] পালঙে [৭২৭] ব-খেদুং [৭২৮],
ত্রিশ তিন জাতি-ভাজ [৭২৯] মুই পাত্তুং [৭৩০];
যে বর মাগঙর মনের সাধ,
সে বর পেদুং হাদে হাদ।
গীত পাঁচলামা ফুরেই যার,
তঁদা সাধঙর আরবার;

(ষষ্ঠ)

তঁদাৎ বেরা কাপড় লই,
গোজেন ভজঙর গুজি হই [৭৩১]।
মাথা পাতি বত্তা লং [৭৩২],
সাত ভেই সাত ভোন্ [৭৩৩] বর মাগং।
হাদে ঢালি [৭৩৪] পানিয়ে [৭৩৫];
দিব মা বঝমতী [৭৩৬] সাক্ষিয়ে।
এগার হাজার চোরশী সন,
ফল্‌না [৭৩৭] বারে সাধঙর একামন।
চরণে ছালামে ভজঙর,
যেবার ছালামি [৭৩৮] মেলঙর [৭৩৯];
গীত হয় লামা ফুরেয়ে,
বুঝিলে বুঝিব মানেয়ে।
দেবর কুলে [৭৪০] দেব মানাই,
মানেই কুলে লোক মানাই;
কুনি [৭৪১] গেলা সঙ্গী ভেই,
সাধি সমারি [৭৪২] চলি যেই [৭৪৩]। ইতি

গোজেনের লামা এই সমাপ্ত হইল। পাঠক দেখিলেন, লেখকের ভক্তির গভীরতা কত! স্তোত্রের মধ্যে যে "এগার হাজার চোরাশী সন' এর উল্লেখ আছে তাহা বোধ হয় রচনার সময়। তবে হাজার কথাটা সম্ভবতঃ ঠিক নয়। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস — এখানে শতকেই

(৭২৬) খাটে; (৭২৭) পালঙ্কে; (৭২৮) বাতাস খাইতাম অর্থাৎ বায়ুসেবন করিতাম; (৭২৯) ভাষা; (৭৩০) আমি যেন পারি।

(৭৩১) নত হইয়া বসিয়া; (৭৩২) আশীর্বাদ লই; (৭৩৩) ভগ্নী; (৭৩৪) ঢালিতেছি; (৭৩৫) জলকে; (৭৩৬) বসুমতী; (৭৩৭) অমুক; (৭৩৮) যাইবার অর্থাৎ বিদায়ের সালাম; (৭৩৯) মাগিতেছি; (৭৪০) দেবকুলে; (৭৪১) কোথায়; (৭৪২) সমাপ্ত করিয়া একসঙ্গে; (৭৪৩) চলিয়া যাই।

হাজার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং ইহা মখাব্দ। 'লামা'র ভাষায় জাতীয়তা পরিস্ফুট — যদিও কথঞ্চিৎ সংস্কৃত বটে শিবচরণের লেখা পড়া কতদূর ছিল, জানি না; তবে তিনি যে পূর্ব জন্ম হইতে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ বক্তব্য নাই। সমালোচনার ভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত রহিল।

বলিয়া রাখা উচিত যে, এই "লামা" গুলি বস্তুত সঙ্গীত নহে। যে হিসাবে বেদকে গান বলা হয় আমরা সেই হিসাবে — তান-লয় সহকারে গীত হ'য় বলিয়া ইহাদিগকেও সঙ্গীত শ্রেণীভুক্ত করিলাম। অন্যথা ইহাদের সঙ্গীতসমূহ "উভগীত" (৭৪৪) আখ্যায় প্রসিদ্ধ। প্রাণের আকুল পিয়াসা মিটাইতে প্রায় সকলেই "উভগীতের" আশ্রয় লইয়া থাকে। ইহাতে সাধকের হৃদয়োচ্ছ্বাস, উদাসীনের মরম-কাহিনী বিরহীর প্রাণের জ্বালা, প্রেমিকের সরস বিশ্রম্ভালাপ অতি সংক্ষেপে, অথচ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। এ সকল "উভগীতে" প্রায়ই দুই চরণের অধিক থাকে না। তাহাতেও আবার প্রথম চরণটি মাত্র পদমিলনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব ও উত্তরচরণে অর্থগত সম্বন্ধ দেখা যায় না। এবং "উভগীত" নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়াই বোধ হয়, গায়কেরা উপসংহারে একটি সুদীর্ঘ 'কুই' (উ — উ — উ — উ) ধ্বনি দিয়া উহাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিয়া লয়। নিম্নে কয়টি প্রধান ভাবের গান সমুদয়ের নমুনা দেওয়া যাইতেছে ঃ—

উভগীত

ভক্তিভাব

১। ফুলে তুলি আলামৎ (৭৪৫)
সকল দেবতা ছালামৎ (৭৪৬) — উ — উ — উ — উ ...

২। তাগল ধারেই (৭৪৭) খোছিলৎ (৭৪৮),
বচ্ছি (৭৪৯) সরস্বতী মর্জ্জিলৎ (৭৫০) — উ — উ — উ — উ ...

৩। খাড়ি (৭৫১) লামেই কালাম্ (৭৫২) দ্যং (৭৫৩),
পঞ্চ সভা লক (৭৫৪) ছালাম দ্যং — উ — উ — উ — উ ...

৪। আরেরে (৭৫৫) বানেল (৭৫৬) যার জনম,
আগে ছালাম দ্যং তার চরণ — উ — উ — উ — উ ...

৫। তঁদাৎ বেরেই কাপড়ান,
ভজগুর গোজেনর চরণান — উ — উ — উ — উ ...

(৭৪৪) "উভগীত" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় দুরূহ। সম্ভবতঃ এসকল সঙ্গীতে পুরাকালে দম্পতী কর্তৃক উদগীত হইত। উভয়ের গীত এই অর্থে "উভগীত" সংজ্ঞা হইয়া থাকিবে, (৭৪৫) আদর্শ সূচক পটে (আলাম শব্দের পরিচয় আগে দেওয়া হইয়াছে), (৭৪৬) সালাম দিতেছি। (৭৪৭) দায়ে ধরে দিতেছি, (৭৪৮) খরশিলে - ধারাল - শিলায়, (৭৪৯) বস অর্থে, (৭৫০) মোর জিবে — আমনার জিহ্বায়, (৭৫১) কাষ্ঠখণ্ড, (৭৫২) গাছের গড়া, (৭৫৩) দিতেছি, (৭৫৪) লোক, (৭৫৫) অতিপূর্বে, (৭৫৬) প্রস্তুত করিল,

উদাস ভাব

১। সুপারি কাবি [৭৫৭] খানে খান,
উদে [৭৫৮] মনখুন [৭৫৯] নানা গান — উ — উ — উ — উ ...

২। ছরমা [৭৬০] কুরারে [৭৬১] কি খুদ দিম [৭৬২],
উদাসী মনরে কি বুঝ্ দিম্ — উ — উ — উ — উ ...

৩। ছরমা কুরা ন খায় খুদ্
উদাসী মনে ন পায় বুঝ্ — উ — উ — উ — উ ...

৪। দনা [৭৬৩] উজানি জুনি গেল
পুরানি ভালেৎ [৭৬৪] দিন উদি [৭৬৫] গেল — উ — উ — উ — উ ...

৫। মাম্বারা [৭৬৬] খেইয়া [৭৬৭] ছাগল্যা;
দয্যাৎ [৭৬৮] ন ভাজের পাগল্যা [৭৬৯] — উ — উ — উ — উ ...

বিরহ ভাব

১। মদনা তদেগর ঠুট্ জ্বলে [৭৭০]
রাঙা খাদিয়ে বুক জ্বলে — উ — উ — উ — উ ...

২। কিজিং ছিনি [৭৭১] পক্ষী গেল,
ভরন্দি বাজারৎ [৭৭২] লক্ষ্মী গেল — উ — উ — উ — উ ...

৩। চিগন [৭৭৩] মরিচা [৭৭৪] টানঙর [৭৭৫];
দে'লে স্বপ্পনে [৭৭৬] কানঙর [৭৭৭] — উ — উ — উ — উ ...

৪। দগরের [৭৭৮] বেঙ্ওয়া কর্‌কারি [৭৭৯];
লইয়ে পরাণে ধরফারি — উ — উ — উ — উ ...

৫। তোতেক [৭৮০] উড়ে ঝাকবলি [৭৮১]
রাখিৎ [৭৮২] ন পারম্ [৭৮৩] থাক্ বলি — উ — উ — উ — উ ...

প্রেমভাবাত্মক — গীতে অশ্লীল কথাগুলি অতি সাবধানে বিন্যস্ত হইলেও 'আদমের' মধ্যে কিংবা অনতিদূরে গান করা বয়োবৃদ্ধগণ পছন্দ করে না। 'কারণ ইহাতে যুবতীগণের চরিত্রভ্রষ্টা

(৭৫৭) কাটি, (৭৫৮) উঠে, (৭৫৯) মন হইতে, (৭৬০) লাজুক, (৭৬১) মোরগকে, (৭৬২) দিব, (৭৬৩) প্রায় তিনদিকে পর্বত-বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র, (৭৬৪) মঙ্গলেব, (৭৬৫) উঠিয়া, (৭৬৬) ফল বিশেষ, (৭৬৭) খাদক, (৭৬৮) সমুদ্রে, (৭৬৯) এক পর্বপরিমিত বাঁশ—ভাসিতেছে না, (৭৭০) মদনা তোতার ঠোঁট ঝকমক করে, (৭৭১) উপত্যকা ভূমি ছাড়িয়া, (৭৭২) পূর্ণ বাজাবে, (৭৭৩) ছোট, (৭৭৪) বেত, (৭৭৫) টানিতেছি, (৭৭৬) স্বপ্নে দেখিয়া, (৭৭৭) কাঁদিতেছি, (৭৭৮) ডাকিতেছি, (৭৭৯) কর্‌করি নামক বেঙটি, (৭৮০) তোতা, (৭৮১) ঝাঁকে ঝাঁকে, (৭৮২) রাখিতে, (৭৮৩) পারিতেছি না

হওয়ার আশঙ্কা আছে; প্রেমোন্মত্ত যুবকগণ জুমক্ষেত্রে বা বিজন অরণ্যে মনের আকুল আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন কণ্ঠে পরিব্যক্ত করে। এ সময়ে প্রণয়িণী ভিন্ন অপর কেহ, সঙ্গে থাকে না, — অথবা প্রেমিক সম্পূর্ণ একাকীই থাকে। তাহারা কখনও বা গাইয়া বেড়ায় —

১। মাছে খেল শিল—কেই [৭৮৪]
ন-দেলে তোরে, মোর চিগন বেই, [৭৮৫] ন-পাবং থেই — উ—উ—উ—উ ....

২। বনৎ দগরে হরিণ — ছ;
ন-দেলে তোরে মরিব — উ — উ — উ — উ ...

৩। উড়ের পক্ষী তল্ চেইয়া;
ছাড়ি — নপারিম্ তর্ — মেইয়া — উ — উ — উ — উ ...

৪। ডিঙি কুলেম্বি, [৭৮৬] ত — র্খাদাৎ [৭৮৭],
মোর আসল পরান্নান্ [৭৮৮] ত — র্হাতৎ — উ — উ -- উ — উ ...

৫। এক পণ সুপারি হাজিব [৭৮৯],
তরে-মরেনি [৭৯০] ছাজিব [৭৯১] — উ — উ — উ — উ ইত্যাদি।

এভাবের আর কতকগুলি সঙ্গীত আছে, তৎসমুদয় কেবল যুবতীদিগের চিত্ত-বিজয়ের নিমিত্ত সন্ধান করা হয়। যুবতীগণ তাদৃশ সম্মোহনবাণে বিমুগ্ধ হইলে, যখন মরমের চঞ্চলতায় সরমের কপাট খুলিয়া যায়, পাল্‌টাগানে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করে। ঈদৃশ সঙ্গীতালাপ অবশ্য যথোচিত সাবধানেই হইয়া থাকে। আবার তাহার ভাষাও কিরূপ সংযত এবং সতর্ক, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে —

যুবক — (চিগন ছরা, চিগন চেই [৭৯২],
খুজি ডাগঙর [৭৯৩] চিগন বেই!
(ছরাছরি বিল হব;)
তোর হাতর পান-খিলি হিল [৭৯৪] হব?

যুবতী — ইঁজরের মাদাৎ বই [৭৯৫] চান-চাগৈ [৭৯৬],
খাদী মেলি — দিয়ম্ [৭৯৭] পান খাগৈ [৭৯৮]।

---

(৭৮৪) শিলের কলঙ্ক, (৭৮৫) যুবতী রমণীকে সরস সম্বোধন, (৭৮৬) ধরিব অর্থাৎ বাঁধিব, (৭৮৭) তোমার খাটে; (৭৮৮) প্রাণ খানি, (৭৮৯) হারাণ যাইবে, (৭৯০) তোমার ও আমার মিলন কি, (৭৯১) সাজিবে অর্থাৎ শোভা পাইবে, (৭৯২) মাচ ধরিবার যন্ত্র বিশেষ, (৭৯৩) আপনা হইতে আহ্বান করিতেছি, (৭৯৪) আস্বাদবিশিষ্ট, (৭৯৫) মাথায় অর্থাৎ প্রান্তে বসিয়া; (৭৯৬) চন্দ্র দেখ গিয়ে; (৭৯৭) খুলিয়া দিব, (৭৯৮) খাও গিয়ে।

যুবক — ধুন্দা[৭৯৯] বাজেই[৮০০] ত — দি[৮০১];
এতক মাগিলুম ন — দিলি।

যুবতী — শিলর কাঙারা[৮০২] কলে ধর;
পরাণে মাগিলে বলে ধর।

যুবক — শিলর কাঙারা ডর গরে[৮০৩];
বলে ধত্তুম্ লাজ গরে।

যুবতী — (মইন ঘরৎ খের[৮০৪] ঝাড়ি;)
মুই থেইম্[৮০৫] বেরা—ঘাজি[৮০৬]।

যুবক — বেল্যা নিগল্যে তিতি[৮০৭] পেইক্[৮০৮],
থবাক[৮০৯] বাজ্যেম্বই[৮১০] নিছিরোইৎ[৮১১]।

ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য ভদ্র পরিবারে এতাদৃশী স্বেচ্ছাচারিতা পূর্বকালেও ছিল না, এবং এখনও নাই। বর্তমানে সাধারণ চাক্‌মাগণের মধ্যেও কচিৎ মাত্র দেখা যায়।

বিমিশ্র সঙ্গীত

প্রধান কয়ভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। এতদ্ভিন্ন কতিপয় গীতকে বিমিশ্র শ্রেণীভুক্ত করা যায়; তাহাতে বিমিশ্র ভাবের সমাবেশ থাকে। এগুলি বেশ লম্বা লম্বা; তবে এক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের অর্থগত সম্বন্ধ খুব বিরল — কেবল ছড়ার ন্যায় কতকগুলি এলোমেলো কথায় গ্রথিত মাত্র। যথা ঃ—

১। দীঘলি বাগৎ[৮১২] চরের মৈছ্[৮১৩],
সমারে[৮১৪] বেড়াদন্[৮১৫] নন্ — ভৈজ্[৮১৬]।
দগরের কুদুগী[৮১৭] ছন— বনৎ[৮১৮];
যত কূট্যারি[৮১৯] তার মনৎ[৮২০]।
পানি খেই ন্যাই[৮২১] পনখুন[৮২২];
দুখন তুলিজ[৮২৩] মনখুন[৮২৪]।

(৭৯৯) তামাক, (৮০০) সাজাই; (৮০১) ত — তামাক সাজাইতে তন্নিম্নে যে কঙ্কর দেওয়া হয়, (৮০২) শিলাবাসী কাঁকড়া, (৮০৩) ভয় করে, (৮০৪) খড়, (৮০৫) থাকিব, (৮০৬) বেড়া ঘেঁসিয়া, (৮০৭) অপরাহ্নে বা রাত্রিতে বাহির হইলে, (৮০৮) চাতক পক্ষী, (৮০৯) মঞ্চের ঠেস্ বিশেষ, (৮১০) ঘা দিব গিয়ে, (৮১১) নিশীথ রাত্রি, (৮১২) (খোলের) দীর্ঘ বাঁকে, (৮১৩) মহিষ, (৮১৪) সঙ্গে, (৮১৫) বেড়াইতেছে, (৮১৬) ঠাকুর ঝি ও জ্যেষ্ঠ ভাতৃবধূ, (৮১৭) স্ত্রীসজারু, (৮১৮) "ছনবনে", (৮১৯) কূটবুদ্ধি, (৮২০) তাহার মনে, (৮২১) খাইয়া, (৮২২) পরিষ্কার থেকে, (৮২৩) দুঃখ তুলিও না, (৮২৪) মন হইতে

২। বার্চ্ছি[৮২৫] বিয়া[৮২৬] পলগে[৮২৭],
নোয়া জুস্মান্[৮২৮] কাবি কলগে[৮২৯];
কলগৎ উদিল্ পদনা[৮৩০];
তদেগ্ পুঝি মদনা,
মদনা তদেগে কদা কয়,
খাদৎ[৮৩১] উজেল্লি[৮৩২] সদাগর;
মুজুনা[৮৩৩] মাদি পিচ্ছোলে[৮৩৪];
ইখুন্‌বেচ[৮৩৫] ভালা করিবো ঈশ্বরে।

৩। অজল[৮৩৬] পাগর্য্যা নীজঝুপ্[৮৩৭];
দিন দিন পরেল্লি[৮৩৮] কোলিযুগ[৮৩৯],
কোলিযুগৎ সত্য নেই,
বুগচিরি দেগেলে[৮৪০] পত্ত্য[৮৪১] নেই।

৪। ছ্বরা উজানি তুত্তং মাছ[৮৪২];
গুজরি[৮৪৩] পরেত্তি[৮৪৪] বৈশাখ মাস;
বৈশাখ মাসেনি ধান্ কজা[৮৪৫];
উত্তর ধাকদ্[৮৪৬] পানকদা[৮৪৭];
কুজি কুজি[৮৪৮] ছিনাং[৮৪৯] পান;
উথ্যে পুগেদি[৮৫০] পুনং চান[৮৫১]।
পুনং চানে সাজ ধল্য[৮৫২];
হাজেদুং[৮৫৩] মাজেদুং[৮৫৪] লাজ গল্য[৮৫৫]।

৫। কুকুর পুছিহাদ্ দবা[৮৫৬],
হাদ্ দবা-ছ[৮৫৭] নাক্ দবা;
নাক্‌দবা-ছ ভোমরা;
লড়াই নিল[৮৫৮] চোঙরা[৮৫৯];

(৮২৫) বড়সী, (৮২৬) বাহিয়া, (৮২৭) লোফাইয়া, (৮২৮) নূতন জুমখানি, (৮২৯) গিরিগহ্বরে, (৮৩০) জুমের পোড়ার পর নবোদগতে বাঁশ, (৮৩১) ঘাটে, (৮৩২) উপস্থিত হইল, (৮৩৩) এঁটেল, (৮৩৪) মাটি পিছলায়, (৮৩৫) ইহা হইতে বেশী, (৮৩৬) উচ্চ, (৮৩৭) গাছবিশেষ, ঝোঁপ নীচ, (৮৩৮) আসিয়া পড়িতেছে, (৮৩৯) কলিযুগ, (৮৪০) বক্ষ চিরিয়া দেখাইলে, (৮৪১) প্রত্যয়, (৮৪২) দীর্ঘ ঠোঁটবিশিষ্ট মাছ, (৮৪৩) গর্জ্জন করিয়া, (৮৪৪) আসিয়া পড়িতেছে, (৮৪৫) ধান্যবপন, (৮৪৬) উত্তর পার্শ্বে, (৮৪৭) পানের বর, (৮৪৮) কাঁচি, (৮৪৯) ছিন্ন করি (বহুবচনে), (৮৫০) পূর্বদিকে উঠিয়াছে, (৮৫১) পূর্ণচন্দ্র, (৮৫২) সাঁজ ধরিল অর্থাৎ আঁধার হইল, (৮৫৩) হাসিতে, (৮৫৪) কথা বলিতে, (৮৫৫) লজ্জা করিল, (৮৫৬) শ্বেতহস্তবিশিষ্ট, (৮৫৭) হাতধলার বাচ্চা, (৮৫৮) তাড়াইয়া নিল, (৮৫৯) বড় হরিণ

ধেল [৮৬০] চোঙরা গাং পার হোই [৮৬১];
সারেন্দ্ [৮৬২] কুনাদন্ [৮৬৩] রং — বারোই [৮৬৪];
এক্কোয়া সারেন্দ তিন্নোয়া খিল [৮৬৫];
তিন্নোয়া খিলৎ তিন্নান্ জিল [৮৬৬];
কানাই গাঙর [৮৬৭] দোছরি [৮৬৮];
ইছ্য [৮৬৯] লামে সুর ধরি [৮৭০];
বাচ্ছুন [৮৭১] কাবি নয় কুড়ি,
নয় কুড়ি বাঁশর তুলং ক্যাং [৮৭২];
ক্যঙে দিলুম চেরাগে [৮৭৩];
দেবায় কল্য পেরাগে [৮৭৪];
চেরাগর ধূমা [৮৭৫] লং কনি [৮৭৬];
উঠ্যে বাজারৎ [৮৭৭] অংবলি [৮৭৮]।
আংবালি বাজারৎ কি উঠ্যে?
চিগন্ চিগন্ তোবালে [৭৭৯] উঠ্যে। ইত্যাদি।

এই যে সকল সঙ্গীতের বিবরণ প্রদত্ত হইল, বলা বাহুল্য, তাহাদের সহিত কোনও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না।

সঙ্গীতে অনুরাগ

প্রথমেই বলিয়াছি, ইহারা যাত্রা, কবির গান প্রভৃতিতে যথাসাধ্য উৎসাহ দান করে। বিদেশীয় গায়কদল আসিয়া বৎসর বৎসর এই সুযোগে প্রভূত অর্থ লইয়া যায়, অথচ নিজেদের মধ্যে তাহা রক্ষা করিবার কাহারও তাদৃশী চেষ্টা পরিদৃষ্ট হয় না। কেবল তরণী সেন নামক "লার্ম্মা গোছা"র জনৈক দেওয়াননন্দন কয়েকবৎসর ধরিয়া এক যাত্রার দল চালাইয়া ছিলেন। তিনি তেমন উন্নতি দেখাইতে না পারিলেও, তদীয় উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রশংসাযোগ্য, সন্দেহ নাই। ইহাতে শিক্ষিত সাধারণের যোগ থাকিলে, আশানুরূপ উন্নতির আশা করা যাইতে পারিত। সম্প্রতি কামাখ্যা নামে অপর এক চাক্মা যুবক এপক্ষে মনোযোগ দিয়াছে। তাহার শক্তি সামান্য হইলেও, আমরা হৃদয়ের সহিত তাহার সাফল্য কামনা করি। নিকৃষ্ট বলিয়া অগ্রাহ্য করা অতি সহজ, তাহাকে উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিতেই যাহা কিছু কষ্ট। উপযুক্ত উৎসাহ ও সহায়তা পাইলে, ইহা সমাজের বহু অর্থ রক্ষা করিতে পারিবে। তাই আমি সর্বশেষে এতৎপ্রতি সমগ্র চাক্মা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বর্তমান ইতিবৃত্ত সমাপ্ত করিলাম।

---

(৮৬০) পলাইল, (৮৬১) নদীপার হইয়া, (৮৬২) সারিন্দা, (৮৬৩) কুঁদাইতেছে, (৮৬৪) সূতাব, (৮৬৫) কীলক, (৮৬৬) তাব, (৮৬৭) কানাই নদীর, (৮৬৮) দুই নদীর সঙ্গমস্থল, (৮৬৯) চিংড়ি, (৮৭০) সারি ধরিয়া, (৮৭১) বাঁশগুলি, (৮৭২) মঠ, ৮৭৩) প্রদীপ, (৮৭৪) দেবতায় বজ্রপাত করিল, (৮৭৫) ধূম, (৮৭৬) চুয়াইয়া মদ্য পড়িবার পাত্রের মুখে যে নেক্ড়া মুড়িয়া দেওয়া হয়, (৮৭৭) বাজাবে, (৮৭৮) কর্ণাভরণ, (৮৭৯) তোয়ালে।

উপসংহার

(১) বাঙ্গালী — সংস্রব — (২) মিশনারী — চেষ্টা এবং (৩) ইংরাজধিকারের ফল।

১

আমি নিজেও বাঙ্গালী; সুতরাং আমার মুখে বাঙ্গালী-চরিত্রের সমালোচনা তেমন শোভন না হওয়ারই কথা। কেননা, বাঙ্গালীসুলভ দোষগুণ ত আর আমাকে ছাড়িয়া নহে! তবে যদি সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া, আমার দ্বারা স্বীয় সমাজের কোন কলঙ্ককথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আশা করি — বঙ্গবাসিসমাজ সেই আত্মনিন্দার নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন। কতিপয় নীচ মনা লেখক বাঙ্গালী জাতিকে যাদৃশ কুৎসিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন;বাঙ্গালী — চরিত্র যে তাহা হইতে বহু পরিমাণে উন্নত, একথা অসঙ্কোচে বলা যায়। জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্‌পটুতায় কি কর্মতৎপরতায় জগতে বাঙ্গালীর তুলনা মেলা কঠিন এবং তাহাদের শক্তিও অসামান্য। পক্ষান্তরে বাঙ্গালীর শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণেরও অভাব নাই। বাঙ্গালীর দুর্বলতাও সর্বত্র প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে, তাহারা আপন দৌর্বল্য পরিহার করিয়া স্বকীয় সামর্থ্য প্রকাশে সক্ষম। বর্তমান দেশব্যাপী আন্দোলন হইতে মদীয় মন্তব্যের সত্যাসত্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কমিশনার মিঃ জন বিমসের কথায়* বলিতে গেলে — "চাক্‌মাগণ অর্ধবাঙ্গালী।" বস্তুতঃ ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ এবং আচার ব্যবহারে বাঙ্গালীর অনুকরণ যথেষ্টরূপে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এবং ইহাদের ভাষাও যে বাঙ্গলাভাষার বিকৃত অবস্থামাত্র, তাহাও যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন চাক্‌মাদিগের (উপাধি ব্যতিরিক্ত) নামগুলিও এমন বাঙ্গালী-ভাবাপন্ন যে, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে বাঙ্গালী হইতে পৃথক করা একরূপ অসম্ভব।

*Letter No. 227H
Dated – 5-9-1879

এক্ষণে দেখা যাউক, ইহাদের এই বাঙ্গালী অনুকরণ কতদূর সুফলপ্রসূ হইয়াছে। ১৮৭২ ইংরাজীর ১লা জুলাই কাপ্তেন লুইন বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন * "চাকমাগণ বাঙ্গলা বলে। বহু বৎসর ধরিয়া, বাঙ্গালী কৃষকদিগের সহিত অবাধ সম্মিলনে আমাদের রাজ্যের মধ্যে তাহারাই অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের কোন জাতির মধ্যে কাহাকেও শাসনকর্তার কার্যের বাধা ঘটাইতে দেখি নাই।তাহাদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত, তাহারা আর মনঃপ্রাণে চাক্‌মা জাতিতে থাকিতে চাহে না। ... পক্ষান্তরে প্রায় সমুদয় চাক্‌মা দেওয়ান ন্যূনাধিক পরিমাণে বাঙ্গালীদিগের সহিত

*Lette: No. 532

বসবাস করিতেছেন। ইহাতে দ্বিবিধ ফল আছে। দেওয়ান ও হেড্ম্যানগণ তাঁহাদের প্রজাগণকে চাপিয়া রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা অধিক লাভভাগী হন; এবং তাহাদিগকে অধিকতর শাসনে ˬ রাখা যায়। অপরদিকে চাক্মাদিগের মধ্যে এমন এক তেজস্কর ভাব জন্মিতেছে যে, তাহারা দেওয়ানগণ হইতে স্বকীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে প্রথমে চেষ্টা করিবে।" অনন্তর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন মিঃ পাউয়ার কমিশনার মহোদয়কে যে পত্র* লেখেন, তাহাতেও "বাঙ্গালী ও চাক্মাদিগের সম্মিলনে চাষে"র উল্লেখ আছে। ১৮৭৯ ইংরাজিতে কমিশনার বাহাদুর বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টে যে পত্র (Letter No. 227 H) লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি বলিয়াছেন — "আমরা আশা করি, চাক্মাগণ হাল চাষে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। কেননা তাহারা অর্ধবাঙ্গালী; তাই মঘদের অপেক্ষা হালচাষে অধিকতর কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছে।" সুতরাং চাক্মাদিগের হালচাষের এই উন্নতিকে বাঙ্গালী সংসর্গের উৎকৃষ্ট ফল বই আর কিছুই বলা যায় না।

*Letter No. 472

কেবল ইহা নয়, এরূপ শত শত প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে; যাহাতে দেখা যাইবে যে — বাঙ্গালীর সাহচর্যই চাক্মাদিগের বর্তমান উন্নতির মূল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভাগীয় কমিশনারগণ রাঙামাটি গভর্নমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী বোর্ডিং স্কুলে বাঙ্গালী ছাত্রের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের সদুদ্দেশ্যে অনিষ্টেরই আশঙ্কা ছিল। বাঙ্গালী ছাত্রের প্রতিযোগিতা না পাইলে চাক্মাছাত্র দিগের বর্তমান উন্নতিও যে বহু-পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ইহা বুঝিতে পারিয়াই শিক্ষিত সম্প্রদায় গভর্নমেণ্টের তাদৃশ প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিতেছিলেন। আশা করা যায়, বর্তমান বৌদ্ধাধিকার প্রবল থাকিলেও চাক্মাসমাজ বাঙ্গালী অনুকরণে অচিরে চট্টগ্রামীয় বড়ুয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় জ্ঞানোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

গ্রন্থাংশে আমরা দেখাইয়াছি, "কালিন্দী রাণী বাঙ্গালি মন্ত্রী দ্বারা পরিচালিত" "রাজা হরিশচন্দ্র বাঙ্গালী পদ্ধতির লোক" "বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁহার এত ঝোঁক যে, তিনি হিন্দুপর্ব এবং ভোজাদিও পালন করিয়া থাকেন" "রাজা আপনাকে হিন্দু বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ প্রয়াসী" ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা দ্বারা কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালী সংস্রবের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। এতৎসঙ্গে কমিশনার মি: জন, বিম্সের আরও কিঞ্চিৎ অভিমত* দেখাইয়া রাখি। — "(ডিপুটি কমিশনার) কাপ্তেন গর্ডনের রিপোর্টে দেখা যায়, পাহাড়ীদিগের মধ্যে সম্প্রতি এমন একভাব জন্মিয়াছে যে, তাহারা দীর্ঘতর সময় ধরিয়া একস্থানে তাহাদের চিফ্ বা হেড্ম্যানের কর্তৃত্বাধীন থাকিতে চাহে না। এই ভাব সম্ভবতঃ বাঙ্গালীদিগের প্রাধান্যে ঘটিয়াছে। এই বাঙ্গালীদিগের পরিচয় তাঁহার নিজের কথায় "Who are striving to impress the simple hilimen with that spirit of referring everything to law courts and questioning the validity of every order of

*Letter No. 21 H, 11-2-1879

an executive officer, which is so strong among themselves" অর্থাৎ যাহারা এই সরল স্বভাব পাহাড়ী-দিগের মনে প্রত্যেক বিষয়েই আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ এবং শাসন-কর্তৃগণের আদেশের বৈধতা বিচার করিবার ভাব-যাহা তাহাদিগের নিজেদের মনেও খুব প্রবল, উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। আমরা রোয়াজা (অর্থাৎ হেড্‌ম্যান) প্রথা প্রবর্তিত না করিলে ইহারা অধিকতররূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।" ইত্যাদি।

প্রাগুদ্ধৃত মন্তব্যে কেবল ঈর্ষ্যাপ্রকাশ ছাড়া অপর কোন যুক্তি আছে বলিয়া ত মনে হয় না। যে বাঙ্গালীদের সংমিশ্রণে চাক্‌মাদিগের এতাদৃশী উন্নতি, যাহাদের অনুকরণে মুমূর্ষ জাতি নবজীবন লাভ করিয়া সভ্যতার দাবি করিতে অগ্রসর হইতেছে, সেই বাঙ্গালী সংসর্গের প্রতি দোষারোপ করা আদৌ সঙ্গত বোধ হয় না। মিঃ বিম্‌সের অন্যান্য উক্তির সহিতও একমত হওয়া যায় না। বাঙ্গালী প্রাধান্য কি তাহাদের বাসস্থান স্থায়ী রাখিবার সাহায্য করিয়াছে, অথবা তাহাদিগকে উদাসীন প্রায় ঘুরাইয়াছে ও ঘুরাইতেছে? পাঠকবর্গ দেখিয়া আসিয়াছেন, ইহারা জুমের জন্য কেমন এখানে ওখানে ঘুরিতেছিল। এখনও যাঁহারা লাঙ্গল ধরে নাই, তাহাদের সেই দুর্গতি;— দুই বৎসর একস্থানে স্থায়িরূপে থাকিবার উপায় নাই। বাঙ্গালীই ইহাদিগকে প্রথমে চাষ শিক্ষা দেয়। অদ্যাপি অনেকে বাঙ্গালীর সহায়তা ভিন্ন নিজেরা স্বাধীনভাবে চাষ চালাইতে পারে না। যাহারা চাষ ধরিয়াছে, তাহারা স্থায়ী বসতিও স্থাপন করিয়াছে। যদিও চাষী পাহাড়ীর মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও জুমিয়ার ন্যায় বাসস্থান পরিবর্তন করিতে দেখা যায়, তাহা সম্ভবতঃ ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভাবে। সুতরাং বাঙ্গালী সংস্রবে ইহাদিগের স্থিতিশীলতার ক্ষতি হইয়াছে, এ কথা নিতান্তই ভিত্তিহীন।

মনুষ্যতালুকের সৃষ্টিতে অবশ্য রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। ইহা যদি বাঙ্গালী-পরামর্শ প্রসূত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রনাদাতার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত অজ্ঞতা লইয়া কোন এক জাতির উপর দোষারোপ করা কদাপি ন্যায়সঙ্গত নহে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালী সমাজের অপর এক দুর্নাম অর্থপিশাচ মোক্তার ও মহাজনদিগের গর্হিত উৎপীড়ন। উপযুক্ত পানে জলৌকাও তৃপ্ত হয়, কিন্তু ইহাদিগের আকর্ষণ পেট ফাটিয়া গেলেও, ছাড়িবার নহে। যাহাকে একবার পথে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে সর্বস্বান্ত করিয়া পরিতুষ্ট হইলেও, হতভাগার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল বলিতে হয়।

কাপ্তেন লুইন "ফ্লাই অন্ দি হুইলে" লিখিয়াছেন* "আমি নীচ বাঙ্গালী মোক্তারদিগের দ্বারা অতিশয় ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়াছিলাম। তাহারা পাহাড়ীদিগের অজ্ঞতা ও সারল্যের প্রলোভন আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছিল। ঘরে ঘরে ঝগড়া বাধাইয়া, তাহারা ইহাদিগকে মোকদ্দমা দায়ের করিতে উত্তেজিত করিত।" "ধূর্ত্ত বাঙ্গালী মোক্তার ও টর্নিগণ এই পার্বত্যপ্রদেশের গরলস্বরূপ। তাহাদিগকে এখান হইতে তাড়াইতে আমি কদাপি শৈথিল্য প্রকাশ করি নাই।

*Page 284

*Page 336-337

(সম্ভবতঃ মহামুনি) মেলার পরে আমি এমন এক উপযুক্ত কারণ পাইয়াছিলাম, যদ্দারা তাহাদের অবশিষ্ট তিনজনকেই স্টীমারযোগে এদেশে হইতে তাড়াইবার সুবিধা হইয়াছিল। সাধারণতঃ যেমন হয়, তাহারাও তদ্রূপ কমিশনার ও গভর্নমেন্ট সমীপে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল। তাহাতে অজ্ঞতা এবং দুর্বলতার মধ্যে কলহ বাধাইয়া ও মোকর্দ্দমা তুলিয়া কিরূপে তাহারা জীবিকানির্বাহ করিত এবং আমার বিচারের বিরুদ্ধে আইনের কূটতক ও বিপরীত বর্ণনায় অপিল করিয়া কিরূপে গভর্নমেন্টের শাসন শক্তিকে দুর্বল করিবার চেষ্টা পাইত, আমি তৎসমস্তই দেখাইয়াছিলাম। ... চতুর বাঙ্গালিগণ পাহাড়ীদিগের প্রতি অত্যাচারপূর্বক টাকা বাহির করিবার জন্য আমাদের আইনকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিত।"

সত্য কথা বলিতে কি, এই বর্ণনার কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। ভুক্তভোগী অনেক সাক্ষী অদ্যাপি পাওয়া যায়। অবশেষে গভর্নমেন্ট এই পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যবর্তী মোক্তারাদির প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাও অনেকদিন গত হইতে চলিল; তথাপি এত বৎসর পরেও সেই অত্যাচার ক্ষত আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে। সেইসঙ্গে গভর্নমেন্ট কর্তৃক উত্তরর্ণদিগের সুদের হারও শতকরা বার্ষিক বার টাকা করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু অধুনা সেই আবরণমাত্র প্রকাশ্যতঃ রাখিয়া মহাজনদিগের উৎপীড়ন অবাধে চলিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, মিতব্যয়িতার অভাবে পাহাড়ীরা প্রায়শঃই ঋণ করিতে বাধ্য হয়। যত টাকা ধার করিবে, খতে তাহার দেড়গুণ লিখিয়া দিতে হইবে, ইহা অত্রত্য চিরাগত পদ্ধতি। অন্যথা কোন মহাজন হইতেই সাধারণ লোকে কর্জ্জ পায় না। সুদ অবশ্য নিয়মাতিরিক্ত নয়। কেবল ইহা নহে, বৎসরান্তে চক্রবৃদ্ধিক্রমে সুদ-আসল যোগ করিয়া পুনরায় তাহাদিগ হইতে উক্তদেড় গুণের খৎ পরিবর্তন করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে দেয় টাকা এককালীন পরিশোধের শক্তি না থাকিলে অধমর্ণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মহাজনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন রাঙামাটী উচ্চ ইংরেজী স্কুলের হেড্মাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত রামকমল দাস মহাশয় একদা তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, এমনও একদিন গিয়াছে, — যে মহাজনেরা মৃত অধমর্ণের উত্তরাধিকারীর অভাবে তাহার শ্মশানোত্থিত ধূম যেইদিকে গিয়াছিল, সেই প্রতিবেশীদের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করিত! উঃ কি ভয়ানক ব্যবস্থা। ইহাকেই "বে-আইনী মুল্লকে"র বিধি বলা যাইতে পারে বটে! এখানকার মহাজনেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান উপলক্ষ করিয়া বসিয়া আছে। প্রজ্ঞাদৃষ্টিশালী দেখিতে পান — নির্মম দস্যু ছদ্মবেশে শিকারের প্রতীক্ষা করিতেছে! এ সম্বন্ধে আমি নিজে আর কিছু না বলিয়া কাপ্তেন লুইনের "ফ্লাই অন্ দি হুইল" হইতে আর একটি চিত্র উঠাইয়া দিতেছি, যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "আমি অবাস্তব কোনও ঘটনা জানাইব না। ইহা কাল্পনিক নহে; আমি ইহা হইতে আরও শোচনীয়

*Page 338

উদাহরণ জানি। "জনৈক পাহাড়ী মহাজনের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিলে, মহাজন বলিল, — বন্ধু, বেশ ভালই হইল; এই দেখ — আমি তোমার খৎ নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি।" এই বলিয়া সে উক্ত পাহাড়ায় খতের বদলে অপর এক পুরাতন কাগজ ছিঁড়িল। ঐ বেচারী লিখিতে বা পড়িতে জানে না; সুতরাং মহাজনের দায় হইতে মুক্ত হইল ভাবিয়া, আনন্দের সহিত ঘরে গেল।

"মহাজন কিছুকাল পরে উক্ত খৎ মূলে সেই পাহাড়ীর বিরুদ্ধে সুদ ও আসলের চক্রবৃদ্ধি কষিয়া নালিশ উপস্থিত করে। এই পাহাড়ীকে আমরা নীল চন্দ্র বলিব। উপস্থিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথা নিয়মে নীলচন্দ্রের নামে সমন জারীও করা হয়। মোকদ্দমার শুনানির দিন মহাজন তদীয় নৌকার মধ্যে থাকিয়া নীলচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরে তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি অনুরাগপূর্ণ মুখ এবং স্বরে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করণাভিপ্রায়ে বলিল, 'প্রিয়বন্ধু সত্যই আমি দুঃখিত হইতেছি যে, আমার ভ্রমে তুমি কত কষ্ট ও পথশ্রম পাইয়াছ। তোমার আর আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। সমনখানি আমাকে দাও। আমি সাহেবকে প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিব। ততক্ষণ তুমি আমার ঘরে গিয়া খাও এবং মদ্যপান কর।

এইরূপে সেই হতভাগ্য মাছি আহার ও পানের নিমিত্ত গেল আর সে সময়ে চতুর উর্ণনাভ আদালতে চলিল। এদিকে যথাসময়ে মোকদ্দমার ডাক হইল, নীলচন্দ্রকে উপস্থিত না পাইয়া মহাজনের সম্পূর্ণ দাবিতে মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রী হইয়া গেল। অনন্তর মহাজন স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তদীয় দায়িককে আতিথেয়তা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী পাঠাইয়া দিল। আপিলের ম্যাদ গত হওয়ার পূর্বে তাহাকে আর কোন কথা বা চিহ্ন জানাইল না। ইহাতে ডিক্রী বলবৎ হইয়া দাঁড়াইল। অনন্তর ঐ দুর্ভাগ্য পাহাড়ীর মস্তকোপরি ঝঞ্ঝা-বাত ঘুরিতে লাগিল। সে ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, অপরিমেয় ঋণে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। এরূপ কার্জ্জে সে আর কোন দিন পড়ে নাই এবং পরিশোধ করিবারও আশা করিতে পারে নাই। কাজেই সে প্রকৃত পক্ষে অবশিষ্ট জীবনের নিমিত্ত মহাজনের দাস হইয়া রহিল। যদিও এ পাহাড়ে প্রকৃত ন্যায়পর উত্তমর্ণও আছেন, কিন্তু তথাকথিত মহাজনের সংখ্যাই বিশেষ প্রবল। বস্তুতঃ তাহাদিগের এতাদৃশ জঘন্য ব্যবহার কখনই মার্জ্জনীয় নহে। তাহাদের কৈফিয়ত যে, আমরা ব্যক্তিবিশেষের সহিত এরূপ করি বটে, কিন্তু আবার অনেকেই আমাদিগকে প্রতারিত করে। গড়ে হিসাব করিলে, আমরা যে বেশী কিছু লাভ করি, এমত নহে, বস্তুতঃ অনেকেই যে মহাজনের টাকা 'বেমালুম হজম' করিয়া ফেলে, ইহাও অসত্য নহে। শুনিয়াছি, সহৃদয় গভর্নমেন্ট মহাজন-দিগের উৎপীড়ন সংবাদে ব্যথিত হইয়া অধমর্ণাদিগকে এক সময়ে ২৮০০০ হাজার টাকা ধার দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অর্দ্ধেক টাকাও আদায় হয় নাই, — 'অন্য পরে কা কথা?' সুতরাং এরূপস্থলে অল্পসুদে কুসীদ ব্যবসায়ীদের পোষাইবে কেন? তাই বলিয়া তাহারা যে বামের চাপড় খাইয়া শ্যামের বুকে ছুরি বসাইবে, ইহাও সর্বতোভাবে গর্হিত ও নিন্দনীয়! রাজা

ভুবনমোহন রায় মহোদয়ের ঐকান্তিকী চেষ্টায় সম্প্রতি গভর্নমেন্ট হইতে আদেশ হইয়াছে, কোন উত্তমর্ণ অধমর্ণের সম্বৎসরোপযোগী খাদ্য সংস্থান না রাখিয়া মাল ক্রোক করিতে পারিবে না। ইহাতেও নিরুপায় পাহাড়ীদিগের অশেষ উপকার হইয়াছে। সুখের বিষয়, সহৃদয় গভর্নমেন্ট পাহাড়ীদিগকে স্বয়ং ঋণ দিয়া মহাজনদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন। আশা আছে, এতদ্বারা তাহাদের সর্বস্বান্ত হওয়ার কারণ অচিরেই বিদূরিত হইবে।

কাপ্তেন লুইন বাঙ্গালী চরিত্র সম্বন্ধে আর যে সব মন্তব্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন ঈর্ষাপ্রসূত। বস্তুতঃ তিনি বাঙ্গালী — চরিত্রের বিকৃতি অঙ্কনে সাতিশয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কোন কোন স্থানে তিনি বাঙ্গালীদের অকর্মণ্যতা প্রতিপন্ন করিতেও চেষ্টা পাইয়াছেন। বোধ হয়, বাঙ্গালী কর্মচারীগণ তদীয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া অভিযোগাদি করিয়াছিলেন;তাহাতেই তিনি "ফ্লাই অন্ দি হুইলে" লিখিয়াছেন* "বাঙ্গালী বাবুরা যখন দেখিলেন যে, আমার বিরুদ্ধে আবেদন ও অভিযোগ সমুদয় পন্ড হইয়া গেল, তখন তাঁহারা একযোগে কর্ম পরিত্যাগ করেন।" ... "সুতরাং আমি বার্মিস ক্লার্ক আনাইয়াছিলাম।" কিন্তু আমরা তদানীন্তন রাজকর্মচারী (বর্তমান সব ডেপুটী কালেক্টর) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের মুখে শুনিতে পাই — মিঃ লুইন বাঙ্গালিগণকে তাড়াইয়া তাহাদের পদে (আরাকানী) মঘ কেরানী নিযুক্ত করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু অবশেষে তাহাদিগের দ্বারা, কাজ চলে না দেখিয়া, বাঙ্গালীদিগকে পুনরায় আহ্বান করেন এবং তাহাদের পদোন্নতি করিয়া দিয়া মনোমালিন্য দূর করেন। হায়, তথাপি তিনি খোঁচা দিতে ছাড়েন নাই। অপর এক স্থলে* লিখিয়াছেন, — "আমি একজন ভিন্ন অপর সকল বাঙ্গালীবাবু হইতে পৃথক ছিলাম। ধর্মাধিকরণে মদীয় উপযোগিতা লোকে তখন বুঝিল! বস্তুতঃ তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা সমর্থন কল্পে যাহাই লিখুন না কেন, তাহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ করিবার স্থান ইহা নহে। তিনি বাঙ্গালা বাবুগণের সম্পর্কে কিরূপ ছাড়িয়াছিলেন, তাহা তখনকার বাঙ্গালীসমাজ কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তদানীন্তন কর্মচারিগণ হইতে অধুনা এরূপ সাক্ষ্যই পাওয়া যায়।

*Page 361

*Page 363

যাক্, বাঙ্গালী চরিত্রের সাফাই গাইতে গিয়া অনেক বাজে কথা বকিলাম। মোট কথা, বাঙ্গালী-সংস্রবে চাক্‌মাদিগের ইষ্টানিষ্ট দুই ঘটিয়াছে। বাঙ্গালীদের হইতে তাহারা ভাষা, শিক্ষা, চাষ ও বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল দুর্লভরত্ন লাভ করিয়া আজ সভ্য সমাজে পরিচিত হইতেছে, তজ্জন্য তাহারা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী-জীবনের স্বভাবগত যে দোষ, তাহাও তাহাদিগেতে সংক্রামিত না হইয়া যায় নাই। আমরা পাশ্চাত্য জাতির কাছে যে পরিমাণে বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইয়াছি, চাকমাগণও আমাদের সঙ্গফলে প্রায় তৎসমস্তই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। অবশ্য, ইহাতে ইংরেজাধিকারও মুখ্যভাবে কম সাহায্য করে নাই। আর একটি দৃষ্টানুকরণ — চাকরী। কিন্তু ইহাতে প্রচলিত শিক্ষারই ফল বলিতে হইবে। ফলতঃ বাঙ্গালীর

সংসর্গে যা কিছু সামান্য অনিষ্ট ঘটিলেও, তাহাদের দ্বারা প্রভূত উপকার লাভ হইয়াছে। নতুবা তাহাদের বর্তমান অভ্যুদয় কদাপি সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রমাণ পার্বতীয় অপরাপর জাতি এযাবৎ বহুদূরে পড়িয়া আছে।

এই চাক্‌মা ও বাঙ্গালীর সংস্রব আরম্ভ হইয়াছে, আজ কালের কথা নহে। 'দেঙ্গ্যাওয়াদি আরে দফুং" এ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও এতৎ সম্বন্ধে পরিচয় পাইয়াছি। তখন তাহাদিগের মধ্যে যে একতার ভাব দেখা গিয়াছিল, আরও বহুকালপূর্বে যে তথাকথিত সংস্রব আরম্ভ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ক্রমে পরস্পরের সম্বন্ধে এত ঘনিষ্ঠ হয় যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগেও বাঙ্গালিগণ চাক্‌মা-রাজার মন্ত্রী ছিলেন। যাহা হউক বড়ই সুখের কথা যে, বর্তমানে ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ধর্মে, কর্মে, ভাষায়, কথায় শিক্ষাদাতা বাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার উপযুক্ত হইয়াছে। কোন কোন বাঙ্গালী তাহাদের 'বাঙাল' আখ্যায় — বাঙ্গালীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন মনে করিয়া দুঃখিত হয়। কিন্তু আমরা তাহা সরল প্রাণের মধুর সম্ভাষণ বোধে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরাও পূর্ববঙ্গবাসিগণকে 'বাঙাল' ডাকেন এবং উড়িষ্যাবাসীদিগকে আমরা 'উড়ে' বা 'উড়িয়া' বলি, তজ্জন্য কাহারও মনে কষ্টগ্রহণ করা কর্তব্য নহে।

২

মনুষ্য সমাজের অধ্যুষিত ভূমন্ডলের এমন কোন স্থান আছে কিনা জানি না, যথায় খৃষ্টিয়ান মিশনারী মহোদয়গণের ধর্মালোকরশ্মি বিকীর্ণ হয় নাই। পথে-ঘাটে-বনে-জঙ্গলে — সর্বত্রই তাঁহাদের গতিবিধি। অবিচলিত উৎসাহে, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে যাবতীয় বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্মবিস্তার চেষ্টায় তৎপর দেখা যায়। বস্তুতঃ যাঁহারা ঈদৃশী সাধনায় নিরত, তাঁহারা এবং তাঁহাদের সাহায্যকারীগণ মহামতি যীশুর প্রকৃত আশীর্বাদভাজন ও সমাজের প্রশংসার পাত্র।

সম্ভবতঃ সকলেই অবগত আছেন যে, এই মিশনারীসমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে "লন্ডন ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি" সর্বপ্রথম ১৮১২ খৃষ্টাব্দে আসিয়া চট্টগ্রাম ও এই পার্বত্য প্রদেশের দক্ষিণাংশে কার্যারম্ভ করেন। এই প্রথম উদ্যোক্তার নাম রেভঃ, ডি. ব্রুইন। কিন্তু তিনি অতি অল্প দিন পরে তাঁহারই কর্তৃক দীক্ষিত জনৈক মঘ-বালকহস্তে নিহত হন। তৎপরবর্তী মিশনারী রেভঃ পিককও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর রেভঃ ফিঙ্ক আসিয়া কার্যভার গ্রহণ করিলেন। তদীয় চেষ্টায় দুই বৎসরের মধ্যেই কক্সবাজার ও তৎসমীপবর্তী কয়েকটি গির্জায় ১৬৩ জন ধর্মান্তরিত পাহাড়ী যোগদান করিতেছিল, কিন্তু প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং অধিকাংশ জ্বর ও যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে রেভঃ ফিঙ্কের চেষ্টা ও অধ্যবসায় সমস্ত পন্ড হইয়া যায়। অতঃপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এতদ্দেশে এই সম্প্রদায়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কেবল "ফ্লাই অন্দি

হুইলে" দেখিতে পাই, কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন, — এখানে ধর্মপ্রচারার্থে জনৈক মিশনারীকে পাইবার জন্য, আমি কলিকাতাবাসী মিশনারীদের সহিত চিঠি লেখালেখি করিয়াছিলাম। আমি যখন বুঝিলাম যে, এ সকল সরল জড়োপাসক-দিগের মধ্যে ধর্ম-প্রচারের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তখন আমার নিজ হইতে উক্ত মিশনারীর অর্ধেক বেতন দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। পরন্তু এ বিষয়ে আমি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগকে সম্মতি প্রদান করি নাই।" ইতি — ইহা ১৮৬৬ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের কথা হইলেও, চেষ্টা বা সঙ্কল্পমাত্র ফলে কিছুই হয় নাই। অধিকন্তু আমরা এই শেষ কয় পংক্তি হইতে তদীয় অন্তঃকরণ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। — তিনি স্বধর্মপ্রেমে এমনি মাতোয়ারা ছিলেন যে, ভিক্ষুগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

*Page 379

যাহা হউক, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রেভঃ ডি. ক্রজ্ চট্টগ্রামের কার্যভার গ্রহণ পূর্বক দ্বিতীয় চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি বৎসরে একবার মাত্র এই পার্বত্যপ্রদেশে প্রচারার্থ পর্যটন করিতেন, তাহাতেও নাকি তিনি জ্বরে এরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন যে, অবশেষে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর রেভঃ ম্যাক্লিন তদীয় স্থলাভিষিক্ত হন। তখন হইতে এই সম্প্রদায় প্রকৃত ফলপ্রসূ হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৫ অব্দে ম্যাক্লিন দীর্ঘ বিদায় লইয়া স্বদেশে যান; প্রত্যাবর্তন পথে 'পোর্ট সেইডে' নিউমোনিয়ায় (Pneumonia) পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার পর রেভাঃ ডোনেল্ড কর্মভার গ্রহণ করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি নিয়মিতরূপে কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৯ অব্দে অবসর গ্রহণকালে তিনখানি 'আউট স্টেসন' এবং ৭৫ জন মেম্বরবিশিষ্ট একখানি গির্জ্জা রাখিয়া যান।

বলা বাহুল্য, মিশনারীগণের প্রাগুক্ত যাবতীয় চেষ্টা প্রধানতঃ চট্টগ্রামেই চলিয়াছিল। ইহাতে চাক্মা সম্প্রদায়ের দূরের কথা, এই পার্বত্যপ্রদেশের সহিতও সম্বন্ধ অতি সামান্য ছিল। অনন্তর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রেভঃ জর্জ্জ হিউজ এবং তদীয় পত্নী আসিয়া উক্ত কার্যভার গ্রহণ করেন। ইহারা এই মিশন কার্যে আত্মসমর্পন করিবার পূর্বে উভয়েই ইংলন্ড এবং ওয়েল্সে বহুকাল ধরিয়া শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বর্তমান কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, এই পার্বত্যপ্রদেশের কার্যে, চট্টগ্রামে থাকিয়া সাময়িক পরিদর্শন অপেক্ষা নিকটে থাকিতে পারিলেই অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত তাঁহারা রাঙামাটিতে অত্রত্য হেড্ কোয়ার্টার স্থাপন করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন এখানে বর্তমান সুরম্য 'বাংলা' নির্মিত হয়, তখন হইতেই তাঁহাদের কার্যালয় এখানে স্থায়িরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃই তাঁহাদের আশা সফলতা লাভ করিয়াছে; সেই বৎসরেরই শেষভাগে তাঁহাদিগের সম্প্রদায়-সংখ্যা ৬০০ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্যাভার বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি একজন ইউরোপীয় সহকারীও পাইলেন। তাঁহারা এখানে শিক্ষা-সাহায্যেও মনোযোগ অর্পণ করেন। চৌদ্দখানি গ্রামে পাঠশালা খোলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিনখানিতে 'বোর্ডিং'ও ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র

পাওয়া দুর্ঘট হইল। প্রচারের সুবিধার্থে অনন্তর তাঁহারা চিকিৎসা-সাহায্য উন্মুক্ত করিলেন। তজ্জন্য লন্ডনের সুশিক্ষিত ডাক্তার জি. ও. টেইলর এম.বি.;এফ.আর.পি.এম., সস্ত্রীক আসিয়া যোগদান করেন। তদীয় পত্নীও একজন তত্রত্য সুশিক্ষিতা ধাত্রী, ইতোপূর্বে লন্ডন নগরের কোন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাগারে "সিষ্টার" (Sister) স্বরূপে কিছুকাল কার্য করিয়াছিলেন।

১৯০৬ অব্দে তাঁহারা চন্দ্রঘোনায় দ্বিতীয় কার্যক্ষেত্র খোলেন। তথায় সুপ্রসিদ্ধ "লুইনের পাহাড়ে"র উপর অপর এক রমণীয় 'বাংলা' বিনির্মিত হয়। এই স্টেশনের ভার ডাঃ টেইলার এবং তদীয় পত্নীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহাদের চিকিৎসা-সাহায্যে কেবল পার্বত্যগণ নহে, প্রতিবেশী হিন্দু মুসলমান অধিবাসিগণও প্রভূত উপকার লাভ করিতেছে। পরবর্তী বৎসর তাঁহারা এক 'আউট ডোর ডিস্পেন্সরী' খুলিয়াছেন, গত সনে এক সুবৃহৎ ইষ্টকনির্মিত (Arthington) 'হস্পিটাল' প্রস্তুত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই নূতন স্টেশনের নিমিত্ত যদিও তাঁহাদের অর্ধলক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা ইতোমধ্যেই বহুসহস্র পীড়িত ব্যক্তি অশেষ উপকার লাভ করিয়াছে।

মিশন সম্প্রদায়ের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী একরূপ প্রদত্ত হইল, এক্ষণে তাঁহাদের বর্তমান পরিচালকগণের একটি স্থূল পরিচয় দিয়াই মদীয় বক্তব্য শেষ করিতেছি। এই সম্প্রদায় পরিচালনে অধুনা —

মিশনারী — রেভঃ জি. এবং মিসেস্ হিউজ তাঁহাদের সহকারী — রেভঃ পি. এইচ., জোন্স এবং রেভঃ প্রিয়নাথ সাঁৎ।

ডাক্তার — জি. ও. এবং মিসেস্ টেইলার তাঁহাদের সহকারী — শ্রীযুক্ত ডাঃ রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস (এসিঃ) এবং শ্যামাচরণ চাক্‌মা (কমপাউন্ডার)। এতদ্ব্যতীত নয়জন পাহাড়ী প্রচারক এবং তেরজন বাঙ্গালী ও পাহাড়ী শিক্ষক আছেন।

আশা করি এতদ্দ্বারা প্রিয় পাঠকমণ্ডলী তাঁহাদের চেষ্টার উগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বলিব কি, এত প্রাণপণ যত্ন চাক্‌মাসমাজে অতি অল্পই ফলপ্রসব করিয়াছে। পূর্বে যে শিক্ষা সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তৎকল্পে তাঁহারা এই চাক্‌মাপ্রধান চাক্‌মা সার্কেলে কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক স্কুল রাখিয়াছিলেন। যদিও সেইসকল কোনও স্কুলে খৃষ্টিয়ান শিক্ষক না এবং খৃষ্টিয়ান উপদেশও দেওয়া হইত না, তথাপি চাক্‌মাগণ তাঁহাদের প্রতি এত অবিশ্বাসী যে, অপর শিক্ষা-সাহায্য অভাবে তাহারা সন্তানগণকে অশিক্ষিত রাখিত, তবুও এইসব বিদ্যালয়ে পড়িতে দিত না;অধিকন্তু সামান্য সামান্য বাধাও উপস্থিত করিত। ইহাতে তাঁহারা সেই সকল স্কুল বন্ধ করিয়া দেন। এখানে কেবল খৃষ্টিয়ান বালকদিগের আবশ্যকোপযোগী ২।৩ খানি স্কুল মাত্র রাখিয়া তাঁহাদের অবশিষ্ট শিক্ষা-সাহায্য বোমাং সার্কেলে স্থানান্তরিত

করিয়াছেন;তথায় কাপ্তাই উপত্যকাবাসী বহুসংখ্যক মঘ তাঁহাদের অনুযাত্রী হইয়াছেন। আশ্চর্যের কথা, — এই স্থূল সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতেও চাক্‌মা-সমাজ দুঃখিত নহে, বরং যেন তাহারা বলিতেছে — 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!"

এইরূপে, মিশনারী চেষ্টা খুব প্রবল হইলেও, বিরাট চাক্‌মা সম্প্রদায় হইতে তাঁহারা অতি সামান্য সহানুভূতিই পাইয়াছেন। এ যাবৎ সোনারাম, শ্যামাচরণ, রঘুমণি প্রভৃতি ৩, ৪ জন মাত্র তাঁহাদের দলভুক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ভদ্রপরিবারসম্ভূত যে একজন ছিলেন, তিনি আবার বৌদ্ধধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত তিনজনই তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিতে একান্ত বাধ্য। কেননা, এই সোনারাম অতি দরিদ্র চাক্‌মার সন্তান ছিল। প্রথমে বাসার চাকরী মাত্র অবলম্বন করিয়া চট্টগ্রাম যায়, তাহাতেই মিশনারী আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু তাঁহারাও তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজে পর্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে সে তাঁহাদের সহকারীরূপে প্রচারের কার্যে আছে। শ্যামাচরণও দরিদ্র-সন্তান, শিশুকালে পিতৃহীন হইয়া জনৈক ত্রিপুরার অন্নে প্রতিপালিত হয়। অধুনা তাঁহাদের সাহায্য লাভ করিয়া কমপাউন্ডারী কার্যে অগ্রসর হইয়াছে। অপর রঘুমণি এক দীন হীন বৃদ্ধ, তাহার জীবিকা নির্বাহের দ্বিতীয় উপায়ই নাই। বস্তুতঃ এই ধর্মোন্মত্ত মিশনারী সম্প্রদায় বাড়ী ঘর আত্মীয় বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় এই সুদূর দুর্গম প্রদেশে দুশ্চর-প্রচার ব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়া আছেন। তাঁহাদের এত অর্থব্যয়, এত ক্লেশ স্বীকারেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া মনে দুঃখ হয়। তবে আশ্বাসের কথা এই যে, রেভঃ হিউজ মহোদয় আমায় লিখিয়াছেন, — "The results therefore from among the Chakmas has not been great. The number of baptised Chakmas in membership with the Christian church is small, but the number of equirers and of those who believe in the 'Lord Jesus Christ' as their saviour is by no means inconsiderable." অর্থাৎ 'তাই চাক্‌মা সম্প্রদায়ের মধ্যে ফল এত বেশী নহে। গির্জাভুক্ত চাক্‌মা খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং প্রভু যীশু খীষ্টকে পরিত্রাতা স্বরূপে বিশ্বাসকারীর সংখ্যা কোনরূপে মন্দ নহে।' তিনি আরও বলেন, — 'The missionaries are inspired with the hope, that when the sense of fear of consequences which now animates so many of the people passes away, the number of additions to the church will be large; and that this timidity will pass, may, is passing they feel absolutely confident.' অর্থাৎ 'মিশনারীগণ আশায় উৎফুল্ল আছেন যে, এই অসংখ্য লোক যাহার পরিণামফলের ভয়ে এক্ষণে কাতর রহিয়াছে; যখন তাহাদের এই ভয় চলিয়া যাইবে, তখন গির্জায় দীক্ষিতের সংখ্যা ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাইবে এবং এই ভীরুতা দূর হইবে, না — চলিয়া যাইতেছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে (খৃষ্টিয়ানদের পরিণাম ফলে) বিশ্বাস উপলব্ধি করিতেছে।



সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন মঙ্গল কি অমঙ্গলের নিমিত্ত হইয়াছে. তাহার বিচার বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। আর তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষ মন্তব্য ইংরেজ বা আমাদের কাহারও হইতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা এক্ষেত্রে উভয় পক্ষই স্বার্থসংপৃক্ত। তবে ইহা নিশ্চিত যে, সেই বৈদিক যুগ হইতে বিচার করিলে এ জগতে আমাদের স্থান বহু উচ্চে অবস্থিত;আর তাহা ছাড়িয়া দিলে বর্তমান যুগে আমরা ইংরেজ হইতে অনেক শিখিয়াছি, এবং এখনও আমাদের সেই শিক্ষা পূর্ণ হয় নাই। যাহারা এককালে সহোদর ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহাতে বিজাতিকে আনিয়া বসাইয়াছিল এবং তাহাদের সহিতও মনোমালিন্য হওয়ায়, অপর এক বৈদেশিক শক্তিকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল, আর এক্ষণে সেই ভারতবাসী আসমুদ্র-হিমাচল ব্যাপিয়া রাজনৈতিক অধিকার লাভের আন্দোলন ধরিয়াছে — ইহাও ইংরেজ-শাসনের অন্যতম শুভময় ফল নহে কি? সে যাহা হউক, এই প্রবন্ধ তাদৃশ রাজনীতিক গবেষণার নিমিত্ত নহে। ইংরেজাধিকারে কেবল চাক্‌মাজাতির ইষ্টানিষ্ট পর্যালোচনা মানসেই ইহার অবতারণা।

একটি কথা প্রথমে এস্থলে উল্লেখ করিতেই হইতেছে। সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য, রাজপুরুষগণও মনুষ্য বটেন, সুতরাং রাজশক্তি ব্যতিরিক্ত মানব-সুলভ দুর্বলতাও তাঁহাদেরও মধ্যে রহিয়াছে। তবে কাহারও কাহারও তাদৃশ দুর্বলতা রাজশক্তির রুদ্রমুর্তি অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। এই গ্রন্থে তাদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব নাই সত্য, কিন্ত অতীব দুঃখের সহিত তৎসমুদায় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বলিতে কি, অনেক কথা আমরা চাপিয়া যাইতে ত্রুটি করি নাই। কেননা, ব্যক্তিগত স্বার্থচেষ্টা অতি নীচতারই পরিচায়ক; পবিত্র রাজশক্তির ভিতর দিয়া তাহা দেখাইতে গেলে, রাজারই অবমাননা করা হয়। তথাপি যে কয়েক কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি, ন্যায় ধর্মের মর্যাদানুরোধে মাত্র। তাঁহাদের তথাকথিত কার্যকে কেহ রাজবিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করিলে, মহাভ্রমে পতিত হইবেন।

মির মহম্মদ কাসিম বঙ্গের সিংহাসনারোহণ করিয়া কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইংরেজ কোম্পানীকে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের সর্বাধিকারীত্ব দানে পুরস্কৃত করেন। তদবধি চট্টগ্রামের ভাগ্যচক্রের সঙ্গে সঙ্গে চাক্‌মাদিগের অদৃষ্টনেমিও ইংরেজ-হস্তে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। তবে তদানীন্তন চাক্‌মারাজগণ করদ ও মিত্ররাজপ্রায় ব্যবহৃত হইতেন। রাণী কালিন্দীর শাসনকাল হইতেই মিত্রতাবন্ধন ক্রমে অধীনতাশৃঙ্খলে দৃঢ়তর করিবার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরেজাধিকারে চাক্‌মাসমাজে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে যেমন আঘাত পড়িয়াছে; সাধারণের সুখ-সুবিধা তেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ কথায় কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বর্তমান সভ্যতাদীপ্তযুগে ব্রিটিশ শাসন না আসিলেও তাদৃশ সুযোগ পাওয়া যাইত। উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা অপরাপর স্বাধীন ও মিত্ররাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে পারি না। কারণ পৃথিবীর

বক্ষে লব্ধ প্রতিষ্ঠ এতাদৃশ পরক্রমশালী জাতির অধীন না হইলে, তাহাদের বর্তমান উন্নতি অন্ততঃ সর্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সংঘটিত হইত কিনা, গভীর সন্দেহ আছে। ইতিপূর্বে যে মুসলমানাধীনে ছিল, তৎকালীক ইতিবৃত্তও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলাময় এবং অশান্তিতে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ রাজা প্রবল প্রতাপশালী না হইলে দেশের শান্তিরক্ষা একরূপ অসম্ভব। তখন দক্ষিণে মঘ, পূর্বে কুকি এবং উত্তরে ত্রিপুরারাজের ক্ষমতাও কম ছিল না, মুসলমানরাজ একমাত্র পশ্চিমে থাকিয়া আশ্রিত-রাজ্যের কত আর শান্তিবিধান করিতে পারেন! ইংরেজ এদেশের একচ্ছত্র সম্রাট, সুতরাং তাঁহাদের হইতে যথার্থ আশা করা যাইতে পারে।

গ্রন্থভাগেও প্রদর্শিত হইয়াছে, ইংরেজাধিকারের প্রথমভাগ পর্যন্ত এতদ্দেশে নির্মম কুকিদিগের শোচনীয় অত্যাচার অব্যাহতপ্রায় চলিতেছিল। তাহাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখিয়া অনন্তর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে গভর্নমেন্ট দেশ সুশাসনকল্পে যেই প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপদ্রবও কমিতে লাগিল। হায়, তখন ধনী-নির্ধন কাহারও ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ ছিল না। সকলেই সপরিবারে সতত সশঙ্কিত থাকিত। তাহাদের ভয়ে স্বামী-স্ত্রীকে, মাতা-সন্তানকে, পুত্র-জরাজীর্ণ পিতামাতাকে ফেলিয়া পালাইয়াছে। এরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অধিক কি, সুদূরবাসী আমরাও শিশুকালে "লেংটা কুকি"দিগের তাদৃশ পাশবিক অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া শুনিয়া ভয়-ব্যকুল হইতাম। আর এক্ষণে আসিয়া যাহা দেখিতেছি, তদ্দ্বারা তাহারা যে কোন কালে তেমন হিংস্র-চরিত্রের ছিল — কিছুতেই ধারণা হয় না। "বাবু" দেখিলে, কাছে আসিতেও ভয় পায়, এবং একজন "বাবুর" সমভিব্যাহারে চারিজন কুকি চলিতেও প্রাণভয়ে কাতর হয়। ধন্য ইংরেজ-প্রভুত্ব!

ইহা হইতেই এতদ্দেশে শান্তিরক্ষায় গভর্নমেন্টের যোগ্যতা অক্লেশে অনুমিত হইতে পারে, তবে এই সঙ্গে একটি আনুষঙ্গিক কথা না বলিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। বিগত আদমসুমারী মতেও দেখা যায়, এতদঞ্চলে সর্বসাকল্যে ২১৪১০ ঘর লোকের বসতি আছে অথচ দেশের ক্ষেত্রফল ৫১৩৮ বর্গমাইল। সুতরাং গড়ে প্রায় ১/৪ বর্গমাইলে এক ঘর লোকের বসতি পড়ে। ঘর হিসাবে জনসংখ্যাও গড়ে ৫.৯ মাত্র। অতএব এই শ্বাপদসঙ্কুল দেশে এরূপ বিরলবসতি কত যে বিপজ্জনক — সামান্য অনুধাবনেই বুঝিতে পারা যায়। বর্তমানে দস্যু বা ততোধিক ভয়ানক কুকি-উপদ্রব দমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু হিংস্রজন্তুর অত্যাচার যথেচ্ছ চলিতেছে। উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশও কৃষকেরা গৃহে আনিতে পায় না, তদুপরি পানের ভয়ে ত নিয়তই উৎকণ্ঠায় থাকিতে হয়। এতদবস্থায় আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল — বন্দুকের সংখ্যা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই হাজারও নহে, অর্থাৎ প্রায় ২৩/৪ বর্গমাইল অন্তর একটি করিয়া বন্দুক আছে। তাই আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার প্রধান সহায় বন্দুকের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা কর্তব্য। পূর্বে ইহাদিগের হইতে বন্দুকের টেক্স লওয়া হইত না, আজ কয়েকবৎসর হইতে বন্দুক প্রতি ।০ চারি আনা করিয়া কর বসিয়াছে। বস্তুতঃ

ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমাদের দেশে আমোদ তথা শিকার-প্রয়াসে মাত্র বন্দুক রাখা হইয়া থাকে;আর ইহারা তাহা শস্য এবং ততোধিক জীবনরক্ষার নিমিত্ত রাখিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ইহাদিগকে এইজন্য যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া বিধেয়। আর পার্বত্য পার্বত্য চট্টগ্রামে বারুদাদি বিক্রয়ের দুইটি মাত্র ডিপো আছে। অথচ একবার তিনমাসের জন্য ।।০ আধসেরের অধিক বারুদ বিক্রয় নিষিদ্ধ। ইহাতে একদিকে যেমন তাহাদিগকে বহুদূর হইতে দুর্গম পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া অশেষ কষ্ট পাইতে হয়, পক্ষান্তরে তিনমাসে আধসের বারুদ দ্বারা কিছুতেই চলে না। অর্দ্ধসের বারুদে কোনরূপ শতেক বার পর্যন্ত গুলি ছোঁড়া যায়। কিন্তু হিংস্র জন্তুর উপদ্রব বৃদ্ধি পাইলে, বিশেষতঃ ফসলের পক্ষী ও বন্য পশু হইতে শস্য রক্ষা করিতে ঐ বারুদে তিনদিনও চলে না। তাই প্রার্থনা, কর্তৃপক্ষ এজন্য অধিকতর কৃপাদৃষ্টি করিবেন।

অবশ্য বর্তমানে দেশের নানাস্থানে যেরূপ গন্ডগোল চলিতেছে, তাহাতে আমাদের এই প্রস্তাবে গভর্নমেন্ট কর্ণপাত না করিতে পারেন, তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, এখানে তেমন কোন গোলযোগের লক্ষণও নাই, এবং এই নিরীহ সরল প্রাণ পাহাড়ীদের মধ্যে তাদৃশ ভাব আসা সম্ভবও নহে। তবে যে মধ্যে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলাচারের সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা ব্যক্তিবিশেষের মস্তিস্ক বিকৃতিমাত্র। তথাপি সন্দেহ হইলে কর্তৃপক্ষ সার্কেলাচিফের মত গ্রহণ করিয়া সৎভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে প্রার্থিত বিশেষ, সুবিধা দিতে পারেন।

পথের দুর্গমতা ও আপদসঙ্কুলতা নিবন্ধন এবং সংবাদাদি প্রেরণের সুবিধা অভাবে পূর্বে এদেশের আমদানী রপ্তানি প্রায় চলিত না। ইংরেজের প্রবল ক্ষমতাবলে এক্ষণে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, যাতায়াতের এবং সংবাদ প্রেরণের সুবিধাও দিন দিন অতি দ্রুতভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে। অবশ্য ডাক ও টেলিগ্রাম সম্বন্ধে এখানে ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত সমানই ব্যবস্থা, কিন্তু রাস্তাঘাটাদির নিমিত্ত কোন পথকর নাই। এইরূপে অসুবিধাসমূহ দূরীকৃত হওয়াতে অধুনা বাণিজ্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ তাঁহাদের প্রবর্তিত অবাধবাণিজ্যের কল্যাণে ইহাদের অশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। নতুবা একদিকে আমদানী অভাবে যেমন জীবনযাত্রা দুর্বহ হইত, পক্ষান্তরে রপ্তানী না থাকিলেও ততোধিক অসুবিধা ঘটিত। অধুনা এদেশবাসীগণ বাণিজ্যের সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্রমেই অধিকতরভাবে তাহাতে লিপ্ত হইতেছে। এই সঙ্গে ইংরেজরাজের অন্যতম সহৃদয়তার কথা পুনরায় বলিয়া রাখা প্রয়োজন। কতিপয় বাঙ্গালী মহাজন এই নিরীহ পার্বত্যদিগকে প্রতারিত করিতে যেরূপ অহর্নিশ যত্নশীল, তাহাতে গভর্নমেন্টের সাধুচেষ্টা সবিশেষ ধন্যবাদার্হ। সুদের হার হ্রাস, ততোধিক ন্যূন সুদে ঋণদান এবং সংবৎসরোপযোগী আহার্যের ক্রোক প্রতিষেধ ব্যবস্থা প্রভৃতি ইংরেজরাজেরই মহতী কীর্তি।

গ্রন্থভাগেই দেখিয়াছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ঐকান্তিক উৎসাহেই চাক্‌মাগণ লাঙ্গলের চাষ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই অনুরাগ বর্তমান রাজা বাহাদুরের উপাধি প্রদানকালেও ভূতপূর্ব লেপ্টেনান্ট গভর্নর সার জন উড্‌বরণের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। বন-সংরক্ষিণী ব্যবস্থাও

তাহারই অন্যতম কারণবিশেষ। মাইয়সী রিজার্ভ ছাড়িয়া দিতেও মাননীয় গভর্নমেন্ট বলিয়াছেন, চাষের ভূমির বিস্তারের নিমিত্তই ইহা করা হইল। অপরতঃ রাজা অপেক্ষা হেড্‌ম্যানদিগের দ্বারাং চাষের প্রতি লোক অধিকতর প্ররোচিত হইতে পারে, তজ্জন্য কৃষিলব্ধ রাজস্বে রাজা হইতে হেড্‌ম্যানের কমিশন ভাগ অধিক রাখা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কৃষিতে প্রথম তিন বৎসর নিষ্কর-সুবিধা দিয়া তাহা আরও লোভনীয় করিয়াছেন। তবে চাষ বিস্তারের পক্ষে আর দুই অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ — বন্দোবস্তিগুলি সাধারণ 'আমল নামা' মাত্র; গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করিলে যখন তখন সেই জমি বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ — ইহাতে অধীনস্বত্ব প্রদানের অধিকার নাই; এমন কি কেহ গোপনে অধীনস্বত্ব দিয়াছে প্রমাণিত হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার 'আমল নামা' খারিজ করিতে পারেন। অথচ গভর্নমেন্টের এই বিধি কার্যতঃ রক্ষাও হইতেছে না; শুনিতে পাই, বুদ্ধিমানগণ বিনামায় যথেষ্ট ইজারা চলাইতেছেন, কিন্তু রাজশক্তির ভয়ে সকলে সাহস না পাওয়ায় চাষবিস্তারে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। তাই আমরা এস্থলে মাননীয় গভর্নমেন্টসমীপে উক্ত অভাবদ্বয় নিরাকরণার্থ সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইতেছি। 'আমল নামা'র পরিবর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের রীতি থাকিলে, এতদিনে খুব সম্ভব এদেশের আবাদযোগ্য প্রায় সমুদয় ভূমিতেই চাষ চলিত এবং ইহাদের মধ্যে স্থান পরিবর্তনের যে একটা উচ্ছৃঙ্খল বাসনা অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও প্রায় থাকিত না। আর এই জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি লাঙ্গল চালনার উপযুক্ত করা সমধিক ব্যয়সাপেক্ষ। এক এক ভূমি আবাদের উপযোগী করিতে, অন্ততঃ ৫০ পঞ্চাশ টাকা খরচ পড়ে; এবং চাষের জন্য অনূন্য একশত টাকার এক যোড়া মহিষ প্রয়োজন। গরীব পাহাড়ীদের অনেকেই এই মূলধন অভাবে চাষে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না এবং দুঃসাহস করিয়া করিলেও অনেকে মহাজনদিগের কুসীদায়ে ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য এ নিমিত্ত সহৃদয় গভর্নমেন্ট সামান্য সুদে কৃষকদিগকে ঋণদান করিতেছেন। সেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেও যখন এদেশে সর্বপ্রথম লাঙ্গলের চাষ প্রবর্তিত হয়, ইংরেজরাজ প্রজাসাধারণকে ৮০০০০ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইতে কোনরূপে মাত্র ৫০০০০ টাকা আদায় হইয়াছিল। তথাপি গভর্নমেন্ট আবশ্যকস্থলে ঋণদানে কুণ্ঠিত নহেন, গত বৎসরও প্রায় ২৫০০০ হাজার টাকা দিয়াছেন। কিন্তু তবুও সকলের প্রয়োজনীয় অভাব মোচিত হইতেছে না। কেননা উপযুক্ত জামিন বা সম্বলের অভাবে অনেকেই ঋণ পায় না, সুতরাং অন্ততঃ সমর্থ ব্যক্তিগণকে ইজারা প্রদানের ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে তাঁহারা অধিক পরিমাণে ভূমি আবাদ করিয়া আবশ্যকীয় মহিষাদি সহ সাধারণ্যে বিলি করিতে পারেন। চাষদ্বারা যে ইহাদের উন্নতি হইতেছে, তাহা সহৃদয় গভর্নমেন্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন দেখিয়াই, আমরা এই দুই প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। বর্তমান সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ আর. এইচ. স্নেইড্‌ হাচিন্সন্‌ মহোদয় এতৎপ্রতি সবিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাই; তিনি চাষ বিস্তারের দিকে যেরূপ যত্ন লইতেছেন, আশা করি, এই আলোচনার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিবেন।

এই সঙ্গেই আলোচনাযোগ্য, এই হতভাগ্য পাহাড়ীদিগকে গত উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে ইংরেজরাজের দয়াল হস্ত অবারিতভাবে অভয় প্রদান করিয়াছে। অন্যান্যবারের কথা নাইবা ধরিলাম, গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষে এখানকার অবস্থা যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে সহৃদয় গভর্নমেন্টের আনুকূল্য লাভ না করিলে ইহাদের অর্দ্ধেকেরও অধিক নিশ্চিতই কালসদনে গমনে বাধ্য হইত। তাদৃশ এককালীন দান ছাড়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণকে ইংরেজ গভর্নমেন্ট ৬,০০০ টাকা বিনাসুদে ঋণ দিয়াছিলেন এবং আবশ্যক হইলে আরও দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি সতর্কদৃষ্টি ইংরেজরাজের প্রধান খ্যাতি। ইহাদিগের পূর্ববর্ত্তীগণ রাজা হইতে এরূপ যত্ন পাইয়াছে কিনা, বিশেষ, সন্দেহ আছে। ব্রিটিশাধিকারে আসার পর এ অঞ্চলে ক্রমে (রাঙামাটি, বান্দরবন, বড়কল, লামা, মানিকছড়ী, রামগড় ও তিনটিলায়) সাতটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বসন্তের আক্রমণ নিবারণকল্পে টীকাদানের ব্যবস্থাও কম সহৃদয়তা-পরিচায়ক নহে। তবে কিনা দেশীয় লোকের বিশ্বাস গো-বীজের টীকা বসন্তের প্রকৃষ্ট অন্তরায় নহে। তাই অধিকাংশ লোকই টীকাদানের প্রাচীন প্রথার প্রতি অধিকতর আস্থাবান। এ সম্বন্ধে বিলাতেও আন্দোলন চলিতেছে, শুনা যায়। সে যাহা হউক এই টীকার নিমিত্তও গভর্নমেন্টের বার্ষিক প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয়িত হয়।

স্বাস্থের পরেই শিক্ষার কথা আইসে। কিন্তু বলিতে কি, প্রজাপুঞ্জের শিক্ষাবিধানের নিমিত্তও প্রাচীন চাক্‌মা-রাজগণ কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহীয়সী কালিন্দী রাণীর উন্নত শাসন খুঁজিয়াও তৎসম্বন্ধে কোন প্রয়াসচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইংরেজরাজ প্রত্যক্ষভাবে এদেশ শাসনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন — অদ্যাপি অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হয় নাই। এই স্বল্পকালমধ্যে নিরক্ষর প্রায় চাক্‌মা সমাজ যে কি পরিমাণে শিক্ষোন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা গ্রন্থভাগেই বিস্তারিত দেখাইয়া আসিয়াছি। এই নিমিত্ত গভর্নমেন্টের বার্ষিক প্রায় বিশ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় হয়। বস্তুতঃ শিক্ষার বিস্তার ইংরেজ রাজত্বের সর্বোৎকৃষ্ট সুফল। জাতিধর্মনির্বিশেষে জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা ভারতে ইংরেজের ন্যায় আর কেহই করেন নাই। এই শিক্ষা বিস্তারের ফলে চাক্‌মাসমাজে এক সম্পূর্ণ নূতন উদ্দীপনা প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে নৈতিক ও সামাজিক বহুবিধ সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছে। এমন কি, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সমস্যা লইয়াও চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এইরূপে ইংরেজশাসন ইহাদের জীবন, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ যত্ন লইতেছেন যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল, অনন্তর শাসন পরিচালন লইয়া দুই চারিটি কথা মাত্র পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইব। পূর্বাপেক্ষা যে অধুনা সাধারণের সুবিচার লাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহাতে আবার অধিকতর সুবিধা এই যে, এখানকার বিচারকার্যে ষ্ট্যাম্পের আবশ্যকতা নাই এবং ব্যবহারজীবীদিগেরও উৎপীড়ন নাই। সামান্য সাদা এক খণ্ড

কাগজেই আবেদন গ্রাহ্য হয়, এবং বাদী প্রতিবাদীগণ ইচ্ছা করিলে নিজেরাই পরস্পর ও সাক্ষীকে প্রয়োজন মত প্রশ্ন করিতে পারে। এক কথায় ইংরেজরাজ এখানে সহজে ও সরলভাবে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন-ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধর্মে ও জাতীয়তায় আঘাত লাগিবে আশঙ্কায় তৎসংক্রান্ত বিচারাদি সমাজের প্রধানগণের উপর ন্যস্ত রাখিয়াছেন। আরও সুখের কথা, ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে রাজকর্মচারীপদে গ্রহণ করিয়াও গভর্নমেন্ট যথেষ্ট সহৃদয়তায় পরিচয় দিতেছেন।

পরিশেষে আমরা সুদক্ষ রাজ কর্মচারী কাপ্তেন টমাস হার্ব্বাট লুইন মহোদয়ের কয়টি কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছি। তাঁহারই দ্বারা এদেশে ব্রিটিশ রাজ্য বিস্তৃত ও সুদৃঢ় হয় এবং তিনি বহু বৎসর ধরিয়া এখানকার শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন। সুতরাং ইংরেজশাসনের সমালোচনা তিনি যেরূপ নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, আমাদিগের হাতে ততটা হওয়ার আশা নাই। তিনি পুর্বোল্লিখিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং তএত্য অধিবাসীবৃন্দ" নামক পুস্তকের উপসংহার শেষে লিখিয়াছেন;—

"এক্ষণে আমি বলি, আমরা এই পার্বত্যপ্রদেশ নিজেদের নিমিত্ত শাসন করিব না, ইহার অধিবাসীবৃন্দের মঙ্গল এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত মাত্র শাসন-দণ্ড চালাইব। তাহা সভ্যতা বিস্তারের জন্য নহে, পরন্তু সভ্যতা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। এখানে কেবল একজন লোক ব্যতীত আর কিছুরই প্রয়োজন দেখা যায় না। শাসন ক্ষমতা দিয়া তাহাদের উপর একজন কর্মচারী দেওয়া হউক; তিনি যেন গভর্নমেন্টের বিরাট কপিচক্রের মধ্যে কেবল দড়ির ন্যায় না চলেন; পরন্তু তাহাদের অপারগতায় সহিষ্ণু, সত্বরতার সহিত পর্যবেক্ষণপর এবং সমগ্র বসুধায় কুটুম্বজ্ঞানরূপ তাহাদের স্বাভাবিক অনুভূতিতে উপলব্ধি হন। এই নূতন ভাব সমূহ হৃদয়ঙ্গম ও তাহাদের ধারণাকে মার্জিত করিয়া লইতে উপযুক্ততা থাকে, কিন্তু কোন জাতীয় সংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে যেন সাবধান রহেন। এইরূপ পরিচালনাধীনে তাহাদের নিজেকেই শনৈঃ শনৈঃ সভ্যতা লাভ করিতে দেওয়া হউক। শিক্ষাব্যবস্থা তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকুক, তাহারা তাহা স্বকীয় বিধি ব্যবস্থা মতে চালাইয়া — বিনষ্ট ও বিকৃত ইংরেজী আদর্শে নহে, পরমেশ্বরের সৃষ্টপ্রাণীর নূতন ও মহান স্বরূপে বাহির হইয়া আসিবে।" (১১৮ পৃষ্ঠা।)

আমরাও তদীয় উদার উপদেশের সহিত একমত হইয়া — ভগবান সমীপে প্রার্থনা করি, প্রজার সর্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান রাজা ও রাজশক্তির চিরকামনীয় হউক।

—— সমাপ্ত ——

মতামত

(বহু বিস্তৃত পত্র হইতে সংক্ষিপ্ত অংশমাত্র উদ্ধৃত)

চাকমারাজ শ্রীশ্রীযুত ভুবনমোহন রায় বাহাদুর এবং সুপ্রসিদ্ধ রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই. ই. মহোদয়দ্বয়ের অভিমত পুস্তকের প্রথমেই মুদ্রিত হইয়াছে। অনন্তর—

জাতীয় অন্যতম নেতা — পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্‌টার **শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র** দেওয়ান মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"** আপনি যে আমাদিগকে জনসাধারণের নিকট পরিচিত করিতে এত শক্তি ও অর্থ ক্ষয় করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র সমাজ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। বস্তুতঃ আপনি আমাদের জাতিকে অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদেরও স্বজাতি সম্বন্ধে জানিয়া লইবার আছে। এতভিন্ন আমাদের পুরাবৃত্ত-ভাগ আপনার অসীম গবেষণার ফল; ইহাতে বহু অজ্ঞাত গৌরব-গরবের কাহিনী অতীতের তিমিরাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে আপনার কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াছে। আমাদের প্রত্যেক বালকের হস্তে ইহার এক এক খণ্ড দেখিতে পাইলে বুঝিব, সমাজ প্রাচীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার এবং হাইকোর্টের বিচারপতি মান্যবর **শ্রীযুক্ত ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম. এ. ডি. এল, ডি. এস. সি, সি. এস. আই.** মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"I have looked ** with great interest. The work evinces considerable research, earried on first hand under difficult circumstances, and the result is a valuable contribution to the anthropological study of Indian hill tribes. The author deserves encouragement, and, it would be a bare act of just recognition of solid work if the Government were to patronise the book".

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক এবং রিপন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ. মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"Babu Satis Chandra Ghosh has done real service to Bengali literature by the publication of his work on the Chakma tribe of

Chittagong. So far as I am aware, this is the first work of its kind in our literature and it is sure to give an impetus to ethnological and anthropological studies among our young men. There is a wide and an almost unlimited field for such studies in connection with the wild tribes of the province and the work that has been done in this direction by foreign scholars has to be snpplemented and completed by our own men. It is a sign of the times that a Bengalee gentleman has come forward to take up the work of investigation and exploration and the fruits of his research as embodied in the title volume will be welcomed by all lovers of our literature. The author is a pioneer in the work and let us hope that his example will be followed by others. I am glad that the Bangiya Sahitya Parisad as the foremost literary scientific society entirely manned by Indians has thought it proper to encourage the author by finding a place for the book in the series of useful works published under its auspiecs But the author stands in need of more substantial form of encour· agement and I hope that all lovers of our literature will extend their gracious patronage to the author. Our Government has never been niggardly in the matter of encouraging authors of Bengali works of real merit, and Babu Satis Chandra Ghosh has established a claim upon the Government by his valuable and original contribution to a hitherto neglected branch of the Bengali literature."

লেখকাগ্রগণ্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি. আই. ই. মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"** চাক্‌মা জাতি নামক বৃহৎ গ্রন্থ উপহার পাইয়া একান্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। আপনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। আপনাকে শত ধন্যবাদ। যেমন অতল ও অপার মহাসমুদ্রের মধ্যে অতি সামান্য বারি বিন্দু, তেমনই মানব জাতির ইতিহাস স্বরূপ মহাসমুদ্রের মধ্যে চাক্‌মাজাতির ইতিবৃত্ত। ইহা একদিকে, এই অর্থে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর — অতি ক্ষুদ্র নগন্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু আর একদিকে, ইহার মূল্য অতি বৃহৎ। কেননা এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক বস্তুর সংকলন ও সংগ্রহের দ্বারাই মানবজাতিরূপ বিরাট পুরুষের ঐতিহাসিক জীবন চরিত সংকলিত হইয়া থাকে। আপনি সে মহাচরিতরূপ মহিমান্বিত মন্দিরের একপার্শ্বে একখানি

সুন্দর ইষ্টক সংযোজিত করিয়াছন। ইহা আপনার বিশেষ সৌভাগ্য এবং দেশেরও সৌভাগ্য। ভারতবর্ষের ভূগোল বৃত্তান্ত কতকটা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভৌগোলিক ইতিহাস নাই। যদি কোন ভাগ্যবান সাহিত্যিক কোন দিন ভারতের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত অথবা সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে প্রয়াসপর হন, তখন এই চাক্‌মাজাতি নামক গ্রন্থ নিশ্চয়ই তাঁহার প্রয়োজনে লাগিবে এবং ইহা খুঁজিয়া লইতে হইবে। গ্রন্থের ভাষা বিষয়ের উপযোগী। গ্রন্থোক্ত বিবরণ পারিপাট্যের সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি দেশের শিক্ষিত সমাজে আদৃত হইলে সুখী হইব।"

অবসরপ্রাপ্ত সুবিজ্ঞ সিবিলিয়ান মিঃ জে. ডি. এণ্ডার্সন মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"** I am delighted to see a production of this kind in Bengali. Until lately Indians were strangely indifferent to the scientific, the enthological and linguistic interest of the humbler Indian raees, and yet, evidently, the investigation of their customs and language could by no one be more effactually made than by men whose own speech is intelligible to their semisavage or backward races. ** you have collected a great quantity of interesting matter. * I have asked the Royal Asiatic Society to let me review your book in their Journal. I will do my best to write a cureful appreciation of your learned labours."

বহু ভাষাতত্ত্ববিদ্ প্রাচ্য পণ্ডিত ডাঃ জি. এ. গ্রিয়ার্সন পি. এইচ. ডি., আই. সি. এস., সি. এস. আই. মহোদয় লিখিয়াছেন,— "**** it is a most valuable contribution on a little known branch of ethnology, I congratulate you on its successful completion."

বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. মহোদয় লিখিয়াছেন—

"** একটী নগন্য জাতি, যাহার নাম অনেকের নিকটই অজ্ঞাত ছিল, তাহাকে নগন্য মনে না কবিয়া সতীশবাবু বিপুল উদ্যমের সহিত, নানা উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক এই ইতিহাসখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ** ভারতবর্ষের যে কোন স্থানের ইতিহাসকে নগন্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার সময় এখন নহে। ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র না ভাবিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিলে তাহাতে কত সুফল ফলিতে পারে, সতীশ বাবুর এই ইতিহাস তাহার নিদর্শন স্বরূপ। ইহাতে শুধু অজ্ঞাত এক জাতীর কৌতূহলোদ্দীপক মনোরম একখানি চিত্র প্রকাশিত হয় নাই, বস্তুতঃ আমাদের দেশের ইতিহাসের নানা তমসাচ্ছন্ন কোন সতীশ বাবুর গবেষণার ফলে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসরূপ মুক্তামালা

গ্রন্থন করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে সতীশ বাবুর মতন উদ্যমের বজ্র সেই মণিপথ সমুৎকীর্ণ করিতে হইবে।"

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যার **শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাইট** এম. এ., ডি. এল. মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"** It is written in simple and elegant style, evinces much research, and gives an interesting account **"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম. এ., পি. এইচ. ডি. মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"** excellent and exhaustive work in Bengali **. It throws full light on the Chakma tribe and the Bengali dialect as spoken by them. Your style of writing is simple and idiomatic and your treatment of the subject is logical and interesting. I am sure your book will be widely appriciated as it deserves to be. **"

সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ **শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য** এম. এ. মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"** আমি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া * অনেকে ঐতিহাসিক রহস্য অবগত হইতে পারিয়াছি। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য বসতঃ নিকৃষ্ট উপন্যাসাদি গ্রন্থই সমাধিক আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইতিহাসবাদি গ্রন্থের তাদৃশ আদর দেখিতে পাওয়া যায় না। অস্মদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আমি অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। পাঠ করিয়া যে একান্ত প্রীত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কমিশনার ও পূর্ব্ববঙ্গ আসামের বর্তমান ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ **মিঃ এফ. পি. ডিক্সন, আই. সি. এস.** মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"** full of information and of interest."

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ কবি ও লেখক **শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর,** এম. এ. বি. এল. মহোদয় লিখিয়াছেন—

"** It is as excellent in its internal merits as it is beautiful in its external binding and displays a power of insight and keen observation into the character and inner life of a people, rarely to be found in any other history of this kind in the Bengali language. **"

বহুদর্শী লেখক **শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার** বি. এল., এম. আর. এ. এস. মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"সমালোচনার জন্য অনেক গ্রন্থ পাই, কিন্তু এমন গ্রন্থ উপহার পাওয়া বড় সহজ সৌভাগ্য নয়। রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, যে আপনার চাক্‌মাজাতির সচিত্র ইতিবৃত্ত জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম। * আপনার গ্রন্থে চাক্‌মাজাতির বিবরণ এত পরিপূর্ণভাবে আছে, যে এই গ্রন্থখানি যদি ইংরাজিতে লিখিত হইত, তবে এন্‌থ্রপলজিকাল্‌ অনুসন্ধান সভা আপনাকে সম্মানিত করিতেন। ** এই অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি কেহ পড়িবে না জানি, কিন্তু আপনি যে কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন, তাঁহার পুরস্কার দান করিবার জন্য একজন আছেন — তিনিই আপনাকে পুরস্কৃত করিবেন।"

বঙ্গীয় গবর্নমেন্টের প্রধান অনুবাদক রায় **শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর** লিখিয়াছেন;—

"** এই গ্রন্থ প্রণয়নে আপনি যেরূপ পরিশ্রম, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্তমান বাঙ্গালা লেখক সম্প্রদায়ে নিতান্ত বিরল। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ বহুকাল পাঠ করি নাই। গ্রন্থের প্রাতিপাদ্য বিষয়ের হৃদয়গ্রাহিতা সামান্য পত্রযোগে বর্ণনা করা অসম্ভব। কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি ঐতিহাসিক, সকল প্রকার তত্ত্বেরই অবতারণা গ্রন্থমধ্যে দেখা যায় এবং সেই অবতারণার জন্যই গ্রন্থখানি এত হৃদয়গ্রাহ্য হইয়াছে। ** গ্রন্থের ভাষা ভাল ও সুপাঠ্য। কাগজ, ছাপাই ও বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট।"

বসুমতী ও হিতবাদীর ভূতপূর্ব সম্পাদক **শ্রীযুক্ত জলধর সেন** মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"** আপনার পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিযাছি বলিলে কিছুই বলা হয় না। আমি পুস্তকখানির আগাগোড়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। আপনি চাক্‌মাজাতি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য কোন কথাই বাদ দেন নাই। এজন্য যে আপনাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে। ***"

সুপ্রসিদ্ধ লেখক **শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর** মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"** আপনি যে প্রণালীতে চাক্‌মাজাতির ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, ইহাই ইতিবৃত্ত লিখিবার প্রকৃত প্রণালী। এ বিষয়ে আপনার গ্রন্থ আদর্শ স্থানীয় বলা যাইতে পারে। ভারতের প্রত্যেক ভাগের ইতিবৃত্ত এইভাবে সঙ্কলিত হইলে, সমগ্র ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপিত হইবে সন্দেহ নাই। শুধু রাজাদের বংশাবলী ও রাজত্বকালের বিবরণ — দেশের প্রকৃত ইতিহাস নহে। আপনি এই গ্রন্থ-রচনায় যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল। আপনার 'চাক্‌মাজাতি' যেমন কৌতুহলোদ্দীপক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ।*"

বিখ্যাত সমালোচক **শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল.** মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"** আপনার অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহে আপনি

প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকরণ পরিপাটীও প্রশংসনীয় হইয়াছে। আপনার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। ** স্বল্প কথায় বলা যায় যে. আপনার পুস্তক কুতূহলোদ্দীপক. কৌতুকপ্রদ, সুতরাং উপাদেয় হইয়াছে।"

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক **শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী** মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"*** আপনার সংগ্রহগুণে এবং সাজাইবার সুশৃঙ্খলায় ইতিহাসখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। ** আপনার যথেষ্ট কৃতিত্ব ও গবেষণার পরিচয় পাইলাম। ঐতিহাসিক অংশ আপনি যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগে যেভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতেও আপনার যথেষ্ট গুণপনা ও বস্তুসংগ্রহের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ফলতঃ আমার বিশ্বাস, এ পর্য্যন্ত যতগুলি বন্যজাতির বিবরণ লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহার কোনটিই আপনার অবলম্বিত সুচিন্তিত পথে অগ্রসর হয় নাই। আপনার চাক্‌মাজাতির ইতিবৃত্তখানি সর্ব্বপ্রকারে কৌতূহলোদ্দীপক, সুখপাঠ্য, সুলিখিত এবং সুন্দর ইতিহাস হইয়াছে। এই শ্রেণির সাহিত্যে এবং ইতিহাসেও এখানি· একখানি অপূর্ব্ব, নূতন এবং প্রথম পুস্তক হইয়াছে। আপনার ন্যায় আরও যে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশের বর্ব্বরজাতি মধ্যে বাস করেন. তাঁহারা যদি আপনাকে অনুসরণ করিয়া বঙ্গভূমির আদিম সন্তানগুলির ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের এবং বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা প্রধান অংশ ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে। **"

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সরকার এম. এ. মহোদয় লিখিয়াছেন;—

"*** It contains a lucid and graphic description of the manners and castoms of the Chakmas, their arts and manufactures, their religion and marals and their social and political condition. It moreover presents to the reader a good deal of historical information which is equally interesting and instructive. ** It is a really valluable production, and a rich contribution to the modern· literature of Bengal."

সংবাদপত্রের মতামত

নব্যভারত — "*** এই গ্রন্থকার চাক্‌মাজাতির ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এই সকল আদিম নিবাসীদিগের বিবরণ না জানার দরুণ ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিবার বা ভাবিবার সময় আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। ** গ্রন্থকার বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সুবিস্তীর্ণ পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। এই সুন্দর গ্রন্থখানি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার এক বিশেষ অভাব পূর্ণ হইল।"

জ্যোতিঃ। — "*** এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে সতীশবাবু পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসার অসাধারণ পরিচয় দিয়াছেন বটে, প্রত্যেক বিদ্যোৎসাহী পাঠক ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহ দান করুন, অর্থের ও সময়ের ব্যয় উভয়ই সফল হইবে। একটি জাতিকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে যাহা যাহা দরকার, সতীশ বাবু তৎসমস্তই ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চাক্‌মাদের ত ইহা জাতীয় সম্পদই বটে, অন্যের পক্ষেও ইহা একটা অতি উপাদেয় সামগ্রী। পড়িতে উপন্যাস অপেক্ষাও মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ বিবেচিত হইবে।"

ভারতী।— "*** লেখকের দুঃসহ শ্রমসাধনার ফলে গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদস্বরূপ হইয়াছে। লেখক চাক্‌মাজাতির ইতিবৃত্ত; সামাজিকতা, সভ্যতা প্রভৃতির সুন্দর একটী চিত্র পাঠকের সমক্ষে ধরিয়াছেন; ভৌগোলিক তথ্যটুকুও বাদ পড়ে নাই। গ্রন্থখানিতে লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনাশক্তি সুশৃঙ্খল বর্ণনাভঙ্গী ও উদার সহানুভূতি প্রতি পত্রে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। এই অজ্ঞাত পাবর্বত্যজাতির ঘরের ছোট কথাটিও লেখকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।"

প্রবাসী। — "*** আর একখানি ভাল বই, আমরা সাদরে অভিবাদন করিতেছি। কোনও জাতিবিশেষের ইতিহাস সঙ্কলন বাংলা সাহিত্যে খুব অল্পই আছে। তাহার মধ্যে এখানি সবর্বপ্রধান মনে হয়। গ্রন্থকার নিজের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা চট্টগ্রামের চাক্‌মাজাতির আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা-প্রণালী, ঘরবাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষাপ্রবাদ প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকলই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহা পাঠে জঘন্য উপন্যাসের চেয়ে অধিকতর কৌতূহল ও আনন্দ লাভ হইবে নিঃসন্দেহ। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতিও পরিষ্কার। ***"

ইণ্ডিয়ান মিরর। "The book shows that he has made excellent use of his oppartunities. The history, ethnology, manners, customs, language, literature, religion, and characteristics of the tribe have been described with comprehenciveness and in a style that canot fail to fascinate. The book is interspered with illustration which add much to its attractiveness."

দি ঈষ্ট্। — "*** The work is written in Bengali, neatly got up and illustrated with half tone pictures of the chakma hill tribe of Chitagong and a map of the hill tracts. It deals with the history of the chakma race, their customs, religion and detail of every day life. He has not only given an abundant proof of his careful study of the history of this

race, but his ability to write it in an interesting manner. The style of the book is simple, clear and vigorous. The work is a monument of the author's patent research and indifatigable industry for a number of years. Such a production in Bengali or even in English from the pen of a Bengali is rare indeed and speaks volumes in favour of the young author who, being a teacher in the hill tracts, mixed freely with the hill people to gather materials for his work. **We wish all success to this new publication and trust it wiil be appreciated by the Bengali public and the author encouraged by the educational authorities."

বেঙ্গলী— "** It is a valuable publication the historical importance whereof cannot be gainsaid. ** the author Babu Satis Chandra Ghosh has spared no pains to make his work a highly profitable study. It bears traces of a careful and prolonged research and we are glad to be able to say that we have gone trhough the book with sustained interest. ** The volume under notice is exquisitely bound and its printing and get up leave nothing to be desired. There are some illustrations which add to the value of the book."

অমৃত বাজার — "** has given us such a relief — there is so much life and thought so cogently put together. We are struck with the deep insight displayed by the author in every page of this excellent book. The labour and the trouble undertaken and the critical acumen displayed extort praise. The Chakma tribe has an interesting history of progress of their own and the author has done a great service to the Bengali reading public by revealing it to them. Readers may find points of difference but they make the book all the more valuable because of the independent line of thought of the author. It is a pity that amongst so many scribblers in fiction there are so few, so exceedingly few, to deal in with facts — and fewer still who would not take the trodden path and find a way of their own. We recommend the book to the careful study of all Bengali

readers and we hope Mr. Ghosh has for us fresh and the surprises stored away in his antiquarian research chambers."

ইংলিশম্যান। — "*** We should record with due apreciation and respect, that the 26th publication of the granthall of that admirable society is a topographical, historical, ethnological and linguistic account of the Chakmas in the Chitagong Hill Tracks which we can only compare with the series of similar works published in English under the auspices of the Government of Eastern Bengal and Assam. ** the subject, more over, is one of such technical itnerest that if would require a critic with first hand knowledge of the tribe described to do justice to the author's learning and perseverance. Are we to regret that the book was not published in English? We are divided in mind. It would have had a larger audience, and one more competent, perhaps, to discuss the anthro-pological chapter. On the other hand, Mr. Ghosh has established an excellent precedent. There are still, as there have always been, men employed by verious native States who, knowing no English, are not on that account less competent to acquire such a knowledge of the people among whome they live such as can rarely be gained by a foreigner. ** The simplest plan is to induce them, if they will, to tell fully all that they know, and this seems to have been the plan followed by Mr. Ghosh. He would indeed be hard to please who could not find something to interest him in a book so full of varied material, the accumulations of many years of intercourse with an engaging and interesting people. Mr. Ghosh's attitude towards his Chakma friends is, in itself, characteristic and interesting. ** Mr. Ghosh begins his book by claiming for the Chakmas the highest place in civilsation and intelligence among the High landers of India, and does not hesitate to rebuke Brian — Hodgson himself for including them among the aboriginal races. His zeal for his clients may be exaggerated — it is for experts to decide — but it indicates the true anthropologist's enthusiasm.

For surely no anthropologist ever succeeded in writing a full and fair account of any isolated race unless he felt a real liking for the people whose ways and manners be has studied. *** Let us hope that the examle he has set will be widely followed, and that other Indian gentlemen whose work has placed them among primitive peoples, will not and in due course publish their observations. In any case, we think that it is only becoming that we should record the publication of what is no doubt the first anthropological work printed in any Indian vernacular, and is therefore an additional honour to the not inconsiderable pretentions of Bengali literature. Sound scholarship and accurate observisation quite what one would expect of the Bengali race, as indeed might fairly be inferred from their unmistakeable aptitude for law and procedure. Let us hope the Mr. Ghosh's elaborate work may set a precedent soon to be followed by many imitations."

(From a long Review)

চাকমা জাতি
(আদ্যভাগ)

পাবর্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তাদিগের তালিকা।

খৃষ্টাব্দ	সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ডেপুটি কমিশনার	এসিঃ এবং এক্সট্রা এসিঃ কমিশনারগণ
১৮৬৪	জি. ম্যাক্‌গিল, জি. সি. কিল্‌বি।	
১৮৬৫	জি. সি. কিল্‌বি।	
১৮৬৬	জি. সি. কিল্‌বি, লেপ্টেঃ টি. এইচ. লুইন।	
১৮৬৭	কাপ্তেন টি. এইচ্. লুইন।	আর. এইচ্. রেইনী।
১৮৬৮	কাপ্তেন টি. এইচ্. লুইন।	আর. এইচ্. রেইনী, এ, রেট্রে।
১৮৬৯	কাপ্তেন টি. এইচ্. লুইন, এ. রেট্রে, মেজর জে. এম্. গ্রেহাম।	এ. রেট্রে।
১৮৭০	কাপ্তেন টি. এইচ. লুইন (ছুটিত্যে), এ.রেট্রে মেজর জে. এম্.গ্রেহাম।	এ. রেট্রে।
১৮৭১	কাপ্তেন টি. এইচ. লুইন মেজর জে. এম. গ্রেহাম, এ. ডবলিউ. কোক্রাম।	এ. রেট্রে।
১৮৭২	কাপ্তেন টি. এইচ. লুইন, এ. ডবলিউ. কোক্রাম।	এ. রোট. (ছুটিত্যে),লেপ্টেঃ এ. হ. গর্ডন।
১৮৭৩	কাপ্তেন টি. এইচ. লুইন।	এ. রেটে (ছুটিত্যে), লেপ্টেঃ এ. ই. গর্ডন।
১৮৭৪	কাপ্তেন টি. এইচ. লুইন, এ. ডবুলিড. বি,	লেপ্টেঃ এ. ই. গর্ডন, এফ. এ. চিচেষ্টার, এ. রেট্রে।
১৮৭৫	এ. ডবলিউ. বি. পাউয়ার।	এফ্. এ. চিচেষ্টার।
১৮৭৬	এ. ডবলিউ. বি. পাউয়ার,. জে. এন্ডার্সন।	লেপ্টেঃ এ. ই. গর্ডন।

খৃষ্টাব্দ	সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ডেপুটি কমিশনার	এসিঃ এবং এক্সট্রা এসিঃ কমিশনারগণ
১৮৭৭	জে. এন্ডার্সন, ই. এইচ. রুডোক।	এ. রেট্রে।
১৮৭৮	জে. এন্ডার্সন, (ছুটিতে), ই, ই. এইচ. রুডোক, কাপ্তেন এ. ই. গর্ডন।	লেপ্টেঃ জো. এফ. রিভেট - চার্নক।
১৮৭৯	কাপ্তেন এ. ই. গর্ডন, কাই. জি.লিলিংটন সি. এ. এস. বেডকোর্ড	সি. এ. এস. বেডফোর্ড; লেপ্টেঃ জে. এফ্. রিভেট - চার্নক।
১৮৮০	কাপ্তেন এ. ই. গর্ডন, সি. এ. এস. বেডকোর্ড. আর. এইচ্. রেইনী	সি. এ. এস. বেডফোর্ড
১৮৮১	কাপ্তেন এ. ই. গর্ডন, এল. আব. ফোরস জে. কেনেডি।	আর. আর. পোপ।
১৮৮২	এল. আর. ফোর্বস্।	
১৮৮২	এল. আর. ফোর্বস্।	
১৮৮৪	এল. আর. ফোর্বস্, সি. এ. এস. বেডফোর্ড	
১৮৮৫	সি. এ. এস. বেজফোর্ড, এস.জে. ডাগ্লেস্।	জে. এল. হেরল্ড্।

ডেপুটি কমিশনারগণ	শাসনকাল	ডেঃ মাজিঃগন	শাসনকাল
সি. ৫. এস. বেডফোর্ড	১-১-১৮৮৬	ডবলিউ	১৮৮৬-৮৭
বেডফোর্ড।	১৬-৫-১৮৮৭	এফ. সি	
সি, ওয়েন।	১৭-৫-১৮৮৭-২৩-৫-১৮৮৭	মষ্ট্রিয়াস	
এল. আঁর	২৪-৫-১৮৮৭ -		
ফোর্বস।	৩১-১৮৯১		
সি. এ. এস	১-৪-১৮৯১	সি. ওয়েন	১৮৮৭
বেড়্ফোর্ড।	১৭-৪-১৮৯১		
সি. এম. মারে	১৮-৪-১৮৯১	এ. ডবলিউ	
সি. আই. ই.	১৫-১১-১৮৯১	কোজারেট	১৮৮৭-৮৮

শুনিতে পাই, ইতিপূর্ব্বে ১৮৬০ হইতে ১৮৬৩ খৃঃ অব্দ — মিঃ ম্যাকগিলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কাপ্তেন ম্যাক্‌বেথ্‌ কাপ্তেন গ্রেহাম্‌, এবং জন টুয়েডিক প্রভৃতি ছিলেন; তৎপর কিছুদেনের জন্য কমিশনারের পার্শ্বনেল এসিঃ অভয়াচরণ দাস মহোদয় ও অস্থায়িভাবে এই কার্য্য করেন।

এসিস্টান্টকমিশনারগণ	শাসনকাল	ডেঃ মাজিঃগণ	শাসনকাল
সি. এম. মারে	১৬-১১-১৮০১ —		
সি. আই. ই	২৫-১২-১৮৯১		
এফ. সি. ডেলি।	২৬-১২-১৮৯১— ১২-১-১৮৯২		
সি. এম. মারে সি. আই. ই.	১৩-১-১৮৯২— ৩০-৬-১৮৯৩	এইচ. এইচ. হার্ড	১৮৮৭-৮৯
জে. এ. কেইভ	১-৭-১৮৯৩ —		
ব্রাউন।	৭-১১-১৮৯৩		
সি. এম.মারে.সি. আই. ই.	৮-১১-১৮৯৩— ১৪-৬-১৮৯৪		
আব. এইচ. স্নেইড্ হাচিন্সন	১৫-৬-১৮৯৪ ১৫-১২-১৮৯৪	সি. এফ্ মেঙ্গন	১৮৮৯
সি. এম. মারে	১৬-১২-১৮৯৪		
সি. আই. ই.	- ২০-৩-১৮৯৬		
জে. এ. কেইভ্ ব্রাউন।	২১-৩-১৮৯৬ — ১৯-৪-১৮৯৭		
ডবলিউ. এন. ডেলিভিন।	২০-৪-১৮৯৭ — ১-৩-১৮৯৮		
এফ্. পি. ডিক্স'ন।	১০-৮-১৮৯৭ — ৩১-৮-১৮৯৭		১-৪-১৮৯১
জে. এ. কেইভ্ ব্রাউন।	২-৩-১৮৯৮ — ১-৫-১৯০০	জে. টি. জার্বো	১৫-২-১৮৯৩ ২১-৩-৯৬
সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ			— ৩১-৮-৯৯ ৩-১১-৯৯

সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ	শাসনকাল	ডেঃ মাজিঃগন	শাসনকাল
আর. এইচ. স্নেইড. হাচিন্সন।	২-৫-১৯০০— ১-৯-১৯০১	আব. এ. স্টিফেন	১০-১০-০১ — ১৮-৫-০২
আর. এ. স্টিফেন।	২-৯-১৯০১ — ৯-১০-১৯০১		১৮-৭-০২ — ৬-৭-০৩
আর. এইচ. স্নেইড. হাচিন্সন।	১০-১০—১৯০১ — ১৮-৫-১৯০২		
আর. এ. স্টিফেন্।	১৯-৫-১৯০২ — ১৭-৭-১৯০২	ওয়ার্ডজোন্	৭-৭-০৩ ২৯-৮-০৫
আর. এইচ্.স্নেইড. হাচিন্সন।	১৮-৭-১৯০২ — ১৮-৬-১৯০৪		
আর. করডেন রামসে।	১৯-৬-১৯০৮ — ১৭-১১-১৯০৪	এইচ. এল. ফেল	৩০-৮-০৫ — ২৩-৮-০৬
আর. এইচ. স্নেইড. হাচিন্সন।	১৮-১১-১৯০৪ — ১৬-৯-১৯০৬	আর. এ. স্টিফেন	১৫-৮-০৬ - - ১৬-৯-০৬
আর. এ. স্টিফেন	১৭-৯-১৯০৬ — ২১-৯-১৯০৬		২২-৯-০৬ — ১৯-১১-০৬
আর. এইচ. স্নেইড হাচিন্সন।	২২-৯-১৯০৬ — ১৩-৮-১৯০৮		
এইচ. এল্ফেল্।	২৪-৮-১৯০৮ — ১১-১০-১৯০৮	এইচ. এল. ফেল	১২-১০-১৯০৬
আর. এইচ. স্নেইড্ হাচিন্সন।	১২-১০-১৯০৮		

মধ্যভাগ

সকৌন্সিল গভর্নর জে ডিয় কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ
পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বিধান
প্রথম পরিচ্ছেদ
(উপক্রম)

১

(১) এই বিধান পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ১৯০০ সালের বিধান, নামে অভিহিত হইতে পারে। (২) ইহা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সর্ব্বাংশে চলিবে। (৩) স্থানীয় গভর্নমেন্টের কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত তারিখ হইতে এই বিধান কার্য্যকরী হইবেক।

২

(১) এই বিধানে—

(ক) "পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম" শব্দে এই ধারার দ্বিতীয় অংশানুসারে বিজ্ঞাপিত স্থানসমূহকে বুঝায় এবং (খ) "কমিশনার" শব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার বুঝানো যাইতেছে।

(২) স্থানীয় গভর্নমেন্ট পূর্ব্বে সকৌন্সিল গভর্নর জেনেরেলের সম্মতি লইয়া কলিকাতা গেজেটে* বিজ্ঞাপনী দ্বারা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন এবং ঐরূপে উক্ত সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ইহা ও বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ গঠনে স্বতন্ত্র লেপ্টেনান্ট গভর্নরের অধীনে যাওয়ায়, এক্ষণে এতৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্বাদি উক্ত "কলিকাতা গেজেটের" পরিবর্ত্তে স্থানীয় (পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের) "গভর্নমেন্ট গেজেটে" প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সিডিউল যথা : — গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের ১৮৪৩ সালের ভারতের দাসত্ববিষয়ক আইন। (The Indian Slavary Act, 1843), ১৮৫০ সালের বিচারকদের রক্ষা বিষয়ক আইন (The Judicial Officer's Protection Act 1850), ঐ সালের রাজকীয় বন্দিবিষয়ক আইন (The State Prisoners Act, 1850), ১৮৫৭ সালের রাজকীয় অভিযোগ সম্বন্ধীয় আইন (The State Offences Act, 1857), ১৮৫৮ সালের রাজকীয় বন্দি - বিষয়ক আইন, ভারতীয় দণ্ডবিধি (The Indian Penal Code) ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, ১৮৬৪ সালের কশাঘাত আইন (The Whipping Act, 1864) ইহার ষষ্ঠ ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া হইবে — উপরোক্ত ধারামতে যাহা কিছু থাকা সত্ত্বে ও কোন অপরাধীকে যে কোন শাস্তির পরিবর্ত্তে বা সঙ্গে কশাঘাত দ্বারা দণ্ড দেওয়া যাইবে, ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্যবিষয়ক আইন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
(আইন)

৩

(৩) এই বিধানের অধীন থাকিয়া অষ্টাদশ ধারার ব্যবস্থানাসারে যে যে সময়ে যে নিয়ম প্রচলিত হইবে, সেই মতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইবে।

(১) সিডিউলে আইনসমূহের যে পর্য্যন্ত নির্দ্ধারন ও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তৎসমূদায় এই বিধানের বাধা না জন্মাইলে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম চলিতে পারিবেক।

(২) যদ্যাপি স্থানীয় গভর্নমেন্ট পূর্ব্বে সকৌন্সিল গভর্নর জেনেরেলের সম্মতি লইয়া "কলিকাতা গেজেটে" বিজ্ঞাপনী দ্বারা ঘোষণা করেন যে,

(ক) অপর কোন আইন সম্পূর্নরূপে, বা আংশিক ভাবে কিংবা কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া (যাহা বিজ্ঞাপনীতে বর্নিত হইতে পারে), এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে চলিবে অথবা (খ) সিডিউলে বিবৃত যে কোন আইন বা ধারার (ক) অংশানুসারে বিজ্ঞাপনী দ্বারা প্রযুক্ত হইতে ঘোষিত আইন এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে চলিবে না।

এতদিন এযাবৎ কিংবা অতঃপর বিধিবদ্ধ অপর কোন আইন পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে প্রযুজ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
(কয়েক অফিসের নিয়োগ ক্ষমতা)

৪

স্থানীয় গভর্নমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপনী দ্বারা —

(ক) যে কোনো ব্যক্তিকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিটেণ্ডেন্ট নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং

(The Indian evidence Act, 1872), ১৮৭৭ সালের ভারতীয় তমাদী আইন (The Indian Limitation Act 1877), ১৮৭৮ সালের ভারতীয় বনবিষয়ক আইন (The Indian Forest Act, 1878), ১৮৭৯ সালের হস্তিরক্ষণ আইন (The Elephants' Preservation Act, 1879), The General Clauses Act 1897, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি (The Code of Criminal Procedure 1898) কিন্তু ১৮১৭ ধারানুসারে প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতায় চিফ্ দেওয়ান বা হেড্ম্যান কর্ত্তৃক যে সকল মোকদ্দমা মীমাংসিত হয়, তাহাতে এই আইনের কোন অংশ থাকিবে না, ১৮৯৮

তথাকথিত প্রদেশে শাসন কার্য্যের সাহায্য নিমিত্ত যে কয়জন উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তত সংখ্যক এসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং অপর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারেন।

৫

স্থানীয় গভর্নমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপনী দ্বারা এই বিধানের অন্তর্গত কিংবা ভবিষ্যতে প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থাধীন সুপারিন্টেন্ডেটের যাবতীয় বা কোন ক্ষমতা যে কোন এসিস্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেটকে অর্পনএবং তদীয় এলাকাধীন স্থানের সীমা নিরূপন করিয়া দিতে পারেন।

৬

ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারোদ্দেশ্যে এবং রাজস্ব ও সর্ব্বসাধারনের সুবিধার্থে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জিলা গঠিত হইবে;সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইবেন;এবং উক্ত ধারানুসারে স্থানীয় গভর্নমেন্ট যে আদেশ করেন তদধীনে উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব অপরাপর কার্য্যসমূদয়ের পরিচালন ক্ষমতা সুপারিন্টেন্ডেন্টের হস্তে অর্পিত হইবে।

৭

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে এক সেসন বিভাগ গঠিত হইবে, এবং কমিশনার সেসন জাজ হইবেন। (২) সেসন জাজ স্বরূপে তৎসমীপে কমিশনার; যে কোন অপরাধের বিচার, ম্যাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক তৎসমীপে বিচারার্থ প্রেরিত না হইলে ও প্রাথমিক বিচারালয়ের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন, এবং তাদৃশ বিচার গ্রহন কালে তিনি ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধির নির্দ্ধারিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক "ওয়ারেন্ট কেসের" বিচারের নীতি অনুসরণ করিণবেন।

সালের ভারতীয় পোষ্ট অফিস আইন : বঙ্গের লেপ্টেনান্ট গভর্নর বাহাদুরের ১৮৬৯ সালের পুলিস বিধান (The Bengal General Clauses Act 1899; এবং বঙ্গীয় আদালতের ১৮১৮ সালের বঙ্গের রাজকীয় বন্দী-সম্বন্ধীয় বিধানবলী (The Bengal State Prisoners Regulation 1818) প্রভৃতি আইনসমূহের যতটুকু পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে চট্টগ্রাম জেলার প্রবর্ত্তিত হয়। তদ্ভিন্ন ১৮৮১ সালের পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত পুলিশ বিধান (The Chittagong Hill Traccts Frontier Police Regulations 1881) ইহার "ডেপুটি কমিশনার" স্থলে "সুপারিন্টেন্ডেন্ট" শব্দ বসিবে।

৮

স্থানীয় গভর্নমেন্ট ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে প্রাণদণ্ডের আদেশ মঞ্জুর করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতা পরিচালন করিবেন; এবং কমিশনার কথিত বিধানের অবশিষ্ট ব্যবস্থাসমূহে হাইকোর্টের ক্ষমতা চালাইবেন।

৯

সুপারিন্টেন্ডেন্ট পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন কর্ম্মচারী বা আদালত সম্মুখে উপস্থাপিত ফৌজদারী বা দেওয়ানী যে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারেন এবং তাহা হয়ত নিজেই বিচার করিতে অথবা অপর কোন কর্ম্মচারী কি আদালতের নিকট বিচারের জন্য দিতে পারেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
(অস্ত্র, বারুদাদি, গাঁজা ও মদিরা প্রভৃতি)

১০

(১) সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা এবং যে কোন গ্রামের অধিবাসীদিগের অধিকারে যে পরিমাণ ও যে রকমের বারুদাদি থাকিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারেন এবং যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন, সেই সকল অধিবাসীদিগকে একত্রিত রূপে বা তাহাদের যে কেহকে স্বতন্ত্রভাবে উক্ত আগ্নেয়াস্ত্র বা বারুদাদি অধিকারে রাখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। (২) এই ধারার '১' অংশানুসারে যে সকল আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই চিহ্নিত এবং রেজেস্টারী ভূক্ত করা যাইবে (৩) সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই ধারার '১' অংশানুসারে প্রদত্ত আগ্নোস্ত্র ও বারুদাদি অধিকারে রাখিবার যে কোন অনুমতি তুলিয়া লইতে পারেন, এবং তদনুসারে যাবতীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও বারুদাদি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অথবা তদীয় একতম অধস্তন কর্ম্মচারীর নিকট প্রদান করিতে হইবে। (৪) সুপারিন্টেন্ডেন্ট যে কোন ব্যক্তি কে বারুদাদি প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করিতেএবং তাদৃশ অনুমতি উঠাইয়া লইতে পারেন। (৫) যদি কোন ব্যক্তি সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আগ্নেরাস্ত্র বা বারুদাদি অধিকার রাখে অথবা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী করে, কিংবা বারুদাদি প্রস্তুত করে, তবে সে তিন বৎসরের অনতিকাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকারে দণ্ডিত হইবে। (৬) পূর্ব্বে স্থানীয় গভর্নমেন্টের সম্মতি লইয়া সুপারিন্টেন্ডেন্ট লিখিত হুকুম দ্বারা কোন গ্রামে এই ধারায় '১' '২' '৪' ও '৫' অংশ সমূহ বা তাহাদের যে কোনটী প্রযুক্ত হইবে না, আদেশ করিতে পারেন।

১

(১) পূর্ব্বে কমিশনারের সম্মতি লইয়া সুপারিন্টেন্ডেন্ট লিখিত হুকুমদ্বারা দা, বর্শা, তীরধনু বা এ সমুদয়ের যে কোন অস্ত্র লইয়া যাইতে কোন গ্রামের সমগ্র কিংবা যে কোন অধিবাসীকে বারণ করিতে পারেন, যদি তৎপ্রদেশের শান্তিরক্ষাকল্পে তাদৃশ নিষেধ বিধান তাঁহার প্রয়োজনীয় মনে হয়। (২) এই বিধানের '১' অংশানুসারে বিহিত প্রত্যেক আদেশ যতকাল ধরিয়া বলবৎ থাকিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিত হইবে। (৩) কোন ব্যক্তি এই বিধানে '১' অংশানুসারে বিহিত আদেশ অমান্য করিলে ছয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকারে দণ্ডিত হইবে।

২

(১) কেহ সুপারিন্টেন্ডেন্টের মঞ্জুরীকৃত পাশ (License) ব্যতিরেকেআফিঙ, গাঁজা, চরস্ অথবা এই সমুদয় দ্বারা প্রস্তুত কোন দ্রব্য আমদানী, রপ্তানি, উৎপাদন কি বিক্রয় করে, অধিকারে রাখে, অথবা আফিঙ, গাঁজা বা চরস্ উৎপাদনের নিমিত্ত কোন গাছের চাষ করে, তবে সে ছয় মাসের অনধিকাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকারে দণ্ডিত হইবে। (২) এই ধারার '১' অংশানুসারে বিহিত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যে কোন ব্যক্তি পারিবারিক ব্যবহারের নিমিত্ত সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রদত্ত পাশ ব্যতিরেকে ও পাঁচ তোলা পর্য্যন্ত আফিঙ, গাঁজা বা চরস অথবা তদ্দ্বারা প্রস্তুত কোন দ্রব্য রাখিতে পারিবেন।

৩

(১) কোন ব্যক্তি সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রদত্ত পাশ ব্যতিরেকে কোন বিদেশীয় সুরাসার কিংবা চুয়ানো মদিরা আমদানী কি বিক্রয় করিলে তিন মাসের অনধিকাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডিত হইবে। (২) (ক) কোন ব্যক্তি স্বকীয় ব্যবহারার্থে — বিক্রয়ের জন্য নহে, যে কোন বিদেশীয় সুরাসার বা চুয়ানো মদিরা — যাহারা শুল্ক প্রদত্ত হইয়াছে, আমদানী করিলে;অথবা (খ) যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্বকীয় ব্যবহারার্থে যথাবিধি কাহার ও দ্বারা আনী, তাদৃশ সুরাসার বা মদিরা তাহার স্থানত্যাগকালে বা মৃত্যুর পর বিক্রয় করে বা তাহার পক্ষে কি তাহার সম্পর্কিত প্রতিনিধির পক্ষে 'নিলাম করা হয়, তাহা হইলেও — এই ধারার আমলে আসবে না।

ব্যাখ্যা। এই ধারার উদ্দেশ্যার্থে " বিদেশীয় সুরাসার বা চুয়ানো মদিরা" শব্দে বুঝাইতেছে যে, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয় না, এমন কোন সুরাসার বা চুয়ানো মদিরা।

৪

কোন ব্যক্তি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের প্রদত্ত পাশ ব্যাতিরেকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে প্রস্তুত ও উৎপাদিত সুরাসার বা চুয়ানো মদিরা রপ্তানি কি বিক্রয় করিলে তিন মাসের অনধিককাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়প্রকারে দণ্ডিত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(বিবিধ)

৫

১৮৬১ সালের পুলিস আইন এবং ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় আইন (বঙ্গীয় পুলিস বলের ব্যবস্থা সংশোধক আইন) অনুসারে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে এক সাধারণ পুলিস ডিস্ট্রিক্ট স্বরূপে বিবেচিত হইবে, এবং কমিশনার ইনস্পেক্টর জেনেরেল অব্ পুলিসের যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিবেন।

৬

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের যাবতীয় কর্ম্মচারী সুপারিন্টেন্ডেন্টের অধস্তন-স্বরূপে পরিগণিত হইবেন; তিনি তাদৃশ যে কোন কর্ম্মচারীর তথা ৬ষ্ঠ ধারানুসারে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কোন ক্ষমতালব্ধ এসিস্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের যে কোন আদেশ পরিবর্ত্তন করিতেপারেন। (২) কমিশনার পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট বা অপর কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক এই বিধানানুসারে বিহিত যে কোন আদেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। (৩) এই বিধানানুসারে যে কোন আদেশ স্থানীয় গভর্নমেন্ট পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

৭

(১) এই বিধানের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গভর্নমেন্ট নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন। (২) সাধারণভাবে উপরিলিখিত ক্ষমতার কোন বাধা না

জন্মাইয়া এরূপ নিয়মাবলী দ্বারা বিশেষত ঃ —

(ক) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে দেওয়ানী বিচার পরিচালন সংক্রান্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন।

(খ) তথাকথিত প্রদেশের মোকর্দ্দমায় আইন-ব্যবসায়ীদেগের উপস্থিতি নিবারণ বা নিয়মিত করিতে পারেন।

(গ) তথাকথিত প্রদেশ দলিলাদি রেজেস্টারীর ব্যবস্থা করিতে পারেন।

(ঘ) তথাকথিত প্রদেশ ভূমির হস্তান্তর করণে বাধাপ্রদান বা তাহা নিয়মিত করিতে পারেন।

(ঙ) তথাকথিত প্রদেশকে সার্কেল সমূহে, সেই সকল সার্কেল্ নানা তালুকে এবং তৎসমুদয় তালুক, আবার নানা মোজায় বিভাগ করতে পারেন।

(চ) চিফ্ দেওয়ান হেড্ম্যানগনের যোগে তথাকথিত সার্কেল, তালুক ও মৌজা সমূহের রাজস্ব নির্দ্ধারণ বা সংগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারেন।

(ছ) চিফ্ দেওয়ান এবং হেডম্যানগণের ক্ষমতা ও এলেকার সীমা নির্দ্দেশ এবং তাদৃশ এলেকা ও ক্ষমতার পরিচালন নিয়মিত করিতে পারেন।

(জ) দেওয়ান ও হেড্ম্যানের নিযুক্তি ও পদচ্যুতি নিয়মিত করিতে পারেন।

(ঝ) চিফ্ দেওয়ান, হেড্ম্যান ও গ্রাম্য কর্ম্মচারীদিগকে পুরস্কারস্বরূপ সাধারণতঃ ভূমির স্বত্ত্ব বা অপর যাহা উপযুক্ত বিবেচিত হয়, দিতে পারেন।

(ঞ) চাষী রায়তগনের এক সার্কেল হইতে সার্কেলান্তরে পলায়নে বাধা, বা তাহা নিয়মিত করিতে পারেন।

(ট) সাধারণের উপকারার্থে প্রয়োজনীয় ভূমি গভর্নমেন্ট কর্ত্তৃক খাসকরণ নিয়মিত করিতে পারেন।

(ঠ) তথাকথিত প্রদেশে টেক্সের টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

(ড) এই বিধান বা তদধীন সময়ে সময়ে প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কর্ম্মচাবীদিগের কার্য্যবিধি নিয়মিত করিতে পারেন।

(৩) এই ধারানুসারে স্থানীয় গভর্নমেন্ট কর্ত্তৃক বিহিত যাবতীয় নিয়মাবলী কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইবে;এবং তাদৃশী বিজ্ঞাপনী এই বিধানের ন্যায় কার্যকরী হইবে।

৮

এই বিধান অথবা তৎকালে প্রচলিত কোন আইন ভিন্ন, এই বিধান বা উপরোক্ত নিয়মানুসারে বিহিত কোন মীমাংসা, কার্য্য বা আদেশ সম্বন্ধে অন্য কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

৯

১৮৬০ সালের ২২ আইন (সাধারণ বিধান ও আইনানুসারে স্থাপিত আদালতের এলেকা হইতে চট্টগ্রাম জিলার পূর্ব্ব সীমাবর্ত্তী কতিপয় প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করার আইন) ১৮৬৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন (১৮৬০ সালের ২২ আইনের সংশোধক আইন) ১৮৭৪ সালের সিডিউল ডিষ্ট্রিক্টস্ আইনের দ্বিতীয় সিডিউলের এবং ১৮৯১ সালের রহিত ও সংশোধিত করার আইনের যে অংশে (পূর্ব্বোক্ত যে কোন আইনের কথা উল্লেখ থাকে, তাহা এ) তদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

উপরিউক্ত বিধানের অষ্টাদশ ধারানুসারে

লেপ্টেনান্ট গভর্ণর বাহাদুর কৃত নিয়মাবলী

(Dated the 1st May 1900, Notification No. 123 P.D.)

দেওয়ানী বিচার পরিচালন

১

দেওয়ানী বিচার কার্য্য অতীব সরল ভাবে সত্বর তার সহিত যোগ্য ও ন্যায় সঙ্গত রূপে নিস্পত্তি চলিবে।

২

বিচারক অভিযোগাদি পরিচালনকালে প্রথমত উভয়পক্ষের মৌখিক জবানবন্দি শুনিয়া তাহাদের মধ্যে প্রকৃত বিচার নিস্পত্তি করিতে চেষ্টা করিবেন। বিচারক সাক্ষ্য ব্যতিরেকে মোকর্দ্দমার প্রকৃত বিষয়ের উপর মীমাংসা করিতে অসমর্থ না হইলে, সাক্ষী আহ্বান করা হইবে না।

৩

নথিতে নিম্নোক্ত বিররনী থাকিবে, যথা — অভিযোগকারীর নাম, অভিযোক্তার নাম, মোকর্দ্দমার দাবী ও অন্য বিষয়ের প্রকৃতি, অভিযোগকারীর বর্ণনার সারাংশ, অভিযোক্তার বর্ণনার সারাংশ, (যেখানে সাক্ষ্য গৃহীত হয়) সাক্ষীর জবানবন্দীর সারাংশ, বিচার নিস্পত্তির যুক্তি এবং তারিখ ও দস্তখত যুক্ত হুকুম।

৪

কোন বিষয় বা অভিযোগে কোর্টফিস গৃহীত হইবে না।

৫

পরওয়ানা জারীর রুজিনা — অধিকতম নিকটবর্ত্তী থানা হইতে যাতায়াতে যত দিন প্রয়োজন হয়, এতদিনের দৈনিক ছয় আনা হিসাবে গৃহীত হইবে।

৬

পরওয়ানা বা ডিক্রিজারী করিতে রাজকর্ম্মচারিগণ যতদূর সম্ভব দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে চলিবেন। অপর জিলার আদালত হইতে প্রাপ্ত সমন বা ডিক্রি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী পরিলক্ষিত হইবে;— (১) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বাহিরের দেওয়ানী আদালত সমূহ হইতে জারী করিবার নিমিত্ত পরওয়ানা বা ডিক্রি —

(ক) পরওয়ানা সম্বন্ধে মোকর্দ্দমার অবস্থা এবং পাঠাইবার কারণ, আর ডিক্রি সম্বন্ধে রায়ের এক খণ্ড নকল — ইংরাজিতে বিকৃত করিয়া এবং

(খ) হাইকোর্টের নির্ধারিত ফিল সহ আসিলে, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সেই পরওয়ানা বা ডিক্রি জারী করাইবেন। (২) যদি কোন কার্য্য নৌকা ভাড়া বা রসদ বহন কি তাদৃশ কোন কারণে প্রাপ্ত ফিস হইতে জারী খরচ বেশী লাগিবে বোধ হয়, তাহা হইলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সেই জারী স্থগিত রাখিবেন; এবং তৎসম্পর্কিত দেওয়ানী আদালতে ব্যয়ের বিবরণ ও আবশ্যকীয় খরচের টাকা পাঠাইবার অনুরোধ জানাইবেন। (৩) যদি কোন কারণে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পরওয়ানা বা ডিক্রি জারী করা যায় না বোধ করেন, তখন তিনি তদ্রূপ মনে করিবার কারণ লিখিয়া অবিলম্বে তাহা তৎসম্পর্কিত দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দিবেন, এবং পরওয়ানা বা ডিক্রি বা তৎফিস্ চূড়ান্ত আদেশ পর্য্যন্ত জমা থাকিবে। (৪) এই '২' ও '৩' অংশের কোনটী সম্বন্ধে তৎসম্পর্কিত দেওয়ানী আদালত সুপারিন্টেণ্ডেন্টের আদেশ বরাবর চট্টগ্রামের কমিশনার সমীপে পাঠাইতে পারেন; এবং কমিশনার তাহার উপর হুকুম দিবেন, ও তাহা বরাবর তৎসম্পর্কিত দেওয়ানী আদালতে জানাইবেন। যদি কোন দেওয়ানী আদালত কমিশনারের হুকুমের উপর ও কিছু করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহা গভর্নমেন্টের আদেশের নিমিত্ত ডিস্ট্রিক্ট জজের নামে পাঠাইবেন। (৫) সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, যাহার উপর পরওয়ানা বা ডিক্রি জারী করিতে হইবে। তাহার মর্য্যাদা ও অবস্থানুসারে, তাঁহার নাজীর বা সার্কেল চিফ্ কিংবা রেজেস্টারীভুক্ত হেডম্যানদিগকে দিয়া এই সকল নিয়মে উল্লিখিত পরওয়ানা বা ডিক্রি জারী করাইবেন। সমন বা ডিক্রি জারীর

নিমিত্ত নির্বাচিত এজেন্টদের নিকটে মোহরযুক্ত আদেশ পাঠান ভিন্ন এই সব জারীতে পুলিশ নিয়োজিত না ও হইতে পারে। (৬) সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রত্যেক পরওয়ানা জারিতে তৎসম্পর্কিত দেওয়ানী আদালতে সংবাদ দিবেন এবং ডিক্রি পরিচালনা সম্বন্ধে — যতদিন পর্য্যন্ত তাহা নিষ্পত্তি না হয় সেই আদালতের সহিত পত্রাদি চালাইবেন।

৭

কোন কারণে শতকরা বার্ষিক ১২ বার টাকার অধিক সুদ আদালতে ডিক্রি দেওয়া হইবে না।

৮

যে সকল দলিল নিম্নোক্ত রেজেষ্টারী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী অনুসারে রেজেষ্টারী প্রয়োজন, তৎসমুদয় সেইভাবে রেজেষ্টারী না হইলে কোন মোকর্দ্দমায় গ্রাহ্য হইবে না।

৯

যে আদানপ্রদানের নিমিত্ত মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহা যদি খত দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাদৃশ খতের রেজেষ্টারী অপরিহার্য্য হইলে, তবে কেবল সেইরূপ রেজেষ্টারী যুক্ত খতেরই মোকর্দ্দমা গৃহীত হইবে।

১০

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার যাবতীয় আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনার সমীপে আপিল হইতে পারিবে। তিনি এরূপ আপিলের খরচ কাহাকে দিতে হইবে — মীমাংসা করিতে পারেন।

(আইন ব্যবসায়ী এবং কার্য্যকারক Agent)।

১১

কোন ও কার্য্যে আইন ব্যবসায়ীর উপস্থিতি অনুমোদিত হইবে না এবং যাবতীয় বিষয়েই যেখানে চিফ্‌গন স্বয়ং সম্বন্ধযুক্ত, তাঁহারা যথাসম্ভব নিজেরাই কাজ চালাইবেন মাত্র। যখন চিফ্‌দের স্বয়ং উপস্থিতি অসুবিধা বা কার্য্যকারক নিশ্চিতই আইন ব্যবসায়ী হইবে না।

দলিলাদির রেজেষ্টারী

১২

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত ভূমি সম্পর্কীয় বা তথায় সম্পাদ্য কার্য্য সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত শ্রেনীর দলিলাদি রেজেষ্টারী হইবে;—

(ক) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি, দান, বিভাগ বা বন্ধক বিষয়ক দলিল। (খ) এক বৎসরের অধিককালের জন্য স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা। (গ) খত, কোম্পানীর কাগজ এবং টাকা দেওয়ার প্রতিজ্ঞাপত্র। (ঘ) উৎপন্ন শস্যাদি অন্য কোন দ্রব্য বা যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার বা চুক্তিপত্র। (ঙ) উইল, এবং পোষ্য গ্রহণের ক্ষমতা পত্র। (চ) বন্ধকের মুক্তিনামা। (ছ) কোন সম্পত্তি বা জমিদারীর কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ সনন্দ।

১৩

উপরিলিখিত দলিল ভিন্ন অপর দলিলাদি রেজেষ্টারী না করিলেও চলে। এবং রেজেষ্টারী না করার দরুন তাহা আদালতে অগ্রাহ্য হইবে না।

১৪

আইন বিরুদ্ধ, নীতি বিগর্হিত, সাধারণ উদ্দেশ্যের বিপরীত অথবা স্পষ্টতঃ অসম্ভব কোন প্রতিজ্ঞাপত্র রেজেষ্টারী করা হইবে না।

১৫

যদি রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারীর অবোধ্য এবং ঐ জেলার সচরাচর অপ্রচলিত ভাষায় কোন দলিল রেজেষ্টারীর নিমিত্ত রীতিমত উপস্থিত করা হয়, তৎসঙ্গে সচরাচর প্রচলিত ভাষায় এক যথাযথ অনুবাদ এবং তাহার এক যথাযথ নকল ও না দিলে তিনি তাদৃশ দলিল রেজেষ্টারী করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৬

কোন দলিলে দাগ, পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে ভ্রমসংশোধক লেখা, খালি, চাঁচিয়া তোলা বা পরিবর্ত্তন

দেখা গেলে, যদি তাদৃশ দাগ, পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে ভ্রমসংশোধক; লেখা খালি চাঁচিয়া তোলা বা পরিবর্ত্তনে দলিলের সাক্ষ্য সম্পাদক ব্যক্তির দস্তখত বা সংক্ষিপ্ত সহি না থাকে, তবে তাহা রেজেষ্টারীর জন্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। এবং রেজেষ্টারীর সময় তাদৃশ পঙ্ক্তিদ্বয় মধ্যবর্ত্তী সংশোধক লেখা, খালি, চাঁচন বা পরিবর্ত্তনের কথা তিনি নোট করিবেন।

১৭

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোন দলিলে তাদৃশ সম্পত্তি পরিচিত করিবার পর্য্যাপ্ত বর্ণনা না থাকিলে, রেজেষ্টারীর নিমিত্ত পরিগৃহীত হইবে না।

১৮

উইল অথবা পোষ্য গ্রহণের ক্ষমতা- পত্র ব্যতীত কোন দলীল সম্পাদিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে রেজেষ্টারীর নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মচারী সমীপে উপস্থাপিত না হইলে, যদি তিন মাসের মধ্যে রেজেষ্টারী না করার উপযুক্ত এবং উক্ত কর্ম্মচারীর সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শিত না হয়, তবে তাহা রেজেষ্টারীর জন্য গৃহীত হইবে না। শেষোক্ত স্থলে চারিমাসের মধ্যে হইলে সাধারণ ফিসের চর্তুগুণ লইয়া তবে রেজেষ্টারী করা যাইতে পারিবে।

১৯

উইল বা পোষ্য গ্রহণের ক্ষমতা-পত্র যে কোন সময়ে রেজেষ্টারী হইতে পারে।

২০

রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারীর কার্য্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট দ্বারা বা স্থানীয় গভর্নমেন্ট কর্ত্তৃক উক্ত কার্য্যের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

২১

রেজেষ্টারকারীর নিমিত্ত আনীত প্রত্যেক দলিলই তাহার দাবিদার বা নির্ব্বাহক কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইবে কিন্তু নির্ব্বাহক বা তাহার প্রতিনিধি কি ভাবার্পিত ব্যক্তি অথবা (২২শ নিয়মানুসারে

অনুমোদিত) কার্য্যকারক রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারীর সম্মুখে উপস্থিত বা তৎসম্পাদন স্বীকার না করিলে কোন দলিল রেজেষ্টারী করা হইবে না। যখন রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক আহুত কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইতে অস্বীকার করে বা শপথ গ্রহণ করিতে কি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরদানে কিংবা তাহার বর্ণনায় দস্তখত করিতে অস্বীকার করে, অথবা রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারী সমীপে কোন মিথ্যা বর্ণনা করে, তাহা হইলে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

২২

সাধারণ নিয়মে — (১) পার্ব্বত্য চিফ্‌ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তি, (২) ইউরোপীয় ভদ্রলোক এবং (৩) পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকের পক্ষে মাত্র রেজেষ্টারীর কার্য্য চালাইতে কার্য্যকারক অনুমোদিত হইবে। কেবল সম্ভ্রান্ত অথবা ঘটনার সহিত স্বয়ং পরিচিত কার্য্যকারকগণকেই
কার্য্য চালাইতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

২৩

নিম্নলিখিত হারে রেজেষ্টারীর ফিস্‌ দিতে হইবে ঃ

চাষী রায়তকে পাট্টা দিতে ৯০ আনা

১২শ নিয়মের "গ" শীর্ষকে উল্লিখিত যে কোন দলিলে — ।।০

১২শ নিয়মের "গ" শীর্ষকে উল্লিখিত দলিলে জন্য — যখন দাবি ৫০ টাকার ন্যূন থাকে — ৯০

তাদৃশ কাগজে যখন দাবি ৫০ টাকার কম বা ৩০০ টাকার অধিক থাকে না বা অনির্দ্দিষ্ট থাকে — ।।০ আনা

১২শ নিয়মের "ঘ" শীর্ষকে উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা পত্রে, যখন ওয়াৰ্দ্দা ৩ মাসের অনধিক হয় — ।০ আনা

তাদৃশ কাগজে, যখন ওয়ার্দ্দা তিন মাসের অধিক বা অনির্দ্দিষ্ট থাকে — ।।০ আনা

১২শ নিয়মের "ঙ" শীর্ষকে উল্লিখিত যে কোন দলিলে

" " " " চ " " ।০ আনা

" " " " ছ " " ।০ আনা

১৩শ নিয়মানুসারে রেজেষ্টারী ও অপর যাবতীয় দলিলে — ।।০ আনা

২৪

যাহাতে দলিলের নকল রাখা হয়, সেই বহি লোকদিগকে দেখিতে দেওয়া যাইতে পারে, অথবা নকলের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় ব্যতীত অগ্রিম আট আনা ফিস্ দাখিল করিলে দলিলের এক খণ্ড নকল লওয়া যাইতে পারে।

২৫

রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারী দলিল রেজেষ্টারীর পূর্ব্বে তদীয় সম্মুখে উপস্থিত পক্ষদ্বয় -- তাহারা যাহাদের নামে পরিচিত হইতেছে প্রকৃত তাহারা কিনা, এবং তাহারা দলিলের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়াছে কিনা — তদ্বিষয়ে স্বয়ং সন্তুষ্ট হইবেন।

২৬

তিনি অনন্তর দলিলের পৃষ্ঠে নিম্নোক্ত আকারে লিখিবেন ঃ —

——————(তারিখের) ——————(ঘটিকার সময়)

পিতার নাম —————————————— সাকিন —————— এবং

—————— পিতার নাম —————————————— সাকিন

মৎকর্ত্তৃক পরিচিত——————বা —————— সাকিন —————— কর্ত্তৃক যথা নিয়মে সনাক্ত, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সম্পাদিত কাগজ স্বীকার করিয়াছিল, ও আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল যে, তাহারা ইহার মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছে।

২৭

অনন্তর সেই দলিল পৃষ্ঠ-লিপির (Endorsement) সহিত রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারীর পত্রাঙ্ক ও দস্তখত যুক্ত বহিতে অবিলম্বে নকল করা হইবে। এই নকলে ও রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারী সহি করিবেন, এবং অতঃপর সেই মূল কাগজ দাবিদাবকে ফেরৎ দিবেন।

২৮

রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারী এক পৃথক পুস্তকে যাবতীয় রেজেষ্টারী ও রেজেষ্টারীর অগ্রাহ্য দলিলের তারিখ অনুসারে নিম্নোক্ত মতে এক স্মারক লিপি (Memorandum) রক্ষা করিবেন ঃ—

রেজেষ্টারীর বা রেজেষ্টারী অগ্রাহ্যের তারিখ	রেশন্ বহির কত পৃষ্ঠায় রেজেষ্টারী হইয়াছে বা কি কারণে রেজেষ্টারী অগ্রাহ্য হইয়াছে	উভয় পক্ষের নাম ও সাকিন	দলিলের প্রকৃতি ও তারিখ।

২৯

যে বহিতে দলিলের নকল রাখা হয়, সেই বহি পরিপূর্ণ হইয়া গেলে কাগজেব পক্ষগণের বর্ণনানুক্রমিক এক সূচী তৎসঙ্গে পরিশিষ্ট স্বরূপ যোগ করিতে হইবে।

৩০

রেজেষ্টারী সম্বন্ধীয় যে কোন আবশ্যকীয় এবং ন্যায্য খরচ আদায়ীকৃত ফিস্ হইতে দেওয়া হইবে। আর উদ্বৃত্ত যাহা কিছু তজ্জন্য প্রয়োজন না হইলে, গভর্নমেন্ট সময়ে সময়ে যেরূপ আদেশ করেন, তদানুসারে ব্যবহৃত হইবে। রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারী রসিদ ও খরচের এক পাকা হিসাব রক্ষা করিবেন; এবং ত্রৈমাসিক এক একবার তাহা কমিশনার সম্মুখে মঞ্জুরী ও পুনঃদস্তখতের জন্য উপস্থিত করিবেন।

৩১

১৮৭৭ সালের ভারতবর্ষের রেজেষ্টারী বিষয়ক আইনে "পাট্টা" (স্থাবব সম্পত্তি এবং অস্থাবর সম্পত্তি-র সংজ্ঞা যেরূপ আছে, তাহা এই সকল নিয়মে এবং এই সকল নিয়মানুসারে রেজেষ্টারীকৃত দলিলাদিতে প্রযুক্ত হইবে।

যতবার সুবিধা পাওয়া যায়, রেজেষ্টারী, বহি কমিশনার কর্তৃক পরিদর্শিত এবং পুনঃ দস্তখত করা হইবে।

৩৩

সম্পাদিত দলিলের কোন পক্ষ তাহা অস্বীকার করিবার হেতুতে রেজেষ্টারী অগ্রাহ্য হইলে অগ্রাহ্য হওয়ার তারিখ হইতে তিনমাসের মধ্যে কোন পক্ষ তাহা রেজেষ্টারী করাইবার নিমিত্ত মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারে। এরূপ মোকর্দ্দমায় রেজেষ্টারকারী কর্ম্মচারী কোন পক্ষভুক্ত হইবেন না; তদীয় অগ্রাহ্য আদেশের উপযুক্তরূপে সহিযুক্ত একখণ্ড নকল, তাহাতে দলিল রেজেষ্টারী না হওয়ার যে কারণ লিখিত আছে, সেই কারণের স্পষ্ট (Prima facia) প্রমান স্বরূপ গৃহীত হইবে। এই সকল নিয়মে যাহাই থাকুক না কেন, যে দলিল লইয়া মোকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে, তাহা এই মোকর্দ্দমার সাক্ষ্য স্বরূপ গৃহীত হইবে।

ভূমি

হস্তান্তর বিভাগ বা ইজারাদি প্রদান

৩৪

চায়ের জন্য গভর্নমেন্ট হইতে পাট্টার প্রাপ্ত ভূমি যে কোন নিয়মে প্রদত্ত হউক তাহা এই করারে প্রদত্ত হইবে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর ভিন্ন অথবা কমিশনারের সম্মতি ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপে হস্তান্তর করা বা ইজারাদি দেওয়া যাইতে পারিবে না। কমিশনারের সম্মতি ভিন্ন কোন বিভাগ করা যাইবে না। পীড়া, অযোগ্যতা, নাবালকত্ব, ভ্রমণজনিত অনুপস্থিতি বা তাদৃশ প্রয়োজন বশতঃ কোন কিছু কালের নিমিত্ত অন্যকে তদীয় ভূমি দিলে তাহা ইজাবাদি বলিয়া গণ্য হইবে না; কিন্তু তেমন স্থলে কোন রায়ত তাহার প্রতিনিধি বা গচ্ছিত ব্যক্তির (Trustee) নিকট হইতে স্বকীয় দেয় রাজস্বের অধিক আদায় করিতে পারিবে না।

সার্কেল বিভাগ

৩৫

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে নিম্নলিখিত সার্কেলগুলি আছে। ইহাদের সীমা সর্ব্ববিদিত, এবং তজ্জন্য কোন গোলযোগ নাই —

(১) গভর্নমেন্ট সংরক্ষিত বন প্রবেশ (Govt., forest reserve) সমূহ;

(২) "সম্খসব্ ডিভিসানের খাস মহাল রূপে পরিচিত প্রদেশসহ বোমাং সার্কেল,

(৩) "সদর সব ডিভিসানের খাসমহলে পবিচিত প্রদেশ সহ চাক্‌মাচিফের।

(৬) মঙ্‌চিফের সার্কেল।

তালুক বিভাগ

৩৬

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার নিমিত্ত ১৮৯০ অব্দে যে তত খণ্ড গঠিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় স্থায়ি বিভাগরূপেই পরিগণিত হইয়াছে এবং তাহা তালুক বলিয়া কথিত হয়। সে সকল তিন সার্কেলে নিম্নোক্তরূপে আছে:

বোমাং সার্কেলে — ১৮ খণ্ড, চাক্‌মাচিফের সার্কেলে — ৯ খণ্ড, মং চিফের সার্কেলে — ৬ খণ্ড।

মৌজা

৩৭

তালুকগুলি নানা মৌজায় বিভক্ত হইয়াছে। সাধারণ এক মৌজায় পাহাড়, জঙ্গল ও পতিত জমিসহ অন্যূন দেড়বর্গ মাইল হইতে অনধিক ২০ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত ভূমি থাকিবে। যেখানে চাষ আছে তথায় মৌজা গঠিত হইবে, এবং তাহার বহিঃ প্রান্তবর্ত্তী সীমা মানচিত্রে বিন্যস্ত হইবে। আর যেখানে স্থায়ী গ্রাম আছে, চাষ না থাকিলেও তথার মৌজা সংগঠিত হইবেক। অপরাপর মৌজাসমুদয় অবস্থানুসারে গঠিত হইবে, এবং নির্দ্দিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত তৎসমুদয় অগ্নিফাইণ্ড (undifined) অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট মৌজা স্বরূপ পরিচিত হইবে।

সার্কেল ও মৌজার শাসন

৩৮

চাক্‌মাচিফ, বোমাং ও মংচিফ্ — চিফত্রয়ের উপর তওৎ সার্কেলের শাসনভার অর্পিত, গভর্নমেন্ট কর্ম্মচারী ও তদীয় পরিবার বাজারের বেপারী ও দোকানদারগণ, মৎস্য ও গর্জন খোলার পাট্টা গ্রহীতাগণ ব্যতীত সার্কেল মধ্যে বাস বা চাষকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই এলাকাধীন চিফের প্রজা। বর্ত্তমান হেডম্যানগণের উপর মৌজা শাসনের ভার রহিয়াছে। আর যেখানে

প্রয়োজন হয়, সুপারিন্টেন্ডন্ট চিফ্ ও মোজাবাসীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া হেডম্যান নিযুক্ত করিবেন। প্রাগুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত মৌজামধ্যে বাস বা চাষকারী ব্যক্তিমাত্রেই তত্তৎ হেড়্ম্যানের কর্ত্তৃত্বাধীন হইবে।

খাজনা আদায়

৩৯

প্রত্যেক মৌজার খাজনা হেড়্ম্যানের নিকট দিতে হইবে। মৌজা মধ্যে অধিবাসী কিংবা চাষী প্রত্যেক গৃহস্থই হেডম্যানকে কর দিতে বাধ্য, এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের মঞ্জরি ব্যতীত তাদৃশ বাধ্যতা হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। হেডম্যানগণ চিফ্গণের কর্ত্তৃত্ব এবং পরিচালনাধীনে কর আদায় করিবেন। চিফ্ এবং হেডম্যান গভর্নমেন্ট যে সময়ে যেরূপ মঞ্জুর করেন, যথাক্রমে তদনুযায়ী সংগৃহীত খাজনার উপর কমিশন পাইবেন।

চিফ্ এবং হেডম্যানদিগের শাসন ক্ষমতা

৪০

চিফ্গণ অর্থদণ্ড, ক্ষতিপূরণ আদায়, এবং কয়েদ করিবার ক্ষমতার সহিত এই নিয়মের শেষবাগে বর্ণিত অভিযোগগুলি ছাড়া তাহাদের সার্কেলের যাবতীয় ঘটনা এবং তদধীন হেড়্ম্যানদিগের কৃতকার্য্যের বিচার নির্ব্বাহ করিবেন। সেইরূপ হেড়্ম্যান ২৫ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা ক্ষতিপূরণ আদায় এবং সুপারিন্টেণ্ডেন্টের আদেশ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আটক রাখিবার ক্ষমতার সহিত মৌজার আভ্যন্তরীণ কার্য্য চালাইবেন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই সকল ক্ষমতা পরিচালনার উপর পুনর্ব্বিচার করিতে পারিবেন। তিনি পুলিস হইতে অভিযোগ সংঘটনের সংবাদ লইয়া থাকিবেন। উপরি উল্লেখানুসারে (চিফদিগের) ক্ষমতা ব্যতিরিক্ত অভিযোগ —

(১) গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্ট কর্ম্মচারী এবং গভর্নমেন্ট কর্ত্তক নিস্পন্ন বিচারে বিরুদ্ধে অভিযোগ। (২) সাংঘাতিক আঘাত সংঘটিত বা প্রাণনাশক অস্ত্র ব্যবহৃত দাঙ্গার অভিযোগ। (৩) কাহার বিরুদ্ধে খুন, অপরাধযুক্ত নরহত্যা, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর আঘাত, বেআইনি আটক, বলাৎকার * মানুষ ভুলাইয়া নেওয়া মানুষ চুরি, * এবং অনৈসর্গিক দোষের অভিযোগ।

পাহাড়ীদের মধ্যে যে সকল বলাৎকার, মানুষ ভুলাইয়া নেওয়া, এবং মানুষ চুরি প্রভৃতি ঘটে, তৎসমুদয়ের বিচার ভার ও চিফ্দের হাতে আছে। তাঁহারা এইরূপ জাতীয় সম্পৃক্ত আরও কোন কোন অভিযোগর মীমাংসা করিতে পারেন।

(৪) বলপূর্ব্বক গ্রহণ, দস্যুতা, ডাকাইতি অনধিকার প্রবেশ অথবা ঘরে শিং দিয়া ৫০০ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি লইয়া গেলে। (৫) জালিয়াতি। (৬) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেব বিধানের ৪র্থ পরিচ্ছেদের অন্তর্গত দোষসমূহ। (৭) এই সম্বন্ধে কমিশনার যাহা বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত করেন, তত্তৎ অভিযোগ বা অভিযোম সমূহ।

খাজানা

৪১

কর চতুর্ব্বিধ যথা ঃ

(১) প্রচলিত জুমকর ও বেগার; (২) চাষের খাজানা; (৩) কৃষি ব্যতীত অন্য (দোকানাদি) উদ্দেশ্যে যে ভূমি রাখা হয়, তাহার খাজানা; (৪) ছন এবং গৰ্জ্জন খোলার খাজানা।

জুমকর ও বেগার

৪২

যাহারা দেশরীতি মতে জুমকর দিতে বাধ্য এমন প্রত্যেক জুমিয়া যে চিফের সার্কেলে সে বাস করে, তাঁহারা নিকট গভর্নমেন্টের জন্য জুমকর প্রদান করিবে। যাঁহার মৌজামধ্যে সে বাস করে, সেই হেড্‌ম্যান কর্ত্তৃক তাহা সংগৃহীত হইবে। যদি কোন জুমিয়া যেখানে সে বাস কবে তথা হইতে ভিন্ন সার্কেল বা মৌজায় জুমকারে, তাহা হইলে তাহাকে বিবিন্ন সার্কেল স্থলে — নিজ সার্কেল চিফ্‌কে যাহা দিতে হয়, তদ্ভিন্ন যে সার্কেলে জুম করিয়াছে তথায় ও পূর্ণ জুমকর দিতে হইবে; এবং একই সার্কেলের অন্তর্গত বিভিন্ন মৌজাস্থলে — নিজ মৌজার হেড্‌ম্যানকে যাহা দিতে হয়, তদ্ভিন্ন যে মৌজায় জুম করিয়াছে, তথায় জুমকরের অর্দ্ধেক দিতে হইবে। জুম করিয়া চাষ ও করিলে তজ্জন্য জুমকর হইতে মুক্তি পাইবে না। জুমরেজেষ্টারিতে প্রত্যেক মৌজার জুম ও জুমকর পৃথগ্‌ভাবে দেখাইতে হইবে।

চাষের খাজানা

৪৩

যে কোন উপযুক্ত লোক চাষ করিতে চাহিলে গভর্নমেন্টের গেজেটের কর্ম্মচারী. চিফ্ ও হেড়ম্যান তাহাকে সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়া তজ্জন্য আবশ্যকীয় ক্ষমতা দিতে পারেন। চাষের

খাজানা চিকের পরিচালন এবং পরিদর্শনাধীনে হেড্‌ম্যান কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইযা অবস্থাবিশেষে যেরূপ সুবিধা হয়, একেবারে সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট বা চিকের হাত দিযা প্রদান কবিতে হইবে। হেড্‌ম্যান যে কোন উপযুক্ত রায তাক্‌, তাহার ক্ষমতার যত অধিক ভূমি আবাদ হইতে পারে, সেই পরিমাণ ভূমির ভারার্পণ করিতে পারেন। প্রথম তিন বৎসরের জন্য ইহা কর হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে। অতঃপর সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্ত্তৃক কব নির্দ্ধারিত হইবে, এবং একবার যে হার নির্দ্দিষ্ট হয়, দশ বৎসরের মধ্যে তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে না। হেড্‌ম্যান তাহার মৌজাস্থ যাবতীয় চাষের জমির এক জমাবন্দী প্রস্তুত করিবেন, তাহা সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইলে দাবির মূল কাগজ বলিয়া গণ্য হইবে। এই সকল জমাবন্দী যখন সম্ভব হয়, প্রতিবৎসরই ভূমিতে গিয়া পরীক্ষিত হইবে। পাট্টা অনুসারে যে চাষ হয়, যতদিন বাজেয়াপ্ত না হয়, তাহা ও পাট্টার সর্ত্ত মতে জমাবন্দীভুক্ত করা যাইবে। যখন পাট্টার সর্ত্ত ভঙ্গ করা হয়, তখন সেই পাট্টা রদ করা হইবে, এবং যেন কোন পাট্টা দেওযা হয় নাই, জমি এমনভাবে প্রকৃত চাষীর সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে।

চাষ ভিন্ন অন্য জমি ও বাজারের খাজানা

৪৪

অকৃষ্ট ভূমিসমূহের খাজানা সুপারিন্টেন্ডেন্টই নির্দ্দিষ্ট কবিবেন, এবং যখন এইরূপ নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা জমাবন্দীভুক্ত হইবে ও চাষের খাজানার ন্যায় বিভক্ত হইবে। কিন্তু বাজার সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না, সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাহা মৌজা হইতে পৃথক কবিয়া বন্দোবস্ত প্রদান কবিবেন এবং হেড্‌ম্যানের দ্বারা বা স্বয়ং তিনি যেরূপ উচিত বোধ করেন, তাহা পরিচালন করিতে পারিবেন।

ছন ও গর্জ্জন খোলাব খাজানা

৪৫

মৌজাসকলের (বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের ১৯০২ সালেব এই ডিসেম্বরেব পত্র) সীমামধ্যে উৎপন্ন নূতন ছনখোলা ভিন্ন সমুদয় ছনখোলা এখনকার মত সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্ত্তৃক হয়তঃ বৎসর বৎসর অথবা যে কোন অবস্থাতেই দশ বৎসবেব অনধিক কোন সময়েব জন্য বন্দোবস্ত প্রদত্ত হইবে, এবং যখন বন্দোবস্তি প্রদত্ত হয় — তৎসমুদয়ের খাজানা পৃথক্‌রূপে আদায় করা হইবে, জমাবন্দীভুক্ত হইবে না বা চাষেব কি অকৃষ্টভূমিব রাজস্বের ন্যায বিভক্ত হইবে না।

জায়গীর

৪৬

প্রত্যেক মৌজামধ্যে ৫০ পঞ্চাশ একর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষিযোগ্য ভূমি সীমানির্দ্দিষ্ট ও লিপিবদ্ধ হইয়া হেড্‌ম্যান, পাটোয়ারী কি কারবারী — যদি একজন থাকে, এবং চৌকিদার — যদি এ সমুদয় নিয়োজিত হয়, প্রভৃতি গ্রাম্য কর্ম্মচারীদিগকে বেতন স্বরূপ দেওয়ার নিমিত্ত গভর্নমেন্টের খাসভূমিরূপে পৃথক থাকিবে;এবং তৎসমুদয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্ত্তৃক তাহাদের কার্য্যকাল পর্য্যন্ত বিনা করে প্রদত্ত হইবে। কোন হেড্‌ম্যান বেতনস্বরূপ এই ভূমির পঁচিশ একরের অধিক রাখিতে পারিবেন না; কিন্তু অবশিষ্ট ভূমি যতকাল কাহার ও দখলে দেওয়া না যাইবে, ততদিন সুপারিন্টেন্ডেন্ট যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন, অস্থায়ী বন্দোবস্তে, হেড্‌ম্যানের হেপাজতে রাখিতে পারেন। কোন কর্ম্মচারীই তাদৃশ জমি হস্তান্তর করিবার কিংবা গভর্নমেন্ট বা পরবর্ত্তী কর্ম্মচারী হইতে ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ব্যয়িত কোন ক্ষতিপূরণ লওয়ার অখণ্ডনীয় স্বত্ব থাকিবে না;কিন্তু কমিশনার নবনিযুক্ত কর্ম্মচারীকে জমির স্থায়ী উৎকর্ষের নিমিত্ত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ তদীয় পূর্ব্বাধিকারীকে দেওয়ার জন্য বাধ্য করিতে পারেন।

চিফ্‌দিগেব খাসমহল

৪৭

সার্কেল চিফ্ কমিশনারের মঞ্জুরী ক্রমে তদীয় সার্কেল মধ্যে এক বা ততোধিক মৌজা তাঁহার খাসমৌজারূপে রাখিতে পারিবেন এবং এরূপস্থলে তিনি যতকাল পর্য্যন্ত হেড্‌ম্যান এবং মৌজা কর্ম্মচারীর কার্য্যে ও উপযুক্তরূপে চালাইতে পাবেন, চিফ্ স্বরূপে স্বকীয় পারিশ্রমিক ভিন্ন ও হেডম্যানের প্রাপ্য যাবতীয় পারিশ্রমিক ভোগে অধিকারী হইবেন।

চিফ্‌দিগকে প্রদত্ত অধিকার এবং হেড্‌ম্যানদিগের নিযুক্তি ও পদচ্যুতি

৪৮

চিফ্‌দিগের অধিকার বঙ্গীয় গভর্নমেন্টকর্ত্তৃক নিয়মিত; সুপারিন্টেন্ডেন্ট চিফ্ এবং মৌজাবাসীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া হেড্‌ম্যান নিযুক্ত করিবেন, তিনি মন্দ ব্যবহার বা অনুপযুক্ততার নিমিত্ত তৎসম্পর্কিত চিফ্‌কে অবগত করাইয়া হেড্‌ম্যানকে পদচ্যুত ও করিতে পারেন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট এতদুভয়ের কোন কাজেই চিফের ইচ্ছানুসারে চলিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। এই নিযুক্তি বংশানুক্রমে হইবে না, কিন্তু উপযুক্ত পুত্র হইলে তদীয় পিতার উত্তরাধিকারে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

দেশান্তরগমন ও তজ্জনিত অনুপস্থিতি এবং পরাতকগন

৪৯

চাষী রায়তগণের এক সার্কেল হইতে অন্য সার্কেলে গমন যদি ও একেবারে নিষিদ্ধ নহে, তৎপ্রতি অনুৎসাহ প্রদর্শিত হইবে। কোন চাষীরায়ত সে যে সার্কেল ও মৌজা ছাড়িতে ইচ্ছা করে, তাহার যাবতীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া না দেওযা পর্য্যন্ত দেশান্তর গমন করিতে পারিবে না; এবং চিফ্ ও হেড্ম্যানগণ এইরূপ দেশান্তর গমনে ইচ্ছুক দায়িক ও তদীয় সম্পত্তি সুপারিন্টেন্ডেন্টের আদেশপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিতে পারিবেন। পলায়ন কালের যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ না করিলে, কোন ও পলাতককে পূর্ব্ব পরিত্যক্ত সর্কেলে পুনর্বসতি করিতে দেওয়া হইবে না।

সাধারণের উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় ভূমি

৫০

কৃষিযোগ্যভূমি হেড্ম্যানদিগের দ্বারা এরূপে বিলি করা হইবে না, যাহাতে রাস্তা কি পথ, অথবা সাধারণের সুবিধা বা গভর্নমেন্টের আবশ্যকতার ব্যাঘাত ঘটে, এবং এই অন্তরায স্বরূপ বিহিত যে কোন বন্দোবস্ত সরাসরি মতে রদ করা যাইবে। বন্দোবস্তি প্রদত্ত কোন জমি যখন গভর্নমেন্টের প্রয়োজনে আসে, তখন তাহা ক্ষতিপূরণ প্রদান পূর্ব্বক পুনবায় লওয়া যাইতে পারিবে।

(S.D.) J.A. Bourdillon,
Offig, Chief Secy. to the Govt. of Bengal

অন্ত্যভাগ

মৌজার চকবন্দী

চাক্মা সার্কেল।

এক নম্বর তালুক কাচালং

১

ধামাইছ্রা —— পরিমাণফল ১০ বর্গমাইল, রাজা বাহাদুরের খাস। সীমা যথা, — উ – কাচালঙের শাখা মুবাছ্রী; পূ—কাচালং, ও কর্ণকুলী; পচেঙ্গী ও কাচালঙের মধ্যবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

২

বড়কাট্টলি-পরিঃ ১৭ বঃমাঃ, হেড্‌ম্যান শ্রীনীলচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা — উ——ডাইনর খারিকাটা ছরা;পূ—কাচালং নদী; দ—মাহালছবী;প — দক্ষিণে বন্দকবলা এবং উত্তরে কিল্লামুড়ার মধ্যবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

৩

লংগদুছ — পরিঃ ২০ বঃ মাঃ রাজাবাহাদুরের খাস। সীমা যথা — উ — কাচালং রিজার্ভ; পূ — কাচালং নদী; দ — খারিকাটা ও ডাইনের খারিকাটা;প — দক্ষিণে কিল্লামুড়া ও উত্তরে গবমারার মধ্যবর্ত্তী (১৪৩৯ ফিট উচ্চ) পর্ব্বতশ্রেণী।

৪

বরুনাছরী — পরিঃ ২০ বঃ মাঃ রাজাবাহাদুবের খাস সীমা যথা. .— উ — মাহালহরী;পূ — কাঁচালংনদী;দ — মুবাছরী প — চেঙ্গী ও কাচালঙের মধ্যবর্ত্তী উচ্চপর্ব্বতশ্রেণী।

৫

চাল্‌দ্যাতলীছরা — পরিঃ ৩ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী জেলাধন দেওয়ান। সীমা যথা — উ নলুয়া এবং গবছরী;পূ — কুকুরশিড়া। ট্যাংঙ্গাপর্ব্বত শ্রেণী;দ — বামের খাগারাছরী;পঃ — রাঙাপানিছরার উৎপত্তিস্থান হইতে বামের খাঁগারাছরীর দিকে বিস্তৃত ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, নলুয়ার শাখা রাঙ্গাপানিছরা।

৬

হেদলাটছরা — পরিঃ বঃ ১৺/¸ মাঃ, হেডঃ শ্রী আপেত পাঁনজি (কুকি)। সীমা যথা, উ— লংগদু বাঁকের উপরে এক ছোট নালা, ঐ নালার উৎপত্তিস্থান হইতে পেট ন্যাবমার ছরার শাখা। উগলছরী পর্য্যন্ত এক সরল রেখা; পূ — উগল — ছরী; দ — হেদলাটছরা, তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে প্রাগুক্ত উগলছরী পর্য্যন্ত এক সরল রেখা; প — কাচালং।

৭

ডলুছরী — পবিঃ ৩ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রীচন্দ মানিক দেওয়ান। সীমা যথা. উ — রিজার্ভ লাইন; পূ — মুনিমাগোছারা এবং ঐ ছরার মুখ (মোহনা) হইতে রিজার্ভ লাইন পর্য্যন্ত উত্তরাভিমুখে

এক সরল রেখা; দ — বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী; প — বড়ডলুছ্বরী, এবং ঐ ছ্বরার মুখ হইতে উত্তরদিকে রিজার্ভ লাইন পর্য্যন্ত এক সরলরেখা।

৮

ঘুইছ্বরী — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী নবচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, — উ — রিজার্ভ লাইন কাকপর্য্যার শাখা দুইছ্বরীর মুখ হইতে উত্তর দিকে রিজার্ভ লাইন পর্য্যন্ত এক সরল রেখা খুইছ্বরী পূ — বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী; দ — কাক পর্য্যার শাখা মুনিমাগোছাছ্বরা; প— মুনিমা গোছাছ্বরা ঐ ছ্বরার মুখ হইতে উত্তরদিকে রিজার্ভলাইন পর্য্যন্ত এক সরলরেখা।

৯

মারিচ্যাচর — পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রী থৈয়াতালুকদার। সীমা যথা — উ — পেটান্যার মার ছ্বরা বামের পেটান্যার মার ছ্বরা, ইহার শাখা তালছ্বরী, বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, পূ — বাডুলছ্বরী; দ — বাডুলছ্বরীর মুখ হইতে নলুয়াছ্বরী; প — কাচালং।

১০

রাঙাপানিছ্বরা — পরিঃ ১$^{১}/_{২}$ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী দির্ব্বধন দেওয়ান। সীমা যথা, — উ — নলুয়া; পূ — নলুয়ার শাখা রাঙাপানি ছ্বরার উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণদিকে বামের খাগরাছ্বরীর দিকে বিস্তৃত ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী; দ — খাগরাছ্বরী এবং বামের খাগবাছ্বরী; প — নলুয়াছ্বরার নিকট হইতে ঢেবাছ্বরীর দিকে দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, এবং সেই পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণপ্রান্ত হইতে খাগারাছ্বরী পর্য্যন্ত দক্ষিণদিকে এক সরলরেখা।

১১

পেটান্যার মারছ্বরা — পরিঃ ১০ বর্গ মাঃ হেড্ শ্রী কর্ণচন্দ্র তালুকদার সীমা যথা, — উ — হেড্লাটছ্বরা, তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে কাচালঙের শাখা উগলছ্বরী পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে এক সরল রেখা তাহা হইতে ছোট উলুছ্বরী পর্য্যন্ত এক সরলরেখা, মুখ পর্য্যন্ত ছোট উলুছ্বরী, তাহা হইতে রিজার্ভ লাইন পর্য্যন্ত এক সরলরেখা, রিজার্ভ লাইন, বড় উলুছ্বরী মুখ হইতে রিজার্ভ লাইন

পর্য্যন্ত এক সরলরেখা; পূ — বড় ডলুছ্বরী; দ — বড়কলের উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, বামের পেটান্যার মার ছ্বার যে স্থানে তদীয় করদ তালছ্বরী মিলিত হইয়াছে, তৎপর্য্যন্ত তালছ্বরী, দোছ্বরী পর্য্যন্ত বামের পেটান্যার মার ছ্বরা; প — কাচালং

১২

গবছ্বরী — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীনীলচন্দ্র রোয়া (মেঘ) সীমা যথা — উ — গবছ্বরীর মুখ হইতে উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত নলুয়া; পূ—বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী; দ — গবছ্বরী; প — নলুয়া ও গবছ্বরী।

১৩

নলবন্যা — পরিঃ ৫ বঃ মাঃ রাজা বাহাদুরের খাস। সীমা যথা,—উঃ—বড়কল পর্বত শ্রেনী; পূ — কর্ণফুলী; দ — কর্নফুলী; প — গর্গরিছ্বরা।

১৪

ভাসান্যা আদম — পরিঃ ৫ বঃ মা-, হেডঃ শ্রীমনুয়া তালুকদার। সীমা যথা—উ—নলুয়াছ্বরা; পূ — নলুয়া ছ্বরার নিকট হইতে যাহা ঢেবাছ্বরার দিকে বিস্তৃত হইয়াছে ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার দক্ষিণপ্রান্ত হইতে খাগরাছ্বরী পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিকে এক সরলরেখা; দ-খাগরাছ্বরী; প — কাচালং।

১৫

নলুয়া —পরিঃ ৩ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রীকিনারাম তালুকদার। সীমা যথা, — উ — যাহাতে বাদুলছ্বরীর উৎপত্তি হইয়াছে, বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত সেই জলস্রোত; পূ — বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী এবং নলুয়া; প — নলুয়ার করদ বাড়ুলছ্বরী।

১৬

খাগরাছ্বরী — পরিঃ ৬ বঃ মাঃ হেড্ শ্রী মদনমোহন দেওয়ান। সীমা যথা — কাচালঙের শাখা খাগাবাছ্বরী এবং বামের খাগারাছ্বরী; পূ — কুকুরশিরা ট্যাংগা পর্ব্বতশ্রেণী দ -- ডাইনের উলটাছ্বরী, ডাইনর জুকছ্বরীর উৎপত্তিস্থান হইতে ডাইনর ও বামের উলটাছ্বরীর সংযোগস্থল পর্য্যন্ত এক সরলরেখা, ডাইনর জুকছ্বরী এবং মুখ পর্য্যন্ত জুকছ্বরী; প — কাচালং।

১৭

ঘনমোহর — পরিঃ ৭ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী শশিমোহন দেওয়ান সীমা যথা, -- ১৬ নম্বর খাগারাছরীর মোজাব দক্ষিণ সীমা; পূ — কুকুরশিরা ট্যাঙ্গ্যা পর্ব্বতশ্রেণী; দ — কেরেঙা ছরীর শাখা লেমুছরী এবং কেরেঙাছরী; প — কাচালং।

১৮

কাকপর্য্যা — পরিঃ ২০ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী যুবলাৎ তালুকদার। সীমা যথা — উ — পূর্ব্বে বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী হইতে পশ্চিমে যেখানে ডাইনের কাকপর্য্যার মুখ হইতে উত্তরাভিমুখে কাচালং রিজার্ভে মিলাইতে এক রেখা টানা যায়, সেই বিন্দু পর্য্যন্ত কাচালং ফরেষ্ট রিজার্ভ; পূ — উত্তরে যেখানে রিজার্ভ লাইন বড়কল পর্ব্বতশ্রেণীতে মিলিত হইয়াছে, সেই বিন্দু হইতে দক্ষিণে ডানের কাক্পয্যার দ্বিতীয় কোছরীর জলাঙ্ক পর্য্যন্ত বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী; দ — ডানের কাকপর্য্যার মুখ হইতে প্রথম দোছরী পর্য্যন্ত, তথা হইতে দ্বিতীয় দোছরী পর্য্যন্ত বামের দোছরী, অনন্তর জলাঙ্ক পর্য্যন্ত ডানের দোছরী; প — ডানের কাকপর্য্যা এবং তাহার মুখ হইতে ফরেষ্ট রিজার্ভ পর্য্যন্ত এক সরলরেখা।

১৯

দেওয়ানের চর — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী লাইযাং রোয়াঝা (পাস্থোরা) সীমা যথা -- উ — কর্ণফুলীর করদ রাতা কুরীশিলছরা; পূ — বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী; দ — গগরীছরী এবং কর্ণফুলী; প — কর্ণফুলী।

২০

বেগেনাছরী — পরিঃ ৭ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রীভুবনচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ — হালম্বায় পতিত ভূর্ব্বান্যাছরা; পূ — বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী; দ — রাতাকুরী শিলছরা ও কর্ণফুলী, প — হালম্বা।

২১

হালম্বা—পরি ৬ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী চেংখাং রোয়াঝা (পাঙ্খোয়া) সীমা যথা উ --- বামের হালম্বায় পতিত গবছরী, কুকুর শিরা পর্ব্বতশ্রেণী; এবং বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী; পূ — বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী; দ ঃ বামের হালম্বার করদ ভূর্ব্বান্যা; প — বামের হালম্বা।

২২

কাকটীছরী — পরিঃ ১৮ বঃ মাঃ; হেড্ঃ শ্রী ইন্দ্রজয় দেওয়ান। সীমা যথা উ — কেবেঙ্গা ও তাহাতে পতিত লেমুছরী এবং কুকুরশিরা ট্যাঙ্গ্যা পর্ব্বতশ্রেণী; পূ — হালম্বাছরা, দ কর্ণফুলী; প — কাচালং।

২৩

বগাচতর — পরিঃ ৮ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী গোলক তালুকদার। সীমা যথা, উ—রিজার্ভ লাইল, প—ছোডলুছরী, দ—কাচালঙে পতিত 'ঝিড়ি' এবং ডানের উগলছরী, প—কাচালং।

২। দুই নম্বর তালুক চেঙ্গী।

১

হাজারী বাক — পরিঃ ৮ বঃ মা; রাজা বাহাদুরের খাস। সীমা যথা, উ — কাগত্যা ছরা এবং ঐ ছরার উৎপত্তি স্থান হইতে কর্ণফুলীর শাখা চারিখঙের মুখ পর্য্যন্ত এক সরলরেখা; প — কাইন্দার মুখ হইতে চারিঙের মুখ পর্য্যন্ত কর্ণফুলী; দ — চেঙ্গীর মুখ হইতে কাইন্দার মুখ পর্য্যন্ত কর্ণফুলী; প — চেঙ্গীনদী।

২

বন্দুক ভাঙা — পরিঃ ২০ বঃ মাঃ হেড্ঃ কুমার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায়। সীমা যথা উ — শেলছরী, তৎ করদ দ্বিমুখ্যা ছরা এবং উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত বামের দ্বিমুখ্যা ছরা; পূ— চেঙ্গী ও কাচালঙের মধ্যবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; দ — কাগত্যা ছরা এবং তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে কর্ণফুলীর করদ চারিখণ্ডের মুখ পর্য্যন্ত এক সরলরেখা;

৩

ছয়কুড়ি বিরল — পরিঃ ৩ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী অবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ — দোছরী পর্য্যন্ত সাবেক্‌ক্যাং এবং এই মৌজার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা রেখার যোগস্থল পর্য্যন্ত ডানের সাবেকক্যাং। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ — সাবেক্‌ক্যাং কিল্লাছরার সহিত মিলন স্থান পর্য্যন্ত মাইচছরী ও ছয়কুড়ি বিলের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত শ্রেণী, তথা হইতে কিল্লাছরা পার হইয়া জনের সাবেক্‌ক্যাং পর্য্যন্ত উত্তর পূর্ব্বদিকে এক সরলরেখা; প — চেঙ্গী নদী।

৪

মাই৫ছরি — পরিঃ ৯ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী শশি কুমার দেওয়ান। সীমা যথা. উ — কিল্লাছরার সহিত মিলন স্থান পর্য্যন্ত মাইচ্ছরী এবং ছয়কুড়ি মিলের উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী, তথা হইতে কিল্লাছরা পার হইয়া ডানের সাবেক্ ক্যং পর্য্যন্ত উত্তর পূর্ব্বদিকে এক সরলরেখা; পূ — কাচলং ও চেঙ্গীর মধ্যবর্ত্তী পর্য্যন্ত (এই পর্ব্বতশ্রেনীব সহিত ডানের ও বামের সপমারার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী এবং বামের শেলছরীর উৎপত্তি স্থানের সম্মিলন স্থান পর্য্যন্ত) দ — দোছরী পর্য্যন্ত সাকামারা তথা হইতে দুই সাপমারার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী (কাচালং ও চেঙ্গীর মধ্যবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত); প — চেঙ্গী নদী।

৫

সাবেকে্ক্যং — পরিঃ ৭ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী যোগেন্দ্র নাথ দেওয়ান। সীমা যথা, উ — ৎ
পূ — গবমারা মইন এবং বামের সাবেক্ক্যং; দ — সাবেক্ক্যং, প — চেঙ্গীনদী।

৬

কাটুলতলী — পরি— ১২।। বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী বাঙ্গালী চান্ তালুকদার। সীমা যথা, উ — দোছরী পর্য্যন্ত সাপমারা, তথা হইতে ডানের ও বামের সাপমারার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী; কাচালং ও চেঙ্গীর মধ্যবর্ত্তী পর্য্যন্ত (যেখানে বামের শেলচ্ছরীর উৎপত্তিস্থান ইহার সহিত মিশিয়ছে); পূ — বামের শেলচ্ছরী; দ — দোছরী পর্য্যন্ত শেলচ্ছরী; প — চেঙ্গী নদী।

৭

জাদুখাঁছরা — পরি— ১২।। বঃ মাঃ হেডঃ শ্রীমেত্তা তালুকদার সীমা যথা, উ — জাদুখাঁছরা ও হাজাছরীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, পূ — চেঙ্গী ও কাচালঙের মধ্যবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; দ — সাবেক্ক্যঙের দোছরী হইতে উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত ডানের সাবেক্ক্যং। প — ছাজাছরী ও জাদুখাঁছরীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী।

৮

গবছরী — পরি— ২।। বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী বিজয়গিরি তালুকদার। সীমা যথা, উ — চমরা কুট্যা ও ছোট হাজাছরীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, তারপর চমরা কুট্যা ও গবছরীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র

পর্ব্বতশ্রেণী;পূ — চেঙ্গী ও কাচালঙের মধ্যবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী;দ — হাজাছরী ও জাদুখাঁছরার মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী; প — দোছরীর মুখ হইতে যেখানে ছোট হাজাছরী ও চমরা কুট্যার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিম প্রান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত বামের সাবেক্‌ক্যং।

৯

এগরাল্যা ছরা—পরিঃ ১।। বঃ মাঃ হেঃ শ্রী মানিকচন্দ্র তালুকদার। সীমা যথা, উ চেঙ্গী ও কাচালঙের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী; পূ ঐ দ — চমরাকুট্যা ও ছোট হাজাছরীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী এবং তারপর চমরাকুট্যা ও গবছরীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী;প — উৎপত্তিস্থান হইতে যথায় ছোট হাজাছরী ও চমরাকুট্যার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ততদূর পর্যন্ত বামের সাবেক্‌ক্যং।

১০

শেলচ্ছরী — পরিঃ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রী সূর্য্যধন তালুকদার। সীমা যথা, উ — শেলচ্ছরী;পূ — কাচালং ও চেঙ্গীর মধ্যবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী;দ — শেলচ্ছরীর করদ দ্বিমুখ্যাছরা ও বামের দ্বিমুখ্যাছরা;প — শেলচ্ছরী।

৩। তিন নম্বর তালুক মহাপ্রম্।

১

চৌধুরীছরী — পরিঃ ৬ বঃ মাঃ- হেড্ঃ শ্রী নীলমনি দেওয়ান। সীমা যথা, উ — দীর্ঘ্যাছরার মুখ হইতে বামের বগাছরার মুখ পর্য্যন্ত মূল বগাছরী এবং জলাঙ্ক পর্য্যন্ত বগাছরী;পূ — গড়পাহাড়; দ — গড়পাহাড় হইতে মঘাছরীর মুখ পর্য্যন্ত এক সরল রেখা এবং মঘাছরী;প — বাত্তিমইন।

২

ঘিলাছরী — পরিঃ ৮।। বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী কবিবাজ দেওয়ান সীমা যথা, উ — ১ নম্বর মৌজ্যাস্থ চৌধুরীছরীর দক্ষিণসীমা, পূ — গড়পাহাড়; দ — পোহারছরী, ইহার মুখ হইতে গড়পাহাড়; দ — পোহারছরী, ইহার মুখ হইতে গড়পাহাড়; দ — পোহারছরী, ইহার মুখ হইতে গড়পাহাড় পর্য্যন্ত ঝিড়ি, কাবুকছরী এবং ইহার মুখ হইতে টেঙাছরী মইন পর্য্যন্ত পাহাড়; প — টেঙাছরী মইন।

হাজাছরী — পরিঃ ১০ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী অক্ষয়মান তালুকদার। সীমা যথা, উ — পোহারছরী, ইহার মুখ হইতে গড়পাহাড় পর্য্যন্ত এক সরলরেখা, মাচছরী এবং ছোটমহাপ্রুম; পূ — ছোটমহাপ্রুম; দ — হাজাছরী ও বড় মহাপ্রুম; প — টেঙাছরী মইন।

৪

ছোটমহাপ্রুম — পরিঃ ৬ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রী বাডামান দেওয়ান। সীমা যথা, উ — গড়পাহাড় ও ছোটমহাপ্রুম; পূ — ছোটমহাপ্রুম; দ — মাচছরী, প — গড়পাহাড়।

৫

বুড়ীঘাট — পরিঃ ৩ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী যুবরাজ দেওয়ান। সীমা যথা, উ - চেঙ্গী, মংখোলা নালা; মংখোলা নালা হইতে পলিছরা পর্য্যন্ত অঙ্কিত সরলরেখা, শেরাছরার মুখ পর্য্যন্ত পলিছরা এবং জলাঙ্ক পর্য্যন্ত পেরাছরা; পূ — চেঙ্গী; দ — বড় মহাপ্রুম ও ছোট মহাপ্রুম; চা — হেইদছরা, নয়ানখাঁছরা, জলাঙ্ক পর্যন্ত ঝিড়িছরা এবং পেরাছরার উৎপাদক পাহাড়।

৬

নানাক্রুং — পরিঃ ৫।। বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী পাইন্দং রোয়াঝা (মঘ)। সীমা যথা, উ — নানাত্রুং: পূ — চেঙ্গী; দ — পাল এবং সংখোলা; প — ছোট মহাপ্রুম্।

৭

বড়াদম — পরিঃ ৯ বঃ মা-, হেড্ঃ শ্রী ব্যাসমণি দেওয়ান। সীমা যথা উ — তৈচাক্মা; পূ — চেঙ্গী, দঃ — নানাপ্রুম্ এবং কুকুরমারা ছরা; প — কুকুরমারা ছরা এবং তৈচাক্মা।

৮

বেতছরী — পরিঃ ৫ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী সূর্য্যচন্দ্র তালুকদার। সীমা যথা, উ — বেতছরী ও পাহাড়; পূ — চেঙ্গী; দ — তৈচাক্মা; প — ডানের তৈচাক্মা।

৯

বাক্‌ছরী — পরিঃ ৮ বঃ মাঃ হেড়্ঃ শ্রী রাজচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ — কেঙাইলছরী; পূ — চেঙ্গী; দ — বেতছরী; প — গড়পাহাড়।

১০

তৈচাক্‌মা — পরিঃ ৮ বঃ মাঃ হেড়্ঃ শ্রী নবীন চন্দ্র তালুকদার। সীমা যথা, উত্তর ও পশ্চিম — বেতছরী মইন, কেঙাইল ছরী মইন এবং ত্রিপুরাছরা; দ — বামের বোগাছরী; পূ — তৈ-চাক্‌মা।

১১

বগাছরী — পরিঃ ৪।।, বঃ মাঃ, হেড়্ঃ শ্রীরাজচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ — গড়পাহাড়, তৈচাক্‌মা এবং কুকুরমারা ছরার এক অংশ; পূ — কুকুরমারা ছরা এবং ছোট মহাপ্রুমের এক শাখা; দ — ছোটমহাপ্রুম; প — ঐ।

১২

কেঙাইলছরী — পরিঃ ১২ বঃ মাঃ, হেড়্ঃ শ্রী রাজকুমার তালুকদার। সীমা যথা, উ কেঙাইল ছরী; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ — গড়পাহাড়; প — কেঙাইলছরী মইন।

৪। চারি নম্বর তালুক সর্ত্তা।

১

দূরছরী — পরিঃ ৫।। বঃ মাঃ হেড়্ঃ শ্রী অভয়াচরণ তালুকদার। সীমা যথা, উ — না — ভাঙাছরা, পূ — উত্তরে না-ভাঙার উৎপত্তি স্থান হইতে দক্ষিণে ডানের দূরছরীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত ৩ তিন নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ — দূরছরী; প — ধুরুং।

২

বানর কাটা — পরিঃ ২ বঃ মাঃ, হেড়্ঃ শ্রী কুলচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ — দুরছরী; পূ — দীঘলছরী এবং নারানছরী; দ — বানর কাটা; শ— ধুরুং।

৩

ছোট ধুরুং — পরিঃ ৩ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী কেওজপ্রু রোয়াঝা (মঘ)। সীমা যথা, উ — হরী; পূ — ১১ নম্বর মৌজা শুক্‌নাছরীর পশ্চিম সীমা; দ — ছোট ধুরুং, প — ধুরুং।

৪

ধুরুং — পরিঃ ৬।। বঃ মাঃ হেড়ঃ শ্রীসুজাঁ ও চৌধুরী (মঘ)। সীমা যথা, উ — ছোট ধুরুং ও ধুরুং; পূ — মরমছরী এবং তথা হইতে উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত ডানের মরমছরী; দ — উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত জাদুছরী, তথা হইতে জাদুছরী ও ফুট্যাছরীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত, উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত ফুট্যাছরী, তথা হইতে বড়লেলাঙের এক শাখা গড়পাহাড় পার হইয়া বড়লেলাং পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে বড়লেলাং বরাবর গিয়া চেমীটং মইন; প—চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য প্রদেশের সীমা।

৫

মুক্তাছরী — পরিঃ ৬।। বঃ মাঃ হেড়ঃ শ্রী অনঙ্গ মোহন দেওয়ান। সীমা যথা, উ — শুকনাছরী ও মরমছরীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী, বর্ম্মাছরীর করদ ন্যিানাছরী এবং সর্ত্তার করদ পেকুই; পূ — সর্ত্তা; দ — হাজাছরী, হাজাছরী এবং ত্রিপুরার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী, ত্রিপুরাছরী এবং সর্ত্তা; প — বর্ম্মাছরী।

৬

বর্ম্মাছরী — পরিঃ ৪।। ব ঃমাঃ হেড়ঃ শ্রী চিংলাপ্রুরোয়াঝা (মখ)। সীমা যথা, উ — ১৩ নম্বর লেলাং মৌজার দক্ষিণ সীমা; পূ — বর্ম্মাছরী ও শুক্‌নাছরী; দক্ষিণ ও পশ্চিম — চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী সীমা।

৭

ফটিক্‌ছরী — পরি- ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী কমলাঙ্গা চৌধুরী (মঘ)। সীমা যথা, উ — ৫ নম্বর মুক্তাছরী মৌজার দক্ষিণ সীমা; পূ — ৫ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ — শিলছরী, বাড়ুলছরী এবং রক্তছরী; প — চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সীমা।

৮

ডাবুয়া — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ হেড়ঃ শ্রী খোপায়ং চৌধুরী (মঘ) সীমা যথা, উ — ডাবুয়া নালাতে পতন স্থান পর্য্যন্ত শিলছরী, অনন্তর দক্ষিণাভিমুখে গিয়া ছোট বাড়ুলছরীব মুখ হইতে উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত, তারপব রক্তছরী পার হইয়া চট্টগ্রামের সীমা পর্যন্ত এক সরলরেখা; পূ —

উত্তরে শিলছড়ীর উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে; সোনাই নালার উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত ৫ নম্বর তালুকের সীমা; দ — সোনাই নালার জলাঙ্ক; প — চট্টগ্রামের সীমারেখা।

৯

ডানের বানর কাটা— পরিঃ ৬।। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীহরিকান্ত তালুকদার। সীমা যথা, উ — দূরছড়ী ডানের দূরছড়ী; পূ·— উত্তরে ডানের দূরছড়ীর উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে ডানের লক্ষ্মীছড়ীর উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত ৩ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ — ডানের লক্ষ্মীছড়ী; প — দূরছড়ী, বানরকাটা ও লক্ষ্মীছড়ীর করদ দীঘলছড়ী, নরমছড়ী, গোধাছড়া, লোটকছড়ী এবং করল্যাছড়ী।

১০

লক্ষ্মীছড়ী — পরিঃ ৩।। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী গোপীনাথ তালুকদার। সীমা যথা, উ বানর কাটা, পূ — গাছছড়া, লোটকছড়ী এবং কলল্যাছড়ী; দ — লক্ষ্মীছড়ী; প — ধুরুং।

১১

শুক্‌নাছড়ী — পরিঃ ৩।। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী শ্রী চন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ — ডানের লক্ষীছড়ী; পূ — উত্তরে ডানের লক্ষ্মীছড়ীর উৎপত্তি স্থান হইতে দক্ষিণে ছোট ধুরুঙের উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত ৩ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ — ছোট ধুরুং; প — উত্তরে ডানের লক্ষ্মীছড়ীর মুখ হইতে দক্ষিণে শুকনাছড়ীর মুখ পর্য্যন্ত এক সরলরেখা।

১২

মরমছড়ী — পরিঃ ৩ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী চাইলাপ্রুধামাই (মঘ)। সীমা যথা, উ — ছোট ধুরুং পূ — উত্তরে ছোট ধুরুঙের উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে বর্ম্মাছড়ীর উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত ৩ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ — বর্ম্মাছড়ী; প — মরমছড়ী।

১৩

লেলাং — পরিঃ ২ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী ফাইলা রোয়াঝা (মঘ)। সীমা যথা — উ — ৪ নম্বর ধুরুং মৌজার দক্ষিণ সীমা; পূ — চেনিটং পর্ব্বতশ্রেণী এবং শুকনাছড়ী; দ — ছোট লেলাং; প — পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী সীমা।

১৪

কেরেক্কাবা — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী রমণীমোহন দেওয়ান। সীমা যথা — উ — সর্ত্তা; পূ — উত্তরে সর্ত্তার উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে নাভাঙা এবং কেরেককাবা ছরার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেনী পর্য্যন্ত ৩ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা;দ — টুনিমছরী এবং নাভাঙা ও কেরেককাবার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেনী। প — সর্ত্তা।

১৫

না - ভাঙ্গা — পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী মন্দিচরণ তালুকদার। সীমা যথা — উ ১৪ নম্বর কেরেককাবা মৌজার সীমা; পূ — উত্তবে নাভাঙা ও কেবেককাবার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী হইতে দক্ষিণে ৪ এবং ৫ নম্বর তালুকের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত ৩ নম্বর তালুকের সীমা, দ — ৫ নম্বর তালুকের উত্তরসীমা;প -- সর্ত্তা, না - ভাঙা এবং ডবাকাবা লরা।

৫। পাঁচ নম্বর তালুক ইচ্ছামতী

১

কাসখালি — পরিঃ ৫ বঃ মাঃ হেড্ম্যান পদচ্যুত। সীমা যথা, উ — সোনাই নালার উৎপত্তিস্থান, তথা হইতে ৪ নম্বর তালুকের দক্ষিণ সীমা ফটিকছবী পর্ব্বতশ্রেণী তাহা হইতে শিয়ালবুক্কা ছরা পর্য্যন্ত পর্ব্বতশ্রেণী, এবং তথা হইতে শিয়ালবুক্কা ছরা যেখানে চট্টগ্রামের সীমায় লাগিয়াছে তৎপর্যন্ত; পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম — চট্টগ্রামের সীমা রেখা।

২

কলমপতি — পরিঃ ৫ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রীরুই ভাই চৌধুবী (মঘ) সীমা যথা, — উ — কোরাখালি;পূ — চট্টগ্রামের সীমা রেখা;দ — শিয়ালবুক্কা তথা হইতে সোজাসুজি ফটিকছ্বী পর্ব্বতশ্রেণী;প — উত্তরে কাসখালির উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে শিয়ালবুক্কার জলাঙ্ক পর্য্যন্ত ৪ নম্বর তালুকের পূর্ব্বসীমা।

৩

মুবাছরী — পরি— ৮ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী ভত্তাবাম তালুকদার। সীমা যথা, — উ ৬৭ নং তালুকের সীমা; পূ—চাপাছরা ও ইছামতী নদী;দ—ভেবনচবা;স—৪ নম্বর তালুকের সীমা।

৪

কচুখালি — পরিঃ ১৩ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী শরচ্চন্ড রোয়াঝা (মঘ), সীমা যথা — উ — ভেবনছরা, গুজাপাহাড় এবং খিলাছরী; পূ — বেতছরী পাহাড় ও ইচ্ছামতী নদী; দ — বেতছরী পাহাড় এবং তোয়াখালি; প — ৪ নম্বর তালুকের পূর্ব্ব সীমা।

৫

ঘাগারা — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী ভাগ্যবান তালুকদার। সীমা যথা, উ — বেতছরী ও বেতচরী পাহাড়; পূ — উত্তরে বেতছরী পাহাড় হইতে দক্ষিণে কুর্ম্মাই মইন পর্য্যন্ত ৬ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ — কুর্ম্মাই মইন; প — চট্টগ্রামের সীমা।

৬

হোয়াগৃগা — পরিঃ ১০ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী বেচারাম আমু (টং চঙ্গ্যা) সীমা যথা, উ — কুর্ম্মাইমইন; পূ — উত্তরে কুর্ম্মাইমইন হইতে দক্ষিণে কর্ণফুলী পর্য্যন্ত ৬ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ — কর্ণফলী; প — চট্টগ্রামের সীমা।

৭

ঘিলাছরী — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী রাজচন্দ্র তালুকদার। সীমা যথা উ — ৬ নং তালুকের সীমা এবং চাপছরার উৎপত্তিস্থান; পূ — ৬ নম্বর তালুকের সীমা; দ — খিলাছরী ও গুজা পাহাড়; প — ইচ্ছামতী নদী ও চাপাছরা।

৬। ছয় নম্বর তালুক রাঙামাটি

১

রাঙাপানি — পরি— ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী জয়কুমার দেওয়ান। সীমা যথা, উ — কাটাছরীর মুখ হইতে দোছরী পর্য্যন্ত, তথা হইতে ডানের কাঁটাছরী দিয়া পারোযাছরীর মুখ পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে কাঁটাছরী ও মানিকছরীর মধ্যবর্ত্তী গড় পাহাড় পর্য্যন্ত এক সরলরেখা; পূ — কর্ণফুলী এবং চেঙ্গী; দ — রাঙামাটি হইতে চট্টগ্রামের সরকারী পথ; প — মানিকছরী ও কাঁটাছরীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী।

২

বাকছড়ী — পরি- ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচন্দ্রধর দেওয়ান। সীমা যথা, উ — বাকছড়ীর কিছু উপর হইতে তেমিদুংছরা পর্য্যন্ত এক সরলরেখা, তথা হইতে সেই ছরার উপর দিয়া দোছরী পর্য্যন্ত, তাহা হইতে বামের তেমিদুং দিয়া মানচিত্রে চিহ্নিত মরা সেগুছরী পর্য্যন্ত পর্ব্বতশ্রেণী; পূ — চেঙ্গী; দ — ১ নম্বর রাঙাপানি মৌজার উত্তর সীমা; প — মানচিত্রে চিহ্নিত মরা সেগুছরী পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত।

৩

ঝগড়াবিল — পরিঃ ৭ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী ত্রিজগৎ দেওয়ান। সীমা যথা, উ — সরকারী রাস্তা; পূ — কর্ণফুলী; দ — মাণিকছড়ী ও কর্ণফুলী; প — মাণিকছড়ী এবং ভোয়ালিয়র মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী।

৪

জীবতলী — পরিঃ ৬ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী চণ্ডীচরণ দেওয়ান। সীমা যথা, উ — ঝরংঝার নালা; পূ —কর্ণফুলী; দ — ঐ; পূ — সীতাপাহাড় ফরেষ্ট রিজার্ভ।

৫

কামিলাছড়ী — পরিঃ ২ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ দেওয়ান। সীমা যথা, উ — গোলাছড়ী, ত্রিলোচন দেওয়ানের আবাদী জমিঃ পূ — কর্ণফুলী; দ — সীতাপাহাড় ফরেষ্ট রিজার্ভ পর্য্যন্ত ঝরঝরি; প — সীতাপাহাড় ফরেষ্ট রিজার্ভ।

৬

বড়াদম — পরিঃ ৮বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী ত্রিলোচন দেওয়ান। সীমা যথা, উ — মাণিকছড়ী এবং জারুলছড়ী; পূ — কর্ণফুলী; দ — গোলাছড়ী, তথা হইতে মেরমছড়ীর উৎপত্তিস্থান রামপাহাড় সীমার মইন পর্য্যন্ত; প — দক্ষিণে মরমছড়ীর উৎপত্তিস্থান হইতে উত্তরে জারুলছড়ীর উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত রামপাহাড় সীমার স্থান।

৭

মাণিকছড়ী — পরিঃ ৭।। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী হেধন আমু (টং চঙ্গ্যা) সীমা যথা, উ — আমছড়ী; পূ — মাণিকছড়ী মইন; দ — জারুলছড়ী; প — রান্যাছড়ী মইন।

৮

সাপছরি — পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীরতন মাণিক দেওয়ান। সীমা যথা, জলাঙ্কপর্য্যন্ত শূকরছরী, তথা হইতে এক পাহাড় পার হইয়া নারৈছরীর জলাঙ্ক পর্য্যন্ত; পূ — মাণিকছরী পাহাড়;দ-আমছরী;প-খাগরা মইন।

৯

শূকরছরী — পরিঃ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীগঙ্গা মানিক দেওয়ান। সীমা যথা উ — পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে তেমিদুং এর উৎপত্তিস্থান হইতে পশ্চিমে ফরমইন পর্য্যন্ত জীবতলী মইন; পূ — উত্তরে জীবতলী মইন হইতে দক্ষিণে শূকরছরীর মুখ হইতে অঙ্কিত সরললেখা পর্য্যন্ত মাণিকছরী ও কাঁটাছরী গ্রামদ্বয়কে বিভাজিত পর্ব্বতশ্রেনী হইতে শূকরছরী মুখ পর্য্যন্ত সরলরেখা,তথা হইতে ডলুছরী ও নারাইলছরী পার হইয়া খরিকাটা ছরা দিয়া ফোর মইন পর্য্যন্ত; প — দক্ষিণে ডানে খারিকাটার জলাঙ্ক হইতে উত্তরে জীবতলী মইন ও ফোরমইনের মিলন স্থান পর্য্যন্ত ফোরমোইন।

১০

কুদুগছরী — পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী মুক্তাকিশোর দেওয়ান সীমা যথা, উ — কুদুগছরী ও চেগেইয়া ছরীর মধ্যবর্ত্তী গুড়পাহাড় হইতে উত্তরপশ্চি মাভিমুখে আসিয়া কুদুগছরী পার হইয়া ছোট ডলুছরী দিয়া ওল্লামইন পর্য্যন্ত;পূ — উত্তরে জীবতলী মইন হইতে, দক্ষিণে ছোটডলুছরীর মুখ হইতে অঙ্কিত সরলরেখার সংযোগস্থল পর্য্যন্ত গড় পাহাড়;দ — পূর্ব্বে তৈমিদুঙের উৎপত্তিস্থল হইতে দক্ষিণে ফোরমইনের উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত জীবতলী মইন;প — কুতুবছরী এবং ইচ্ছামতী গ্রামদ্বয়কে বিভক্তিকৃত পর্ব্বতশ্রেণী।

১১

ডলুছরী — পরিঃ ৫ ।। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকান্তনাথ চাক্‌মা। সীমা যথা, উ — বড় মহাপ্রুং, এবং পূর্ব্বে গাদর মরম হইতে পশ্চি মে হাজাছরীর জলাঙ্ক পর্য্যন্ত হাজাছরী;পূ — একপার্শ্বে চেগাইয়াছরী ও মুবাছরী এবং অপরপার্শ্বে হাজাছরী ও বাদুলছরী —এতৎ মধ্যবর্ত্তী গড়-পাহাড়;দ — উত্তর গড়পাহাড় হইতে কুদুগছরী পার হইয়া ছোটডলুছরী দিয়া ওল্লামইন পর্য্যন্ত;প — ইচ্ছামতী ও হাজাছরী গ্রামদ্বয়কে বিভক্তীকৃত ওল্লামইন।

১২

তৈমিদুং — পরিঃ ১০ বঃ মাঠ হেডঃ শ্রীকৃষ্ণচরণ দেওয়ান সীমা যথা, উ — যেখানে গড়পাহাড় মহাশ্রং পার হইয়াছে, ততদূর পর্যন্ত মহাশ্রং;পূ — চেঙ্গী;দ — বাকছরী বাজারের কিঞ্চিৎ উপরের চেঙ্গী হইতে অঙ্কিত সরলরেখা, তথা হইতে শাখা ডোলছরী পর্য্যন্ত তৈমিদুং, তাহা হইতে বামের তৈমিদুং ও কুতুবছরী গ্রামদ্বয়কে বিভক্তীকৃত পাহাড় পর্য্যন্ত;প - গড়পাহাড়।

৭। সাত নম্বর তালুক রাজভবন

১

বালুখালি — পরিঃ ৬ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ -কর্ণফুলি এবং রাঙামাটি ছরার মিলন স্থান হইতে মংপ্রুর পাজা, কাশ্যা, ধনাগাজা এবং পালেঙ্গ্যা। মাঘের আবাদী জমীর উত্তর সীমা দিয়া বামের দেওয়ানের ছরা পর্য্যন্ত রেখা, অনন্তর তাহা ডানের দেওয়ানের ছরা দিয়া পরে বামের দেওয়ানের ছরার উৎপত্তিস্থান হইতে রাঙামাটিছরার উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত এক সরলরেখা; পূ — রাঙ্গামাটি ও কাইন্দার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী;দ — মঘবান নালা, পরে মাণিকছরীর মুখ হইতে কাইন্দা ও রাঙামাটির মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত এক সরলরেখা;প — কর্ণফুলী।

২

মঘবান — পারিঃ ১০ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী কামিনী মোহন দেওয়ান। সীমা যথা, উ বালুখালি মৌজার দক্ষিণসীমা;পূ — ধনপাতা ও কাইন্দাকে বিভক্তীকৃত পর্ব্বতশ্রেণী;দ - জলাঙ্ক পর্য্যন্ত ধনপাতা ছরা, প — কর্ণফুলী।

৩

রাঙামাটি — পরিঃ ১১ বঃ মাঃ, বাজাহাদুরের খাস। সীমা যথা, উ — কর্ণফুলী ও কাইন্দা;পূ — কাইন্দা; দ — ১ নম্বর বালুখালি মৌজার উত্তর সীমা;'প — কর্ণফুলী।

৪

কৌশল্যাঘোনা — পরিঃ ৬ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী ঘনেশ্বর তালুকদার। সীমা যথা, উ — চোমরাছরী এবং কর্ণফুলী নদী;পূ — হিজাছরী, তদীয় শাখা চোমরাছরী এবং পাহাড়;দ — রাইন্ খ্যং ছরা; প — কর্ণফুলী

৫

ধনপাতা — পরিঃ ৪।। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীজয়চন্দ্র তালুকদার। সীমা যথা, উ — ধনপাতাছ্‌রা এবং তদীয় করদ ডলুছ্‌রী; পূ — ডলুছ্‌রী এবং হিজাছারী মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী; দ — চোমরাছ্‌রী; প — কর্ণফুলী।

৬

ভার্জ্যাতলী —৫ বঃ মাঃ হেড্‌ঃশ্রীরাইয়ংরোয়াঝা (মুরুং) সীমা যথা, উ — রাইম্‌ খ্যং; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ — হরিণছ্‌রা; প —সীতাপাহাড় ফরেষ্ট রিজার্ভ।

৭

ছাক্রাছ্‌রী — পরিঃ ১০ বঃ মাঃ হেড্‌ঃ শ্রীহিচাধন আমু (টং চঙ্গ্যা)। সীমা যথা, উ — দীঘলছ্‌রী এবং পর্ব্বতশ্রেণী; পূ-উত্তরে দীঘলছ্‌রী হইতে দক্ষিণে রাইন খ্যং রিজার্ভ পর্য্যন্ত পর্ব্বতশ্রেণী; দ —রাইন খ্যং হিজার্ভ; প — রাইন খ্যং ছ্‌রা।

৮

কাঙারাছ্‌রী — পরিঃ ৬।। বঃ মাঃ, হেড্‌ শ্রীকেওজচাঁই রোয়াঝা (মঘ)। সীমা যথা, উ — পশ্চিমে চোমরাছ্‌রীর উৎপত্তিস্থান এবং পূর্ব্বে ডলুছ্‌রীর উৎপত্তিস্থানের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী; পূ — নাবেইছ্‌রী; দ — রাইন খ্যং ছ্‌রা; প — হাজাছ্‌রী এবং চোমরাছ্‌রী।

৯

কুতুবদিয়া — পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেড্‌ঃ শ্রীকর্ম্মধন দেওয়ান। সীমা যথা, উ — রাইন খ্যং নদী; পূ — ঐ; দ— ঐ প — গাছ্‌কাটাছ্‌রা।

১০

হেমন্ত — পরি- ১১ বঃ মাঃ, রাজা বাহাদুরের খাস। সীমা যথা, উ — কাইন্দা ও শুভলঙের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী; পূ — ঐ; দ —বসন্ত; প — কর্ণফুলী।

১১

নারেইছ্‌রী — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেড্‌ঃ শ্রী তিলকচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, — উ — নারেইছ্‌রী, তদীয় করদ ডলুছ্‌রী, এবং তাহার উৎপত্তিস্থলের গড় পাহাড় পর্য্যন্ত; পূ — উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; দ — ডানের ও বামের তগলক ছ্‌রার মধ্যবর্ত্তী গড় পাহাড়, দোছ্‌রী হইতে নিম্নদিকে

ঝাডালকাটিছ্বরীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত তগলকছ্বরা, তগলকছ্বরার মুখ হইতে দুই তগলকছ্বরীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত এক সরলরেখা, এবং ? খণ্ডের করদ কেরনছ্বরী; প — রাইন্ খ্যং নদী।

১২

ফুলগাজিবাগের ছ্বরা — পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ — ফুলগাজিবারে ছ্বরা; পূ — কাইন্দা ডানের কাইন্দা ও মধ্যকাইন্দা; দ — পর্ব্বতশ্রেণী প — ঐ।

১৩

বিলাইছ্বরী — পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী মাণিকচাঁন তালুকদার সীমা যথা — উঃ -বিলাইছ্বরী; পূ — উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; দীখলছ্বরী; প — রাইনখ্যং

১৪

কেরনছ্বরী — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রীমিক্কাধন তালুকদার। সীমা যথা — উ — কেরণছ্বরী, দুইকেরণছ্বরী মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, এই পাহাড়শ্রেণী হইতে তডালক ছ্বরার মুখ পর্য্যন্ত এক সরলরেখা, মুখ হইতে দোছ্বরী পর্য্যন্ত তগলক ছ্বরা এবং দুই তগলক ছ্বরার মধ্যবর্ত্তী গড়পাহাড়; পূ — উচ্চপর্ব্বতশ্রেণী; দ — খিলাইছ্বরী; প — রাইন্খ্যং নদী।

১৫

বসন্ত — পরিঃ ৫ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রীচেক্ তুই রোরাঝা (কুকি)। সীমা যথা, — উ — উৎপত্তিস্থান হইতে হাজাছ্বরীর পশ্চিমে যেখানে এক নিম্ন পর্ব্বতশ্রেণী রহিয়াছে এবং গেবিন্দ বাগের ছ্বরা নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত বসন্ত ছ্বরা; পূ — উচ্চ পুখা পর্ব্বতশ্রেণী; দ — বামের কাইন্দার করদ বাদুলখাটছ্বরা; প - এই মৌজার উত্তরসীমায় উল্লিখিত নিম্ন পাহাড়শ্রেণী, বামের বাদুলছ্বরী, তদীয় করদ বাঁদর মারা ছ্বরা, ডানের বাদুলছ্বরার করদ লগেন্যাছ্বরা, তাহার মুখ হইতে চুকের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত এক সরলরেখা, তথা হইতে বামের কাইন্দা ও বাদুলখাটছ্বরার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত অপর এক সরলরেখা।

১৬

কাইন্দা — পরিঃ ৮ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী নবীনচন্দ্র দেওয়ান। উত্তরসীমা; পূ — উত্তরসীমার নিম্নপর্ব্বতশ্রেণী, বামের বাদুলছ্বরী, তাহার করদ বাঁদরমারা ছ্বরা, ডানের বাদুলছ্বরীর করদ টাগ্য়ামাছ্বরা, রাগয়ামাছ্বরার মুখ হইতে খোদাচুকের পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত এক সরলরেখা, তথা হইতে বামের

কাইন্দা এবং বাদুর খাটছরার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত অপর এক সরলরেখা, বাদুল খাটছরা এবং উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; দ — রাইন খ্যঙের কাঙারাছরী মৌজার উত্তর ও পশ্চিম সীমাসূচক পর্ব্বতশ্রেণী; প — মধ্যকাইন্দা, ডানের কাইন্দা এবং মুখের নীচের কাইন্দা।

১৭

বারুদগোলা — পরিঃ ১১ বঃ মাঃ, হেড়্‌ঃ শ্রীচরণ আমু (টংচঙ্গ্যা) সীমা যথা, উ — পশ্চিম হরিণছরার মুখ হইতে পূর্ব্বে গাছকাটার মুখ পর্য্যন্ত রাইন খ্যং নদী; পূ — গাছকাটা ছরার মুখ হইতে তাহার দোছরী, তথা হইতে জলাঙ্ক পর্য্যন্ত ডানের গাছকাটা ছরা; দ —উৎপত্তিস্থান হইতে মুখ পর্য্যন্ত ডানের ও গাছকাটাছরা; প — মুখ হইতে দোছরী পর্য্যন্ত হরিণছরা, তথা হইতে উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত বামের হরিণছরা এবং উত্তরে যে বিন্দু হইতে বামের হরিণছরা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে দক্ষিণে ডানের গাছকাটাছরার উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত খিলাছরা।

১৮

বল্লালছরা — পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেড়ঃ শ্রীচন্দ্রধন আমু (টং চঙ্গ্যা)। সীমা যথা, উ — রাইনখ্যং মুখ হইতে দোছরী পর্য্যন্ত বহুলতলী ছরা, তথা হইতে ভালাঙ্ক পর্য্যন্ত ডানের বহুলতলী ছরা, তাহা হইতে এক দিকে বল্লালছরা ওতিনকুন্যাছরা, অপরদিকে গাছকাটা —এতৎ মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী; পূ — রাইন্‌খ্যাং রিড্যার্ভ।

৮। আট নম্বর তালুক শুভলং

১

মিতিঙাছরি — পরিঃ ব- মাঃ, হেড়্‌ঃ শ্রী কৃষ্ণকিশোর দেওয়ান। সীমা যথা, উ — কর্ণফুলী, পূ — শুভলং এবং হাজাছরী; দক্ষিণ ও পশ্চিম — পশ্চিমে হাজাছরীর উৎপত্তিস্থান হইতে উত্তরে যেখানে শুভলং পর্ব্বতশ্রেণী কর্ণফুলীর সহিত মিলিত হইয়োছে, ততদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতশ্রেণী।

২

জুরছরী — পরিঃ ১৫ বঃ মাঃ রাজাবাহাদুরের খাস। সীমা যথা, উ — শুভলঙের করদ খাগারাছরী: পূ — খাগারাছরীব করদ উপরের বালুখালি, সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত নিম্ন পাহাড়

সমুদায় সাইচ্যল পর্ব্বতশ্রেণী; দ — পানছরী; মুখ হইতে নিম্নদিকে উপরে শিলছরী পর্য্যন্ত শুভফলং উপরের শিলছরী, উপরের শিলছরী ও চুমাচুমির মধ্যবর্ত্তী পুখা পর্ব্বতশ্রেণী, চুমাচুমি, তাহার মুখ হইতে নিম্নদিকে খাগরাছরীর মুখ পর্য্যন্ত শুভলং।

৩

আঁধার মানিক — পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, রাজাবাহাদুরের খাস। সীমা যথা, — উ — ছোট বাঘা, ছোট বাঘার উৎপত্তিস্থান হইতে ডানের হাজাছরীর উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত এক সরলরেখা হাজাছরী, কর্ণফুলী এবং সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী; পূ — এরেইছরী; দ — নিম্নে এরেইছরীর উৎপত্তিস্তান হইতে কেতর খাইয়ার মুখ পর্য্যন্ত শুভলং, কৈতর খাইয়ার উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত বামের কৈতর খাইয়া, হাজাছরী, তাহার মুখ হইতে নিম্ন দিকে কর্ণফুলীর সহিত সঙ্গমস্থান পর্যন্ত শুভলং; প — কর্ণফুলী।

৪

জারুলছরী — পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ — তিন টিলাছরা; পূ — শুভলং; দ — মঘাছরী; প — উচ্চপর্ব্বতশ্রেণী।

৫

এবেইছরী — পরিঃ ৭১/৪ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী মদনমোহন দেওয়ান। সীমা যথা, উ — এরেইছরী, ডানের এরেইছরী এবং এরেইছরীর উৎপত্তিস্তল উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; পূ — উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী এবং খাগরাচরীর করদ কুসুমছরী; দ — খানারাছরী; প — শুভলং।

৬

পানছরী — পরিঃ ২০ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রীলাল মোহন দেওয়ান। সীমা যথা, উ — শুভলঙের করদ পানছরী; পূ — ডানের পানছরী ও সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী; দ — মৈদং এবং বামের মৈদং প — শুভলং।

৭

মৈদং—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী বিরাজমোহন দেওয়ান। সীমা যথা, উ — মৈদং এবং বামের মৈদং. পু — মৈদং এর উৎপত্তিস্থল উচ্চ পবর্বত শ্রেণী, দঃ শুভলঙের করদ তে-ছরী, প — শুভলং।

৮

তিন্‌দোছ্‌রী — পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, হেড্‌ঃ শ্রী নীলচন্দ্র কারবারী সীমা যথা উ —তে-ছ্‌রী, পূ — সাইচাল;দ — হরিণ খাটছ্‌রা, পশুতলং এবং হরিন খাটছ্‌রা।

৯

বাঘাছোলা — পরিঃ ২$^{১}/_{২}$ বঃ মাঃ, হেড্‌ঃ শ্রী পঞ্চারাম তালুকদার। সীমা যথা,উ — কর্ণফুলী; পূ — কর্ণফুলীর করদ ও থাহা দেওয়ানের চরের কিঞ্চিৎ নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই হাজাছ্‌রী, ডানের হাজাছ্‌রী, হাজাছ্‌রীর উৎপত্তি স্থান হইতে ছোট বাঘা পর্য্যন্ত এক সরল, রেখা; দ— কর্ণফুলীর করদ ছোট বাঘা এবং কর্ণফুলী; প — কর্ণফুলী।

১০

চোখপতিঘাট —পরিঃ ৩।। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী কিঙ্কর দেওয়ান। সীমা যথা উ — খাগারাছ্‌রীর নীচে ও বনজুগীছ্‌রীর উপরে শুভলঙে পতিত এক ছোট ঝিড়িড়ি হইতে বনজুগীছ্‌রার করদ বামের ও ডানের ঢেবাছ্‌রীর সংযোগস্থল পর্য্যন্তএক সরলরেখা, উৎপত্তিস্থান হইতে বামের চেবাছ্‌রীর সহিত সংযোগস্থল পর্য্যন্ত ডানের ঢেবাছ্‌রী, ডানের ঢেবাছ্‌রীর উৎপত্তিস্থানের গড় পাহাড়;পূ —শুভলং;দ — চুমাচুমি এবং বামের চুমাচুমি;প —উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

১১

ডুবাজারুল — পরিঃ১০ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী জালৈয়া তালুকদার। সীমা যথা, উ—উপরের শিলাছ্‌লী;পূ — শুভলং;দ—তিনটিলাছ্‌রা; প — উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

১২

কুসুমছ্‌রী — পরিঃ ৫ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রীবীনাধন দেওয়ান। সীমা যথা, উ — খাগরাছ্‌রীর করদ কুসুমছ্‌রী;প — সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী;দ — উৎপত্তিস্থান হইতে নিম্নে কুসুমছ্‌রীর মুখ পর্য্যন্ত খাগরাছ্‌রী;প — খাগরাছ্‌রী।

১৩

ইৎছ্‌রী — পরিঃ ৯ বঃ মাঃ হেডিঃ শ্রী পুষ্পধন আমু (টং চেঙ্গা)। সীম! যথা উ — কাঁদেবাছ্‌রী; পূ — শুভলং;দ —হরিণখাটছ্‌রা;প — উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

১৪

বনজুগাছরা — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রীচন্দ্রধন তালুকদার। সীমা যথা মৌজার উ — বামের কৈতরখাইয়া এবং কৈতরখাইয়া পূ — শুভলং;দ — ১০ নম্বর চোখপতিঘাট মৌজার উত্তর সীমা; প — উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

১৫

ফকির-ছরা-পরিঃ ৫ বঃ মাঃ হেড্ঃ শ্রী মেঘনাথ দেওয়ান। সীমা যথা উ — মঘাছরী; পূ — শুভলং;দ — কাঁদেবাছরা; প—উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

১৬

লুলাংছরী — পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রী কৈলাসধন দেওয়ান। সীমা যথা, উ -– উৎপত্তি স্থান হইতে উপরের বালুখালির সহিত সংযোগস্থান পর্য্যন্ত খাগারাছরী;পূ — সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী; দ — সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উপরের বালুখালির উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত গড় পাহাড়; পূ —খাগারাছরীর করদ উপরের বালুখালি।

৯। নয় নম্বর তালুক বড় কল

১

ভুষণছরা — পরিঃ ১৬ বঃ মাঃ, রাজাবাহাদুরের খাস। সীমা যথা, উ — বক -রিবাপেরছরা; তাহার সহিত সংযোগস্থল হইতে কর্ণফুলীর সহিত সংযোগস্থল পর্য্যন্ত ছোটহরিণা, পূ — কর্ণফুলী;দ — কর্ণফুলী এবং বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী;প — বড় কল পর্ব্বতশ্রেণী।

২

গুইছরী — পরিঃ ২০ বঃ মাঃ রাজাবাহাদুরের খাস।।সীমা যথা, উ — কর্ণফুলী; পূ — ঠেগাখাল; দ —মোন্দুরছরী;প -সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী।

৩

দুমদুখ্যা— পরিঃ ২০ বঃ মাঃ রাজাবাহাদুর ঘাস। সীমা যথা, উ—ডলুছরী, পূ—ঠেগাখাল, দ—মোন্দরছরী, প—সাইচাল পবর্বত শ্রেণী।

৪

গর্জ্জনতলী — পরিঃ ৫ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রীকুলচন্দ্র তালুকদার। সীমা যথা, উ— ধনঞ্জাছরী; পূ — মাওদং পর্ব্বতশ্রেণী;দ — উলুছরী এবং তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে উচ্চ পর্ব্বত পর্য্যন্ত এক গড় পাহাড়; প — কর্ণফুলী।

৫

গোরস্থান — পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেড়ঃ শ্রীচন্দন খাঁ দেওয়ান। সীমা যথা, উ — ।
ঃ মাওদং পর্ব্বতশ্রেণী; দ —ধঞ্জাছরী; প — কর্ণফুলী।

৬

বড় হরিণা — পরিঃ ১৮ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রী তোজিরায় রোয়াঝা (ত্রিপুরা)। সীমা যথা, উ — বড়হরিণার করদ গাছকাটা ছরা, পূ — নিম্নের গাছকাটা-ছরার সহিত সংযোগস্থল হইতে মাহালছরীর সহিত সংযোগস্থল পর্য্যন্ত বড় হরিণা;দ — বড় হরিণার করদ মাহালছরী, প — উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী ।

৭

আইরা ছরা — পরিঃ ১৩ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রীরওন খাঁ দেওয়ান। সীমা যথা, উ — করদ বাকছরীর নিম্নে ও কালাপুনাছরার উপরে পতিত জঘনাছরী, এবং ইহার উৎপত্তিস্থান হইতে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত এক গড়পাহাড়; পূ — সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী, দ্বিতীয় দোছরীর বামের আইবাছরী এবং দ্বিতীয় দোছরীর ডানের দোছরী;দ — সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী; প — কর্ণফুলী।

৮

হেইৎভরাইয়া — পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রী ইন্দ্রধন দেওয়ান। সীমা যথা, উ — ডেলুছরী, এবং ইহার উৎপত্তিস্থান হইতে উচ্চপর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত এক গড় পাহাড়, পূ - সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী; দ — ৭ নম্বর আইবাছরা মৌজার উত্তরসীমা; প — কর্ণফুলী।

৯

কুকিছরা — পুরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীচংপুইলাল রোয়াঝা (কুকি)। সীমা যথা উ — ছোট হরিণা এবং বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী; পূ — উৎপত্তিস্থান হইতে নিম্নদিকে তদীয় করদ কুকিছরার সহিত সংযোগস্থল পর্য্যন্ত ছোট হরিণা; দ — কুকিছরা ও ডানের কুকিছরা; প —বড়কল পর্ব্বত্শ্রেণী।

১০

ছোটহরিণা — পরিঃ ১৫ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী পুচিহাম রোয়াঝা (ত্রিপুরা) সীমা যথা, উ— ডানের কুকিছরা, ছোট হরিণার করদ কুকিছরা; ছোট হরিণা কালা পুনাছরা, পূ — ধুমবাৎ পর্ব্বতশ্রেণী; দ — গুইছরী, ছোটহরিণা, ছোটরহিণার করদ রক্‌বিবাপেরছরী, ডানের রকবিবাপের ছরী; প- বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী।

১১

মাওদং — পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী ভৈরবচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা. উ — কর্ণফুলী; পূ - মাওদ; পর্ব্বতশ্রেণী; দ — কর্ণফুলীর হেদয়ার ছরা; প — কর্ণফুলী।

১২

ধূমবাৎলাং — পরিঃ ৮ বঃ মাঃ হেড়ঃ শ্রী পবনরাজ দেওয়ান। সীমা যথা; উ — তৈপুং এবং তাহার করদ এবং মধ্যবর্ত্তী নিম্নপর্ব্বতশ্রেণী, তগলকছরা, এবং বড় হরিণার সহিত সংযোগস্থলের নিম্নদিকে তৈবুং; পূ — বড়হরিণা, এবং বড়হরিণার মুখ হইতে নিম্নদিকে ছোট হরিণার মুখ পর্য্যন্ত কর্ণফুলী; দ — মোহনা হইতে উপর দিকে গুইছরীর সহিত সংযোগস্থল পর্য্যন্ত ছোটহরিণা; প — মুখ হইতে দোছরী পর্য্যন্ত গুইছরী, তথা হইতে জলাঙ্ক পর্য্যন্ত ডানের দোছরী; পরেউঠানচওরা এবং দক্ষিণে উঠানচরা হইতে উত্তরে জয়বুং ও তশলক ছরার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী।

১৩

তৈবুং -— পরি ৯ বঃ মা-, হেডঃ শ্রীমাণিক্যা তালুকদার। সীমা যথা, উ — রাঙাপানি ছরা, এবং ডানের রাঙাপানি ছরা; পূ — বড়হরিনা; দ — তগলকছরা;প —তৈবং ও তগলকছরার মধ্যবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

১৪

বামের হালম্বা — পরিঃ ৬১/২ বঃ মাঃ, হেড়ঃ শ্রী বিদ্যাধর তালুকদার। সীমা; যথা উ—বামের মাহালছরী; পূ — বড় হরিণা; দ —রাঙাপানিছরা এবং ডানের রাঙাপানিছরা প — পাহাড় এবং বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী।

১৫

সাইচাল — পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রী তাঙ্গ্যা রোয়াঝা (পাঙেখায়া) সীমা যথা, উ — বামের আইরাছ্বার দ্বিতীয় দোছ্বরী; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-সাইচাল পর্ব্বতশ্রেণী; প -ডানের আইবাছ্বার দ্বিতীয় দোছ্বরী।

১৬

কলাবন্যাছ্বরা — পরিঃ ২ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রীচুন্ন তাং রোয়াঝা (পাঙেখায়া) সীমা যথা উ ধূমবাংলা; পর্ব্বতশ্রেণী; পূ —ঐ; দ — ছোট হরিণার করদ কলাবন্যাছ্বরা; প-ছোটহরিণা।

১৭

চিবা বড়হরিণা — পরিঃ ৮ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রী জয়ন্ত তালুকদার। সীমা যথা, উত্তর ও পূর্ব্ব - উৎপত্তিস্থান হইতে নিম্নদিকে গাছকাটাছ্বরার মুখ পর্য্যন্ত বড় হরিণা; উত্তর ও পশ্চিম - বড়কল পর্ব্বতশ্রেণী; দ — বড়হলিনার করদ গাঠ কাটছ্বরা।

বোমাং সার্কেল *

১। এক নম্বর তালুক সোনাইছ্বরী

১

খাড়ং — (শ্রী খোয়াই লাউ (রায়াঝা),

২

রেজু —নোংগ্যে (রায়াঝা)

৩

সোনাইছ্বরী —(শ্রী চাঁইধা ও রোয়াঝা)

* প্রায়শই পরিবর্ত্তনশীল মৌজা-চকবন্দী বড় অধিক প্রয়োজনীয় হইবে না মনে করিয়া অতঃপর বোমাং ও মঙ সার্কেলের কেবল তালুক, তদন্তর্গত মৌজাএবং বন্ধনী মধ্যে তত্তৎ হেতাম্যানের নাম দিয়া গেলাম।

৪

নাখাংছরী — (শ্রীমংফুই (রায়াক্ষা),

৫

তুম্বুরু — (শ্রীমাহাদ আলি),

৬

জারুল্য — (শ্রী চাঁই ও সুরুং),

৭

পাগলি — (শ্রী চাইলা কারবারী)।

২। দুই নম্বর তালুক দোছরী

১

দোছরী — (শ্রীছানাই রোয়াঝা)

২

তালুক খাইরা — (শ্রী খোঁয়াইখাই (রায়াঝা)

৩

তর্গু — (শ্রী আমুইমুরুং)।

৩। তিন নম্বর তালুক বাঘখালি

১। বাইশাড়ি — (শ্রীকেওমং রোয়াঝ), ২। বাঘখালি —(শ্রী খেপং বৈদ্য)

৪। চারি নম্বর তালুক ইয়ংছা

১। ইটগর —(শ্রীমংলা খাই), ২। ইয়ংছা — (চাঁথুয়াই রোয়াঝা), ৩। ছন্সু — (শ্রী রাজা মুরুং), ৪। ফ্যাসাখালি — (শ্রী অংথোয়াইমঘ)

৫। পাঁচ নম্বর তালুক অলিক দম

১। টোইন (শ্রীমংচাউ (রোয়াঝা), অলিকদম (শ্রী ফাইওয়া মুরুং), ৩। চোখ্যং — (শ্রী রেফো), ৪। মংগুই —(শ্রীমুইউ রোয়াঝা), ৫। টোইনফা — (শ্রীপাংলিং রোয়াঝা), ৬। চাইমফ্রা — (শ্রী লোচন খুমি)।

৬। ছয় নম্বর তালুক লামা।

১। ছাগল খাইয়া — (শ্রী অংজাই) ২। দরদরি — (শ্রী হরিফ্র রোয়াঝা), ৪। লামা -(শ্রী অংক্যজাই রোয়াঝা) ৪।নাথাং — (শ্রী মংপ্রেং রোয়াঝা), ৫। পো[illegible] —(শ্রী শঙ্কু রোয়াঝা) ৬। লং খ্যং — (শ্রী রেওয়ারাই মুরুং) ৭। ছোট বমু — (পাইচাউ রোয়াঝা)।

৭। সাত নম্বর তালুক বসু।

১। বম — (শ্রী জিনি ও রোয়াঝা) ২। সরই — শ্রীরাধামোহন ত্রিপুরা) ৩। লুলাই — (শ্রী লুওয়াই রোয়াঝা) ৪। ডলু — (শ্রী জগবন্ধু ত্রিপুরা), ৫। জেমুপালং — (শ্রী আ হৈ মুরুং।

৮। আট লম্বর তালুক ফাইতং

১। গজাল্যা — (শ্রী থোয়াইং[illegible] রোয়াঝা), ২। ফাইতং — (শ্রীলাইও), ৩। চাম্বী — (শ্রী ইয়লাফ্র রোয়াঝা)।

৯। নয় নম্বর তালুক তঙ্কাবতী।

১। উত্তর হাঙ্গর — (শ্রী নীলাম্বর দে), ২। দক্ষিণ হাঙ্গর —(শ্রী চিম্বেক মুরুং), ৩। তঙ্কাবতী — (শ্রী আবদুল বারি সিকদার) ৪। হরিণ ঝিড়ি — (শ্রী কিংলাই মুরুং) ৫। টাকের পানছরী (শ্রী রেংরাং মুরুং)।

১০। নম্বর তালুক বান্দর বন।

১। বান্দর বপন —(রাজার খাস), ২। সুয়ালক — (শ্রী ঘুঁইয়রি রোয়াঝা), ৩। বেনীকাং — (শ্রী রামহরি মুরুং) ৪। বেতছরী —(শ্রী ক্যজখাঁই চৌধুরী), ৫। কাচলং —রাজার খাস)।

১১। এগার নম্বর তালুক ক্যমলং

১। কুললং — (শ্রী মংলাফ্র রোয়াঝা), ২। রাজবিলা — (শ্রীরুইভ্যং), ৩। কাক্রাছরী — (শ্রীচাইয়ংগ রোয়াঝা), ৪। রা-খালি (শ্রীওগাফ্র চৌধুরী), ৫। নারাণ গিরি — (শ্রী চাঁয়রী চৌধুরী), ৬। চিৎমরং (শ্রী থোয়াইনফ্র চৌধুরী) ৭। চেমি — (শ্রীরুই ও রোয়াঝা), ৮। কোলাখ্যং — (শ্রীছাথোয়াইফ)।

১২। বার নম্বর তালুক কাপ্তাই

১। পেকুয়া — (শ্রী মোনারাম কারবারী),২। চেংখ্যং — (শ্রী ক্ষেমানন্দ ত্রিপুরা), ৪। কাপ্তাই — (শ্রী মণিরাম ত্রিপুরা), ৫। হারা — (শ্রী জলাফ্র রোয়াঝা), ১০।ধনুছরী — (শ্রী খিজাও ফাঙ্কি), ১১। আরাছরী — শ্রী দেবীচরণ কারবারী)।

১৩। তের নম্বর তালুক তারাছা

১।বালা ঘাটা — (শ্রীমংচাইয় চৌধুরী), ২। রোয়াংছরী — (শ্রী চাথোয়াইক্র মঘ), ৩। বেথ্যং — (শ্রী ছদু খাঁইরোয়াঝা), ৪। তারছা — (রাজার খাস), ৫। পাংখ্যং — (শ্রী ছদুইঞ রোয়াঝা), ৬। কিমুখ্যং — (শ্রী রামকুক্প কুকি), ৭।আলি খ্যং — (শ্রী থ্যাংলেইং কুফি), ৮।কখ্যাং — (শ্রীমংজ্যই রোয়াঝা), ৯। নোয়াপতং — শ্রী সেংতাং কুকি), ১০। মুরুখ্যং — (শ্রী ক্যজাই চৌধুরী) ১১। মৈনখ্যং —(শ্রী অংথোয়াই সরদার), ১২। লাফক্ষ্যং — (শ্রীমংকুইয় রোয়াঝা)।

১৪। চৌদ্দ নম্বরতালুক পাইন্দূ।

১। ঘরাউ (রাজার খাস), ২। পাইন্দু — (শ্রী মংথুইলা রোয়াঝা) ৩। চাঁদা (শ্রী থোয়াইংক্রে চৌধুরী), ৪। ফুমখ্যাং (শ্রী ছাথাংফ্র রোয়াঝা)।

১৫। নম্বর তালুক রুমা

১। কোলাড়ি — (রাজার খাস), ২। কেলু — (রাজার খাস)। ৩। চেফ্র — (শ্রী অংফ্র চৌধুরী), ৪। পলি (শ্রী মংখ্র রোয়াঝা)।

১৬। ষোল নম্বর তালুক চেমা।

১। ছাইকদু- পদচ্যুত। ২। খোয়াখ্যং — (শ্রী রাইয়ং মুরুং) ৩। খাইকখ্যং —(শ্রীমংক্য রোয়াঝা, ৪। থান্‌ছি — (শ্রীলৈদু তাং মুরুং)

১৭। সতের নম্বর তালুক ঘালাইঙ্গা

১।আলেক্‌খ্যং — (শ্রী অংজাউ), ২। ঘালাইঙ্গ্যা - (রাজার খাস), ৩। পানতলা — (শ্রীথাংলাই মুরুং) ৪। সেঙ্গুন — (শ্রীছানাইফ্র রোয়াঝা)।

১৮। আঠার নম্বর তালুক রেমাক্রি

১। তিন্দু — (শ্রীকংপ্রং রোয়াঝা), ২। মিবুখ্যা — (শ্রীলাংতাই থুমি) ৩। সিঙ্গাপা —(শ্রী অং থোয়াইঙ্গ থুমি), ৫। মধু — (শ্রী লেংথুই থুমি), ৫। রেমাক্রি — (শ্রী কোকাই খুমি)

মঙ্‌ সার্কেল

১। এক নম্বর তালুক রামাশরা

১। আমতলী — (শ্রীরসিকচন্দ্র দেওয়ান), ২। বড়নাল — (শ্রী ভৈরব চন্দ্র দেওয়ান), ৩। তুবুলছরী — (শ্রী কৈলাসচন্দ্র তালুকদার), ৪। তৈলাভাঙা (শ্রী শিশির কুমার দেওয়ান), ৫। আচলং—শ্রী মাণিকধন তালুকদার), ৬। বড়বিল— (শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেওয়ান), ৭। অযোধ্যা - (শ্রী ধর্ম্ম ধাম), ৮। বেলছরী - (শ্রী রুঘু মণি), ৯। ভার্গগ্যা নালা — (শ্রী রঙ্গচরণ রোয়াঝা) , ১০। খেদপুরী — শ্রীরামপদ রোয়াঝা), ১১। গোমতী (শ্রীমধুমঙ্গল), ১২। বান্দর ছরা — (শ্রী মণিরাম রোয়াঝা) ১৩। তাইংদং — (রাজার খাস), ১৪। মাকুম তেছা — (শ্রী জাংফা রোয়াঝা) ১৫। বাদুলছরা (শ্রী মঙ্গল চাঁন), ১৬। চাঁয়রাকাপা - শ্রী পূর্ণচন্দ্র পো মাং), ১৭। বাইনাগুমতী — (শ্রী কানুরাম তাইমাং)

২। দুই নম্বর তালুক অযোধ্যা

১। মাটিরাঙা — (শ্রী মধু তুহশীলদার), ২। গুইমারা— (শ্রীমংখে চৌধুরী), ৩। ছদোয়াপাড়া — (শ্রীক্যজ চৌধুরী) ৪। বাইলাছরী — (শ্রী রাজুধন রিয়াং), ৫। তৈমাতে — (শ্রীক্যজরী চৌধুরী), ৬। ধল্যা — (শ্রী সুন্দরাম মুরুচি), ৭। হাজাছরী — (শ্রী রামকান্ত রোয়াঝা)। ৮। অভ্যা — শ্রী নয়ান সিং রোয়াঝা), ৯। আলুটিলা — (শ্রী গগনচন্দ্র দেওয়ান) ১০। তৈকাতাং — শ্রীর্সাবঞ্জর রোয়াঝা) ১১। দলদলি — (শ্রী বংশীচরণ রোয়াঝা), ১২। ওয়াচ — (শ্রী দোয়ং চৌধুরী)।

৩। তিন নম্বর তালুক সোনাই পাথর

১। মাণিকছরী — (রাজার খাস) ২। বড় পিলাক — (শ্রী লাথোয়া চৌধুরী), ৩। জুগ্যারচোলা — (শ্রী মংসা চৌধুরী) ৪। জাইছরী — (শ্রী মথুরা চৌধুরী) ৫। বরৈতলী — (শ্রী থোয়ারী চৌধুরী), ৬। লুরে মরম — (শ্রীরেত্রা চৌধুরী), ৭। ডলু — (শ্রী খংজুই চৌধুরী, ৮। ডেবলছরী — (শ্রী সুইপ্রু চৌধুরী), ৯। গৈছরী — (শ্রী চরেফ্র চৌধুরী), ১০। জারুলছরী — (শ্রী চোলাপ্রু চৌধুরী), ১১। জুগাছরী — (শ্রী সুইলাপ্রু চৌধুরী) ১২। দুল্যাতলী -- শ্রীকঁও চৌধুরী) ১৩। মৈয়ার খিল —(শ্রীছাথং চৌধুরী), ১৪। মংক্রুতলী — (শ্রী ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী) , ১৫। রাঙাপান্যা — (রাজার খাস) ১৬। তিনদোছরী — (শ্রীহলাধু চৌধুরী), ১৭। কুমারী — (শ্রী কোংডায় চৌধুরী), ১৮। তৈকর্ম্মা — (শ্রীঐঙ্গ চৌধুরী) ১৯। সিন্দুকছরী — (শ্রী জিয়াধন রোয়াঝা), ২০। হাপছরী — (রাজার খাস), ২১। নাক্রোই — (রাজার খাস)।

৪। চারি নম্বর তালুক সোনাই পাথর

১। রামগড় — (শ্রী চাইনধাও চৌধুরী), ২। বাডানাতলী — (শ্রীক্যজরি চৌধুরী), ৩। কালাপানি — (শ্রী রামমণি রোয়াঝা) ৪। ছদুরখিল — (শ্রী অঙ্গ্যা চৌধুরী), ৫। তেমরম — (শ্রী দোয়ং চৌধুরী), ৬। চাইফ্রপাড়া — শ্রীকঞ্জাফ্র চৌধুরী, ৭। নাকাপা — শ্রী মাথাল্যা চৌধুরী) ৮। পন্ডরাম ঘাট — (শ্রী তারি রোয়াঝা), নাঙা — (শ্রীদিকাও চৌধুরী।)

৫। নম্বর তালুক পুঁজগাও

১। গাছবান — (শ্রী শ্রীদাস রোয়াঝা), ২। জোরমরম — (শ্রী গগন চন্দ্র রোয়াঝা) ৩। বেগুনছরা — রাজার খাস), ৪। লতিকান — (রাজার খাস), ৫। পুঁজগাং — (রাজার

খাস), ৬। চেঙ্গী — (রাজার খাস), ৭। লোগাং — (রাজার খাস), ৮। বড় পানছড়ী — (রাজার খাস), ৯। ছোট পানছড়ী - রাজার খাস), ১০। যুগলছড়ী — (রাজা বাহাদুর)।

৬ নম্বর তালুক মাহালছড়ী

১। মুবাছড়ী --- (শ্রী নিত্যানন্দ খিসা), ২। কাইয়ংঘাট — (শ্রী রাজকুমার তালুকদার, ৩। লেম্বুছড়ী — (শ্রী নবীনচন্দ্র তালুকদার), ৪। চাঁয়রাছড়ী — (শ্রী কাঁলাচাঁদ চৌধুরী), ৫। খেলাপাড়া — (শ্রীমংক্র চৌধুরী), ৬। দুপুগ্যানালা — (শ্রী রামমোহন খিসা), ৭। সেরেঙানালা — (শ্রী কিস্তা খিসা), ৮। মাচছড়ী — (শ্রী লাব্রেচাঁই চৌধুরী), ৯। গামারী ঢালা —শ্রী উমাচরণ দেওয়ান), ১০। নূনছড়ী — শ্রী গোবর্দ্ধান রোয়াঝা), ১১। উল্টাছড়ী — (শ্রী হরিধন), ১২। দাদকূপ্যা — (নাবালক পক্ষে মংখই), ১৩। ইদছড়ী — (শ্রী হরিধন দেওয়ান), ১৪ দুরছড়ী --- (শ্রী পূর্ণজয়), ১৫। গোলাবাড়ী — (শ্রী বেম্রাচাঁই), ১৬। কমলছড়ী (ঈশানচন্দ্র দেওযান), ১৭। ভুয়াছড়ী — (শ্রী মোগলধন কারবারী), ১৮। বাঙালকাঠি — (শ্রীযজ্ঞ ধন রোয়াঝা), ১৯। পোয়াছড়া (শ্রী কুঞ্জলারিয়াং)।